বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীসুকুমার সেন, এম্-এ, পি-এইচ্, ডি
অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয

মডার্ণ বুক এজেন্সি
১০ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা

|| আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েষু ||

|| আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েষু ||

|| আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েষু ||

|| আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েষু ||

|| আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েষু ||

|| আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েষু ||

রবীন্দ্র-পর্ব্ব

সৃষ্টি-যুগ (১৮৮১-১৯৪১)

তিস্রো দ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থা

একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট্।

আণিং ন রথ্যমমৃতাধি তস্থু-

রিহ ব্রবীতু য উ তচ্চিকেতৎ ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথের রসদৃষ্টির অভিব্যক্তি ও স্বরূপ

১

কাব্যসৃষ্টির ভিতর দিয়া কবিচিত্তগহনের যে গভীর প্রেরণা বিচিত্র রূপরসরীতিতে অভিব্যক্তি লাভ করিবার চেষ্টা করে তাহার মধ্যে কবির মানসপ্রকৃতির গঠনের বিবর্তনের ও পরিণতির পরিচয় সাধারণত দুর্লক্ষ্য হইলেও নিতান্ত অপ্রাপ্য নয়। অবশ্য এই পরিচয় মিলে সেইসকল লেখকের রচনায় যাঁহারা প্রকৃত কবি—যাঁহাদের নিগূঢ় ব্যক্তিত্ব বহির্জগৎ অপেক্ষা অন্তর্লোকেই বেশি করিয়া প্রকাশ পায়, কাব্যকলার মধ্য দিয়া যাঁহাদের ব্যক্তিত্বের আকুতি সার্থকতা খোঁজে, যাঁহারা রূপরসবর্ণগন্ধশব্দস্পর্শভাবের জগৎকে স্বকীয় হৃদয়াবেগের ও উপলব্ধির রসায়নে জীর্ণ ও আত্মসাৎ করিয়া নূতন রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর যাঁহারা সত্যকার কবি-মনীষী নহেন, যাঁহারা কবিভাবাব মাত্র, কাব্যরচনা যাঁহাদের কাছে কলাবিলাস বা চিত্তবিনোদন-উপায় ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়, যাঁহারা সৃষ্টি না করিয়া নকল করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র,—তাঁহাদের কাব্যকলায় নিগূঢ় ব্যক্তিত্বের প্রতিবিম্বন নাই।

রবীন্দ্রনাথ "কবীনাং কবিতমঃ"। তাঁহার মত মনে-প্রাণে চিন্তায়-কর্মে দুঃখে-সুখে জীবনে-মরণে সমানভাবে রসদৃষ্টিমান্ সাহিত্যস্রষ্টা মানুষের ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি জন্মায় নাই। বহুমুখ গুণপনায় এবং রসসৃষ্টিশিল্পের বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনারূঢ় হইতে পারে এমন নাম বোধ করি তিনটির বেশি মিলে না। একজন হইতেছেন প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লেস, দ্বিতীয় মধ্যযুগের ইতালীয় শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, এবং তৃতীয় আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের কবি কালিদাস।— তিনজনের মধ্যে শুধু কালিদাসই কতকটা কাব্যরস

সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সমানধর্ম্মা। রবীন্দ্রনাথের উত্তুঙ্গ প্রতিভার বন্দনা করিতে গেলে বৈদিক-কবিকৃত দেবরাট্ ইন্দ্রের বন্দনাই মনে পড়ে,

নহী নু-অস্য প্রতিমানমস্তি
অন্তর্জাতেষু-উত যে জনিত্বাঃ।

২

কবিমানসপ্রকৃতির ও রসদৃষ্টির বিকাশের ও পরিণতির দিক দিয়া বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কাব্যসৃষ্টিকাল এই তিন যুগে ভাগ করা যায়—আত্মমুখীন (ইন্‌ট্রস্‌পেক্‌টিভ), প্রাঙ্‌মুখীন (প্রস্‌পেক্‌টিভ), এবং পরাঙ্মুখীন (রিট্রস্‌-পেকটিভ)।

নিতান্ত বালককালেই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার উদ্বোধন হইয়াছিল। বড় কষ্টের এই উদ্বোধনকে তপস্যা বলিলে অযথার্থ হয় না। শৈশবের বেশির ভাগ এবং পৌগণ্ড কাটিয়াছিল অন্তঃপুরের অনাদরে, বাহির মহলে দ্বিতলের এক ঘরের কোণে ভৃত্যশাসনের গণ্ডীর মধ্যে। বহুসন্তানবতী মাতার স্নেহদৃষ্টি সর্ব্বদা সুলভ ছিল না। বাহির মহলে বড়রা থাকিতেন তফাতে, নিজেদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে আসর জমাইয়া। ছোট-ছেলেদের বাড়ির বাহির-দরজা পার হইবার হুকুম ছিল না। তাঁহার অপেক্ষা বছর দুয়েকের বড় সঙ্গী দাদার ও ভাগিনেয়ের দেখাদেখি রবীন্দ্রনাথ জেদ করিয়া নিতান্ত শিশুবয়সেই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। কিন্তু স্কুলে গিয়াও বিশেষ লাভ হইল না। বিদ্যালয়ের সাধারণ সহপাঠীদের অভদ্র স্বভাব ও অশুচি ব্যবহার গৃহকোণপালিত বালকের রুচির আভিজাত্যের ও মনের শুচিতার উপর রূঢ় আঘাত হানিয়া তাঁহার চিত্তকে সঙ্কুচিত স্পর্শকাতর এবং আত্মগত করিয়া দিল। মনের এই inhibition বা সঙ্কোচপরায়ণতার জন্য পরবর্ত্তিকালে লোকে অযথা কবিকে অহঙ্কৃত ও আভিজাত্যপরায়ণ মনে করিয়া তাঁহার উপর পুনঃপুন অবিচার করিয়াছে।

সাধারণ অবস্থায় ভদ্রঘরের ছেলেরা বাল্যে ও কৈশোরে ঘরে-বাহিরে অল্পস্বল্প স্বাধীনতা পাইয়া বয়স্য-সহপাঠীদের সাহচর্য্যে চিত্তস্ফূর্ত্তির ও আত্মবিস্তারের যে-

সব সুযোগ পায় বালক রবীন্দ্রনাথের অদৃষ্টে তাহা জোটে নাই। অধিকন্তু ইনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক ও মুখচোরা ছেলে। তাই ইচ্ছা ও সুযোগ সত্ত্বেও উপযাচক হইয়া কাহারো সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করা সে-বয়সে ইহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব ছিল। বাল্যে স্বাভাবিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন বলিয়া উদ্দাম নিরাবরণ ক্রীড়ারত শিশুর রূপ কবির চিত্ত চিরকাল আকর্ষণ করিয়াছে;—"মন কাঁদ্‌চে, মর্‌বার আগে গা-খোলা ছেলের জগতে আরেকবার শেষ ছেলে-খেলা খেলে নিতে…।"

ভৃত্যশাসনের গণ্ডীবদ্ধ গৃহকোণ হইতে জানালার সঙ্কীর্ণ অবকাশ দিয়া বহিঃপ্রকৃতির যেটুকু অংশ তাঁহার নয়নগোচর হইত,—বাহির-বাগানের পুকুরের একধার, তাহার এক কোণে ঝুরি-নামানো চীনা বটগাছ, জলে পাতিহাঁসের সাঁতার আর পাড়ার লোকের নিত্যনিয়মিত স্নানের বিচিত্র ভঙ্গি, আকাশের কালিটুকুতে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা—এইসব দেখিয়া দেখিয়া এবং তাহার উপর শিশুকল্পনার বিচিত্র রঙ ফলাইয়া কবির শৈশবের নিঃসঙ্গ নির্জন দিনগুলি গড়াইয়া যাইত। সন্ধ্যায় ভৃত্যদের কাছে এবং রাত্রে মা-দিদিমার মুখে শোনা রামায়ণ-মহাভারতকাহিনী রূপকথা ও ছেলেভুলানো ছড়া শিশু কবির মনে দিনের বেলার নিরুদ্দিষ্ট শিথিল রূপকল্পনাকে সীমাবদ্ধ সংহত ও মূর্ত্ত করিয়া তুলিত। বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরধ্বনির ও শ্রাবণধারার ঝর্ঝরতানের সঙ্গে ছেলেভুলানো ছড়ার করুণ সুর মিলিত হইয়া বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের "জল পড়ে পাতা নড়ে"—এই আদিম ছন্দের তালে তাঁহার অস্ফুট রসকল্পনা আবেগের দোল খাইত। "বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী এল বান"—এই ছড়াটি বিশেষ করিয়া শিশুকবির চিত্তে যেন মেঘদূতের বাণী বহন করিয়া আনিত। এই ছড়া এবং বৃদ্ধ খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্জের ছড়া—যাহাতে নায়ক শিশু রবীন্দ্রনাথের "ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল"—ছন্দঃস্পন্দ ও শব্দচ্ছটা দিয়া শিশুচিত্তে রোমাণ্টিক কবিকল্পনার বীজ বপন করিয়াছিল। সুদূর অতীতের এই রোমাণ্টিক শিশুকল্পনার কথা স্মরণ করিয়া শেষবয়সে কবি লিখিয়াছেন,

প্রথম সার্থক কাব্যপ্রচেষ্টা বিদ্যাপতির পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল। "ভানুসিংহ ঠাকুর"—এই নামের মধ্যে কবি বিদ্যাপতির প্রতি তরুণ রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার পরিচয় রহিয়াছে।[১]

অল্পবয়সে রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের 'মন্দ্রনির্ঘোষে' আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বড় হইয়া যখন মেঘদূত পড়িলেন তখন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির প্রৌঢ়কল্পনায় কলিকাতার নবীন কবি স্বীয় শৈশবকল্পনার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

ইমারত-ঘেরা ক্লিষ্ট যে আকাশটুকু
তাকিয়ে থাকতো একদৃষ্টে আমার মুখে,
বাদলের দিনে গুরুগুরু কোরে তার বুক উঠতো দুলে।
বটগাছের মাথা পেরিয়ে কেশর ফুলিয়ে দলে দলে
মেঘ জুটতো ডানাওয়ালা কালো সিংহের মত।
নারকেল ডালের সবুজ হতো নিবিড়,
পুকুরের জল উঠতো শিউরে শিউরে।
যে চাঞ্চল্য শিশুর জীবনে রুদ্ধ ছিল
সেই চাঞ্চল্য বাতাসে বাতাসে বনে বনে!

কবিপ্রতিভাবিকাশের পক্ষে অপরিসীম সৌভাগ্যের হেতু হইলেও বাল্য-স্বাধীনতার অভাব ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথের মনকে অতিশয় স্পর্শকাতর করিয়াছিল। এইজন্যই তাহার বাল্য ও কৈশোর রচনায় যৌবনোন্মেষের স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণতার মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক বিষাদের গাঢ় ছায়াপাত হইয়াছে।

৩

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সম্পূর্ণ নিজস্ব কাব্য 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত'। এখানে দেখা গেল যেন কবির চিত্ত আত্মসংশয় ও সন্দেহভীরুতার গুটি কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্য

[১] প্রথম প্রথম ভারতীতে প্রকাশিত রচনায় স্বাক্ষর থাকিত "ভ"। ইহা "ভানুসিংহ ঠাকুর" এই নামের আদ্য অক্ষর। ভানু = রবি, সিংহ = ইন্দ্র।

উন্মুখ হইয়াছে। শুধু এই বাধা ও বেদনা যে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক যেন তখনও সহজ হইয়া উঠিতেছে না। তখনো কবিচিত্তে বাসনা ও আদর্শ সুস্পষ্ট রূপ ধরে নাই, তাই হৃদয়াবেগের অস্ফুটতা যেন কবিকে সংসারের সহজ সম্পর্ক হইত পৃথক্ করিয়া রাখিতেছিল। তাই কবি প্রভাত-সঙ্গীতের উৎসর্গে লিখিয়াছিলেন,

আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি একটা বাব্‌লা গাছের মত,
বড় বড় কাঁটার ঘায়ে তফাৎ থাকে লতা যত।
সকাল হলে মনের সুখে ডালে ডালে ডাকে পাখী,
(আমার) কাঁটা ডালে কেউ ডাকে না চুপ করে তাই দাঁড়িয়ে থাকি।

সেইজন্য বৃহৎসংসারের স্নেহ-প্রেম-সমর্থন-সমবেদনালাভের জন্য কবিচিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যাকুলতাই সন্ধ্যা-সঙ্গীতের রহস্য,

গুরুভার মন লয়ে, কত বা বেড়াবি ব'য়ে?
এমন কি কেহ তোর নাই,
যাহার হৃদয়'পরে মিলিবে মুহূর্ত তরে
হৃদয়টি রাখিবার ঠাঁই?

কবিহৃদয়ের তখন একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল কৈশোরপ্রেম, যে-প্রেমের স্নিগ্ধালোকে তরুণ কবির লাজনম্র চিত্তমুকুল বিচিত্র বর্ণগন্ধসমারোহে উন্মীলিত হইতেছিল। এই প্রেমের উদ্দেশ করিয়াই কবি লিখিয়াছিলেন,

আগে কে জানিত বল কত কি লুকান' ছিল
হৃদয়-নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে!

কিন্তু সেখানেও সম্পূর্ণ সান্ত্বনা নাই। সেখানে নিপীড়িত বাসনা ও নিরুদ্ধ ভাবাবেগ অলঙ্ঘ্য অন্তরায় রচনা করিয়াছে।

পরবর্তী কাব্য 'প্রভাত-সঙ্গীত'। সেখানে দেখি যে একদা শুভক্ষণে অকস্মাৎ কবিচিত্তে হতাশ-বাসনার কুজ্ঝটিকাজাল অপসৃত হইয়া গিয়া বৃহৎসংসারের বিচিত্র

জীবনরস অপরূপ মহিমায় উপচিয়া উঠিয়াছে। শৈশবে দোতলার ঘরের জানালা দিয়া যে মুগ্ধ দৃষ্টি অদূরে-সুদূরে পাঠাইয়া দিয়া শিশুকবি আলোছায়ার আলিম্পন-রহস্যে মন ডুবাইয়া বসিয়া থাকিতেন বহুকালের হারানো সেই রসদৃষ্টি আবার যেন তিনি নূতন করিয়া পাইলেন। বহিঃপ্রকৃতিকে ছাড়াইয়া কবিচিত্ত মানবপ্রকৃতির গভীরতর সৌন্দর্যে ডুব দিল। চোখের নেশা কবিকে নূতন কবিয়া পাইয়া বসিল। এখন,

মনেতে সাধ যে দিকে চাই
কেবলি চেয়ে রব!
দেখিব শুধু নয়ন মেলি
কথাটি নাহি কব!
পবাণে শুধু জাগিবে প্রেম
নয়নে লাগে ঘোর!
জগতে যেন ডুবিয়া রব
হইয়া রব ভোর!

মানবহৃদয়ের বিচিত্র স্নেহসম্পর্কের মধ্যে সেই রস কবিচিত্তকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল যাহা শৈশবে পর্য্যাপ্তভাবে জোটে নাই।

পথের ধারে, ঘরের দ্বারে
বালিকা এক মেয়ে
ছোট ভায়েরে পাড়ায় ঘুম
কত কি গান গেয়ে!
তাহাব পানে চাহিয়া থাকি
দিবস যায় চ'লে
স্নেহেতে ভরা করুণ আঁখি
হৃদয় যায় গ'লে!…

কোথা বা শিশু কাঁদিছে পথে
মায়েরে ডাকি ডাকি,
আকুল হয়ে পথিক-মুখে
চাহিছে থাকি থাকি !
কাতর স্বর শুনিতে পেয়ে
জননী ছুটে আসে,
মায়ের বুক জড়ায়ে শিশু
কাঁদিতে গিয়ে হাসে।

'ছবি ও গান' কাব্যে আসিয়া দেখি যে জীবলীলায় আনন্দদৃষ্টির এই নবলব্ধ স্বপ্নাবেশ 'কবিকে পাইয়া বসিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির পটে এবং মানবসংসারের প্রাঙ্গণে সর্ব্বত্রই কবি যেন রসসৌন্দর্য্যের ছবি দেখিতেছেন, এবং এই সৌন্দর্য্যোপলব্ধির রসাবেশ কবিতায় গানে উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেছে বস্তুসম্পর্ক এড়াইয়া এবং প্রচলিত ছন্দোবন্ধ কাটাইয়া।' কিশোরপ্রেমের সম্বন্ধেও কবিচিত্ত যেন সহজ ও সচেতন হইয়া উঠিয়াছে,

কথা কও নাহি কও
চোখে চোখে চেয়ে রও
আঁখিতে ডুবিয়া যাক আঁখি !

ছবি ও গানের পালা শেষ হইতে না হইতে এমন এক ঘটনা ঘটিয়া গেল, কবিচিত্তে এমন এক আকস্মিক দুঃসহ শোকের রূঢ় আঘাত লাগিল, যাহাতে ছবির নেশার ও গানের মোহের রসচাঞ্চল্য দূর হইয়া চিত্তে প্রশান্তির সঞ্চার করিল। এতকাল যেন কবিচিত্তের যৌবনস্বপ্নে বিশ্বের আকাশ ছাইয়াছিল ; এতদিন যেন মানবজীবনলীলার তটস্থ দর্শকরূপে কবি নিজেকে এক মোহের ঘেরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন,

আমি গাঁথি আপনার চারিদিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন

মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,

দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।

একমাত্র যাঁহার স্নেহদৃষ্টির আলোকে এবং মর্মবেদনার ছায়ায় কবিপ্রতিভা স্ফুটনোন্মুখ হইয়াছিল সেই বধূঠাকুরাণীর আকস্মিক মৃত্যুতে কবিচিত্তের রূপরসাবেশ টুটিয়া গেল; দর্শকের সুখাসন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কবি সহসা জীবনের কঠিন রঙ্গভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। এখন নূতনতর রসানুভূতির জন্য কবিহৃদয় বুভুক্ষিত হইয়া উঠিল; উৎকণ্ঠা জাগিল মানবজীবন রহস্যের গভীরতর পরিচয়ের জন্য,

এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে

জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।

শূন্যহৃদয়ের সুদুঃসহ শোক কবিচিত্তের আলস্য এবং কাব্যকলার অস্পষ্টতা অপসারিত করিয়া সচেষ্ট মানবপ্রীতির সঞ্চার করিল। বৃহত্তর জীবনের নিত্যোৎসবের মধ্যে কবি নিজের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষতি ভুলিতে চাহিলেন। তাই প্রার্থনা,

যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে

প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,

আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে

তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক!

কবিচিত্তে বাৎসল্যের আবির্ভাব কিশোরপ্রেমের বিরহবেদনায় মাধুর্য্যের ছোপ ধরাইল। কাব্যসৃষ্টির সার্থকতা বিষয়ে সংশয়ও যেন কাটিয়া গেল।

এ গান বাঁচিয়া থাকে যদি তোর মাঝে।

আঁখিতারা হয়ে তোর আঁখিতে বিরাজে!

এ যেন রে করে দান

সতত নূতন প্রাণ,

এ যেন জীবন পায় জীবনের কাজে!

কাব্যপ্রতিভার প্রথম অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ হইল 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে। অপূর্ণতা এবং অপরিণতি সত্ত্বেও ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিশিষ্ট বা

রিপ্রেজেন্টেটিভ কাব্য। পরবর্ত্তিকালের বিপুল রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই কড়ি ও কোমলে অঙ্কুরাবস্থায় আছে, এমন কি তথাকথিত মিষ্টিক্ আধ্যাত্মিকতাও। জীবনের গভীরতম রহস্যের ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই কবিচিত্তে ঔৎসুক্যের সঞ্চার করিয়াছে,

মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়! ···
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।

কড়ি ও কোমল হইতে রবীন্দ্রকাব্য-ইতিহাসে দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রাঙমুখীন যুগের আরম্ভ। কবিদৃষ্টিকোণ ঘুরিয়া গিয়াছে; কবিচিত্ত আপনার সৃষ্ট বাধা ভেদ করিয়া বৃহৎসংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণ করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কবিহৃদয়ের অতৃপ্তি ও বিরহবেদনা এখন মর্ম্মদহনের হেতু না হইয়া রসপরিণতি লাভ করিল এবং ভাবার্পিত বা idealised হইয়া একদিকে অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মলোকে উঠিয়া গেল, অপরদিকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। এইখানেই বুঝিতে পারি কেন রবীন্দ্রকাব্যে ব্রহ্ম ও বিশ্ব, জীব ও জগৎ অখণ্ডভাবে ও অবিরোধে একই সঙ্গে স্থান পাইয়াছে। এই অদ্বৈত-দৃষ্টির পিছনে কোন বিশিষ্ট দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক মতবাদ নাই, আছে রসানুভূতিলব্ধ সত্যবোধ। ইহার সহিত উপনিষদের কবির আনন্দানুভূতির সবিশেষ ঐক্য আছে।

'মানসী'র কবিতাগুলি লিখিবার কালে কবির ভরা যৌবন। ভাব ও কাল অনুসারে মানসীর কবিতাগুলিতে দুইটি স্তর লক্ষিত হয়। প্রথম স্তরের কবিতায় দেখা যায় যে প্রেমস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে এবং কবিচিত্ত আত্মস্থ হইয়া স্থূল প্রেমের অতৃপ্তি ও গ্লানি হইতে মুক্ত হইয়া স্থিরতর আত্মরতির মধ্যে আশ্রয় খুঁজিতেছে। তবুও অন্তর্দ্বন্দ্বের আর্ত্তি একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাই প্রশ্ন

হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?

দ্বিতীয় স্তরের কবিতায় নবযৌবনের অকৃতার্থ প্রেম রসায়িত এবং লোকাতীত আদর্শে রূপায়িত হইয়া কবিহৃদয়কে চিরবিরহী করিয়াছে। এই বিরহরসাশ্রিত প্রেম রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্রধান আলম্বন,

এ প্রেম আমার সুখ নহে দুখ নহে।

দুই-একটি কবিতায় এই আদর্শায়িত প্রেমকল্পনা ব্যক্তিগত প্রেমের সঙ্কীর্ণতামুক্ত হইয়া অধ্যাত্মপ্রেমের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। যেমন,

তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন ওই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ-পূর্ণিমা। ···
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।

দ্বিতীয় স্তরের কবিতাগুলির মধ্যেই মানসীর নিজস্ব সুর রণিত হইয়াছে। বাস্তব প্রেমের মোহ কাটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে নবযৌবনের প্রেমকল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া কবিহৃদয়ের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট রূপ ধরিয়া কবিজীবনের ধ্রুবতারারূপে উদিত হইল। ইহাই রবীন্দ্রনাথের 'মানসী প্রতিমা"।

'সোনার তরী'তে হৃদয়াবেগের আবর্ত থিতাইয়া গিয়াছে এবং কবিচিত্তে গভীরতর প্রশান্তির এবং কবিদৃষ্টিতে গাঢ়তর রসাবেগের সঞ্চার হইয়াছে। কাব্যটির অধিকাংশ কবিতা উত্তরমধ্যবঙ্গে নদীতীরে বাস-কালে রচিত হইয়াছিল বলিয়া নদীপ্রবাহ ও মানবজীবনপ্রবাহ এক হইয়া গিয়া সোনার তরীতে একটি মুখ্য অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। চিত্তপ্রশান্তি ও নৈর্ব্যক্তিক রসদৃষ্টি কবির রসানুভূতিতে চরাচরের হৃদয়াবেগ প্রতিফলিত করিয়াছে; কবির হৃদয়াবেগ [illegible]র হৃদয়াবেগে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার পরিচয় পাই সোনার তরীর অধিকাংশ কবিতায় এবং সমসাময়িক ছোটগল্পগুলিতে।

সোনার তরীর 'মানসসুন্দরী' কবিতায় মানসীর "মানসী প্রতিমা"কে অতীত-অনাগতের চিরন্তন রসলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া কবিচিত্ত তাহাকে রসানুভূতির পরম আলম্বনরূপে লাভ করিয়াছে,

ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছ মোর মর্ম্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় মানসসুন্দরী রোমান্সের নায়িকা বা রূপকথার মোহিনী সাজিয়া কবিহৃদয়ের অখিল আবেগসাগর মথিত করিয়াও শেষ অবধি নিজের রহস্য সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতেছে না,

তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে,
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না বলে।

জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য কবিচিত্তের ব্যাকুলতা সোনার তরীতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে সুতীক্ষ্ণভাবে।

'চিত্রা'য় মোটামুটিভাবে সোনার তরীরই অনুবৃত্তি চলিয়াছে। বিশেষত্ব এইমাত্র, চিত্রার অনেকগুলি কবিতায় সোনার তরীর বিশুদ্ধ হৃদয়াবেগের উপর যেন ভক্তি-নম্রতার রঙ ধরিয়াছে। মানসসুন্দরীও যেন এখন কবিহৃদয়ের বাসনার অতীত তীরে চলিয়া গিয়া "অন্তর্যামী" হইয়া কবির নিগূঢ় ব্যক্তিত্বকে দুঃখসুখের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি ও পরম সার্থকতার দিকে আগাইয়া লইয়া যাইতেছে। একটু পরে এই অন্তর্যামীরই দেবায়ন বা apotheosis পাইতেছি 'জীবনদেবতা' কবিতায়। অন্তর্যামী এবং জীবনদেবতা, এই দুই ভাব-কল্পনার মধ্যে পার্থক্য এইটুকু—অন্তর্যামী যেন কবির জীবাত্মা অথবা জীবনের শুভবুদ্ধি আর জীবনদেবতা যেন পরমাত্মা বা জীবনের সত্য-উপলব্ধি বা Personal

God, অন্তর্যামী যেন পথের সুহৃদ্ বা প্রিয়া, আর জীবনদেবতা যেন ঘরের স্বামী বা প্রিয়।

কবিচিত্তের অচিরাগামী মুক্তির বার্তা ধ্বনিত হইয়াছে 'কল্পনা'র কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতায়। রোমান্টিক রসভাবালুতা ত্যাগ করিয়া সংস্কারের আবরণ ছাড়িয়া সত্যকে বরণ করিয়া লইবার জন্য এক কঠিন আহ্বান যেন কবিচিত্তকে মুহুর্মুহু ডাক দিতেছে। কবিচিত্ত এই অমোঘ আহ্বান স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তথাপি হৃদয়ের ভাবঘন আবরণ হারাইবার আশঙ্কা ঘুচিতেছে না।

রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ,
আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নত শিরে
তোমার আহ্বান।

এই আহ্বান কবিচিত্তকে ভাবাবেগের স্থিতিভূমি হইতে সরাইয়া দিয়া মুহূর্তের জন্য সংস্কারমুক্তির স্বাধীন ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিল।

'ক্ষণিকা'-য় সেই অপরিসীমমুক্তিমুহূর্তের অনুভূতির বিচিত্র প্রকাশ। অতীত-ভবিষ্যতের বন্ধন হইতে ও সর্ববিধ সংস্কারবিজড়িত হৃদয়াবেগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কবিচিত্ত একদা যে নিরাসক্ত উদাসীন আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছিল তাহারই অনুভূতি ক্ষণিকার লঘুছন্দে সহজভাষায় লেখা কবিতাগুলির মধ্যে ঝঙ্কৃত হইয়াছে। আমি আছি তাই আর সমস্তই আছে—এই যে অস্তিত্বমাত্রবোধের নিরাবিল ও নির্বন্ধন আনন্দ, যাহা জীবলীলার নিগূঢ় রস, ইহাই ক্ষণিকা কাব্যের রহস্য।

যা আসে আসুক, যা হবার হোক,
যাহা চলে যায় মুছে যাক্ শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক্ দ্যুলোক ভূলোক
প্রতি পলকের রাগিণী।
নিমেষে নিমেষ হয়ে যাক্ শেষ
বহি নিমেষের কাহিনী।

দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের উন্মাদনায় এবং বিদেশে সাম্রাজ্যলোভীদের বীভৎস হিংস্রতায় কবিচিত্তে ক্ষণিকার নির্লিপ্ত আনন্দ-পরিবেশ টুটিয়া গেল। তখন কবিহৃদয় প্রাচীন ভারতের মৌনশান্ত মহিমায় ও অবিচল আত্মপ্রতিষ্ঠায় স্বদেশের মুক্তির আদর্শ খুঁজিতে লাগিল। 'নৈবেদ্য' কাব্যে এই এষণার পরিচয় মিলে।

পত্নীবিয়োগ কবিচিত্তের আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্যে বিরহবেদনার সঞ্চার করিয়া নূতনতর কারুণ্যমণ্ডিত ভাবাবেগের সৃষ্টি করিল। মাতৃহীন সন্তানের অবোধ ব্যাকুলতা যেন কবিচিত্তে অপূর্ব বাৎসল্যরসের প্রস্রবণ খুলিয়া দিল। 'শিশু'র প্রথমার্দ্ধের কবিতাগুলিতে এই অভিনব রসগভীর বাৎসল্যদৃষ্টির পরিচয় জাজ্বল্যমান।

'খেয়া'য় রবীন্দ্রকাব্য সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের অবসান ঘটিল। জীবনের বিচিত্র বেদনার মধ্য দিয়া চরম সত্য-উপলব্ধির আকূতি, দুঃখের মধ্য দিয়া প্রেয়োলাভের ব্যাকুলতা খেয়ার মর্ম্মকথা। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা অজ্ঞাতসারে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরিয়া বৈষ্ণবসাধনার অত্যন্ত কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। চিত্রার "জীবনদেবতা" চপল প্রণয়ী; ক্ষণিকায় তিনি হইয়াছেন "অন্তরতম"; খেয়ায় কবিচিত্ত মিলনোৎকা অচিরবিরহিণীর মত প্রণয়োদ্বেল ব্যাকুলতা লইয়া হৃদয়স্বামীর সহিত মিলনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিয়াছে।

> রাতের বেলা ঝিল্লি ডাকে
>
> গহন বনমাঝে।
>
> ওগো ধীরে ধীরে দুয়ারে মোর
>
> কার সে আঘাত বাজে?
>
> যায় না চেনা মুখখানি তার,
>
> কয় না কোনো কথা,
>
> ঢাকে তারে আকাশভরা
>
> উদাস নীরবতা।

ইহার পর সন্তানশোকের নিদারুণ আঘাত কবিচিত্তের আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে কাব্যরসের সঙ্কীর্ণতা হইতে বাহির করিয়া ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত করিল;

নিরুদ্ধ ভাবাবেগ গানের সুরের অজস্রতায় ছাড়া পাইয়া বাঁচিল। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' কাব্যের গানে ও কবিতায় ভক্তিরসের মুখ্য প্রকাশ হইয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে ইহাকে "জনান্তিক" বলা চলে।

তৃতীয় অর্থাৎ পরাঙ্মুখীন যুগের আরম্ভ হইল 'বলাকা'য়। এইসময় হইতে অতীত যৌবনদিনের জন্য এবং পৃথিবীতে জীবলীলাসমাপনের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে বলিয়া এক সকরুণ বেদনা কবিচিত্তে অপরাহ্ণের দীর্ঘায়মান ম্লানচ্ছায়া বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। কবিচিত্তের যৌবনপ্রাঙ্গনে একদা যে বসন্ত "দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে" কলহাস্যকোলাহল তুলিয়া

নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে,
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে;
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি' সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্চ্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

আসন্ন বিচ্ছেদবেদনার আভাস মর্ত্যধরার আনন্দক্ষণগুলিকে মধুরতর করিয়া তুলিতেছে।

আজ এই যে দিনের শেষে
সন্ধ্যা যে ঐ মাণিকখানি পরেছিল চিকণ কালো কেশে
গেঁথে নিলেম তারে
এই তো আমার বিনি সুতার গোপন গলার হারে।

বিশ্বপ্রকৃতির চঞ্চল মুহূর্তের সহজ রূপরস আকণ্ঠ পান করিয়াও তৃষা মিটিতেছে না এবং সে আনন্দ-উপলব্ধি কাব্যে প্রকাশ করিয়াও যেন তৃপ্তি হইতেছে না,—ইহাই কবিচিত্তের অপরিসীম বেদনা।

যে কথা বলিতে চাই
বলা হয় নাই,—
সে কেবল এই
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখি-সম্মুখেই
দেখিনু সহস্রবার
দুয়ারে আমার।

মধ্যাহ্নসূর্য্য পশ্চিমদিগন্তের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে, তাই স্মৃতির সঞ্চয়গুলি চিত্তপটে দীর্ঘতর ছায়া মেলিয়া কবির অলস ভাবনাগুলিকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। নবযৌবনের অকৃতার্থ প্রেমও তাই স্মৃতির রঙীন মায়ায় বিজড়িত হইয়া 'পূরবী'র কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়াছে। নবযৌবনক্ষণে ভাবরসঘন প্রেমের চকিত স্পর্শের স্মৃতি বিরহী কবির চিত্তবীণায় একদা যে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল তাহারই অনুরণনে কাব্যজাহ্নবী নিঃসৃত হইয়াছিল,—এখন তাহা পুনঃপুন মনে পড়িতেছে।

বিরহের দূতী এসে তার সে স্তিমিত দীপখানি
চিত্তের অজানা কক্ষে কখন্ রাখিয়া দিল আনি'।
সেখানে যে বীণা আছে, অকস্মাৎ একটি আঘাতে
মুহূর্ত্ত বাজিয়াছিল; তার পরে শব্দহীন রাতে
বেদনা-পদ্মের বীণাপাণি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে-থেমে-যাওয়া বাণী।

অস্তায়মান সূর্য্য পূর্ব্বগগনের দিকে চাহিয়া বিদায় লয়। তাই কিশোরপ্রেমের বন্দনা কাব্যসৃষ্টির শেষ যুগে বিশেষভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে।

তুমি সে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী
দেবতার দূতী।
মর্ত্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকূতি।

ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত বারি
মৃত্যুর আড়ালে
দেবতার হ'য়ে সেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু-বাহু বাড়ালে।

নিগূঢ় তমিস্রাময় বিরাট নৈঃশব্দ্যের উপকূলে আসিয়া এখন কবিহৃদয় যেন সেই অভিসারিকার পদধ্বনির আশায় বাণীহীন প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া জাগিয়া রহিল।

দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি-পরশ,
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ-সুধারস।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের রসদৃষ্টির শেষ অভিব্যক্তি।

৪

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা অবাস্তব এবং তাঁহার কাব্যসৃষ্টি বস্তুতন্ত্রতাবিহীন এইরূপ একটা অভিযোগ অনেকদিন হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্য বিপুল এবং সুগভীর, ইহা ভালো করিয়া বুঝিতে হইলে অধ্যয়ন ও অনুধাবনের সঙ্গে সবিশেষ রসজ্ঞতার প্রয়োজন। এই সমাবেশ দুর্লভ বলিয়াই আমাদের দেশে রবীন্দ্র-কাব্য লইয়া মাতামাতি হইলেও উপযুক্ত আস্বাদন বা রসগ্রহণ হয় নাই। পূর্ব্বে যে আলোচনা করা গেল তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে রবীন্দ্র-কাব্য যতই দুর্বোধ্য বা "ধোঁয়াটে" হউক না কেন ইহার মূলে সর্ব্বদাই কাব্যস্রষ্টার সুগভীর বাস্তব অনুভূতি রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে শ্রেণীর শিল্পী তাহাতে অভিজ্ঞতার বাস্তবতা কবিচিত্তের অনুভূতিতে ও রসদৃষ্টিতে বিচিত্রভাবে রূপায়িত হইয়া নূতন সৃষ্টিরূপে দেখা দেয়। তাই সেই কাব্যসৃষ্টিতে সর্ব্বদা বাহ্যদৃষ্টির স্থূল বাস্তবতা খুঁজিয়া পাওয়া দায় হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের মত কবিপ্রতিভা লইয়া ইতিপূর্ব্বে আর কেহ জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশে শুধু কালিদাসকে রবীন্দ্রনাথের পর্য্যায়ের কবিস্রষ্টার মর্য্যাদা দেওয়া যায়।

প্রকৃত কবিমাত্রেই রোমান্টিক।[১] রবীন্দ্রনাথও রোমান্টিক, অতি-রোমান্টিক বলিলেও চলে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক দৃষ্টি শেলি-কীট্‌স্‌-কোল্‌রিজ্‌ প্রমুখ ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের দৃষ্টি হইতেও কিছু স্বতন্ত্র। ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যে কবি কাব্যসৃষ্টির মধ্যে নিজের ভাবাবেগ বিস্তার করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা ইহার উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোমান্টিক
আমি সেই পথের পথিক
যে পথ দেখায়ে চলে দক্ষিণ বাতাসে,
পাখির ইশারা যায় যে পথের অলক্ষ্য আকাশে।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মনের ভাবনা অব্যক্ত ব্যথার পুঞ্জমাত্র নয়, কবিচিত্তের ধ্যানধারণায় তাঁহার নিগূঢ় ব্যক্তিত্বের বাহিরে তাহা স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা ইমোশনকে ছাড়াইয়া ইন্‌টুইশনের রহস্যলোকে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রসানুভূতি কাব্যের বিষয়কে বাস্তবের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে পাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। কাব্যের বিষয়কে অতীত-অনাগতের মধ্যে বিস্তার করিয়া দিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব কবিকল্পনা অখণ্ডরসোপলব্ধিতে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ 'চৈতালী'-র 'পদ্মা' কবিতাটি ধরা যাইতে পারে।

২

রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলায় যে তত্ত্বদৃষ্টির পরিচয় আছে তাহা প্রচলিত কোন দর্শন-শাস্ত্রের আওতায় পড়ে না। বিশেষ কোন দার্শনিক বা রসতাত্ত্বিক মতবাদ অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ কাব্যসৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার বিশিষ্ট তত্ত্বদৃষ্টি ও রসদৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই অধিগত হইয়াছিল কল্পন-মনন-আত্মোপলব্ধির ভিতর

[১] রোমান্টিকতার সংজ্ঞানির্দ্দেশ এইভাবে করা যায়,—কোন সুদূর, অনির্ব্বচনীয়, ঈপ্সিত আদর্শের বা অবস্থার প্রতি কল্পনাপ্রবণ অথবা ভাবাতুর মনের যে ইমোশনাল অভিসার তাহাই রোমান্টিক মনোভাব। কাব্যকর্তার রোমান্টিকতা সিসৃক্ষু বা কল্পনাপ্রবণ, কাব্যপাঠকের রোমান্টিকতা চিন্ময়ক্ষু বা ভাবপ্রবণ।

দিয়া। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বদৃষ্টি একান্তভাবে স্বকীয়; ইহা তাঁহার স্ব-ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। ইহাকে বলা যাইতে পারে জীবনদর্শন। বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট পটভূমিকায় নিখিলজীবনলীলার রসোপলব্ধি—ইহাই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন। এই রসদৃষ্টির আভাস আছে উপনিষদে, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" কাব্যসাধনার মধ্য দিয়া কবি উপনিষদের আনন্দদৃষ্টির সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"—উপনিষদের ঋষি-কবির এই সিদ্ধান্তের উপপত্তি হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। তাঁহার রসদৃষ্টিতে

> আনন্দলোক দ্বার খুলেছে,
> আকাশ পুলকময়,
> জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের,
> জয় আলোকের জয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা অলস কল্পনাবিলাস নয়, তাঁহার কাব্যকলা "কাগজের রঙীন ফানুষ" নয়, কবির আত্মপ্রকাশ বা self-expression মাত্রও নয়। ইহা তাঁহার self-realisation বা আত্মোপলব্ধির উপায়। কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে ইহার রূপের ঐশ্বর্য্য, গানের সুরে অভিব্যক্ত হইয়াছে ইহার রসের অনির্ব্বচনীয়তা। তাই কবি বলিয়াছেন,

> দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
> গানের ওপারে,
> আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি
> পাইনে তোমারে।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে বিপ্রদাসের মুখে রবীন্দ্রনাথ নিজের কথাই বলিয়াছেন, "আমার ধর্ম্মকে কথায় বলতে গেলে ফুরিয়ে যায় তাই বলিনে। গানের সুরে তার রূপ দেখি, তার মধ্যে গভীর দুঃখ, গভীর আনন্দ এক হয়ে মিলে গেছে; তাকে নাম দিতে পারিনে।"

রবীন্দ্রনাথের রসদৃষ্টির সঙ্গে বৈষ্ণবদর্শনের লীলাবাদের গভীর ঐক্য আছে। উপনিষদের আনন্দদৃষ্টির সঙ্গেও বৈষ্ণবদর্শনের রসানুভূতির অনৈক্য নাই। বেদে বলিয়াছে,

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।

উপনিষদে বলিয়াছে, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" বৈষ্ণবকবি বলিয়াছেন আরও সহজ করিয়া,

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

এইখানে বৈষ্ণব-বাউল-সহজিয়াদিগের বহিরঙ্গ রসসাধনার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনার একটা বড় মিল আছে।

৬

ভারতীয় কাব্যসাহিত্যকে যদি তিন স্তরে ভাগ করা যায় তাহা হইলে তিন স্তরের গীতিকাব্যকলার বিশিষ্ট উৎকর্ষ পাইব যথাক্রমে ঋগ্বেদের সূক্তে, কালিদাসের কাব্যে আর রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্পর্ক এই তিন স্তরে আনুপূর্বিকভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। বর্ষা ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ঋতু। এই ঋতুর প্রকাশ ভারতীয় সাহিত্যে যেমন হইয়াছে এমন আর কোথাও নয়। ভারতীয় কাব্যসাহিত্যের তিন স্তরে বর্ষার প্রকাশ কিভাবে হইয়াছে তাহা দেখা যাক।

ঋগ্বেদে বর্ষার শ্যামল মেঘপুঞ্জকে কল্পনা করা হইয়াছে পর্জন্যের দূত। সারথির কশার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সিংহগর্জ্জন করিতে করিতে মেঘদল আকাশকে বর্ষণোন্মুখ করিয়া তুলিতেছে,—বৈদিককবি এই উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন।

রথীব কশয়াশ্বাঁ অভিক্ষিপন্
আবির্দূতান্ কৃণুতে বর্ষ্যাঁ অহ।
দূরাৎ সিংহস্য স্তনথা উদীরতে ,
যৎ পর্জন্যঃ কৃণুতে বর্ষ্যং নভঃ ॥

কালিদাসের কবিকল্পনায় বর্ষা আসে শুধু জীবের জীবনোপায় লইয়া নয়, প্রধানত বিরহিহৃদয়ে প্রেমেব আশ্বাস বহন করিয়া। পর্জন্যের অবোধ দূত হইয়াছে সন্তপ্তের শবণ, বিবহীব সন্দেশবহ। সে চলিয়াছে রসের বার্ত্তা লইয়া।

ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিবহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যয়মিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥

কালিদাসের মেঘদূত ধাইয়া চলে লীলাচঞ্চল দিগ্‌গজের মত, অচিরবিরহীব আশ্বাস বহন করিয়া। আর ববীন্দ্রনাথের বর্ষাসমারোহ ঘনাইয়া আসে কবি-হৃদয়ে চিরবিরহীব "সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা" স্মৃতি মন্থন করিয়া; কবিহৃদয়কে আশ্বাসহীন অব্যক্ত বিরহব্যথায় মথিত করিয়া "ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণ-তিমিব"। তাই

এ ভরা ভাদব দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে' মন যেতে চায়।
বিজন যমুনা-কূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পবাণ বুলে বিরহব্যথায়।

কালিদাসেব কাব্যে এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেমন ঋগ্বেদের সূক্তেও তেমনি নিসর্গ বা বিশ্বপ্রকৃতি একটি প্রধান স্থান লইয়াছে। তবে ঋগ্বেদে বহিঃ-প্রকৃতির রূপে দেবলীলারই অভিনয় বা অনুকৃতি পরিলক্ষিত হইয়াছে, যদিও এই দেবলীলা আবার আদর্শান্বিত মানবলীলার অনুসরণ। তথাপি বৈদিককবির

উৎপ্রেক্ষায় অভিনব ও প্রকৃত কবিদৃষ্টির পরিচয়ের অসদ্ভাব নাই। যেমন অহোরাত্রির আবর্ত্তনে,

নানা চক্রাতে যম্যা বপূংষি
তয়োরন্যদ্ রোচতে কৃষ্ণমন্যৎ।
শ্যাবী চ যদরুষী চ স্বসারৌ
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

অথবা দিগ্‌বধূ-কল্পনায়,

আ ধেনবো ধুনয়ন্তামশিশ্বীঃ
সবর্দুঘাঃ শশয়া অপ্রদুগ্ধাঃ।
নব্যা নব্যা যুবতয়ো ভবন্তী-
র্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

কালিদাসের কাব্যে বহিঃপ্রকৃতি দেবলোক ছাড়িয়া লোকালয়ে মানুষের গৃহপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; বিশ্বপ্রকৃতির সমবেদনার পটভূমিকায় মানুষের সুখদুঃখ শান্ত, সংযত ও মধুর হইয়া দেখা দিয়াছে। কালিদাসের উপমা-উৎপ্রেক্ষায় মানুষের সম্পর্কে বহিঃপ্রকৃতির সাদৃশ্য ও সাযুজ্য বোধ হয় চরম কাব্যরূপ পাইয়াছে। অর্থাৎ কালিদাস মানবলীলাকে প্রকৃতিলীলার ভাষায় সার্থক অনুবাদ করিয়াছেন। যেমন, স্বয়ংবরসভায় রঘু-ইন্দুমতীর দৃষ্টিবিনিময়,

ততঃ সুনন্দাবচনাবসানে
লজ্জাং তনূকৃত্য নরেন্দ্রকন্যা।
দৃষ্ট্যা প্রসাদামলয়া কুমারং
প্রত্যগ্রহীৎ সংবরণস্রজেব ॥

মেঘদূত কাব্যে কালিদাস আরও আগাইয়া আসিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের দিকে। কেননা কোন কোন উৎপ্রেক্ষায় প্রকৃতিলীলা মানবলীলায় রূপান্তরিত হইয়াছে। যেমন,

গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিশমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥

রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনায় মানবলীলার ভাবার্কো বিস্তার করিয়া দিয়া বহিঃপ্রকৃতিকে নব রূপে রূপায়িত এবং নব রসে রসায়িত করা হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যের রস পান করিয়া আমরা বিশ্বপ্রকৃতিকে যেন নূতন চোখে দেখি। জনশূন্য নদীসৈকতে সন্ধ্যাগগনের অস্তরাগ দেখিয়া মনে অজানিত বিরহের গোপন স্মৃতি জাগিয়া উঠে। মনে হয়,

বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে যাওয়া তোমার সিন্দূরে।

বসন্তের প্রভাতে প্রকৃতির পরিপূর্ণতার মধ্যে মনে পড়ে যেন কার

আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল।

গভীর নিশীথে ঝিল্লিধ্বনি শুনিলে মনে এই উৎপ্রেক্ষাই জাগিয়া উঠে যেন ধ্যান-মগ্ন বিশ্বপ্রকৃতি "অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর" গাঁথিয়া চলিয়াছে।

নিখিল চরাচরের উপর মানবীয় ইমোশনের এই যে অধ্যাস ইহাতেই বোধ হয় রোমান্টিক গীতিকবিতার পরম বিকাশ হইয়া গেল।

৭

দুইএক স্থলে রবীন্দ্রনাথ বেদের কবিতা হইতে উৎপ্রেক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন, "বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে আজ দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি"। এই উৎপ্রেক্ষা একাধিক উষা-সূক্তে পাওয়া যায়, "অপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম্"। কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের উৎপ্রেক্ষা বৈদিককবির ভাবের অনুসরণ করিয়াছে স্বাধীনভাবে। যেমন,

নিঃশব্দ-চরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি' কারে
চ'লে যায় ডাকি'।...

তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে ;
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে ॥

—তুলনীয়

অস্থুরু চিত্রা উষসঃ পুরস্তাৎ ···
প্রবোধয়ন্তীরুষসঃ সসন্তং
দ্বিপাচ্চতুষ্পাচ্চরথায় জীবম্ ॥

বিরাটত্বে রবীন্দ্রনাথের উৎপ্রেক্ষা কখনো কখনো বৈদিক ও মহাকাব্যিক উৎপ্রেক্ষাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। যেমন,

কালের রাখাল তুমি সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জন প্রান্তর-তলে
আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

এইরূপ উৎপ্রেক্ষাকে ইংরাজিতে cosmic simile বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৈশোরক

১

বালক রবীন্দ্রনাথ যখন সৃজ্ঞান সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন তাঁহাদের বাড়ীতে হিন্দুমেলার স্বদেশী উন্মাদনা এবং দেশে ন্যাশনালিজ্‌ম্‌-এর আন্দোলন ঘনাইয়া উঠিয়াছে। তখন রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালীর নবজাগ্রত বেদনা হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' (শ্রাবণ ১২৭৭) কবিতার মধ্যে পূর্ণ বাঙ্ময়রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার প্রথম প্রচেষ্টা বিশেষ করিয়া এই কবিতাটির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। আদি-কৈশোরক যুগের (১৮৭৩-৭৫) কবিতাগুলিতে ভারতের পরাধীনতার বেদনার কথাই একান্তভাবে বলা হইয়াছে। একটি ছাড়া এই সমস্ত কবিতা লেখা হইয়াছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে হিমালয়-ভ্রমণের পর (১৮৭৩)। সেই কারণে হিমালয়ের দৃশ্য রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক যুগের অধিকাংশ কবিতায় ও কাব্যে বারবার দেখা দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যে পণ্ডিতের কাছে মেঘনাদবধ কাব্য পড়িতেন, এই কারণে এই কাব্যখানির উপর তাঁহার নিরতিশয় বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। তবুও তাঁহার বাল্যকালের রচনায় অজ্ঞাতসারে মধুসূদনের ভাষার ছাপ মধ্যে মধ্যে পড়িয়াছে। কচিৎ মধুসূদনের ব্যবহৃত অভিধানিক শব্দের প্রয়োগও আছে। বাক্যমধ্যে parenthosis-এর ব্যবহার এবং "যথা", "যেমতি" ইত্যাদি শব্দযোগে উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ মধুসূদনের অনুসরণ। কখনো কখনো মধুসূদনের ভাষা ও উৎপ্রেক্ষা অনুকৃত হইয়াছে। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

> উর্ম্মিহীন নদী যথা ঘুমায় নীরবে
> সহসা করণ ক্ষেপে সহসা উঠেরে কেঁপে
> সহসা জাগিয়া উঠে চল উর্ম্মি সবে।[১]

[১] বনফুল প্রথম সর্গ।

বন্ধুতার ক্ষীণ জ্যোতি, প্রেমের কিরণে—
(রবিকরে হীন ভাতি নক্ষত্র যেমন)
বিলুপ্ত হয়েছে কি রে বিজয়ের মনে ?[১]

আজি নিশীথিনী কাঁদে, আঁধারে হারায়ে চাঁদে
মেঘ-ঘোমটায় ঢাকি কবরীর তারা।[২]

বেষ্টিত বিতন্ত্রী-বীণা লূতা-তন্তু-জালে।[৩]

কিশোর রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানভাবে হেমচন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন ছন্দে। কৈশোবক যুগের কয়েকটি কবিতায় হেমচন্দ্রের "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে" কবিতার ছন্দ অনুসৃত হইয়াছে। মিলহীন পয়ারেও এইরূপ অনুসরণ দেখা যায়।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কাব্যের মুগ্ধ পাঠক ছিলেন, তাই জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে বিহারীলালের প্রভাব তাঁহার বালককালের রচনায় আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই প্রভাব আশানুরূপ ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। 'বনফুল' ও 'কবি-কাহিনী' কাব্যদ্বয়ের বাহিরে বিহারীলালের প্রভাবের কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন নাই। কয়েকটি গাথা-কবিতায় অবশ্য বিহারীলালের প্রবর্তিত তিন মাত্রার ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। তাহাও সন্ধ্যাসঙ্গীতের বহুকাল পূর্বে শেষ হইয়া গিয়াছে।

বনফুলের প্রথম সর্গের উপক্রমে বিহারীলালের অনুকরণ স্পষ্ট বোঝা যায়।

শিরোপরি চন্দ্র সূর্য্য, পদে লুটে পৃথ্বীরাজ্য
মস্তকে স্বর্গের ভার করিছে বহন ;

অথবা,

কে ওগো নবীনা বালা, উজলি পরণ-শালা
বসিয়া মলিনভাবে তৃণের আসনে ?

বনফুলের তৃতীয় সর্গ বিহারীলালের ছন্দে লেখা।

[১] ঐ ষষ্ঠ সর্গ। [২] ঐ প্রথম সর্গ। তুলনীয় মধুসূদন, "নাহি তারা কবরীবন্ধনে"।
[৩] কবি-কাহিনী তৃতীয় সর্গ।

দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের প্রভাব ছিল গুরুতর। 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যেও এই প্রভাব লুপ্ত হইয়া যায় নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির বিশেষ মিল না থাকিলেও উভয়ের বাগ্‌ভঙ্গিতে অসাধারণ ঐক্য আছে।[১] ইহার একমাত্র হেতু হইতেছে বালক রবীন্দ্রনাথের মনে বড়দাদার ব্যক্তিত্বের ও কাব্যশিল্পের অসামান্য প্রভাব। বনফুলের সপ্তম সর্গের প্রথমাংশে স্বপ্নপ্রয়াণের ছন্দের ভাষার ও ভাবের অনুকৃতি সুব্যক্ত। "কাণের কাছেতে গিয়া বায়ু কত কথা ফুসলায়" দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি। ভগ্নহৃদয়ের প্রথম সর্গের এই কয় ছত্রেও স্বপ্নপ্রয়াণের প্রতিধ্বনি পাই,

হরিণ শাবক যত ভুলিবে তরাস,
পদতলে বসি তোর চিবাইবে ঘাস।
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি মুখে তার দিব তুলি,
সবিস্ময় সুকুমার গ্রীবাটি বাঁকায়ে
অবাক্ নয়নে তারা রহিবে তাকায়ে!

বাঙ্গালা সাহিত্যে "কাব্যোপন্যাস" বা "গাথা কাব্য" প্রবর্তন করেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।[২] ইহার অনুসরণ করেন স্বর্ণকুমারী এবং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের মধ্য কৈশোরক যুগের অধিকাংশ রচনাই গাথা-কাব্য বা গাথা-কবিতা। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের উপর অক্ষয়চন্দ্রের প্রভাব পড়িয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবন্ধুদের মধ্যে প্রথমতম। ইহার অপরোক্ষ প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনার প্রসারে এবং কাব্যশিল্পের গঠনে যে কতটা সহায়তা করিয়াছে, তাহা জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ হইতে বোঝা যায়।

বিদেশী কবির মধ্যে Shelley-র প্রভাব কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য দুইটিতে স্ফুটতর।

[১] দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৫০৪-০৫ দ্রষ্টব্য। [২] ঐ পৃ ৪৪০ দ্রষ্টব্য।

২

রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যের আদি যুগকে তিন ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়,—আদি-কৈশোরক (১৮৭৩-৭৬), মধ্য-কৈশোরক (১৮৭৫-৮১) এবং অন্ত্য-কৈশোরক (১৮৮১-৮৩)। আদি-কৈশোরকে পাই দেশপ্রেমাত্মক কয়েকটি কবিতা এবং লুপ্ত 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্য।

'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য। পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়-যাত্রার মুখে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন বোলপুরে (শান্তিনিকেতনে) কাটাইয়াছিলেন (ফাল্গুন-চৈত্র ১২৭৯)। সেইখানে এই কাব্য লেখা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু-নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালো বাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্কর-শয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার উপযুক্ত বাহন সেই বাঁধানো লেট্স্ ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল খাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারো কাছে রাখিয়া যায় নাই।"[১] পৃথ্বীরাজের পরাজয়কাহিনী যে বালককবির চিত্তে বেদনার সঞ্চার করিয়াছিল তাহার আরও প্রমাণ পাই 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতায় এবং 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকায়।

'হিন্দুমেলায় উপহার'[২] রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরসমন্বিত প্রথম মুদ্রিত রচনা। কবিতাটির ছন্দে ভাষায় এবং ভাবে হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীতের স্পষ্ট অনুসরণ করা হইয়াছে। ইহারও পূর্ব্বে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাওয়া যাইতেছে। তাহাতে স্বাক্ষর নাই বলিয়া সংশয়ের অবকাশ একেবারে যে নাই তাহা বলা চলে

১ জীবনস্মৃতি। ২ অমৃতবাজার পত্রিকার ১৪ ফাল্গুন ১২৮১ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত এবং তাহা হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত [রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়, পৃ ৬০-৬২]।

না। যত দূর মনে হয়, ১২৮০ সালের মাঘ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'ভারত ভূমি' রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা।[১]

৩

মধ্য-কৈশোরক যুগে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত গাথা-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রণয়ের অচরিতার্থতা, প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মিলনে আত্মকৃত অথবা দৈবঘটিত ব্যাঘাত, ও তজ্জনিত হতাশা এই কাব্যগুলির বিশিষ্ট সুর। বালককল্পনাসুলভ অতি-নাটকীয় ঘটনার অসদ্ভাব নাই। পাত্রপাত্রীরা সাধারণ সংসারের প্রতিবেশের বাহিবে কুটীববাসে হয় একাকী নয় পিতৃসাহচর্য্যে মানুষ হইয়াছে এবং সকলেই নিজেব হৃদয়াবেগে নিবত। নায়ক প্রায়ই কবির নিজের প্রতিচ্ছবি। বলা বাহুল্য এই প্রতিচ্ছবি স্বাভাবিক নয়; বালককবির কল্পনার বঙ তাহার উপর ভাল করিয়াই লাগিয়াছে। তবুও কবিহৃদয়ের আত্মপ্রকাশ একেবাবে নাকা পড়িয়া যায় নাই। এই কাব্যগুলিতে সমস্ত আড়ম্বর ও কৃত্রিমতা ছাড়াইয়া কবিহৃদয়ের যে অকৃত্রিম আবেগ উৎসারিত হইয়াছিল এবং ভাবে ও ভাষায় যে অভিনবত্বের সূচনা করিয়াছিল তাহা সে-সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্যে অপ্রত্যাশিত। পরবর্ত্তিকালের বিপুল রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যেব সুমহৎ সম্ভাবনার বীজ এই কাব্য-গুলির মধ্যে রহিয়াছে অঙ্কুরোদ্গমেব প্রত্যাশায়। পরিণতবয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কৈশোবক কবিতাগুলির জন্য লজ্জাবোধ করিতেন। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিয়াছেন, "ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালিব কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে—উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।" কিন্তু তাঁহাব কাব্যপ্রতিভাব অকাল-বসন্তে এই ফলপ্রত্যাশাবিহীন বনফুলমুকুল-

[১] 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা'-ব তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কবিতাটিকে অপ্রকাশিত কোন ডায়েরির নজিরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চাহেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালকের লেখা এই কবিতাটির [illegible]হৎ সম্ভাবনা জ্যোতিরিন্দ্রের পরবর্ত্তী কবিজীবনের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই, সুতরাং ইহা তাঁহার রচনা মনে করা কঠিন।

সত্তার বৃথাই দেখা দেয় নাই। কবি স্বীকার করিয়াছেন, "যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য[১] লজ্জা বোধ হয় বটে কিন্তু তখন মনের মধ্যে যে একটা উৎসাহের বিস্ফার সঞ্চারিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার মূল্য সামান্য নহে।" এই উৎসাহের বিস্ফারে রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভার বীজ অঙ্কুরোদ্গমের অবকাশ পাইয়াছিল।

পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের-এর কথা ছাড়িয়া দিলে 'বনফুল' রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচিত ও প্রকাশিত কাব্য,[২] যদিও ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল 'কবি-কাহিনী'-র দেড় বৎসরেরও অধিককাল পরে। বনফুল আট সর্গে গ্রথিত। ছন্দ আদ্যন্ত মিত্রাক্ষর। "কাব্যোপন্যাস"-টির আদি ও শেষ দৃশ্য তুষারশুভ্র হিমালয়বক্ষ। আখ্যানবস্তু সামান্যই। পিতা ও কন্যা হিমালয়শিখরে কুটীরে বাস করে। পিতা ছাড়া কন্যা আর দ্বিতীয় মানব দেখে নাই। পিতার যেদিন মৃত্যু হইল সেদিন তৃতীয় মানব বিজয় দেখা দিল। বিজয় কমলাকে লোকালয়ে লইয়া গিয়া তাহাকে ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে। কমলার কিন্তু মন বসিতেছে না। ক্রমে ক্রমে বিজয়ের বন্ধু নীরদকে সে ভালবাসিয়া ফেলিল। এদিকে নীরজা মনে মনে বিজয়ের প্রতি আসক্ত। নীরদ কমলার ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে বারেবারে মন ফিরাইতে বলিল, কিন্তু মন বারণ মানিল না। বিজয় ব্যাপার বুঝিয়া নীরদকে ভর্ৎসনা করিয়া দেশত্যাগ করিতে বলিয়া শেষে ঈর্ষ্যার জ্বালায় তাঁহাকে হত্যা করিল। নীরদের দেহের সৎকার করিয়া কমলা বিধবাবেশ ধারণ করিল এবং আবার হিমালয়বক্ষে ফিরিয়া গেল। কিন্তু সেখানে আর পুরানো দিনের সুখশান্তি ফিরিয়া পাইল না। নীরদের স্মৃতি তাহার চিত্তকে দিবানিশি দহন করিতে লাগিল। অবশেষে একদিন তুষারশিলায় পদস্খলিত হইয়া কমলা দেহত্যাগ করিল।

বনফুলের প্লটের আরম্ভে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর উদাসিনীর অনুসরণ করা হইয়াছে। কমলার ভূমিকায় কালিদাসের শকুন্তলা চরিত্রের প্রভাব আছে।

[১] 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র অনেকগুলি কবিতার মধ্যে তখনই কাব্যকলাপরিপক্বতা দেখা দিয়াছিল, সেই-কারণে কবি এইগুলিকে পরবর্ত্তী কালে পরিবর্জ্জন করেন নাই।

[২] জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব (১২৮২-৮৩, ১৮৭৬); পুস্তকাকারে ১২৮৬ সালে (১৮৮০)।

কাব্যটির স্থানে স্থানে ভাব-ভাষা-অলঙ্কারে দ্বিজেন্দ্রনাথের, বিহারীলালের এবং মধুসূদনের প্রভাব আছে।

৪

'কবি-কাহিনী'[১] রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রথম কাব্য। ইহা বনফুলের দুই বৎসর পরে রচিত হয়। কাব্যটির আখ্যায়িকায় শেলি-র প্রভাব সত্ত্বেও ইহাতে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা পরিস্ফুট হইতে শুরু করিয়াছে। বনফুল কাঁচা লেখা; কবি-কাহিনীতে কিছু পাক ধরিয়াছে। এবং বনফুলে যে অনুকরণপ্রচেষ্টা দেখা যায় কবি-কাহিনীতে তাহা কমিয়া গিয়াছে। বাগ্‌ভঙ্গিতে ও অলঙ্কারপ্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এই কাব্যে অসন্দিগ্ধভাবে দেখা দিয়াছে। যেমন,

> কালের মহান্‌ পক্ষ করিয়া বিস্তার,
> অনন্ত আকাশে থাকি হে আদি জননি,
> শাবকের মত এই অসংখ্য জগৎ
> তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন![২]
>
> নীরবতা ঝাঁ ঝাঁ করি গাইছে কি গান,
> মনে হয় স্তব্ধতার ঘুম পাড়াইছে।[২]
>
> ওই হৃদয়ের সাথে, মিশাতে চাই এ হৃদি
> দেহের আড়াল তবে রহিল গো কেন?[৩]

যৌবনোন্মেষসুলভ কুণ্ঠা এবং হৃদয়াবেগের অস্ফুট ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক কাব্যের মর্ম্মকথা। কবি-কাহিনীতে ইহার প্রথম আভাস পাইতেছি।

> আঁধার সমুদ্রতলে, কি যেন বেড়াই খুঁজি
> কি যেন পাইতেছি না চাহিতেছি যাহা।[৩]

[১] ভারতী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত (পৌষ-চৈত্র ১২৮৪), পুস্তকাকারে ১৯৩৫ সংবতে অর্থাৎ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। [২] প্রথম সর্গ। [৩] দ্বিতীয় সর্গ।

রবীন্দ্রনাথ (১৮৭৭)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

[পৃ ৩৪

কি যেন হারায়ে গেছে খুঁজিয়া না পাই,
কি কথা ভুলিয়া যেন গিয়েছি সহসা,
বলা হয় নাই যেন প্রাণের কি কথা।
প্রকাশ করিতে গিয়া পাই না তা' খুঁজি ![১]

কবি-কাহিনী চারি সর্গে গ্রথিত। ছন্দ অমিত্রাক্ষর পয়ার ও ত্রিপদী। অমিত্রাক্ষর ত্রিপদী লিখিয়া কবি ছন্দে নূতনত্ব দেখাইলেন। কবি-কাহিনীর প্লটে নাটকীয়তা নাই। নায়ক-কবি প্রকৃতির মাধুর্য্যচিন্তাব ভোব হইয়া আছেন। তাহার পর তাঁহার চিত্তে অনির্ব্বচনীয় অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিল। এমন সময়ে বালিকা নলিনী কবির প্রতি সমবেদনা লইয়া দেখা দিল। ক্রমশ কবি নলিনীকে ভালবাসিল কিন্তু তবুও অতৃপ্তি দূব হইল না। আরও কিছুর জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া অবশেষে কবি দেশপর্য্যটনে বাহিব হইল। কবির বিরহে নলিনী শুখাইতে লাগিল। দেশপর্য্যটনে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ কবিতে না পারিয়া কবি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল নলিনীর মৃতদেহ তুষারের উপর পড়িয়া আছে। নলিনী দেহ সমাধিস্থ করিয়া কবি স্থানত্যাগ করিল এবং হিমালয়ের অন্যত্র গিয়া তপস্যায় নিরত হইল। বিশ্বপ্রেমে নারীপ্রেমের স্মৃতি ডুবিয়া গেল। জগতেব সব কিছু ব্যথা-বেদনা অবিচাব-অত্যাচাব বৃদ্ধ কবির চিত্তে করুণার আঘাত হানিতে লাগিল।

সমস্ত ধরার তবে নয়নের জল
বৃদ্ধ সে কবির নেত্র করিল পূর্ণিত!
যথা সে হিমাদ্রি হোতে ঝরিয়া ঝরিয়া
কত নদী শত দেশ করয়ে উর্ব্বর।
উচ্ছ্বসিত করি দিয়া কবির হৃদয়
অসীম করুণাসিন্ধু পোড়েছে ছড়ায়ে
সমস্ত পৃথিবীময়। মিলি তাঁর সাথে

[১] তৃতীয় সর্গ।

জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী ভারতী
কাঁদিলেন আর্দ্র হোয়ে পৃথিবীর দুখে,
ব্যাধশরে নিপতিত পাখীর মরণে
বাল্মীকির সাথে যিনি করেন রোদন ![1]

জগতের শোক নিজের শোকে পরিণত করিয়া কবি পরম সান্ত্বনার ও বৃহৎ আনন্দের অধিকারী হইলেন, এবং কাল পূর্ণ হইলে

এক দিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া ![1]

কবি-কাহিনীর নায়ক-কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। কাব্যখানি যখন লেখা হয় তখন তাঁহার বয়স ষোল। বয়স কাঁচা হইলেও মনে এবং কাব্যকলায় পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই আদি-কৈশোরকের উচ্ছ্বসিত দেশপ্রেম অতিনাটকীয়তাবর্জ্জিত হইয়া প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে দেখা দিয়াছে এই কাব্যে। অত্যাচার-অবিচারকে স্থান ও কালের গণ্ডীতে পৃথক্ করিয়া না দেখিয়া কবি তাহার আসল কারণ খুঁজিয়াছেন মানুষের আদিম পশুপ্রকৃতিতে, স্বার্থপরতায়। এবং ইহার প্রতিকার আছে শুধু প্রেমে-ভ্রাতৃত্বে, অখণ্ড মানবের মহামিলনে। বালককবি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন,

সে দিন আসিবে গিরি, এখনই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানব হৃদয় ![1]

বিশ্বপ্রেমের বাণীবহন রবীন্দ্র-কাব্যের একটি প্রধান সাধনা। এই বাণীর অস্ফুট কাকলি প্রতিধ্বনিত হইয়াছে ষোল বছর বয়সের লেখা এই কাব্যটিতে।

এ যে সুখময় আশা দিয়াছ হৃদয়ে
ইহার সঙ্গীত দেবী, শুনিতে শুনিতে
পারিব হরষ চিতে ত্যজিতে জীবন ![1]

[1] চতুর্থ সর্গ।

কবি-কাহিনীর নায়কের বৃদ্ধবয়সের চিত্রে রবীন্দ্রনাথ যেন নিজেরই পরিণত বয়সের রূপ প্রতিফলিত করিয়াছিলেন,

বিশাল ধবল জটা বিশাল ধবল শ্মশ্রু,
নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি গম্ভীর মূরতি,
প্রশস্ত ললাট দেশ, প্রশান্ত আকৃতি তার
মনে হোত হিমাদ্রির অধিষ্ঠাতৃ-দেব ![১]

মধ্য-কৈশোরক কালের কয়েকটি মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ছোট ছোট গাথা 'শৈশব সঙ্গীত' (১২৯১) কাব্যে সঙ্কলিত হইয়াছিল। 'প্রতিশোধ' প্রথমে তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত ছিল।[২] কাহিনীতে শেক্‌স্‌পিয়রের হ্যামলেট নাটক-কাহিনীর ক্ষীণ প্রভাব আছে। নায়ক কুমারের পিতা শয্যায় গুপ্তঘাতকের ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়া মরিবার পূর্ব্বে পুত্রকে প্রতিশোধ লইবার জন্য শপথ করান। প্রতিশোধ-গ্রহণের জন্য কুমার শত্রুর সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিতে ঘুরিতে একদা তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে এক কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কুটীরে প্রতাপ কন্যা মালতীকে লইয়া বাস করিত। কুমার মালতীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ ভুলিয়া সেই কুটীরেই রহিয়া গেল। উভয়ের প্রণয় দেখিয়া প্রতাপ তাহাদিগকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিল। বিবাহসভায় যেমন প্রতাপ মালতীকে কুমারের হাতে সমর্পণ করিল অমনি কুমারের পিতার প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইল। তাহা দেখিয়া প্রতাপ ও মালতী মূর্চ্ছিত হইল এবং নিমন্ত্রিতেরা পলাইয়া গেল। প্রেতমূর্ত্তি তখন কুমারকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল,

হা রে কুলাঙ্গার, অক্ষত্র সন্তান,
এই কিরে তোর কাজ ?
শপথ ভুলিয়া কাহার মেয়েরে
বিবাহ করিলি আজ !

[১] চতুর্থ সর্গ। [২] ভারতী ১২৮৫ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

কুমার উন্মত্ত হইয়া মূর্চ্ছিত প্রতাপকে মারিতে গেল কিন্তু পারিল না। প্রতাপ ও মালতী চেতন পাইলে কুমার প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে সে-ই তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিল। প্রতাপের মনে অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কুমারেরও প্রতিশোধস্পৃহা নাই। আবার প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইয়া তাহাকে উত্তেজিত করিল। তখন কুমার প্রতাপের বুকে ছুরি বসাইয়া দিল। তাহা দেখিয়া মালতী মূর্চ্ছিত হইয়া কুমারেব পায়ের তলায় পড়িয়া গেল। সে মূর্চ্ছা আব ভাঙ্গিল না। কুমার পাগল হইয়া সেই বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

'লীলা'[১] কবিতার কাহিনীব সঙ্গে ববীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য গল্প 'ভিখারিণী'-র[২] ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে। লীলা বণধীবকে ভালবাসে, তাহাব সহিত বিবাহও হইয়াছে। বিবাহের পর লীলা যখন স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরালয়ে যাইতেছিল, তখন নিরাশপ্রণয়ী বিজয় তাহাকে ছিনাইয়া আনিয়া বন্দী কবিয়া রাখে এবং মিথ্যা করিয়া বলিয়া যায় যে যুদ্ধে বণধীব প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই শুনিয়া লীলা নিজের বুকে ছুরি হানিল। এদিকে বণধীর বিজয়েব দলবলকে পরাস্ত কবিয়া লীলার সন্ধানে আসিয়া দেখিল সে মৃতকল্প। বণধীরকে বিজয়ের প্রতারণার কথা বলিয়া লীলা শেষনিঃশ্বাস ফেলিল। প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া রণধীব রণক্ষেত্রে ছুটিয়া আসিযা

দেখে বিজয়েব মৃতদেহ সেই
রয়েছে পড়িয়া সমর-ভূমে।
রণধীর যবে মরিছে জ্বলিয়া
বিজয় ঘুমায় মবণ ঘুমে!

'ফুলবালা'[৩] রূপক গাথা' ফুলবালক অশোক ও ফুলবালা মালতীর কিশোর-প্রেমের কাহিনী। প্রতিশোধ ও লীলার মত 'অপ্সরা-প্রেম' কাহিনীসর্ব্বস্ব

[১] ভাবতী ১২৮৫ আশ্বিন সংখ্যার প্রথম প্রকাশিত। [২] ভারতী ১২৮৪ শ্রাবণ-ভাদ্র।
[৩] প্রথম অংশ ১২৮৩ চৈত্র সংখ্যা আর্য্যদর্শনে (পৃ ৫৩২-৩৮) এবং দ্বিতীয় অংশ ১২৮৫ কার্ত্তিক সংখ্যা ভাবতীতে প্রথম প্রকাশিত।

নয়। ইহার কাহিনী যৎসামান্য, কবিত্বের প্রকাশই মুখ্যতর। নায়ক যুদ্ধে গিয়াছে, নায়িকা ব্যথিতহৃদয়ে তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে যক্ষ-নারীর মত ;

রজনীর পরে আসিছে দিবস
দিবসের পর রাতি।
প্রতিপদ হোতে হ'ল পূরণিমা,
দিনে দিনে দিনে বাড়িল চাঁদিমা
প্রতি নিশি নিশি ক্ষীণ হয়ে এল
দিনে দিনে দিনে, ধীরে ধীরে ধীরে,
ক্ষয় হয়ে পুনঃ আসিল সে ফিরে
ফুরালো জোছনা ভাতি।[১]

রণজয়ী হইয়া নায়ক সমুদ্রে তরী চাপিয়া ফিরিতেছে। অকস্মাৎ সমুদ্রবক্ষে ঝড় উঠিল।

সহসা ভ্রুকুটী উঠিল সাগর
পবন উঠিল জাগি,
শতেক উরমি মাতিয়া উঠিল,
সহসা কিসের লাগি।
সাগরের অতি দুরন্ত শিশুরা
কহিয়া অস্ফুট বাণী,
উলটি পালটি খেলিতে লাগিল
লইয়া তরণীখানি![১]

নায়কের শৌর্য ও রূপ দেখিয়া এক অপ্সরা মুগ্ধ হইয়া তাহার সঙ্গ লইয়াছিল। তরণী ডুবিয়া গেলে অপ্সরা নায়ককে উদ্ধার করিয়া এক দ্বীপে লইয়া গিয়া বাস করিতে লাগিল। অপ্সরার প্রেম কিন্তু নায়ককে তৃপ্ত করিতে পারিল না। সে কেবলি ভাবে,

১ প্রথম প্রকাশের পাঠ ভারতী ১২৮৫ ফাল্গুন সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কি ধন হারায়ে গেছে, কি সে কথা ভুলে গেছি,
হৃদয় ফেলেছে ছেয়ে কি সে ঘুমঘোর।

অবশেষে প্রিয়ের কল্যাণে অপ্সরা নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিল;

এস তবে এস মায়ার বাঁধন
খুলে দিই ধীরে ধীরে,
যেথা সাধ যাও আমি একাকিনী
বসে থাকি সিন্ধু তীরে।

'অপ্সরা-প্রেম' এবং 'ভগ্নতরী'[১] রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলাত-প্রবাসকালে লিখিত। তাই এই দুই কবিতার পটভূমিকায় হিমালয়ের পরিবর্ত্তে সমুদ্রের দৃশ্য প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। দুইটি কবিতায় ভাবেরও ঐক্য আছে। ভগ্নতরীর আখ্যানের প্রথম অংশ বহুকাল পরে 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে অনুবৃত্ত হইয়াছে। ভগ্নতরী ছোট ছোট পাঁচ সর্গে বিভক্ত। অজিত-ললিতা তরুণ পতি-পত্নী। এক শান্ত সন্ধ্যায় তাহারা নৌকায় চড়িয়া প্রমোদভ্রমণে বাহির হইয়াছে। অকস্মাৎ ঝটিকা উঠিয়া তাহাদের প্রেমস্বপ্ন টুটাইয়া দিল। মজ্জমান নৌকা পরিত্যাগ করিয়া অজিত ললিতের হাত ধরিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অচিরে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ দুই জনকে পৃথক করিয়া বিভিন্ন দিকে লইয়া চলিল। ললিতার অচেতন দেহ নিক্ষিপ্ত হইল এক বিজন দ্বীপের উপকূলে। সেই দ্বীপের একমাত্র অধিবাসী ছিল সুরেশ। সেও বহুকাল পূর্ব্বে নৌকাডুবি হইয়া এইস্থানে আসিয়া পড়িয়াছিল। সুরেশের যত্নে ললিতা সুস্থ হইল, কিন্তু অশেষ সান্ত্বনাসত্ত্বেও অজিতের শোক তাহাকে তিলে তিলে মৃত্যুমুখে লইয়া যাইতে লাগিল। শেষে সুরেশের অক্লান্ত সেবা তাহাকে ধীরে ধীরে বাঁচাইয়া তুলিল। সুরেশের প্রতি ললিতার কৃতজ্ঞতা ক্রমে প্রেমে পরিণত হইল এবং অজিতের স্মৃতি তাহার চিত্তপট হইতে মুছিয়া গেল। একদা দ্বীপের নিকট দিয়া একটী তরণী যাইতেছিল। তাহাতে চড়িয়া তাহারা সুরেশের দেশে ফিরিয়া গেল এবং

[১] [illegible]তী ১২৮৬ আষাঢ় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। জীবনস্মৃতি হইতে জানা যায় যে ভগ্নতরী T[illegible]uay-তে অবস্থানকালে রচিত হইয়াছিল।

বিপাশার তীরে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিল। একদিন তাহারা দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূর গিয়া পড়িয়াছে। যখন খেয়াল হইল তখন সন্ধ্যা নামিয়াছে এবং মাথার উপরে ঝঞ্ঝার মেঘ ঘনাইয়াছে। আশ্রয় উদ্দেশ্যে তাহারা নিকটবর্ত্তী এক ভগ্ন অট্টালিকায় আশ্রয় লইতে গিয়া দেখিল, একটি ঘর হইতে প্রদীপের ক্ষীণ আলোক রশ্মি বাহির হইতেছে। সেই ঘরের দিকে যাইতে যাইতে ললিতা একটি গানের দুই ছত্র ক্ষীণকণ্ঠে গীত হইতে শুনিল। এ গান অজিত তাহাকে বহুবার শুনাইয়াছিল। গান শুনিয়াই ললিতার শরীর ও মন বিকল হইয়া গেল। ঘরে ঢুকিয়া তাহারা দেখে,

বিছানো শুকানো পাতা, শুয়ে আছে রাখি মাথা,
পুরুষ একটি শ্রান্ত-কায়,
অতি শীর্ণ দেহ তার এলোমেলো জটাভার,
মুখশ্রী বিবর্ণ অতি হায়।

ললিতাকে দেখিয়া মুমূর্ষু অজিত মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া গেল এবং করুণদৃষ্টিতে ললিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। ললিতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। তখন

বাহিরে উঠিল ঝড়, গর্জ্জিল অশনি ;
জীর্ণগৃহ কাঁপাইয়া—ভগ্ন বাতায়ন দিয়া
প্রবেশিল বায়ুচ্ছ্বাস গৃহের মাঝারে,
নিভিল প্রদীপ,—গৃহ পূরিল আঁধারে।

ভগ্নতরীর ভাষায় অকৃত্রিম সরলতা এবং অলঙ্কারে সারল্য ও অভিনবতা দেখা দিয়াছে। যেমন,

ঝটিকার অবসানে প্রকৃতি সহাস,
সংযত করিছে তার এলোথেলো বাস।
খেলায়ে খেলায়ে শ্রান্ত সারাটি যামিনী,
মেঘকোলে ঘুমাইয়া পড়েছে দামিনী
থেকে থেকে স্বপনেতে চমকিয়া চায়,
ক্ষীণ হাসিখানি হেসে আবার ঘুমায়।

মধ্য-কৈশোরক কালের লেখা একটি গাথা কবিতা, 'বিষ ও সুধা', সন্ধ্যা-সঙ্গীত প্রথম সংস্করণে (১৮৮২) প্রকাশিত হইয়াছিল।[১] ভাবের দিক দিয়া বিচার করিলে কবিতাটিকে ভগ্নতরীর পর্য্যায়ে ফেলিতে পারা যায়। নারীপ্রেমের ভঙ্গুরতা দুইটি কবিতায়ই ধ্বনিত হইয়াছে। তবে বিষ-ও-সুধায় প্রণয়ের সঙ্গে সৌভ্রাত্রের মাধুর্য্য মিশিয়াছে। কবিতাটির রচনাকাল ভগ্নতরীর অনেক পূর্ব্বে বলিয়া অনুমান হয়। ছন্দ অমিত্রাক্ষর পয়ার। কাহিনী ঘোরালো নয়, বর্ণনারই প্রাধান্য। নায়ক কবি ললিত ও তাহার ভগিনী মালতী একত্র মানুষ হইয়াছে। তাহাদের আর কেহ ছিল না। বালককবির হৃদয় মালতীর স্নেহে ভরপূর ছিল ;

> মালতীর শান্ত সেই হাসিটির সাথে
> হৃদয়ে জাগিত যেন প্রভাত পবন,
> নূতন জীবন যেন সঞ্চরিত মনে।
> ছেলেবেলাকার যত কবিতা আমার
> সে হাসির কিরণেতে উঠেছিল ফুটি!
> মালতী ছুঁইত মোর হৃদয়ের তার,
> তাইতে শৈশব-গান উঠিত বাজিয়া!

ক্রমে উভয়ে তরুণবয়স্ক হইল। নীরদ মালতীকে ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়া লইয়া গেল। সঙ্গীহারা কবি অশান্তহৃদয় লইয়া অন্যমনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কবি ভাবিত,

> অন্যমনে আছি যবে, হৃদয় আমার
> সহসা স্বপন ভাঙ্গি উঠিত চমকি!
> সহসা চেতনা ভেবে, চেতনা খুঁজিয়া
> আগে কি ছিলরে যেন এখন তা নাই।
> প্রকৃতির কি-যেন-কি গিয়াছে হারায়ে
> মনে তাহা পড়িছে না!

[১] পৃ ১১১-৩২। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের "বিজ্ঞাপন"-এ গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন, " 'বিষ ও সুধা' নামক দীর্ঘ কবিতাটি বাল্যকালের রচনা।"

হঠাৎ এক বসন্তদিনে কবি নির্ঝরের ধারে বালিকা দামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। দামিনীর সহিত কবির প্রত্যহ দেখা হইতে লাগিল। দামিনীকে কবি ভালবাসিল। দামিনীর চিত্তও কবির প্রতি উদাসীন রহিল না। বৎসরাধিক কাল কাটিয়া গেলে কবিকে কিছুদিনের জন্য বিদেশে যাইতে হইল। দামিনীর কাছে বিদায় লইবার সময় কবির মনে আশঙ্কা জাগিল, "এ জনমে আর বুঝি পাবনা দেখিতে"। বহু আশা করিয়া কবি যখন ফিরিয়া আসিল তখন দামিনীকে আর দেখিতে পাইল না, দেখিল মালতী বিধবা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। নিজের হৃদয়ের ব্যথাকেই বড় করিয়া দেখায় কবি মালতীর নীরব দুঃসহ বেদনা টের পাইল না। মালতী নিজের দুঃখ চাপিয়া কবিকে সেবা করিতে ও সান্ত্বনা দিতে লাগিল। মালতীর শুশ্রূষায় ক্রমে হৃদয়বেদনা দূর হইয়া গেলে কবি বুঝিতে পারিল যে মালতী নিজে মৃত্যুবরণ করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছে।

> মালতী শুকায়ে গেল, সুবাস তাহার
> এখনো রয়েছে কিন্তু ভরিয়া কুটীর।
> তাহার মনের ছায়া এখনো যেনরে
> সে কুটীরে শান্তিরসে রেখেছে ডুবায়ে!
> সে শান্ত প্রতিমা মম মনের মন্দির
> রেখেছে পবিত্র করি রেখেছে উজ্জ্বলি!

বিষ-ও-সুধার ভাষায় আদি-কৈশোরক কালের অপরিপক্কতা থাকিলেও কল্পনা-কলায় এবং অলঙ্কারশিল্পে, বৈচিত্র্যের নিদর্শন প্রচুর রহিয়াছে। যেমন, আরম্ভে

> অস্ত গেল দিনমণি। সন্ধ্যা আসি ধীরে
> দিবসের অন্ধকার সমাধির পরে
> তারকার ফুলরাশি দিল ছড়াইয়া।

সন্ধ্যা-সঙ্গীতের প্রথম 'উপহার' কবিতাটির বীজ বিষ-ও-সুধার উপোদ্‌ঘাতে আছে, তাই এই বাল্যরচনাটিকে কবি সন্ধ্যা-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।

শুন সন্ধ্যে! আবার এসেছি আমি হেথা,
নীরব আঁধারে তব বসিয়া বসিয়া
তটিনীর কলধ্বনি শুনিতে এয়েছি।
মনে হয় যেন তুমি আমারি মতন
কি এক প্রাণের ধন ফেলেছ হারায়ে।
এস স্মৃতি, এস তুমি এ ভগ্ন হৃদয়ে,—
সায়াহ্ন-রবির মৃদু শেষ রশ্মি-রেখা
যেমন পড়েছে ওই অন্ধকার মেঘে
তেমনি ঢাল এ হৃদে অতীত-স্বপন!
কাঁদিতে হয়েছে সাধ বিরলে বসিয়া,
কাঁদি একবার, দাও সে ক্ষমতা মোরে!

প্রভাত-সঙ্গীতের প্রথম কবিতা 'প্রভাত বিহঙ্গের গান'-এর আভাষও এখানে রহিয়াছে।

বিষময়, বহ্নিময়, বজ্রময় প্রেম,
এ স্নেহের কাছে তুই ঢাক্ মুখ ঢাক্!
তুই মরণের কীট, জীবনের রাহু,
সৌন্দর্য্য-কুসুম-বনে তুই দাবানল,
হৃদয়ের রোগ তুই, প্রাণের মাঝারে
সতত রাখিস্ তুই, পিপাসা পুষিয়া,
ভুজঙ্গ বাহুর পাকে মর্ম্ম জড়াইয়া
কেবলি ফেলিস্ তুই বিষাক্ত নিশ্বাস,
আগ্নেয় নিশ্বাসে তোর জ্বলিয়া জ্বলিয়া
হৃদয়ে ফুটিতে থাকে তপ্ত রক্তস্রোত!

৬

'ভগ্নহৃদয়'[১] রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তম গাথা-কাব্য, চৌত্রিশ সর্গে বিভক্ত। নাটকের মত সংলাপের আকারে লেখা হইলেও ভগ্নহৃদয় নাটক নয়, কাব্য।[২] পাত্রপাত্রীর সংখ্যাও অল্প নয়। প্রধান নায়ক কবি। বাল্যসখী মুরলা তাহাকে গভীরভাবে ভালবাসে, কিন্তু তাহা সে সযত্নে গোপন রাখিয়াছে। কবির হৃদয় ভালবাসার পাত্রের অভাবে নিরাশ্রয় হইয়া পীড়িত হইতেছে। মুরলা তাহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেয়। একদিন কবি নলিনী-নাম্নী বিলাসিনী তরুণীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। নলিনীর ভক্তসংখ্যা অসংখ্য। কাহাকেও সে ভালবাসে না, কিন্তু সকলকেই হাস্যে কটাক্ষে ইঙ্গিতে আশায় ভুলাইয়া রাখে। মুরলার ভাই অনিল ললিতাকে ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে। ললিতা বড় লাজুক মেয়ে। অনিল তাহার লজ্জা কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছে না। সেও শেষে নলিনীর চটুল রূপের মোহে পড়িল। ইহাতে নিজেরই দোষ ভাবিয়া ললিতা অন্তর্দাহে জ্বলিয়া মরণের পথে আগাইয়া চলিল। এদিকে মুরলা ভগ্নহৃদয়ে নিরুদ্দেশ হইলে কবি বুঝিল তাহার হৃদয়ের কতখানি স্থান সে অধিকার করিয়াছিল। মুরলার অন্বেষণে বাহির হইয়া কবি দেখিল সে এক কুটীরে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মৃত্যুর পূর্ব্বে দুইজনের মিলন হইল। মোহপাশবিমুক্ত অনিলও মৃতকল্প ললিতার দেখা পাইল।

এখানেও কবির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রতিফলিত করিয়াছেন। কবির মুখে তিনি নিজেরই মনের কথা দিয়াছেন,

> বহুদিন হ'তে, সখি, আমার হৃদয়
> হোয়েছে কেমন যেন অশান্তি-আলয়,
> চরাচর-ব্যাপী এই ব্যোম-পারাবার
> সহসা হারায় যদি আলোকে তাহার,
> আলোকের পিপাসায় আকুল হইয়া

[১] বিলাতে থাকিতে ভগ্নহৃদয়ের পত্তন হইলেও ফিরিয়া আসিবার সময় জাহাজে ইহার প্রথম অংশের বেশি ভাগ লেখা হয়। দেশে ফিরিয়া কবি কাব্যটি শেষ করেন। ভারতী পত্রিকায় ১২৮৭ কার্ত্তিক-ফাল্গুন সংখ্যাগুলিতে ছয় সর্গ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮০৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। [২] ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

কি দারুণ বিশৃঙ্খল হয় তার হিয়া !
তেমনি বিপ্লব ঘোর হৃদয় ভিতরে
হ'তেছে দিবস নিশা, জানি না কি তরে।![1]

মুরলা ভূমিকায় বিষ-ও-সুধার মালতীর ছায়া পড়িয়াছে। নলিনীর ভূমিকা সম্ভবত কোন বিদেশী তরুণীর আদর্শে অঙ্কিত।[2] তবে এই চরিত্রের যে পরিণতি দেখান হইয়াছে তাহাতে বিলাতি ভাব নাই। বাৎসল্য-স্নেহের আবির্ভাবে হৃদয়ের কাঠিন্য গলিয়া গিয়া প্রেমের আবির্ভাবসম্ভাবনা জাগে,—এই তত্ত্ব রবীন্দ্র-নাথের অধিকাংশ উপন্যাসে উদাহৃত হইয়াছে। ভগ্নহৃদয়েও ইহার ইঙ্গিত পাই। প্রেমের আলোকবঞ্চিত বিশুষ্ক নলিনী ভাবিতেছে,

সেদিন খেলিতেছিল নীরদের ছেলে দুটি
কচি মুখে আধ আধ কথা পড়িতেছে ফুটি,
অযতনে কপালেতে পড়ে আছে চুলগুলি,
চুপি চুপি কাছে গিয়ে কোলেতে লইনু তুলি।
বুকেতে ধরিনু চাপি, হৃদয়ে ফাটিয়া গিয়া
পড়িতে লাগিল অশ্রু দর দর বিগলিয়া,
ডাগর নয়ন তুলি মুখ পানে চেয়ে চেয়ে,
কিছুক্ষণ পরে তারা চলিয়া গেল গো ধেয়ে ![3]

সপ্তম সর্গের প্রথমে যে গান বা কবিতা আছে তাহা 'লাজময়ী' নামে শৈশব-সঙ্গীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কাব্যশিল্পপরিণতির আভাস ভগ্নহৃদয়ের কয়েকটি গানে ও অংশবিশেষে পরিলক্ষিত হয়। যেমন,

আঁধার শাখা উজল করি,
হরিত পাতা ঘোমটা পরি
বিজন বনে, মালতী বালা,
আছিস্ কেন ফুটিয়া ?[4]

[1] প্রথম সর্গ। [2] "নলিনী"র প্রতি কবির মনোভাব সন্ধ্যা-সঙ্গীতের 'দুর্দিন' কবিতায় লক্ষিতব্য। [3] দ্বাত্রিংশ সর্গ। [4] পঞ্চম সর্গ।

সুখের মুখেতে থাকে দুখের কালিমা,
দুখের হৃদয়ে জাগে সুখের প্রতিমা।[1]

আঁখি দুটি লইনু তুলিয়া,
দূরে যেতে ফিরানু বদন!
অমনি সে নূপুরের মত
চরণ ধরিল জড়াইয়া,
সাথে সাথে এল সারা পথ
রুণু ঝুনু কাঁদিয়া কাঁদিয়া।[2]

যে কথা পথের ধারে পঙ্কের মতন,
জড়াইয়া ধরে প্রতি পান্থের চরণ,
সেই একটি কথা তরে হৃদয় আমার,
দিবানিশি ছিলি পোড়ে দুয়ারে তাহার![3]

'ছবি ও গানে'-র 'রাহুর প্রেম' কবিতার পূর্ব্বাভাস,

মরিতে যেতেছি, তবু রাহুর মতন
পদে পদে সাথে সাথে করিবি গমন?[3]

৭

"নাটিকা" ছাপ সত্ত্বেও 'রুদ্রচণ্ড'[4] গাথা-কাব্যেরই সগোত্র, এবং ইহাই রবীন্দ্রনাথের শেষ গাথা-কাব্য। রুদ্রচণ্ড প্রধানত অমিত্রাক্ষর পয়ার-ত্রিপদীতে রচিত। ক্বচিৎ মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ দৃশ্যে বিভক্ত। পৃথ্বীরাজের কাছে পরাজিত হইয়া হৃতরাজ্য রুদ্রচণ্ড কালভৈরবের প্রতিমার সম্মুখে সংকল্প করিয়াছে স্বহস্তে,

[1] তৃতীয় সর্গ। [2] বিংশ সর্গ। [3] একবিংশ সর্গ। [4] ১৮০৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ভগ্নহৃদয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত। ইহা রবীন্দ্রনাথের আমেদাবাদ থাকা কালে প্রথমবার বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এমন অনুমানের হেতু নাই। দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার প্রারম্ভে ইহা রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল, এই অনুমানেই সঙ্গততর। বৌঠাকুরাণীর হাটের সঙ্গে বিষয়বস্তুর মর্ম্মগত মিলও এই অনুমানের সমর্থক।

তাহাকে নিধন করিবে। কন্যা অমিয়াকে লইয়া রুদ্রচণ্ড বনে কুটীর বাঁধিয়া বাস করে। চাঁদ কবি অমিয়াকে ভাইয়ের মত ভালবাসে এবং কুটীরে আসিয়া তাহাকে কবিতা শোনায়। ইহা রুদ্রচণ্ডের অসহ্য হইল। সে অমিয়াকে বলিল, পৃথ্বীরাজের সভাসদ চাঁদ কবি যদি সে বনে আর পদার্পণ করে তাহা হইলে জীবিত ফিরিয়া যাইবে না। অমিয়ার কাতর অনুরোধ রুদ্রচণ্ডের মন গলাইতে পারিল না। যথারীতি চাঁদ কবি অমিয়াকে আপনার রচিত গান শুনাইতে ও শিখাইতে আসিয়াছে। অমিয়া তাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া পিতার নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞার কথা বলিল। চাঁদ তাহা গ্রাহ্য করিল না। তাহার অনুরোধ অমিয়া একটি গান গাহিল, চাঁদও একটি নূতন গান শুনাইল। এমন সময় সেখানে রুদ্রচণ্ডের প্রবেশ। অমিয়ার বাধা সত্ত্বেও রুদ্রচণ্ড চাঁদকে আক্রমণ করিল। চাঁদ প্রতিরোধ করিল। অমিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। রুদ্রচণ্ড পরাজিত হইয়া চাঁদের কাছে প্রাণভিক্ষা করিল পূর্ব্বসংকল্প-সাধনের জন্য। ইতিমধ্যে দূত আসিয়া চাঁদকে রাজসভায় ডাকিয়া লইয়া গেল। চাঁদের অনুগ্রহে প্রাণ পাইয়া রুদ্রচণ্ড আত্মধিক্কারে জর্জ্জরিত হইয়া অমিয়াকে ভৎসনা করিল। পিতার নিষ্ঠুর বাক্যে মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইয়া অমিয়া মূর্চ্ছিত হইল। কন্যার মূর্চ্ছিত দেহ তুলিয়া লইয়া রুদ্রচণ্ড বনের বাহিরে রাখিয়া আসিল। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে অমিয়া চাঁদের অন্বেষণে শহরের দিকে চলিল; পথে তাহার আশ্রয় মিলিল। এদিকে চাঁদ অমিয়াকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, এমন সময় যুদ্ধের আহ্বান আসিল,—মহম্মদ ঘোরী অকস্মাৎ হস্তিনাপুর আক্রমণ করিয়াছে। এই সংবাদ রুদ্রচণ্ড পাইল মহম্মদ ঘোরীর দূতের মুখে। তাহাকে পৃথ্বীরাজের শত্রু জানিয়া মহম্মদ ঘোরী তাহার সাহায্য চাহিয়াছে। রুদ্রচণ্ড দেখিল তাহার মুখের গ্রাস অন্যে কাড়িতে আসিয়াছে। সে দূতকে বলিল,

যেমন পৃথ্বীর শত্রু মহম্মদ ঘোরী
তেমনি আমারো শত্রু কহি তোরে দূত!
পৃথ্বীর রাজত্ব, প্রাণ এসেছে কাড়িতে,
সমস্ত জগৎ মোর ছিনিতে এসেছে।

এখনি নগরে যাব কহি তোরে আমি।
অশুভ বারতা এই করিব প্রচার।

রুদ্রচণ্ড দূতকে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাইতে দিল না।

চাঁদ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার পথে অমিয়াকে দেখিল। অমিয়াও তাহাকে দেখিয়া "ভাই, ভাই" বলিয়া ছুটিয়া আসিল। কিন্তু সেনাপতি তাহাকে থামিতে দিল না, বলিল,

চাঁদ কবি, এই কি সময়!
আমাদের মুখ চেয়ে সমস্ত ভারত,
ছেলেখেলা পেনু একি পথের ধারেতে?
চল চল বাজাও, বাজাও রণভেরী!

রণভেরীদুন্দুভিধ্বনির মধ্যে চাঁদের কথা ডুবিয়া গেল। রুদ্রচণ্ড শহরে আসিয়াছে। তাহার আকুল প্রশ্ন, পৃথ্বীরাজ বাঁচিয়া আছে কি না। নগরের লোক ঘৃণা করিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল না। ক্রুদ্ধ রুদ্রচণ্ড নগরবাসীর উপর মনের ঘৃণা বৃষ্টি করিতে লাগিল নারীর মত,

নগর-কুক্কুর যত মরুক—মরুক!
হীন অপদার্থ যত বিলাসীর পাল,
যুদ্ধের হুঙ্কার শুনে ডরিয়া মরুক!
নবনী-গঠিত যত সুখের শরীর—
নিজের অস্ত্রের ভারে পিষিয়া মরুক!
ঐশ্বর্য্য-ধূলায় অন্ধ নগরের কীট
নিজের গরবে ফেটে মরুক—মরুক!

যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ বন্দী হইয়া নিহত হইয়াছে শুনিয়া রুদ্রচণ্ড যেন নিবিয়া গেল, তাহার জীবন এক মুহূর্ত্তে শূন্য হইয়া গেল। সে ভাবিল, পৃথ্বীরাজ মরে নাই, মরিয়াছে সে নিজে;

যে দুরন্ত দৈত্য শিশু দিন রাত্রি ধ'রে
হৃদয় মাঝারে আমি করিনু পালন,

তারে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল,
পৃথিবীতে আর কিছু ছিল না আমার,
তাহারি জীবন ছিল আমারি জীবন—
এ মুহূর্ত্তে মরে গেল সেই বৎস মোর!
তারি নাম রুদ্রচণ্ড আমি কেহ নই।

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভূমিসাৎ হওয়ায় রুদ্রচণ্ড আত্মঘাতী হইল। যখন সে নিজের বুকে ছুরি হানিয়াছে তখন অমিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মরণের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে রুদ্রচণ্ডের লুপ্ত স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতি ফিরিয়া আসিল, সে কন্যাকে বুকে টানিয়া লইল। এদিকে পৃথ্বীরাজের পরাজয়-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চাঁদ অমিয়ার অন্বেষণে বাহির হইয়াছে। সে যখন অমিয়ার কুটীরে আসিল তখন রুদ্রচণ্ডের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে এবং অমিয়া মুমূর্ষু। চাঁদকে দেখিয়া অমিয়া তাহার শেষ প্রশ্ন করিয়া অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। চাঁদ কবির হৃদয়ে করুণ ক্রন্দন বাজিতে লাগিল,

একি হ'ল, একি হ'ল, অমিয়া, অমিয়া,
এক মুহূর্ত্তের তরে রহিলি না তুই?
করুণ অন্তিম প্রশ্ন মুখে রয়ে গেল,
উত্তর শুনিতে তার দাঁড়ালি নে বোন?
ভাল বোন, দেখা হবে আর একদিন,
সে দিন দুজনে মিলি করিব রে শেষ
দু-জনের হৃদয়ের অসম্পূর্ণ কথা।

রুদ্রচণ্ডের ভূমিকা সুচিত্রিত, তাহাতে নাটকীয় গুণও আছে। তবুও রুদ্রচণ্ড নাটক নয়, কাব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী গাথা-কাব্যের সঙ্গে রুদ্রচণ্ডের পার্থক্য হইতেছে প্রেমরসের স্থানে সৌভ্রাত্ররসের প্রবর্ত্তনে। এইহিসাবে রুদ্রচণ্ডকে 'বৌঠাকুরাণীর হাটের'[১] পূর্ব্বাভাস বলা যাইতে পারে। অমিয়ার এই মর্ম্মবেদনা বৌঠাকুরাণীর-হাটের একাধিক পাত্রপাত্রীর অন্তরে ধ্বনিত হইয়াছে,

[১] ভারতী ১২৮৮ কার্ত্তিক হইতে ১২৮৯ আশ্বিন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

সঙ্কীর্ণ-হৃদয় অতি ক্ষুদ্র এ কুটীর,
ভ্রূকুটীর সম্মুখেতে দিনরাত্রি বাস,
শাসন-শকুনি এক দিনরাত্রি যেন
মাথার উপরে আছে পাখা বিছাইয়া,
এমন ক'দিন আর কাটিবে জীবন ![১]

বনফুল এবং কবি-কাহিনী আংশিকভাবেও পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। পরবর্তী গাথা-কাব্যগুলিকে কিন্তু এতটা অনাদর ভোগ করিতে হয় নাই। ভগ্নহৃদয়ের কতকগুলি অংশ এবং গান স্বতন্ত্র কবিতারূপে 'কাব্যগ্রন্থাবলী'-র (১৩০৩) কৈশোরক অংশে উদ্ধৃত হইয়াছিল।[২] রুদ্রচণ্ড হইতে দুইটি অংশ,[৩] অপ্সরার প্রেম হইতে তিনটি অংশ[৪] ও ফুলবালা হইতে একটি অংশ[৫]-ও সঙ্কলিত হইয়াছিল। উদ্ধৃতির সময় কোন কোন শব্দ পরিবর্তিত হইয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে পরিবর্জন হইয়াছিল।

৮

রবীন্দ্রনাথের প্রথমপ্রকাশিত লিরিক কবিতা বোধ হয় 'শ্মশানে রজনীগন্ধা'। ইহা 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় ১২৮৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংখ্যায় বনফুলের কোন কিস্তি বাহির হয় নাই। বনফুলে যেমন এ কবিতায়ও তেমনি লেখকের নাম নাই। তবে কবিতাটির ভাব ও ভাষা অনুধাবন করিলে কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না।

[১] দ্বিতীয় দৃশ্য। [২] কৈশোরকের চল্লিশটি কবিতার মধ্যে উনত্রিশটি ভগ্নহৃদয় হইতে নেওয়া,—'বাসকসজ্জা' (১), 'শ্যামা' (২), 'চকিলা' (২), 'প্রথম দর্শন' (৪), 'মোহ' (৪), 'আন্দোলন' (৪), 'উল্লাস' (৪), 'একাকিনী' (৫), 'ভাবাবেগ' (৬), 'উচ্ছ্বাস' (৬), 'সমস্যা' (৮), 'লাজময়ী' (১০), 'হারা হৃদয়ের গান' (৯), 'ছায়া' (১১), 'বুঝা পড়া' (১২), 'বিদ্রোহী' (১২), 'আত্ম-সমর্পণ' (১৩), 'বৈরাগ্যমেবাভয়ং' (১৭), 'অভাগিনী' (১৮), 'নৈরাশ্য' (১৯), 'অবজ্ঞা' (২০), 'জাগরণ' (২১), 'বসন্ত সমীর' (২২), 'সংশয়' (২৪), 'প্রত্যাখ্যান' (২৬), 'সায়াহ্নে' (২৮), 'বিশ্রাম' (২৯), 'খেলা-ভঙ্গ' (৩০), শেষ (৩৪)।

[৩] 'আরম্ভে' (৩), 'অবসানে' (৩)। [৪] 'সান্ত্বনা,' 'সোহাগ,' 'বিদায় গান'। [৫] 'নির্ব্বন্ধ'।

অন্যত্র সঙ্কলিত হয় নাই বলিয়া কবিতাটির প্রথম অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

মরি কি ফুল ফুটেছে আজ সকালে !
রাত্রযোগে গেছে ঝড়, মহীরুহ দড়মড়—
জানিনে যে এত সুখ ছিল মোর কপালে !
কি ফুল ফুটেছে আজ সকালে !
ভীষণ প্রলয় ঝড়ে, গোলাপ গিয়েছে পোড়ে
ফুটন্ত কামিনী গাছ ধরাসাৎ হয়েছে !
বেল যূঁই যুথি জাতি— সকলেই হীন ভাতি
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সব ভুঁয়ে পড়ে রয়েছে !
ভেবেছিনু বুঝি হায়, বাগান শ্মশানপ্রায়—
ভেঙ্গে গেছে সব গাছ এই ভাঙ্গা কপালে !
তা নয় তা নয় সখি, একি অপরূপ দেখি
শ্মশানে রজনীগন্ধা ফুটে আছে সকালে।

কবিতাটি 'ক্ষণিকা'-র 'দুর্দ্দিন' কবিতার আরম্ভ স্মরণ করাইয়া দেয়,

এতদিন পরে প্রভাতে এসেছ
কি জানি কি ভাবি মনে।
ঝড় হয়ে গেছে কাল রজনীতে
রজনীগন্ধার বনে।

তাহার পর 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকায় ১২৮৩ সালের চৈত্র সংখ্যায় 'ফুলবালা' (গীতিকা) প্রকাশিত হয়। শৈশব-সঙ্গীতের 'ফুলবালা' কবিতার প্রথম অংশ এই কবিতাটি। দ্বিতীয় অংশ ১২৮৫ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।[১]

'ভারতী' পত্রিকা বাহির হইলে তাহাতে রবীন্দ্রনাথের ছোট কবিতা প্রকাশিত

[১] 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ড) গ্রন্থ-পরিচয়ে ভুল করিয়া সমগ্র কবিতাটি ভারতীতে প্রকাশিত এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

হইতে থাকে। প্রথম (শ্রাবণ ১২৮৪) সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভারতী', দ্বিতীয় (ভাদ্র) সংখ্যায় প্রকাশিত 'হিমালয়' এবং তৃতীয় (আশ্বিন) সংখ্যায় প্রকাশিত 'আগমনী' রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াই মনে করি।[১] এই আশ্বিন সংখ্যা হইতেই 'ভানুসিংহের কবিতা' প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রথম কবিতা, "সজনি গো—শাঙন গগনে ঘোর ঘটা"। ভানুসিংহের দ্বিতীয় এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে' প্রকাশিত হইল অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। এই কবিতাটি লিখিয়া কবি মনের মধ্যে যে নিবিড় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন তাহার স্মৃতি সুদীর্ঘকালেও লুপ্ত হয় নাই,—"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুসি হইলাম"। ১২৮৪ সালে ভারতীতে ভানুসিংহের সাতটি কবিতা প্রকাশিত হয়, পরে আরও ছয়টি বাহির হইয়াছিল। ছবি-ও-গান কাব্যে দুইটি কবিতা ছিল। এই পনেরোটি কবিতা ও ছয়টি নূতন কবিতা লইয়া 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় (১২৯১, ১৮৮৪)। কড়ি-ও-কোমল কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১) নয়টি মাত্র কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল গানরূপে, তাহার মধ্যে একটি নূতন।[২] ১৩০৩ সালে প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থাবলীতে 'কৈশোরক' ভাগের দ্বিতীয় অংশরূপে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ইহাতে প্রত্যেক কবিতার নাম দেওয়া হইয়াছিল, এবং "দেখলো সজনী চাঁদনি রজনী"[৩] কবিতাটির পরিবর্তে "কো তুঁহু বোলবি মোয়" গৃহীত হইয়াছিল। "হম সখি দারিদ নারী" এবং "সখিরে—পিরীত বুঝবে কে"[৪] এই দুই কবিতা পরিত্যক্ত হয় এবং "সংশয়" নামে "হম যব না রব সজনী" কবিতাটি পরিগৃহীত হয়। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর বর্তমান প্রচলিত সংস্করণে কাব্য-গ্রন্থাবলী সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে।

[১] তৃতীয় কবিতাটির সম্বন্ধে কোন সংশয়ই নাই। ইহার আরম্ভ, "সুধীরে নিশার আঁধার ভেদিয়া"। রবীন্দ্রনাথের মধ্য কৈশোরিক-কালের রচনায় "সুধীরে" শব্দের প্রয়োগ একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। [২] "কো তুঁহু বোলবি মোয়"। [৩] ১২৮৭ বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত। [৪] যথাক্রমে ১২৮৪ মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কাছে ইংরেজ বালক-কবি টমাস চ্যাটার্টনের রচিত এবং "T. Rowlie" এই ছদ্মনামে প্রকাশিত প্রাচীন ইংরেজি কবিদের অনুকরণে লেখা জাল কবিতার কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা হইয়াছিল বৈষ্ণব-কবির অনুসরণে ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করিতে। ইহার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-পদাবলী ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন এবং জয়দেবের পদাবলী ঠিকমত যতিবিভাগ করিয়া মাত্রাছন্দে হাত পাকাইয়াছিলেন। সেইজন্য ভানু-সিংহের কবিতায় একেবারে পাকা হাতের লেখা দেখা গেল। ভানুসিংহের কবিতায় কাব্যকলার যে উৎকর্ষ দেখা যায় তাহা সমসাময়িক গাথা অথবা গীতি-কবিতায় দেখা যায় না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, ভানুসিংহের কবিতা লিখিবার সময় বালককবি কৃত্রিম ভাব এবং তৈয়ারী ভাষা ও ছন্দ পাইয়াছিলেন। অন্য কবিতার বেলা তাঁহাকে ভাষা ও ছন্দ গড়িয়া লইতে হইয়াছিল, এবং ভাবের পরিপক্কতার জন্যও সময়ের আবশ্যক ছিল। অনুরূপ কারণে গদ্যরচনায়ও রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা প্রথম হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক কাব্যের মধ্যে একমাত্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীই শেষ পর্য্যন্ত একরকম অক্ষতভাবে টিকিয়া গিয়াছে। পদগুলি "কপিবুকের কবিতা" হইলেও এবং তাহাতে প্রাচীন পদকর্ত্তাদের অকৃত্রিম ভাবাবেগের "প্রাণ-গলানো ঢালা সুর" না থাকিলেও বিশুদ্ধ কবিতা হিসাবে নির্গুণ নয়। প্রাচীন পদকর্ত্তারা সকলেই যে দৈবী প্রেরণা লইয়া ভক্তিরসাপ্লুতচিত্তে পদাবলী রচনা করিতেন এমন কথা বলিতে পারি না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পদাবলী অধিকাংশই অত্যন্ত কৃত্রিম ও গতানুগতিক। সেগুলি মনে করিয়া আমরা কবির কথায় সায় দিতে পারি, "ভানুসিংহ যিনিই হৌন্ তাঁহার লেখা যদি বর্ত্তমান আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।"

১২৮৪ আশ্বিন সংখ্যা ভারতীতে একটি গান প্রকাশিত হইয়াছিল, "তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ"।[১] ১২৮৪ অগ্রহায়ণ হইতে ১২৮৭ পৌষ পর্য্যন্ত

[১] ১২৮৬ ভাদ্র সংখ্যায় আর একটি গান প্রকাশিত হইয়াছিল, 'ভাসিয়ে দে তরী'।

ভারতীতে প্রকাশিত গাথা[১] এবং অপর গীতি-কবিতা 'শৈশব সঙ্গীত' (১২৯১ অর্থাৎ ১৮৮৪) কাব্যে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কেবল একটি কবিতা, 'দুদিন' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭), সন্ধ্যা-সঙ্গীতে ও দুইটি কবিতা, 'শরতে প্রকৃতি' (আশ্বিন ১২৮৭) এবং 'গীত' (মাঘ ১২৮৭), প্রভাত-সঙ্গীতে স্থান পাইয়াছে। শৈশব-সঙ্গীতের অপর কবিতার মধ্যে একটি, 'লাজময়ী', ভগ্নহৃদয় (সপ্তম সর্গ) হইতে গৃহীত[২] এবং তিনটি, 'অতীত ও ভবিষ্যত,' 'ফুলের ধ্যান' এবং 'প্রভাতী', অপ্রকাশিতপূর্ব্ব। শৈশব-সঙ্গীতের ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন, "এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম।"

১. শৈশব-সঙ্গীতে গাথাগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জন হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা ছাঁটা হইয়াছে 'ভারতী-বন্দনা' (১২৮৪ মাঘ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত)।

২ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'-র (অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ড) গ্রন্থ-পরিচয় নির্দ্দেশ ভুল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যৌবনবন

১

বিলাতপ্রবাস শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের মধ্য-কৈশোরক যুগের অবসান সূচিত হইল। রচনায় প্রাবীণ্যের প্রথম স্পর্শ লাগিল 'দুদিন' কবিতায়।[১] কবিতাটি সম্ভবত কবির ইংলণ্ড পরিত্যাগের সময়ে অথবা অল্প কিছুকাল পরে লেখা হইয়াছিল। কল্পনার রঙীন স্বপ্ন ছাড়িয়া সর্ব্বপ্রথম এই কবিতায় কবি নিজের হৃদয়াবেগকেই প্রকাশ করিয়াছেন। কৃত্রিম কবিত্ব-কল্পনার পরিবর্ত্তে যখন রবীন্দ্রনাথ নিজের হৃদয়াবেগ ও অনুভূতিকে স্বাধীনভাবে বাণীরূপ দিতে পারিলেন তখনি তাঁহার কাব্যপ্রবাহের উৎসমুখ খুলিয়া গেল। এইজন্য 'দুদিন' কবিতাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে।

> ক্ষুদ্র এ দুদিন তার শত বাহু দিয়া
> চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া!
> দুদিনের পদচিহ্ন চিরকাল তরে
> অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে!

নবযৌবন যুগের কাব্য 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'[২] ও 'প্রভাত সঙ্গীত'[৩]। সন্ধ্যা-সঙ্গীতের প্রথম সংস্করণে পঁচিশটি কবিতা ছিল। তাহার মধ্যে বাল্যরচনা 'বিষ ও সুধা' নামক গাথা-কবিতাটি দ্বিতীয় সংস্করণে (জ্যৈষ্ঠ ১৮১৪ শক) পরিত্যক্ত হয় এবং 'কেন গান গাই' ও 'কেন গান শুনাই' কবিতা দুইটি তৃতীয় অর্থাৎ কাব্য-গ্রন্থাবলী সংস্করণে (১৩০৩) বাদ গিয়াছে। বারোটি কবিতা প্রথমে ভারতীতে বাহির

[১] ভারতী ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথমপ্রকাশিত এবং সন্ধ্যা-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। কবি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি কিংবা মার্চ মাসে দেশে ফিরিয়া আসেন। [২] ১২৮৯ সালে অর্থাৎ ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত। নামপত্রে ১২৮৮ আছে। নামপত্র বোধ হয় ১২৮৮ সালে ছাপা হইয়াছিল। বই ছাপা হইয়া যাইবার পর আদি ও অন্ত 'উপহার' কবিতা দুইটি ছাপা হইয়াছিল, কেননা এগুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা স্বতন্ত্র। [৩] বৈশাখ ১৮০৫ শকে অর্থাৎ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত।

হইয়াছিল। 'দুদিন' এবং 'বিষ ও সুধা' ব্যতীত সকল কবিতাই শৈশব-সঙ্গীতের কবিতাগুলির পরে লেখা।

সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কবিতায় অপরিণতির পরিচয়ের অভাব নাই, কিন্তু তবুও ইহার মধ্য দিয়া প্রকৃত কবিচিত্তের যে অকৃত্রিম অনুভূতি নব ভাষায় এবং নবতর ছন্দে প্রকাশ পাইল তাহা রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। বিহারীলালের কাব্যে ইতিপূর্বে কবিচিত্তের যে প্রকাশ দেখা গিয়াছে তাহা যেন ভাবগদগদ ও আনন্দরসমত্ততন্দ্রাতুর, এবং সেই হেতু বিহারী-লালের ভাষাও স্খলিত, গদ্‌গদ। সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কবির হৃদয়াবেগ মত্ততার কাছ ঘেঁষিয়াও যায় না এবং তাহা আনন্দরসও নয়। ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার অপরিণতির অব্যক্ত বেদনা নবযৌবনের অসন্তোষ-কুণ্ঠার সহিত মিলিত হইয়া কবিচিত্তকে প্রকাশভীরু ও স্পর্শকাতর করিয়া রাখিয়াছিল। অন্তরের আত্মকৃত বন্ধনের গুটি কাটিয়া বাহির হইবার বেদনাই সন্ধ্যা-সঙ্গীতের অধিকাংশ কবিতার মধ্যে গুঞ্জরিত হইয়াছে। কবির মনোভাব বোঝা যায় একটি ছোট সমসাময়িক গদ্য নিবন্ধ হইতে।

> আমরা মানুষেরা কতকগুলা কালো কালো অসন্তোষের বিন্দু, ক্ষুধার্ত পিপীলিকার মত জগৎকে চারিদিক হইতে ছাঁকিয়া ধরিয়াছি; উষাকে, জ্যোৎস্নাকে, গানের শব্দকে দংশন করিতেছি, একটুখানি খাদ্য পাইবার জন্য। হায় রে, খাদ্য কোথায়! সূর্য্য, উদয় হও! চন্দ্র হাস! ফুল ফুটিয়া ওঠ! আমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা কর; আমাকে আমার পাশে বসিয়া থাকিতে না হয়, অনিচ্ছারচিত বাসর শয্যায় শুইয়া আমাকে যেন আমার আলিঙ্গনে পড়িয়া কাঁদিতে না হয়!

সন্ধ্যা-সঙ্গীতের আরম্ভ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, উচ্ছ্বাস চন্দননগরে মোরান সাহেবের কুঠীতে, এবং অবসান দশ নম্বর সদর ষ্ট্রীটে। কবি লিখিয়াছেন, "এক সময়ে জ্যোতিদাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন—তেতলার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জ্জন দিনগুলি যাপন করিতাম। এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানিনা কেমন

করিয়া, কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল।" কবিচিত্তের এই মুক্তিলাভের প্রথম পরিচয় পাই 'দুঃখ আবাহন'-এ।[১] নবযৌবনবেদনায় যে অব্যক্ত প্রেমের আকূতি আছে তাহা আত্মনিপীড়নের মধ্যে স্বস্তি খুঁজিতে চায়। কবিচিত্তও তাই দুঃখকে আহ্বান করিয়াছে প্রাণের সাথী রূপে, কেননা

নিরালয় এ হৃদয়
শুধু এক সহচর চায়।

স্থান কাল এবং কবিচিত্তের অবস্থা অনুসারে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কবিতাগুলিতে চারিটি স্তর দেখা যায়। প্রথম স্তরের কবিতাগুলি জোড়াসাঁকোয় লেখা—'দুঃখ আবাহন,' 'পরিত্যক্ত,' 'তারকার আত্মহত্যা,' 'সুখের বিলাপ,' 'হৃদয়ের গীতিধ্বনি'।[২] কৈশোরবাসনার সঙ্গে বয়ঃসন্ধির লাজুকতার দ্বন্দ্ব, অন্তর্দাহ, দুঃখাতুরতা, আত্মলোপেচ্ছা ও আশা—অস্ফুটতার বাষ্পোচ্ছ্বাসে ফেনায়িত হইয়াছে এই কবিতাগুলিতে। দ্বিতীয় স্তরের কবিতাগুলি লেখা হইয়াছিল দ্বিতীয়বার বিলাত-যাত্রা হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে, দেরাদুনের পথে অথবা দেরাদুন হইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরে—'আশার নৈরাশ্য,' 'শিশির,' 'পরাজয়' ও 'গান সমাপন'।[৩] ভবিষ্যৎ-জীবনযাত্রার সুনির্দিষ্ট পথ হইতে বারবার ভ্রষ্ট হওয়ায় গুরুজনদিগের নৈরাশ্যে কবিচিত্তের প্রতিক্রিয়া এই কবিতাগুলিতে ফুটিয়াছে।

সংসারে যাহারা ছিল সকলেই জয়ী হল
তোরি শুধু হল পরাজয়,
প্রতি রণে প্রতি পদে একে একে ছেড়ে দিলি
জীবনের রাজ্য সমুদয়।[৪] ..

জনমিয়া এ সংসারে কিছুই শিখিনি আর
শুধু গাই গান!

[১] ভারতী ১২৮৭ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। [২] সূচীপত্রে 'গীতধ্বনি'। [৩] এই কবিতাগুলি ভারতীর ১২৮৮ সালের শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। [৪] 'পরাজয় সঙ্গীত'।

স্নেহময়ী মা'র কাছে শৈশবে শিখিয়াছিনু
দুয়েকটি তান।
শুধু জানি তাই,
দিবানিশি তাই শুধু গাই।[১]

তৃতীয় স্তরের কবিতাগুলি লেখা হইয়াছিল চন্দননগরে গঙ্গাতীরে মোরান সাহেবের কুঠীতে—'অসহ্য ভালবাসা,' 'হলাহল,' 'পাষাণী,' 'শান্তি-গীত,' 'আবার,' 'গান আরম্ভ' এবং 'অনুগ্রহ'। প্রতিদানবিহীন প্রেমের জ্বালা ও প্রচণ্ড হৃদয়াবেগের দাহ এবং তৎপরে হৃদয়দ্বন্দ্বের তীব্রতার অবসানে কিয়ৎপরিমাণে চিত্ত-প্রশান্তি—এই কবিতাগুলির রহস্য। প্রথমে দেহ-মনের সংঘর্ষ,

এইরূপে দেহের দুয়ারে
মন যবে থাকে যুঝিবারে,
তুমি চেয়ে দেখ মুখ বাগে
এত বুঝি ভাল নাহি লাগে![২]

সংঘর্ষে উঠিল হলাহল,

ললিত গলিত হাস, জাগরণ দীর্ঘশ্বাস,
সোহাগ, কটাক্ষ, মান, নয়ন-সলিল-ধার,
মৃদু হাসি, মৃদু কথা, আদরের, উপেক্ষার,
এই শুধু—এই শুধু—দিনরাত এই শুধু
এমন ক'দিন কাটে আর![৩]

হৃদয়মন্থনাবসানে আসিল অবসাদজনিত শ্রান্তি,

কাল উঠিস্ আবার
খেলিস্ দুরন্ত খেলা হৃদয়ে আমার!
হৃদয়ের শিরাগুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি মোর
তাইতে রচিস্ তন্ত্রী বীণাটির তোর,

[১] 'গান সমাপন'। [২] 'অসহ্য ভালবাসা'। [৩] 'হলাহল'।

সারাদিন বাজাস্ বসিয়া
ধ্বনিয়া হৃদয়।—
আজ রাত্রে র'ব শুধু চাহিয়া চাঁদের পানে
আর কিছু নয়।[১]

ইহার মধ্যে আশঙ্কা জাগিতেছে উন্মাদ প্রেমের পুনরাবির্ভাবের। তাই প্রার্থনা,

যাও, মোরে যাও ছেড়ে, নিও না—নিও না কেড়ে
নিও না, নিও না মন মোর ;
সখাদের কাছ হতে ছিনিয়া নিও না মোরে,
ছিঁড়ো না এ সখ্যতার ডোর ![২]

বাসনার দাহ জুড়াইয়া গিয়া চিত্তে স্থিরতর প্রশান্তির আবির্ভাব হইয়াছে এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে ; কাব্যলক্ষ্মীর অধিবাসের জন্য কবিহৃদয় প্রস্তুত রহিয়াছে।

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার,
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে, কবিতা আমার।[৩]

কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়,
ভালবাসি আপনা ভুলিয়া,
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া,
ভক্তি করি পৃথিবীর মত,
স্নেহ করি আকাশের প্রায়।[৪]

১ 'শান্তি-গীত'। ২ 'আবার'। ৩ 'গান আরম্ভ'। ভারতীর পৃষ্ঠায় (পৌষ ১২৮৮) ইহা 'কবিতা সাধনা' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ৪ 'অনুগ্রহ'।

চতুর্থ স্তরের কবিতাগুলি লেখা হইয়াছিল সদর ষ্ট্রীটের বাসায়—'সংগ্রাম-সঙ্গীত,' 'আমি-হারা,' 'সন্ধ্যা,' 'কেন গান গাই,' 'কেন গান শুনাই,' 'উপহার' (প্রথম) ও 'উপহার' (দ্বিতীয়)। এই কবিতাগুলি পড়িলে বোঝা যায় যে হৃদয়দ্বন্দ্বের অবসানে শান্তি আসিয়াছে এবং প্রেমকল্পনায় ধীরতার ও কারুণ্যের সংযোগ হইয়াছে। কাব্যদেবীর বেদী সাজাইয়া বসিয়া রহিয়া কবিচিত্ত স্বস্তি বোধ করিল না। এখন আত্মস্থ হইবার জন্য সচেষ্ট হৃদয়সংগ্রাম আবশ্যক। হৃদয়ের তিক্ততা দূর হইলেই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ হইয়া আসিবে। কবি বুঝিয়াছেন,

এ আমার বিদ্রোহী হৃদয়
আমারে যে করিয়াছে জয়!
যে দিকে মেলিছে আঁখি জ্বলে তরু মরে পাখী,
সে দিক হ'তেছে মরুময়!
চরাচরে আগুন লাগায়,
চারিদিকে দুর্ভিক্ষ জাগায়!
পরাণের অন্তঃপুরে কাঁদিছে আকাশ পূরে
স্নেহ প্রেম বিধবার বেশে![১]

তাই প্রতিজ্ঞা,

মিছা ব'সে রহিব না আর
চরাচর হারায় আমার।···
আজ তবে হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম!
ফিরে নেব, কেড়ে নেব আমি
জগতের একেকটি গ্রাম!···
হৃদয়েরে রেখে দেব বেঁধে,
বিরলে মরিবে কেঁদে কেঁদে![২]

[১] 'সংগ্রাম-সঙ্গীত'। [২] 'আমি-হারা'।

কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও কবি শৈশবের সহজ সম্পর্ক আর ফিরিয়া পাইলেন না। এই ব্যাকুলতা রহিয়া গেল,

পরাণের অন্ধকার অরণ্য মাঝারে
আমি মোর হারাল' কোথায় ?
ভ্রমিতেছি পথে পথে, খুঁজিতেছি তারে—
ডাকিতেছি, আয়, আয়, আয়,
আর কি সে আসিবে না হায় !...
দিবস শুধায় মোরে—রজনী শুধায়,
নিতি তারা অশ্রুবারি ফেলে,
শুধায় আকুল হ'য়ে চন্দ্র সূর্য্য তারা
"কোথা তুমি, কোথা তুমি গেলে ?"[১]

২

'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮৩) কাব্যে কবিচিত্ত আত্মসংশয়ের ও আত্মনিপীড়নের দুঃস্বপ্নঘোর কাটাইয়া বৃহত্তর জীবনের প্রভাতে জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রভাত-সঙ্গীতের একুশটি কবিতার মধ্যে একটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর লেখা—'অভিমানিনী নির্ঝরিণী'।[২] পাঁচটি ইংরেজির অনুবাদ।[৩] দুইটি কবিতা আগেকার যুগের —'শরতে প্রকৃতি' ও 'গীত'।[৪] দুইটি সন্ধ্যা-সঙ্গীতের সময়ের রচনা— 'মহাস্বপ্ন' ও 'সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়'।[৫] 'মহাস্বপ্ন'-এ উদাত্তভাবের সুন্দর প্রকাশ দেখি। ক্বচিৎ দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণের ও কালিদাসের মেঘদূতের দুই-এক

১ 'আমি-হারা।' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার প্রসঙ্গে রচিত এবং ভারতী ১২৮৯ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় একত্র প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ (চৈত্র ১৮১৩ শক অর্থাৎ ১৮৯২) হইতে কবিতাটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। ৩ ১২৮৮ সালের ভারতীর আষাঢ় ও কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। ৪ কবিতা দুইটি ১২৮: সালের ভারতীর আশ্বিন ও মাঘ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে 'শরতে প্রকৃতি' বাদ গিয়াছে। ৫ ১২৮৮ সালের ভারতীর মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ (১৮৮৩)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

ছন্দের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শোনা গেলেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উৎপ্রেক্ষার দীপ্তি ইহাতে ঝলকিয়া উঠিয়াছে।

ঝিল্লি-রবে একমন্ত্র জপিতেছে তাপসিনী নিশি

এই বিরাট উৎপ্রেক্ষাটি সুদূর পরবর্তী কালের একাধিক কবিতায় নূতনতর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। যেমন,

ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রা-নীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।[১]

প্রভাত-সঙ্গীতের সূত্রপাত হইল 'অনন্ত মরণ' কবিতায়।[২] জীবন-মরণের সমস্যা এক করিয়া দেখিয়া কবিচিত্ত অবসাদ ও পরাজয়গ্লানি হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্তি বোধ করিতেছে।

আনন্দে পুরেছে প্রাণ, হেরিতেছি এ জগতে
মরণের অনন্ত উৎসব,
কার নিমন্ত্রণে মোরা, মহাযজ্ঞে এসেছি রে
উঠেছে মহান্ কলরব।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এ[৩] প্রভাত-সঙ্গীতের মূল সুর বাজিল। অকস্মাৎ একদিন কবিচিত্তের তামসী যবনিকা সরিয়া গেলে নিখিলজীবনপ্রবাহের আনন্দময় রূপটি কবির চক্ষে অপরূপ হইয়া দেখা দিল।[৪] আত্মবিস্মৃত কবিচিত্ত অহৈতুক আনন্দে উদ্বেল হইয়া গাহিয়া উঠিল,

জগতে ঢালিব প্রাণ
গাহিব করুণা গান;
উদ্বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।

১ 'আন্-মনা' (পূরবী)। ২ ১২৮৯ আশ্বিন সংখ্যা ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত। ৩ ১২৮৯ অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত। ৪ জীবনস্মৃতি দ্রষ্টব্য।

বিশ্বসংসারের পটভূমিকায় মানবলীলা দেখা দিল অভাবিতপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত হইয়া।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত
মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।[১]

নির্বন্ধন আনন্দের নির্ম্মলদৃষ্টিতে কবি নিজের অতীতজীবনকে স্পষ্ট করিয়া দেখিলেন। 'পুনর্মিলন'-এ[২] ইহার পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় তাঁহার বাল্যস্মৃতির স্নিগ্ধসরস ছায়াপাত হইয়াছে। 'পুনর্মিলন'-এ তাহার সূত্রপাত দেখি। বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ-উৎসবপ্রাঙ্গণে কবিহৃদয় অভিনববাৎসল্যে স্বীয় শৈশবস্মৃতি ফিরাইয়া পাইল।

কে রে তুই কচি মেয়ে, বুকের কাছেতে এসে
কি কথা কহিস্ ভাঙ্গা ভাঙ্গা,
প্রভাতে প্রভাত ঢালে হাসির প্রবাহ তোর
আধফুটো ঠোঁট রাঙা রাঙা।

প্রথম সংস্করণ প্রভাত-সঙ্গীতের 'স্নেহ উপহার'-এ বাৎসল্যস্নেহের স্ফুটতর উন্মেষ হইয়াছে। 'সাধ'[৩] কবিতার সঙ্গে শৈশব-সঙ্গীতের 'ফুলবালা'-জাতীয় কবিতার প্রধান পার্থক্য এইখানেই। কবিতাটির প্রথম স্তবকে নূতনতর ছন্দশ্চটুলতা দেখা দিল;

অরুণময়ী তরুণ উষা
জাগায়ে দিল গান।

[১] 'প্রভাত-উৎসব,' ১২৮৯ সালের ভারতীর পৌষসংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। [২] ঐ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত। [৩] ১২৯০ বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত।

পূরব মেঘে কনক-মুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি
অমনি যেন জগত ছেয়ে
বিকশি উঠে প্রাণ।
কাহার হাসি বহিয়া এনে
করিলি সুধা দান।

"কাহার হাসি বহিয়া এনে করিলি সুধা দান"—'প্রতিধ্বনি'-রও মর্ম্মকথা। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এ কবিচিত্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাস স্বত-উৎসারিত। 'প্রতিধ্বনি'-তে সেই আনন্দবোধকে নিখিল চরাচরের অখণ্ড সৌন্দর্য্য ও আনন্দবোধের অংশ রূপে উপলব্ধি করিয়া কবিচিত্ত অভিনব রসতৃপ্তি অনুভব করিয়াছে। "এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি এই জন্য তাহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থান হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে অন্তরের কোন্ একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে—এবং প্রতিধ্বনি-রূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্য্যে ব্যাকুল করে।"[১] 'প্রতিধ্বনি'তেও একটি বিরাট উৎপ্রেক্ষা আছে,

আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্ব চরাচর।

কবিচিত্তের আনন্দরসতন্ময়তা স্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে 'স্রোত'-এ।

আমার নাহি সুখ দুখ
পরের পানে চাই,

[১] জীবনস্মৃতি।

যাহার পানে চেয়ে দেখি
তাহাই হ'য়ে যাই!
তপন ভাসে, তারা ভাসে
আমিও যাই ভেসে,
তাদের গানে আমার গান
যেতেছি এক দেশে!

রবীন্দ্রকাব্যে জীবনদর্শনের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেল 'চেয়ে থাকা'-য়। ইহাই প্রভাত-সঙ্গীতের সবচেয়ে বিশিষ্ট কবিতা।

সুদূর জলে ডুবিছে রবি
সোনার লেখা লিখি,
সাঁঝের আলো জলেতে শুয়ে
করিছে ঝিকিমিকি!
সুধীর-স্রোতে তরণীগুলি
যেতেছে সারি সারি,
বহিয়া যায় ভাসিয়া যায়,
কত না নরনারী!
না জানি তারা কোথায় থাকে
যেতেছে কোন্ দেশে;
সুদূর তীরে কোথায় গিয়ে
থামিবে অবশেষে।
কত কি আশা গড়িছে ব'সে
তাদের মনখানি
কত কি সুখ, কত কি দুখ
কিছুই নাহি জানি!

জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয়ের এষণা রবীন্দ্রনাথের কবিমনীষার প্রধান আকৃতি।

দুই চোখ দিয়া জগতের রূপরস নিঃশেষে পান করিবার জন্য কবি ব্যাকুল হইয়াছেন। তাই

যায় রে সাধ জগত পানে
কেবলি চেয়ে রই
অবাক্ হয়ে আপন ভুলে
কথাটি নাহি কই।

এই চোখের নেশা যৌবনস্বপ্নকে নূতন রঙে রঙাইয়া দিয়া রবীন্দ্রকাব্যকলায় পালা-বদল সূচনা করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যৌবনস্বপ্ন

১

'ছবি ও গান'-এর[1] পালা শুরু হয় প্রভাত-সঙ্গীত শেষ হইবার পূর্ব্বেই। ইহার অনেকগুলি কবিতা লেখা হইয়াছিল ১২৮৯ সালের শেষের দিকে, প্রভাত-সঙ্গীত প্রকাশিত হইবার অল্প কিছু কাল আগে।[2] ছবি-ও-গানের প্রথম সংস্করণে ত্রিশটি কবিতা ছিল, তাহার মধ্যে আদি ও অন্ত দুইটি ব্রজবুলি। পরবর্ত্তী কালে ব্রজবুলি কবিতা দুইটি[3] ভানুসিংহ-ঠাকুরের পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে ছবি-ও-গান কড়ি-ও-কোমলের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩০১) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে আটাশটি কবিতার মধ্যে ছয়টি মাত্র স্থান পাইয়াছিল।[4] কাব্য-গ্রন্থাবলী সংস্করণ (১৩০৩) হইতে ছবি-ও-গান আবার পূর্ণরূপ গ্রহণ করিল।

কাল ও ভাব বিবেচনায় ছবি-ও-গানের আটাশটি কবিতা ও গান তিন স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তরে 'নিশীথ-চেতনা' ও 'নিশীথ জগৎ'।[5] দ্বিতীয় স্তরের কবিতাগুলি সাধারণত ক্ষুদ্রকায়। এগুলি ১২৮৯ সালের শেষে ও ১২৯০ সালের প্রথমে, কারোয়ার যাত্রার পূর্ব্বে লেখা—'কে ?'[6] 'সুখ স্বপ্ন,' 'একাকিনী,' 'গ্রামে,' 'বিদায়,' 'বিরহ,' 'বাদল,' 'আর্ত্তস্বর,' 'পোড়ো বাড়ি,' 'অভিমানিনী' ইত্যাদি। তৃতীয় স্তরের কবিতাগুলি ১২৯০ সালের মধ্য ও শেষ ভাগে, কারোয়ারে ও

[1] ফাল্গুন ১৮০৫ শকাব্দ, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। [2] দ্রষ্টব্য, "গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম" [উৎসর্গ], "এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছোট ছোট কবিতাগুলি গত বৎসরে লিখিত হয়। কেবল শেষ তিনটি কবিতা পূর্ব্বেকার লেখা, এই নিমিত্ত তাহারা কিছু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।" [বিজ্ঞাপন]। [3] 'কুহু' ও 'অভিসার' যথাক্রমে ভারতীর ১২৯০ জ্যৈষ্ঠ ও ১২৮৮ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। [4] 'সুখের-স্মৃতি,' 'যোগী,' 'স্মৃতি-প্রতিমা,' 'স্নেহময়ী,' 'রাহুর প্রেম,' 'মধ্যাহ্নে,' 'পোড়ো বাড়ি' এবং 'নিশীথ-চেতনা'। [5] যথাক্রমে ভারতীর ১২৯০ আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। রচনাকাল অনেক পূর্ব্বে। [6] প্রথমপ্রকাশ ভারতী ১২৯০ ভাদ্র।

বারোয়ার হইতে প্রত্যাগমনের পরে রচিত—'যোগী,'[১] 'সুখের স্মৃতি,'[২] 'স্মৃতি-প্রতিমা,' 'স্নেহময়ী,' 'রাহুর প্রেম,' 'মধ্যাহ্নে,' 'পূর্ণিমায়'[৩] ইত্যাদি।

প্রথম স্তরের কবিতা দুইটিতে শুনি জাগরোন্মুখ কবিহৃদয়ের প্রভাতসঙ্গীতের প্রত্যাশাব্যাকুলতা। বৃহৎসংসারের বিচিত্র লীলাচাঞ্চল্য কবির শুষ্ক মানসপটে স্বপ্নতুলিকা বুলাইয়া চলিয়াছে।

কত আলো কত ছায়া,
কত আশা, কত মায়া,
কত ভয়, কত শোক, কত কি যে কোলাহল,
কত পশু, কত পাখী, কত মানুষের দল!
উপরেতে চেয়ে দেখ কি প্রশান্ত বিভাবরী,
নিশ্বাস পড়ে না যেন জগৎ রয়েছে মরি!
একবার কর মনে
আঁধারের সঙ্গোপনে
কি গভীর কলরব—চেতনার ছেলেখেলা—
সমস্ত জগত ব্যেপে স্বপনের মহা-মেলা।[৪]

স্বপ্নাবেশনিগড়ে বাঁধা পীড়িত কবিচিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে জীবনপ্রভাতক্ষণে সত্যকার মানবসংসারের মাঝে জাগিয়া উঠিতে।

নিশীথের কারাগারে কে বেঁধে রেখেছে মোরে
রয়েছি পড়িয়া!
কেবল র'য়েছি বেঁচে স্বপন কুড়ায়ে ল'য়ে
ভাঙ্গিয়া গড়িয়া!...
রুদ্ধ প্রাণ ক্ষুদ্র প্রাণী, রুদ্ধ প্রাণীদের সাথে
কত রে রহিব!

[১] ঐ আশ্বিন। [২] ঐ কার্ত্তিক 'মধুর স্মৃতি' নামে। [৩] ঐ পৌষ। জীবনস্মৃতি দ্রষ্টব্য। [৪] 'নিশীথ চেতনা'।

ছোট ছোট সুখ দুঃখ, ছোট ছোট আশাগুলি
পুষিয়া রাখিব!
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি পূরব আকাশ পানে
রয়েছি চাহিয়া,
কবে রে প্রভাত হবে, আনন্দে বিহঙ্গগুলি
উঠিবে গাহিয়া![১]

হৃদয়নিশীথের অন্ধকার হইতে জাগিয়া উঠিয়া কবিচিত্ত যে বৃহৎ-সংসারের আনন্দলীলারসের ভোজে নিমন্ত্রিত হইল তাহার পরিচয় পাই প্রভাত-সঙ্গীতের শেষের দিকের কবিতাগুলিতে। সঙ্গে সঙ্গে কবি নিজের মনে যে বহির্নিরপেক্ষ উল্লাস অনুভব করিতে লাগিলেন তাহার আবেগ লাগিল ছবি-ও-গানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের কবিতাসমূহে। হৃদয়পাশ হইতে মুক্তিলাভের স্বস্তিবোধ নবযৌবনের নেশাকে দ্বিগুণতর করিয়া কবিচিত্তে মত্ততার সঞ্চার করিল।

গহন বনের কোথা হতে শুনি
বাঁশির স্বর-আভাস,
বনের হৃদয় বাজাইছে যেন
মরমের অভিলাষ![২]

সুদূর স্বপন ভেসে ভেসে
চোখে এসে যেন লাগিছে,
ঘুমঘোরময় সুখের আবেশ
প্রাণের কোথায় জাগিছে
মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি![৩]

[১] 'নিশীথ জগৎ'। [২] 'জাগ্রত স্বপ্ন'। [৩] 'সুখ স্বপ্ন'।

এই নেশার ঘোর ছবি-ও-গানের অনেকগুলি কবিতার ছন্দে এবং ভাষায় যেন লাগিয়া আছে। নিম্নে উদ্ধৃত অংশে প্রচলিত ছন্দোবন্ধের যতি ও তাল মিলিবে না ; ভাষাতেও ছড়া-বন্ধের স্বাধীনতার স্পর্শ লাগিয়াছে।

একটি মেয়ে একেলা,
সাঁঝের বেলা
মাঠ দিয়ে চলেছে।
চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে।[১]

একটুখানি সোনার বিন্দু, একটুখানি মুখ,
একা একটি বনফুল ফোটে ফোটে হয়েছে,
কচি কচি পাতার মাঝে মাথা থুয়ে রয়েছে,[২]

কয়েকটি কবিতায় ভাবাবেশ নাই, সেগুলির সুর কিছু চড়া। এই কবিতাগুলি ছবি-ও-গানের মধ্যে বৈচিত্র্য আনিয়াছে।[৩] বাসনা-উদ্দীপ্ত প্রেমের সুতীব্র ক্ষুধা 'রাহুর প্রেম'-কে করিয়াছে দীপ্তিমান। ভাবের দিক দিয়া এটিকে মধ্য কৈশোরক যুগের মধ্যে ধরা যায়। তবে এখানে কবিহৃদয়ের ক্ষুধা অস্ফুট কলভাষ ছাড়িয়া পরিপূর্ণ মুখরতা লাভ করিয়াছে। বর্ষানিশীথের ঝঞ্ঝা কবিহৃদয়ের আর্তনাদের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে 'আর্তস্বর'-এ।

কে আজি রে তোর সাথে
ধরি তোর হাতে হাতে
খুঁজিতে চাহিছে যেন কারে!
মহাশূন্যে দাঁড়াইয়ে,
প্রান্ত হতে প্রান্তে গিয়ে,
কে চাহে কাঁদিতে অন্ধকারে!

১ 'একাকিনী'। ২ 'আদরিণী'। ৩ 'আর্তস্বর', 'রাহুর প্রেম' ও 'পোড়ো বাড়ি'।

আঁধারেতে আঁখি ফুটে
ঝটিকার পরে ছুটে
তীক্ষ্ণশিখা বিদ্যুৎ মাড়ায়ে,
হুহু করি নিশ্বাসিয়া
চ'লে যাবে উদাসিয়া
কেশপাশ আকাশে ছড়ায়ে।

বর্ষার রসরূপের প্রকাশ রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশিষ্ট প্রবাহ। ইহার উৎস খুলিয়াছে ছবি-ও-গানের 'বাদল'-এ।

শ্যামল বনের শ্যামল শিরে
মেঘের ছায়া নেমেছে রে,
মেঘের ছায়া কুঁড়ে ঘরের পরে,
ভাঙ্গাচোরা পথের ধারে,
ঘন বাঁশবনের পরে,
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে যেন ধরে !...
কে জানে কি মনে আশ,
উঠ্‌চে ধীরে দীর্ঘ-শ্বাস
বায়ু উঠে শ্বসিয়া শ্বসিয়া।
ডাল পালা হাহা করে
বৃষ্টিবিন্দু ঝরে পড়ে
পাতা পড়ে খসিয়া খসিয়া।

খর মধ্যাহ্নের তীব্ররূপ রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় রসাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ইহারও সূত্রপাত ছবি-ও-গানে, 'মধ্যাহ্ন' কবিতায়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের প্রতি কবির রোমান্টিক আকর্ষণের প্রথম পরিচয়ও পাওয়া যায় এই [illegible]তায়।

বুঝিরে এমনি বেলা
ছায়ার করিত খেলা
তপোবনে ঋষি-বালিকারা,
পরিয়া বাকলবাস
মুখেতে বিমল হাস
বনে বনে বেড়াইত তারা।

২

'কড়ি ও কোমল' (১২৯৩) কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য অসন্দিগ্ধভাবে মূর্তি পরিগ্রহ করিতে শুরু করিয়াছে। কবিকল্পনা সংযত সুনিয়ন্ত্রিত ও সুস্পষ্ট রূপ ধরিয়াছে, ভাষা ভাবদ্যোতক ও শক্তিমান্ হইয়াছে, এবং ছন্দে ভাব-ভাষার উপযুক্ত লালিত্য ও নবীনতা দেখা দিয়াছে। ভাবে, ভাষায় এবং ছন্দে কড়ি-ও-কোমল বাঙ্গালা কাব্যের ছাঁদে যে অভিনবত্বের অবতারণা করিল তাহার কাছে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনের গুরুত্বও লঘু হইয়া যায়। সন্ধ্যা-সঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত ও ছবি-ও-গানের ভাবে ও ভাষায় আবেগ-কুহেলিকা এবং দ্বিধা থাকায় তাহা সর্বত্র সাধারণ পাঠকের অধিগম্য হয় নাই। কড়ি-ও-কোমলের ভাব সুস্পষ্ট, ভাষা ললিত ও শক্তিমান্, এবং ছন্দ অভিনব ও মধুর। সুতরাং সহৃদয় ও রসজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এই অভিনব কাব্যটিকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু এইরূপ পাঠকের সংখ্যা বোধ হয় মুষ্টিমেয়েরও কম ছিল। সুতরাং সচরাচর যেমনটি ঘটিয়া থাকে, প্রশংসার ভ্রমরগুঞ্জন ছাপাইয়া নিন্দার ঢাকই জোরে বাজিল। যাহারা জীবনে কড়ি-ও-কোমল পড়িবার কোন সুযোগ পায় নাই এবং পাইলেও বুঝিবার কিছুমাত্র যোগ্যতা যাহাদের কস্মিন্ কালে ছিল না তাহারাই ইহার ক্ষুদ্রকায়

ও নিতান্ত তুচ্ছ parody 'মিঠে-কড়া'-র[১] প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। কালের সম্মার্জ্জনীতে মিঠে-কড়া কোন্ দিন অবলুপ্ত হইয়া যাইত, কেবল রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সম্পর্ক থাকার জন্যই অর্দ্ধশিক্ষিত পাঠকসমাজে শুধু স্মৃতিটুকুতে জীবিত আছে। এই নির্বোধ ও নিতান্ত তুচ্ছ রচনা তখন তরুণ কবির স্পর্শকাতর মনে যে ক্ষোভ জাগাইয়াছিল তাহার পরিচয় আছে মানসীর 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' কবিতায়।[২]

কড়ি-ও-কোমলের প্রথম সংস্করণের দুইটি পত্রাকার কবিতা[৩] ও 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' পরবর্ত্তিকালে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'কো তুহুঁ' এই ব্রজবুলি পদটি ভানুসিংহ ঠাকুরের-পদাবলীভুক্ত হইয়াছে। কয়েকটি কবিতা কড়ি-ও-কোমল হইতে পরিবর্জিত হইয়া নাম বদল করিয়া 'শিশু' (১৩১০) কাব্যে স্থান পাইয়াছে।[৪] দুচারিটি কবিতা কড়ি-ও-কোমল কাব্যে থাকিয়াও শিশুতে

[১] নিতান্ত ক্ষুদ্র নিবন্ধটির পূর্ণ নাম 'ইহা কড়িও নহে কোমলও নহে পূরো সুরে মিঠে কড়া' (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩০১)। লেখক "রাহু" অর্থাৎ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। রবীন্দ্রকাব্যের প্রতি কাব্যবিশারদের বিদ্বেষ একেবারে অহেতুক বলিয়া মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। 'সাবিত্রী' (আশ্বিন ১২৯৩) গ্রন্থের শেষে "শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত" 'বিদ্যাপতির পদাবলী'-র এই বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছিল, "প্রায় দশ-বৎসর কাল রবীন্দ্র বাবু বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী অধ্যয়ন করিয়া এই সম্পাদকীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত কয়েকটী সংস্করণে পদের বা টীকার যত ভুল আছে, এই গ্রন্থে প্রায় সে সমস্ত সংশোধিত হইল। ফল কথা, সেই প্রাচীন, শ্রেষ্ঠ কবির কবিত্ব বুঝিতে হইলে—এবং যাবতীয় বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর ভাষা বুঝিতে হইলে—রবীন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত এই সুন্দর, মনোহর পদাবলী সকলেরই ক্রয় করা উচিত। ১৫০ পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। পিপেল্‌স্ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।"

সম্ভবত ইহারই পাণ্ডুলিপি কাব্যবিশারদ লইয়া গিয়া ফেরত দেন নাই (দ্রষ্টব্য 'সূচনা' ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড)।

[২] রচনাকাল ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮। [৩] "বসে বসে লিখলেম" এবং "দামু বোস আর চামু বোসে"। [৪] 'পত্র' ("মাগো আমার"), 'জন্মতিথির উপহার,' 'চিঠি' ও 'শরতের শুকতারা' যথাক্রমে শিশু কাব্যের 'বিচ্ছেদ,' 'উপহার,' 'পরিচয়' ও 'অন্ধ সখী'। 'ফুলের ঘা' তৃতীয় সংস্করণ (কাব্য-গ্রন্থাবলী ...) হইতে পরিত্যক্ত হইয়া 'শীতের বিদায়' নামে শিশুতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

পরিগৃহীত হইয়াছে।[১] "ছবি ও গান এবং ভানুসিংহের পদাবলী সম্বলিত" কড়ি-ও-কোমলের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১) প্রথম সংস্করণের শতাবধি কবিতার মধ্যে—এক নামের একাধিক কবিতা ও 'কো তুহু' বাদ দিলে—উনসত্তরটি কবিতা নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে, "ছবি ও গান, ভানুসিংহের পদাবলী ও কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে ঐ তিন গ্রন্থের যে সকল কবিতা পাঠক সাধারণের জন্য রক্ষাযোগ্য জ্ঞান করি, তাহাই এই গ্রন্থে একত্র প্রকাশিত হইল। কবিতাগুলির স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জন করা হইয়াছে।" কড়ি-ও-কোমলের তৃতীয় সংস্করণ পাই কাব্য-গ্রন্থাবলীতে (১৩০৩)। এখানে কবিতার সংখ্যা ছিয়াত্তর। 'বসন্ত অবসান' ইত্যাদি নয়টি গান এবং 'মথুরায়', 'পত্র' (প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত), 'ক্ষুদ্র অনন্ত' ও 'বিজনে'—দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত এই চারিটি কবিতা তৃতীয় সংস্করণে স্থান পাইয়াছে। আর দ্বিতীয় সংস্করণের ছয়টি কবিতা তৃতীয় সংস্করণে বাদ গিয়াছে।[২]

বধূঠাকুরাণীর আকস্মিকমৃত্যুজনিত শোকের রূঢ় স্পর্শ কবির চিত্ত হইতে ছবি-ও-গানের অলস রসমাদকতা দূর করিয়া দিল। কবি লিখিয়াছেন, "জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল।" কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির মত রবীন্দ্রকাব্যপ্রকৃতিও কোন একটা ভাবকে দীর্ঘকাল আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে না, রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে হাসিকান্নার ছন্দ প্রকৃতিপটে দিবারাত্রির তালফেরতার সঙ্গে লয় রাখিয়া চলে। তাই শোকাবেগ অনতিবিলম্বে কবিচিত্তে রসরূপে পরিণত হইল; কবির অন্তরের দুঃখ-বৈরাগ্য বৃহৎ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে কারুণ্যের গৈরিক রঙ ধরাইয়া অপরূপ অশ্রুধৌত মাধুরীর সঞ্চার করিল। যৌবনস্বপ্ন জাগরোন্মুখ হইল। পূর্ব্বেকার রসদৃষ্টির সঙ্গে ইহার পার্থক্য গভীর। শোকের আঘাত

১ 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,' 'সাত ভাই চম্পা,' 'পুরোনো বট' ইত্যাদি।

২ 'পুরোনো বট,' 'ফুলের ঘা,' 'বসন্ত,' 'অক্ষমতা,' 'আত্মাভিমান' ও 'আহ্বান গীত'।

কবিচিত্তে সংসারবন্ধন শ্লথ করিয়া দিয়া একটি নির্লিপ্ত ভাব আনিল, তাহাতে রসদৃষ্টির মধ্যে হৃদয়াংশ বা আসক্তি কমিয়া গিয়া রোমান্সের রঙ সংসারের ছবিকে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিল। এই নিরাসক্তির আনন্দদৃষ্টিই কড়ি-ও-কোমলের রসদৃষ্টি।

'কোথায়'[১] ও 'শাস্তি' কবিতায়, 'বাকি' কণিকায় ও 'গান'-এ শোকের ব্যক্তিগত রেশটুকু একেবারে লুপ্ত হয় নাই। 'যোগিয়া,'[২] 'বিরহীর পত্র,'[৩] 'বসন্ত অবসান,' 'বিরহ,'[৪] 'বিলাপ,' 'সারাবেলা,' 'আকাঙ্ক্ষা,' 'তুমি,' 'যৌবন-স্বপ্ন,' 'ক্ষণিক মিলন' ও 'গীতোচ্ছ্বাস' ইত্যাদি কবিতায় ও গানে ব্যক্তিগত শোকাচ্ছ্বাস প্রকৃতির ও সংসারের রসকল্পনার মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে।

এ কী রে আকুল ভাষা! প্রাণের নিরাশা আশা
পল্লবের মর্মরে মিশাল।
না জানি কাহারে চায় তার দেখা নাহি পায়
ম্লান তাই প্রভাতের আলো।[৫]

মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ফুটে বকুল-মুকুলে;
কে আমারে করেছে পাগল—শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
যেন কোন্ উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে![৬]

আকাশের দুই দিক হ'তে দুইখানি মেঘ এল ভেসে,
দুইখানি দিশাহারা মেঘ—কে জানে এসেছে কোথা হ'তে!
সহসা থামিল থমকিয়া আকাশের মাঝখানে এসে।
দোঁহা পানে চাহিল দুজনে চতুর্থীর চাঁদের আলোতে।[৭]

১ প্র[illegible]কাশ ভারতী ১২৯১ পৌষ। ২ ঐ কার্তিক। ৩ ঐ ১২৯৩ ভাদ্র-আশ্বিন। ৪ ঐ ঐ 'কত [illegible] শয়ন'। ৫ 'যোগিয়া'। ৬ 'যৌবন-স্বপ্ন'। ৭ 'ক্ষণিক মিলন'।

তাই বুঝি ফুলবনে জাহ্নবীর তীরে
পুরাতন হাসিগুলি ফুটে শত শত।
তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হ'য়ে পল্লবের মতো।...
সে এল না এল তার মধুর মিলন,
বসন্তের গান হ'য়ে এল তার স্বর,
দৃষ্টি তার ফিরে এল—কোথা সে নয়ন?
চুম্বন এসেছে তার—কোথা সে অধর?[১]

প্রেমস্মৃতির রোমান্স্ হইতে সহজেই বাল্যস্মৃতির রোমান্স্ সার্বভৌমিক কবিকল্পনায় পরিণত হইল। 'উপকথা,'[২] 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,'[৩] 'সাত্ ভাই চম্পা,'[৪] 'পুরোনো বট,'[৫] 'কল্পনার সাথী,' 'কল্পনা-মধুপ' ইত্যাদি কবিতা এই পর্য্যায়ের।

মধ্যাহ্নে একেলা যবে বাতায়নে ব'সে,
নয়নে মিলাতে চায় সুদূর আকাশে,
কখন্ আঁচলখানি পড়ে যায় খ'সে,
কখন্ হৃদয় হতে উঠে দীর্ঘশ্বাস,
কখন্ অশ্রুটি কাঁপে নয়নের পাতে,
তখন আমি কি সখী থাকি তব সাথে![৬]

এই ধরণের উৎপ্রেক্ষা পরবর্ত্তিকালে অনেক কবিতায় দেখা গিয়াছে। 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' কবিতাটি কড়ি-ও-কোমলের শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে একটি। "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান" এই ছড়াটি কবির ছিল শৈশবের মেঘদূত।

বিরহিকবিচিত্তের কারুণ্য বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে বাৎসল্যঘটিত

[১] 'গীতোচ্ছ্বাস'। [২] প্রথমপ্রকাশ ভারতী ১২৯১ ফাল্গুন। [৩] ঐ বালক ১২৯২ বৈশাখ। [৪] ঐ আষাঢ়। [৫] ঐ ভাদ্র। [৬] 'কল্পনার সাথী'।

কবিতাগুলিতে। প্রেমের উন্নয়ন বা sublimation-এর সঙ্গে বাৎসল্যের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির প্লটেও স্বীকৃত হইয়াছে। যে স্নেহ শৈশবে কবির ভাগ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জোটে নাই তাহাই উপচাইয়া উঠিল কড়ি-ও-কোমলের এই কবিতাগুলিতে।

বৃহত্তর জীবনে প্রবেশলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠায় "কল্পনা-মধুপ" কবি "আপনার সৌরভে আপনি উদাসী" থাকিতে পারিলেন না। শোকরসের আবেশ কাটিয়া গেল ভবিষ্যতের আহ্বানে, সংসারের সান্ত্বনায়।

মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর,
সম্মুখে রয়েছে প'ড়ে যুগ যুগান্তর![১]

একি ঢেউ-খেলা হায়, এক আসে, আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি,
বিলাপের শেষ তান না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি!
আয় রে কাঁদিয়া লই, শুকাবে দু দিন বই
এ পবিত্র অশ্রুবারি ধারা।
সংসারে ফিরিব ভুলি, ছোট ছোট সুখগুলি
রচি দিবে আনন্দের কারা।[২]

দেশের মূঢ়তার ও দুর্দ্দশার প্রতিও কবি উদাসীন রহিতে পারিলেন না। ইহার নিদর্শন পাই 'বঙ্গভূমির প্রতি' ও 'বঙ্গবাসীর প্রতি' গানে ও 'আহ্বান-গীত' কবিতায়। দেশের প্রতি নিজের কর্ত্তব্য ইতিমধ্যেই কবিচিত্তে পরিস্ফুট রূপ লইয়াছিল। নিজের ভবিষ্যদ্‌বাণী কবি নিজেই সফল করিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই ব'লে,
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,

'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি,' [১] প্রথমপ্রকাশ প্রচার ১২৯২ অগ্রহায়ণ। [২] 'নূতন,' প্রথমপ্রকাশ ভারতী ১২৯২ বৈশাখ।

গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।
একবার কবি মায়ের ভাষায়
গাও জগতের গান—
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়—
ঘুচে যায় অপমান।[১]

কড়ি-ও-কোমলে প্রধান স্থান লইয়াছে সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলি অধিকাংশ সনেটই পয়ার ছন্দে লেখা, দুই একটি দীর্ঘতর ছন্দে। মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতায় এতদিন পরে নূতন ও মধুর রূপ দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথের চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলিতে ইউরোপীয় সনেটের দৃঢ়পিনদ্ধ ভাব নাই, মধুসূদনের কাঠিন্তেরও হয়ত কচিৎ অভাব আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ লিরিক সৌন্দর্য্যে এবং ভাব ও ভাষার সংযত পেলবতায় এই কবিতাগুলি শুচিতায় ও রুচিমাধুর্য্যে অভিষিক্ত হইয়াছে। কয়েকটি কবিতায় নারীর দেহসৌন্দর্য্য কবির শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য আহরণ করিয়াছে। প্রেমের তীব্রতা কোন কোন কবিতায় দীপ্তমধুরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেহের মধ্য দিয়া দেহাতীতের জন্য আর্ত্তি বৈষ্ণবকবিতারও উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।

এতো বৈষ্ণব-কবিও বলিয়াছেন। কিন্তু

হৃদয় লুকান আছে দেহের সায়রে
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন,
সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্ত মাঝে হইব মগন।

১ 'আহ্বান গীত,' প্রথমপ্রকাশ বালক ১২৯২ পৌষ।

আমার এ দেহমন চির রাত্রি দিন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।[১]

বৈষ্ণব-কবি এত দূর বলিতে সাহস করেন নাই, কেন না রাধাকৃষ্ণের লীলাকুঞ্জ-কুটীরের দেহলী ডিঙাইয়া তাঁহাদের কবিদৃষ্টি ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

কড়ি-ও-কোমলের কয়টি সনেট ছাড়া রবীন্দ্রনাথ সত্যকার passionate প্রেমের কবিতা আর বড় লিখেন নাই।

ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।...
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা,
চতুর্দ্দশ[২] বসন্তের একগাছি মালা![৩]

কিন্তু এই দেহদৃষ্টির সম্মুখেও রঙীন ছায়া ফেলিতেছে অতীতদিনের স্মৃতি,

ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব্ব জনমের স্মৃতি!...
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মুরতি ধরি দেখা দিল আজ!
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশি দিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন![৪]

রোমান্সের অসীম মাধুর্য্য সত্ত্বেও passionate প্রেম কবিচিত্তকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। দেহমাধুর্য্যের ফাঁদে পড়িয়া কবিহৃদয় আর্ত্তনাদ করিয়াছে মোহমুক্তি লাভের আশায়।

দাও খুলে দাও সখি ওই বাহু পাশ!
চুম্বন মদিরা আর করায়োনা পান!...
কোথায় উষার আলো কোথায় আকাশ!
এ চির পূর্ণিমা রাত্রি হোক্ অবসান!

[১] 'দেহের মিলন'। [২] আধুনিক পরিবর্ত্তিত পাঠ "পঞ্চদশ"। [৩] 'তনু'। [৪] 'স্মৃতি'।

আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ !
আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্ব্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।...
স্বাধীন করিয়া দাও বেঁধ না আমায়
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায় ![১]

প্রেমকে সাথী করিয়া এবং মানবজীবনের পরিপূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করিয়া দুঃখসুখের যাত্রাপথে অগ্রসর হইবার বাসনা উদ্দীপ্ত হইয়াছে কবিচিত্তে।

চল দোঁহে থাকি গিয়ে মানবের সাথে,
সুখ দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসি কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসার সংশয়রাত্রি রহিব নির্ভয়।[২]

আসল কথা, রোমাণ্টিক অনুভূতির অতৃপ্তি ও অচিরস্থায়িত্ব কবিচিত্তে সংশয় জাগাইয়াছে।

এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা,
সলিল রয়েছে পড়ে শুধু দেহ নাই !
এ কেবল হৃদয়ের দুর্ব্বল দুরাশা
সাধের বস্তুর মাঝে করে চাই চাই ![৩]

এ মোহ ক দিন থাকে, এ মায়া মিলায় !
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে ![৪]

[১] 'বন্দী'। [২] 'মরীচিকা'। [৩] 'অক্ষমতা'। [৪] 'মোহ'।

৬

তখন বাসনাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কবিচিত্ত মানবসংসারে আত্মোৎসর্গের পথে ধাবিত হইল।

তোমারেও মাগিব না, অলস কাঁদনি!
আপনারে দিলে তুমি আসিবে আপনি![১]

আত্মোৎসর্গের পূর্ব্বে চাই আত্মজ্ঞান, হৃদয়ে পরম প্রেমের চরম সত্যের আভাস। কবি সেই পরম প্রেমের স্পর্শের লাগিয়া উদ্‌গ্রীব।

কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন উপহারে,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথা রে!
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে—কোথা সেই অনন্ত জীবন![২]

এই পরম প্রেমই হইতেছে চরম রোমান্‌স,

কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে তারি পাছে পাছে,
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়![৩]

কবিচিত্তে যৌবনস্বপ্নের অবসান ঘটিল এই ব্যাকুল প্রার্থনায়,

আমার হৃদয়দীপ আঁধার হেথায়,
ধূলি হতে তুলি এরে দাও জ্বালাইয়া,
ওই ধ্রুবতারাখানি রেখেছ যেথায়
সেই গগনের প্রান্তে রাখ ঝুলাইয়া।[৪]

[১] 'প্রত্যাশা'। [২] 'চিরদিন'; প্রথমপ্রকাশ ভারতী ও বালক ১২৯৩ জ্যৈষ্ঠ। [৩] 'শেষ কথা'। [৪] 'সত্য' (২); প্রথমপ্রকাশ তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা ১২৯৩ শ্রাবণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যৌবনসাধনা

১

'মানসী'-তে (১২৯৭) রবীন্দ্রকাব্যকলা পূর্ণপ্রতিষ্ঠ হইল। কড়ি-ও-কোমলে অবশ্য ভাষার জড়ত্বের চিহ্নটুকু নাই, ভাষামাধুর্য্যও সেখানে প্রকটিত হইয়াছে প্রায় পূর্ণাঙ্গভাবে। মানসীতে বাক্‌মাধুর্য্যের পরিণাম এবং শব্দনৈপুণ্যের পরিচয় হইয়াছে পূর্ণতর। সেই সঙ্গে মিলিত হইয়াছে ছন্দের বৈচিত্র্য এবং মিলের কৌশল। পংক্তির শেষে, মধ্যে, ক্বচিৎ আদিতে মিলের প্রাচুর্য্য ও সাবলীলতা মানসী কাব্যের ধ্বনিপ্রবাহে স্রোতস্বিনীর তরঙ্গকল্লোল প্রতিধ্বনিত করিয়াছে।[১] "ফেনা ঢোকে নাকে-চোখে প্রবল মিলের ঝোঁকে"—একথা এতটুকুও অতিশয়োক্তি নয়। 'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি' কবিতা দুইটিতে মিত্র-পয়ারে অমিত্রাক্ষরের শক্তির সঙ্গে নূতনতর সুষমা দেখা দিল।

প্রকৃতির পটে মানসজীবনের সুখদুঃখের স্রোত এবং মানবচিত্তের অস্থির ইমোশনের দ্বন্দ্ব মানসী কাব্যের বিশিষ্ট কবিতাগুলিতে ফুটিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলিতে প্রকৃতির লীলাবিলাস কবিমানসে আনন্দের প্রলেপ দিয়াছে অথবা কবিচিত্তের বিভিন্ন অনুভূতিকে রঞ্জিত করিয়াছে। সেখানে প্রকৃতির রসানুভূতি

[১] যুক্তাক্ষরের সুনিপুণ ব্যবহার ছন্দে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। এ ব্যাপার বাঙ্গালা কাব্যে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়াই প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় কবি লিখিয়াছিলেন, "এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে। সেরূপ স্থলে সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া না পড়িলে ছন্দ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। যথা—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল ;
ঊর্দ্ধে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।

'নিম্নে' 'স্বচ্ছ' এবং ঊর্দ্ধে' এই কয়েকটি পদে তিন মাত্রা গণনা না করিলে পয়ার ছন্দ থাকে না। আমার বিশ্বাস যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ; কেবল বাঙ্গালা ছন্দ পাঠ করিয়া বিকৃত অভ্যাস হওয়াতেই সহসা তাহা দুঃসাধ্য মনে হইতে পারে।"

অপেক্ষা কবিহৃদয়াবেগেরই ছিল প্রাধান্য। মানসীতে বৃহৎ প্রকৃতির প্রভাব কবির হৃদয়াবেগের ও অনুভূতির উপর বিস্তারিত হইয়াছে। অশান্তচিত্ত বিক্ষুব্ধ কবি প্রকৃতির কাছে সুবৃহৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়া বৃহত্তর শান্তির উদ্দেশ পাইয়াছে। কবিচিত্তের অকুণ্ঠ প্রকাশের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য মানসী কাব্যে তুল্য মর্য্যাদা পাইয়াছে।

দেহসৌন্দর্য্যের অকৃতার্থতার ও বাস্তবপ্রেমের ক্লান্তিজনিত অবসাদের ফলে কর্ম্মচঞ্চল নূতনজীবনের উৎসাহ কড়ি-ও-কোমল কাব্যের শেষ কথা। মানসী শুরু হইল পুরাতন প্রেমের জ্বালাহীন স্মৃতির অভিসারে। মর্ম্মের কামনাকে সেই স্মৃতির মধ্যে মূর্ত্তিমতী করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল মানসী কাব্যের উদ্দিষ্ট "মানসী প্রতিমা"। বিশ্বপ্রকৃতির "সঙ্গীহারা সৌন্দর্য্যের" আবেদন কবির বিরহিচিত্তে ব্যথার ঝঙ্কার তোলে। আর

সেই মোহ-মন্ত্র গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্ত্তিমতী মর্ম্মের কামনা।

মর্ম্মের সেই কামনাকে

আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গ'ড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।[১]

স্থান কাল ও ভাব অনুসারে মানসীর কবিতাগুলি তিন স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরের যোলটি কবিতা লেখা হইয়াছিল কলিকাতায় ৪৯ পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে ১২৯৩ সালের বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে।[২] পুরাতন প্রেমস্মৃতির রোমন্থন ও তাহা অবলম্বনে আদর্শকল্পনা এই স্তরের অধিকাংশ কবিতার ভাব। দ্বিতীয় স্তরের আটাশটি কবিতা রচিত হয় গাজিপুরে

[১] 'উপহার'। [২] 'ভুলে,' 'ভুলভাঙ্গা,' 'বিরহানন্দ,' 'শূন্যহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা,' 'নিষ্ফল কামনা,' 'সংশয়ের আবেশ,' 'বিচ্ছেদের শান্তি,' 'তবু,' 'পত্র,' 'পুরুষের উক্তি' ইত্যাদি।

১২৯৫ সালের ১১ বৈশাখ হইতে ২৩ আষাঢ়ের মধ্যে।[১] বহিঃ-প্রকৃতির উদার সান্ত্বনায় কবিহৃদয়াবেগের স্থায়িস্থিতিভূমি লাভ এই কবিতাগুলির রহস্য। তৃতীয় স্তরের বাইশটি কবিতা বিভিন্ন স্থানে রচিত হইয়াছিল—কলিকাতা জোড়াসাঁকো, সোলাপুর, খিরকী, শান্তিনিকেতন, লণ্ডন এবং লোহিতসমুদ্র-বক্ষ।[২] রচনাকাল ১২৯৬ সালের ৬ বৈশাখ হইতে ১২৯৭ সালের ১১ কার্ত্তিক। পুরাতন প্রেমের রোমান্টিক আদর্শের সঙ্গে জীবনাদর্শের মিল এবং সেই উপলব্ধির মধ্যে চরমপ্রেয়-উপলব্ধি এই কবিতাগুলির অধিকাংশের মর্ম্মকথা।

রচনাকাল ধরিলে মানসীর প্রথম কবিতা হইতেছে 'পত্র'[৩] (শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত) কবিতাটির ভাষা ও ভঙ্গি যেমন সরল ছন্দের লালিত্য ও মিলের মাধুর্য্য তেমনি অসামান্য। নিভৃতজীবনের প্রতি কবির আকর্ষণ কত তীব্র ছিল তাহার প্রমাণ পাই এই কবিতায়, সেই সঙ্গে পাই নিজের কাব্য-সৃষ্টির সার্থকতায় সন্দেহ।

> আঁধারের কূলে কূলে ক্ষীণশিখা মরে দুলে
> পথিকেরা মুখ তুলে চেয়ে দেখে তাই।
> সকল নক্ষত্র হায় ধ্রুবতারা পানে ধায়,
> ফিরে আসে এ ধরায় একরত্তি ছাই।

একটিমাত্র ছত্রে কলিকাতায় বর্ষাদিনের অতুলনীয় বাস্তব ছবি আঁকা হইয়াছে,

> বেলা যায়, বৃষ্টি বাড়ে, বসি' আলিশার আড়ে
> ভিজে কাক ডাক ছাড়ে মনে অসুখে।

[১] 'একাল ও সেকাল' হইতে 'কুহুধ্বনি' এবং 'শূন্য গৃহ' হইতে 'নব-বঙ্গ-দম্পতীর প্রেমালাপ'।

[২] 'উপহার,' 'ক্ষণিক মিলন,' 'আত্মসমর্পণ' এবং 'প্রকাশ-বেদনা' হইতে শেষ পর্য্যন্ত।

[৩] প্রথম প্রকাশ ভারতী ও বালক ১২৯৪ বৈশাখ। 'শ্রাবণের পত্র'-ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে উদ্দেশ করিয়া লেখা; ইহা ১২৯৪ আশ্বিন সংখ্যা ভারতী ও বালক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল 'শ্রাবণে' নামে। মানসীতে চারি ছত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বৈষ্ণব-পদাবলীর বর্ষাভিসারের ও বিরহের সমস্ত রসনির্য্যাস ঘনীভূত হইয়াছে এই কয় ছত্রে,

পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার,
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ।
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর দুটি ছলছল নলিননয়ন।
এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।
বিজন যমুনা-কূলে বিকশিত নীপ-মূলে
কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহব্যথায়।

এই কবিতায় মেঘদূত ও রাধাবিরহ অবলম্বন করিয়া কবি যে বর্ষামঙ্গল সুর ভাঁজিলেন তাহা মানসীর আর তিনটি কবিতায় ঝঙ্কৃত হইল।[১] একটিতে কবি-হৃদয়ের বিরহ, বিশ্বের বিরহ, রাধাবিরহের রূপকের স্বচ্ছ আধারে উপচিত হইয়াছে।

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর
সেই সে শিখীর নৃত্য
এখনো হরিছে চিত্ত
ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণতিমির।[২]

'মেঘদূত' কবিতার অধিকাংশ মূলের স্থানের স্থানের অপূর্ব্বসুন্দর ভাষান্তর। শেষে শাশ্বতপ্রেমের অভিসারব্যাকুলতা,

কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?

[১] 'একাল ও সেকাল,' 'বর্ষার দিনে,' এবং 'মেঘদূত'। [২] 'একাল ও সেকাল'।

আধুনিক সময়ের সামান্য ও তুচ্ছ জীবনের প্রবাহ বাহিয়া কুহুধ্বনিমাত্র আশ্রয় করিয়া কবিচিত্ত প্রাচীন যুগের এবং নিত্যকালের রসলোকের পানে ছুটিয়াছে।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তাই অতীতের মাঝে ধাই,
শুনিয়া আকুল কুহুরব।
বিশাল মানবপ্রাণ মোর মাঝে বর্তমান,
দেশকাল করি অভিভব।[১]

মানসীর দ্বিতীয় কবিতা 'ভুলে'।[২] ইহাতে পুরাতন প্রেমের বেদনাহীন স্মৃতি কবিচিত্তে জাগরূক হইয়াছে প্রকৃতির শোভাসৌন্দর্যের মধ্য দিয়া। এই স্মৃতির প্রতিক্রিয়া পাই 'ভুল-ভাঙা'-য়। এটির সঙ্গে 'নারীর উক্তি' তুলনীয়। স্মৃতির মাধুর্যমন্থন হইয়াছে নূতনতর মাত্রা-ছন্দে 'বিরহানন্দ'[৩] কবিতায়। বিরহানন্দে কবিহৃদয়াবেগের অতীত-ইতিহাসের পরিচয় রহিয়াছে। 'বিফল মিলন'-এর পরিবর্জিত দ্বিতীয় স্তবকটিকে[৪] কেন্দ্র করিয়া দুই বৎসরেরও অধিক কাল পরে 'ক্ষণিক মিলন' লেখা হইল। 'ভুলে'-র সঙ্গে 'ভুল-ভাঙা'-র যে সম্বন্ধ 'বিরহানন্দ'-এর সঙ্গে 'ক্ষণিক মিলন'-এর সেই সম্বন্ধ। 'শূন্যহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা'-য়[৫] কবি পুরাতন প্রেম-রসদৃষ্টির নূতন অবির্ভাবের অপেক্ষা করিতেছেন। অতীতে

গেয়েছে পাখী চেয়েছে শাখী
মুকুলে!
গানের প্রাণ প্রাণের প্রাণ
কোথায় তারা লুকোলে!

[১]'কুহুধ্বনি'। [২]প্রথমপ্রকাশ ভারতী ও বালক ১২৯৪ আষাঢ়, 'এসেছি ভুলে' নামে। [৩]ঐ জ্যৈষ্ঠ, 'বিফল মিলন' নামে। মানসীতে প্রথম দুই স্তবক বর্জিত হইয়াছে। [৪]"যে জন চলিয়াছে তারি পাছে সবে ধায়!" ইত্যাদি। [৫]প্রথমপ্রকাশ ভারতী ও বালক ১২৯৪ শ্রাবণ, 'নূতন প্রেম' নামে। মানসীতে তিনটি স্তবক পরিবর্জিত হইয়াছে এবং দুইএকটি শব্দেরও পরিবর্তন হইয়াছে।

ফুটে গো বটে আকাশ পটে
তারার হার,
চাহে না মুখে হাসে না সুখে
ডাকে না আর !
জগৎ আঁখি রেখেছে ঢাকি
অভিমানের দুকূলে !
গায় কি পাখী, ছায় কি শাখী
মুকুলে ![1]

এখন তাই পরম-আবির্ভাবের আকাঙ্ক্ষা,

তাহার বাণী দিবে গো আনি
সকল বাণী বাহিয়া।
পাগল ক'বে দিবে সে মোরে
চাহিয়া।

নূতন প্রেমের আবির্ভাবের আশা চরিতার্থ হইল না,' তাই 'নিষ্ফল কামনা' কবিচিত্তে ব্যথা দিতে লাগিল। আদর্শগত প্রেমের সঙ্গে বাস্তবের বিরোধ-জনিত দ্বন্দ্ব ও হৃদয়ের তীব্র বেদনা এই কবিতাটির মিলহীন অসম ছন্দে ও বিষম ভাবে বাঙ্ময় হইয়াছে। ভাব ভাষা ও মিলহীন rugged ছন্দের দিক দিয়া 'নিষ্ফল কামনা' মানসীর সর্ব্বাপেক্ষা জোরালো ও জীবন্ত কবিতা। ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টির জন্য, খণ্ডের মধ্যে সমগ্রতার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে কবিহৃদয়। একসময়ে কবিচিত্তে এই অনুভূতির যে ঈষৎ উপলব্ধি হইয়াছিল সেই হারানো আনন্দানুভূতির জন্য ক্রন্দন।

যে-অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায় !

[1] মানসীতে পরিবর্জিত।

অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য-শিখা।

সমগ্রদৃষ্টির দুর্মূল্য দুরূহতার সম্বন্ধেও কবিচিত্ত সচেতন,

সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস!
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে।
আছে কি অনন্ত প্রেম?

'বিচ্ছেদের শান্তি' কবিতায় নিষ্ফল-কামনা নির্বাণপ্রায় হইয়াছে কর্মজীবনে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আগ্রহে।

মিছে কেন কাটে কাল, ছিঁড়ে দাও স্বপ্নজাল,
চেতনার বেদনা জাগাও,—
নূতন আশ্রয় ঠাঁই, দেখি পাই কিনা পাই
সেই ভালো তবে তুমি যাও।

তবুও পিছুটান রহিয়া গেল।

তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদভরে কাটে সন্ধ্যা বেলা
অথবা শারদপ্রাতে বাধা পড়ে কাজে
অথবা বসন্তরাতে থেমে যায় খেলা।[১]

[১] 'তবু'।

প্রেমের সংশয় কবিচিত্তকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সংসারের কাজে মুক্তি দিতেছে না। ক্ষোভ,

কেন এ সংশয়-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছো মোরে,
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে—প্রেম নহে ফাঁকি
প্রাণ নহে খেলা।

'নিষ্ফল প্রয়াস,' 'হৃদয়ের ধন' ও 'নিভৃত আশ্রম'—এই সনেট তিনটি একদিনে লেখা। প্রথম দুইটিতে রূপের ও বাসনার অকৃতার্থতা অভিব্যক্ত হইয়াছে। তৃতীয় কবিতায় আত্মসমাহিত ধ্যানমৌন প্রেমতপস্যার ছবি আঁকা হইয়াছে। 'নারীর উক্তি' ও 'পুরুষের উক্তি' প্রথম স্তরের শেষ কবিতা। বাস্তবপ্রেমে প্রথম মিলনের উচ্ছ্বাস কাটিয়া গেলে প্রেমপ্রবাহে আসে স্থৈর্য্য, কিন্তু তখনও যদি এক পক্ষে আসক্তি তীব্রতর থাকে তবে অপর পক্ষে নিরাসক্তি হয় প্রবলতর। তাই পুরুষের উক্তি,

আমি চাই তোমারে যেমন
তুমি চাও তেমনি আমারে,
কৃতার্থ হইব আশে গেলেম তোমার পাশে
তুমি এসে বসে আছ আমার দুয়ারে।

দ্বিতীয় স্তরের প্রথম কবিতা 'শূন্যগৃহে'। মানবের দুঃখবেদনার সঙ্গে চিরন্তন কল্যাণ-আদর্শের বিরোধ কবিচিত্তে সন্দেহ জাগাইয়াছে। দ্বিতীয় কবিতা 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি'-র মধ্যে সন্দেহের কুহেলিকা ভেদ করিয়া সত্যের আভাস ফুটিয়াছে। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মন ডুবাইয়া কবি চরমকল্যাণমূর্ত্তির আশ্বাস পাইলেন। ইহার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল 'জীবন-মধ্যাহ্ন'-এ।

নিত্য-নিশ্বসিত বায়ু; উন্মেষিত উষা;
কনকে শ্যামলে সম্মিলন;

দূর-দূরান্তরশায়ী মধ্যাহ্ন উদাস ;
বনচ্ছায়া নিবিড় গহন ;
যতদূর নেত্র যায় শস্যশীর্ষরাশি
ধরার অঞ্চলতল ভরি,'—
জগতের মন হ'তে মোর মর্ম্মস্থলে
আনিতেছে জীবন-লহরী।

'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায় পাই বহিঃপ্রকৃতির দৃশ্যে চিরন্তন মানবলীলার হৃদয়াবেগের ও অনুভূতির প্রতিচ্ছবি। প্রকৃতির নিগূঢ় মর্ম্মস্থলে যে লীলারঙ্গিণী সত্তাটি রহিয়াছে তাহাই যেন নিখিলমানবচিত্তকে চিরদিন ধরিয়া নানাভাবে আকর্ষণ করিতেছে। এই আইডিয়াই পরে 'কৌতুকময়ী,' 'লীলাসঙ্গিনী' প্রভৃতি কবিতায় রূপায়িত হইয়াছে। তবে এখানে যাহা নৈর্ব্যক্তিক পরে তাহা একান্ত ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়াছে।

'শ্রান্তি' কবিতায় যে অবসাদজনিত শান্তির ছবি আঁকা হইয়াছে তাহারি পরবর্ত্তী অবস্থা সুষুপ্তিসুখ-অনুভূতি 'মরণস্বপ্ন'-এ অপূর্ব্ব উৎপ্রেক্ষায় বর্ণিত হইয়াছে। নবজাগ্রত রসদৃষ্টিতে কবিচিত্ত পুরাতন প্রেমের অচরিতার্থতা স্মরণ করিয়াছে 'আকাঙ্ক্ষা'-য়। দিগন্তে নবমেঘের সমারোহ, পূবে হাওয়া আকুল উদাস, কবিহৃদয়ের অকথিত বাণী আজ প্রকাশব্যাকুলতায় উত্তাল।

কতকাল ছিল কাছে, বলিনিতো কিছু,
দিবস চলিয়া গেছে দিবসের পিছু।
কত হাস্য পরিহাস, বাক্য হানাহানি,
তা'র মাঝে র'য়ে গেছে হৃদয়ের বাণী।

এই ভাবটিই পুনরাবৃত্ত হইয়াছে নৈর্ব্যক্তিকভাবে 'বর্ষার দিনে'। শ্বশুরালয়ে নবাগত, জনতাপীড়িত স্নেহক্রোড়বিচ্যুত পল্লীনীড়লালিত বালিকাবধূর হৃদয়-বেদনা গুঞ্জরিত হইয়াছে 'বধূ' কবিতায়। তখন ঠাকুরবাড়ীর বধূরা অল্পবয়সে

শ্বশুরালয়ে আসিত, পিত্রালয়ে যাইবার সুযোগও তাহাদের বড় হইত না। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই পারিবারিক ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া কবিতাটি লিখিয়াছিলেন।

দিনশেষের শান্তসৌন্দর্য্যের প্রশান্ত পটভূমিকায় রোমান্টিক প্রেমাভিসারের অপূর্ব্ব বর্ণসুষম কল্পনা-অনুভূতি এবং ছন্দের কমনীয় নিক্কণ 'অপেক্ষা' কবিতায় বিচিত্র চিত্ররূপ পাইয়াছে। দিবাবসানের শান্তকরুণ মাধুর্য্যের এমন বর্ণনা আর কোথাও নাই,

দিনের শেষে শ্রান্ত ছবি
কিছুতে যেতে চায় না রবি,
চাহিয়া থাকে ধরণী পানে
বিদায় নাহি চায়।
মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে
মিলায়ে থাকে মাঠে,
পড়িয়া থাকে তরুর শিরে,
কাঁপিতে থাকে নদীর নীরে,
দাঁড়ায়ে থাকে, দীর্ঘছায়া
মেলিয়া ঘাটে বাটে।

ভদ্র-বাঙ্গালীর সঙ্কীর্ণ জীবনের নীচতা-ক্ষুদ্রতা ও মূঢ় আত্মসন্তুষ্টি কবিচিত্তকে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। তাঁহার জাতীয়জীবনের আদর্শের কাছে তখনকার দিনের শিক্ষিত বাঙ্গালীর রাজনৈতিক-আন্দোলনের তুচ্ছতা ও "আর্য্যামি"-বড়াইয়ের ক্ষুদ্রতা কোনমতে খাপ খাইতেছিল না। কবিচিত্তের এই নিদারুণ ক্ষোভ প্রকাশিত হইবাছে মানসীর দ্বিতীয় স্তরের কয়েকটি কবিতায়।[১] এই ধরণের প্রথম কবিতা 'দুরন্ত আশা' মানসীর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম। কবিহৃদয়ের সমস্ত তিক্ততার ঝাঁঝ কবিতাটির ব্যঙ্গদীপ্ত শাণিতভাষায় এবং যুক্তাক্ষরচপল দৃপ্তছন্দে উপচাইয়া পড়িয়াছে।[২] গৃহকোণে নিষ্কর্ম্মণ্য

[১] 'দুরন্ত আশা,' 'দেশের উন্নতি,' 'বঙ্গবীর,' 'পরিত্যক্ত,' 'ধর্ম্মপ্রচার' ও 'নব-বঙ্গ-দম্পতীর প্রেমালাপ।' [২] কবিতাটির প্রথম ছত্র "মর্ম্মে যবে মত্ত আশা সর্প সম ফোঁসে" 'স্বদেশ' কাব্যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—"হৃদয়ে যবে বিফল আশা সাপের মত ফোঁসে"। এখানে যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করায় ছন্দের দোলা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সেজন্য ভাবের গাঢ়তাও কমিয়া গিয়াছে।

তুচ্ছ জীবনপাশবদ্ধ কবিমানস উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার জন্য।

থাকিতে নারি ক্ষুদ্রকোণে
আম্রবনচ্ছায়ে,
সুপ্ত হ'য়ে লুপ্ত হ'য়ে
গুপ্ত গৃহবাসে।...
কোথাও যদি ছুটিতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে,
ভব্যতার গণ্ডীমাঝে
শান্তি নাহি মানি।

'পরিত্যক্ত' কবিতার সুর অনুযোগের। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি দেশনেতার উদার বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া কবি এখন আর প্রবীণ সুবুদ্ধিদের হিতোপদেশ মানিয়া জীবনের ব্রত ভাসাইয়া দিয়া উজান স্রোতে ফিরিতে পারিবেন না। 'কবির প্রতি নিবেদন'-এ সাময়িক প্রশংসাবাদ ও যশলোভ তুচ্ছ করিয়া কবিত্বের উন্নত আদর্শ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অতীতজীবনের প্রেমস্বপ্নের সঙ্গে বর্ত্তমান কর্ম্মোদ্যত জীবনের বিরোধ ব্যক্ত হইয়াছে 'ভৈরবী গান'-এ। যে প্রেম সার্থকতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে তাহার অলস রোমন্থন একদিকে কবিচিত্তকে ব্যর্থতার বিষাদভারগ্রস্ত ও দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছে, অপর দিকে নূতন জীবনের আহ্বান তাহাকে পুনঃপুন উদ্বোধিত করিতেছে। বিশ্ববিধাতার ভরসা এই দ্বন্দ্বের সমাধান আনিল।

থামো, শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর
নবীন জীবন ভরিয়া!
যাবো যাঁর বল পেয়ে সংসার-পথ
তরিয়া,
যত মানবের গুরু মহৎ জনের
চরণ-চিহ্ন ধরিয়া।

হৃদয়দৌর্বল্য কাটিয়া গেল। ভাবাতুরতাকে উপেক্ষা করিয়া কবিচিত্ত জীবনের কঠিন সত্যপথ আশ্রয় করিতে উদ্‌যুক্ত হইল।

ওগো এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে!
যাবো আজীবন কাল পাষাণ-কঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ
সুখ আছে সেই মরণে!

দ্বিতীয় সুর অর্থাৎ গাজিপুরের পালা একরকম এইখানেই সাঙ্গ হইয়া গেল।

কবিজীবন যে কঠিন সত্যপথ অবলম্বন করিল তাহার প্রথম বাধা 'প্রকাশ-বেদনা,' অর্থাৎ আত্মপ্রকাশের কুণ্ঠা ও অসম্পূর্ণতা।

আপন প্রাণের গোপন বাসনা
টুটিয়া দেখাতে চাহি রে,
হৃদয়বেদনা হৃদয়েই থাকে
ভাষা থেকে যায় বাহিরে।

অতীত রোমান্‌সের রঙীন মায়া এখনও কাটিয়া যায় নাই; তবে সেই ছায়াছবির মধ্যে কবিচিত্ত একটা শাশ্বতসত্তার সন্ধান করিতেছে।[১] এই সত্তার অনুভবের পরিচয় রহিয়াছে 'ধ্যান,' 'পূর্ব্বকালে,' 'অনন্ত প্রেম' ও 'আত্ম-সমর্পণ' কবিতায়। এইখানে মানসী কাব্যের চরম কথা বলা হইয়া গেল। তাহার পর মানসী-প্রতিমার প্রতিষ্ঠা।[২] যে শাশ্বত কল্যাণশক্তি বা অনন্তপ্রেম ধরিত্রীর কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া জগতের জীবলীলা পরিচালিত করিতেছে তাহারি গূঢ় অনুভূতির পরম কবিত্বময় প্রকাশ 'অহল্যার প্রতি' কবিতায়। পরে 'চিত্রা' কাব্যের 'বসুন্ধরা'-য় এই অনুভূতির গাঢ়তর ও ব্যাপক প্রকাশ দেখিতে পাই।

[১] 'মায়া' ও 'মেঘের খেলা'। [২] 'উপহার'।

'শেষ উপহার' কবিতাটি কবিবন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের একটি ইংরেজি কবিতা অবলম্বনে লেখা। পুরাতন ও নূতন জীবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া কবি-চিত্তের বেদনা প্রকাশিত হইয়াছে 'বিদায়' ও 'সন্ধ্যায়' কবিতা দুইটিতে। নবজীবনের আগমনী বাজিয়া উঠিয়াছে 'আমার সুখ'-এ।

২

মানসী কাব্যে মানবজীবনস্রোতে অবগাহনের যে সঙ্কল্প প্রকটিত হইয়াছে তাহার চরিতার্থতা ঘটিল অব্যবহিত পরেই। জমিদারির ভার লইয়া অতঃপর কবিকে প্রায়শ উত্তর-মধ্যবঙ্গে নদীবক্ষে ও নদীকূলে—শিলাইদহ-সাজাদপুর-পতিসর-কালীগ্রামে—কাটাইতে হইত। শহরবাসী কবি এই উপলক্ষ্যে পল্লীহৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী নরনারীর বাস্তব ও শাশ্বত পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। এই রসদৃষ্টির প্রকাশ মুখ্যত ছোট-গল্পে গৌণত গীতিকবিতায়। অতি সাধারণ নরনারীর অখ্যাত জীবনলীলার মধ্যেও যে চিরন্তন অসামান্যতা আছে তাহা এই গল্পগুলির আড়ম্বরহীন বাস্তব পরিবেশের মধ্যে উজ্জ্বল রসরূপ লাভ করিয়াছে। 'সোনার তরী' (১৩০০) কাব্য ছোট-গল্পগুলির সমসাময়িক, ইহার অধিকাংশ কবিতায় ছোট-গল্পেরই রেশ রহিয়াছে।

সোনার-তরীর অনেকগুলি কবিতায় রূপকথার ও রূপকের স্পর্শ আছে।[১] অপর কবিতাগুলিতেও ভাব জমিয়াছে কাহিনীর সূত্রাভাস অবলম্বনে। অর্থাৎ হৃদয়াবেগ সংযত হইয়া কাব্যবস্তুকে সংহত করিয়াছে। ভাষায় ও ছন্দে শিল্পচাতুর্য মানসীতে যতটা মুখ্য সোনার-তরীতে ততটা নয়। সোনার-তরীর ভাষা সরল ও কমনীয়তর। সমসাময়িক গদ্য পদ্যের মহিমায় সমুজ্জ্বল।

ছোট-গল্পে মানবজীবনপ্রবাহের ভঙ্গতরঙ্গের মালা গাঁথা হইয়াছে। সোনার-তরীর কবিতায় তাহা সমগ্রদৃষ্টিতে জলস্থল-আকাশের সঙ্গে অখণ্ডভাবে উপলব্ধ

[১] 'সোনার তরী,' 'শৈশব সন্ধ্যা,' 'বিম্ববতী,' 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে,' 'নিদ্রিতা,' 'সুপ্তোত্থিতা,' 'হিং টিং ছট্,' 'পরশ-পাথর,' 'দুই পাখী,' 'মানভঙ্গ,' 'যেতে নাহি দিব,' 'অনাদৃত,' 'দেউল,' 'পুরস্কার' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'।

হইয়াছে। এই বিচার অনুসারে সোনার-তরীর প্রথম কবিতা হইতেছে 'শৈশব সন্ধ্যা'।[১]

সরিষার ক্ষেতভরা ফুটিয়াছে ফুল
পুকুরের এক পাড়ে ; বাতাস আকুল
থেকে থেকে গন্ধ তার উড়াইয়া আনে
বহু বরষের কথা জাগায়ে পরাণে।...
ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি চারিধার
শ্রান্তি, আর শান্তি, আর সন্ধ্যা-অন্ধকাব
মায়ের অঞ্চল সম।

এই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গৃহগামী বালকের গীতধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইল ;

তীব্র উচ্চতান
সন্ধ্যারে কাটিয়া যেন করিবে দু'খান।

অমনি কবির মনে জাগিয়া উঠিল চিরন্তন শৈশবজীবনপ্রবাহের মধ্যে আপন শৈশবস্মৃতির ছায়াছবি।

দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।

সোনার-তরীর প্রথম কবিতা 'সোনার তরী'-র[২] সঙ্গে 'অনাদৃত'[৩] কবিতার শুধু ছন্দে নয় ভাবেও সুগভীর ঐক্য আছে। দুইটিতে রূপকছলে এই কথাই বলা হইয়াছে যে নিরাসক্ত আনন্দসৃষ্টির দ্বারাই মানুষ চরমসত্যকে স্পর্শ করিতে পারে, তাহার আমিত্ববেষ্টিত সমগ্রসত্তা কখনো সে সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে না। মানুষের নিগূঢ়তম প্রকাশ তাহার বাসনায় বা কর্মে নয়, তাহার ত্যাগে, তাহার আনন্দোপলব্ধিতে।

[১] প্রথমপ্রকাশ সাধনা ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ, সোনার-তরীতে প্রথম ২২ ছত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে।
[২] প্রথমপ্রকাশ সাধনা ১৩০০ আষাঢ়। [৩] রচনাকাল ২২ ফাল্গুন ১২৯৯।

'সোনার তরী' কবিতাটির ধ্বনিচাপল্যে যেন নদীপ্রবাহের খরস্রোত অনুরণন তুলিয়াছে। ধ্বনি-শব্দ-অর্থের এমন ত্রিবেণীসঙ্গম নিতান্ত দুর্লভ।

'বর্ষা যাপন'[১] মানসী কাব্যের 'পত্র' স্মরণ করাইয়া দেয়। কবিতাটির শেষাংশে রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্প রচনার ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মানসীতে কবি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন মহৎজীবনে প্রবেশ করিতে, এখন জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয়ে জানিতে পারিলেন যে অতি সাধারণ ও অবজ্ঞাত মানব-জীবনের মহত্ত্বের পরিসীমা নাই। তাই অখ্যাত জীবনের তুচ্ছ হাসিকান্না এখন কবির চিত্তে প্রকাশমুখরতা জাগাইল।

জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধূলা
কত ভার, কত ভয় ভুল
সংসারের দশ দিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝরঝর বরষার মত—
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে[২] রসসাধনার যে ইঙ্গিত আছে তাহাতে মানবজীবন-লীলার তত্ত্বটিই রসায়িত হইয়া রূপকারূঢ় হইয়াছে; ইহাই 'বৈষ্ণব কবিতা'-র[২] মর্মকথা। বৈষ্ণব-কবি রাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক লীলাকাহিনীকে আশ্রয় করিয়া নিজের প্রেমরসোপলব্ধিই গাহিয়াছিলেন,

দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা!

'যেতে নাহি দিব'[৩] কবিতায় কবিহৃদয়াবেগ বিস্তারিত হইয়াছে জলেস্থলে-আকাশে। জীবধাত্রী জড়ময়ী বেদনাময়ী পৃথিবী-জননীর অপূর্ব চেতনাদীপ্তিতে কবিতাটি উদ্ভাসিত।

[১] প্রথমপ্রকাশ ভারতী ১২৯৯ শ্রাবণ। [২] ঐ সাধনা ফাল্গুন। [৩] ঐ অগ্রহায়ণ।

চারিদিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্ব-মর্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে। শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী।...
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে ; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন, মুখে নাহি বাণী!
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্ম্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত।

পদ্মাতীরের উদার নির্জন অবকাশে কবিহৃদয় মানসী-প্রতিমাকে কাব্যলক্ষ্মী মানসসুন্দরী রূপে আবাহন করিয়াছে 'মানস-সুন্দরী' কবিতায়। কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের রসানুভূতির ইতিহাস কতকটা রূপকের ভঙ্গিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিশ্বসৌন্দর্য্যের মধ্যে কবিচিত্ত মানসসুন্দরীর লীলা দেখিতেছে, কিন্তু তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া কামনা করিতেছে মূর্ত্তিমতীরূপে পাইতে।

সেই তুমি
মূর্ত্তিতে কি দিবে ধরা? এই মর্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব্ব ঠাঁই হতে সর্ব্বময়ী আপনারে

করিয়া হরণ—ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি ?

মৃত্যুর আড়ালে অরূপের সিংহাসন হইতে যে নারী কবিহৃদয়ের বীণাযন্ত্র বিচিত্র রাগরাগিণীতে ঝঙ্কৃত করিতেছেন তাঁহাকে পুনরায় রূপের বন্ধনে বদ্ধ দেখিবার আশা কবি ছাড়িতে পারিতেছেন না।

গৃহের বনিতা ছিলে—টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়,—
তবু কোন্ মায়া-ডোরে চির-সোহাগিনী
হৃদয়ে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিণী
জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরস্মৃতিময়!
তাই ত এখনো মনে আশা জেগে রয়
আবার তোমারে পাব পরশবন্ধনে!

সমুদ্রের অনাদি উচ্ছ্বাস দেখিয়া কবিচিত্তে যে বিপুল উদ্দাম আনন্দ-অনুভূতি জাগিয়াছিল তাহা 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় অপূর্ব্ব ছন্দমুখর সৌন্দর্য্যে প্রকটিত হইয়াছে। এই আনন্দানুভূতি ব্যষ্টির নয় সমষ্টির। তাই

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানবহৃদয়ে মিশিতে
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।

'ঝুলন'-ও উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল সমুদ্রের তাণ্ডবসঙ্গীতের অবকাশে। কিন্তু এখানে যে আনন্দানুভূতি তাহা সমষ্টির নয় ব্যষ্টির; এখানে কবি "জগৎ-মাতানো সঙ্গীত তানে" ভারতবাসীকে "জাতিজালপাশ ছিঁড়িয়া" ফেলিয়া বিশ্বনৃত্যে যোগ দিতে আহ্বান করিতেছেন না। ঝুলনে শুধু কবি আর তাঁর "পরাণবধূ"; উভয়ের মিলনের যে বাধা রহিয়াছে তাহাই যেন দূর হইয়া যায়, এই বাসনা।

'যেতে নাহি দিব' কবিতায় জীবধাত্রী ধরিত্রী মানবমাতার ভূমিক... ... দিয়াছে, আর 'সমুদ্রের প্রতি'[১] কবিতায় বসুন্ধরা আদিজননী সিন্ধুর দুহিতা রূপে উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে। এই কবিতার দীর্ঘায়ত ছন্দে যেন তটাহত সমুদ্রকল্লোলের আমন্দ্রমন্থরধ্বনি তরঙ্গিত হইয়াছে। কবিও নিজের হৃদয়ের অন্তলে যেন আসন্ন-সৃজনপীড়িত সিন্ধুর অব্যক্ত প্রকাশবেদনা অনুভব করিতেছেন 'ঝুলন'-দোলার অবসানে।

> আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে,
> তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর তরে
> উঠিছে মর্ম্মর স্বর। মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
> যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে
> আপনি সে নাহি জানে শুধু অর্দ্ধ-অনুভব তারি
> ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি'
> আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা-আশা
> প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।

'ভরা ভাদরে'[২] মানসীর 'বর্ষার দিনে'-র সঙ্গে তুলনীয়। 'প্রত্যাখ্যান'-এ ও 'লজ্জা'-য় কবিচিত্তের নায়িকাভাব লক্ষণীয়। নারীর রূপকে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল।

'পুরস্কার'-এ কবির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন; কবির কথায় রবীন্দ্রনাথেরই কাব্যসাধনার মর্ম্মকথা ব্যক্ত হইয়াছে। প্রাণমন দিয়া রবীন্দ্রনাথ ভালবাসিয়াছেন পৃথিবীকে,

> বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
> বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,
> লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা
> সুন্দর ধরাতল'!

১ প্রথমপ্রকাশ সাধনা ১৩০০ বৈশাখ। ২ ঐ ভাদ্র।

রবীন্দ্রকাব্যসাধনাও সার্থকতালাভ করিয়াছে এই আকৃতিতে,

ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্যছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙীন করিয়া দিব।...
না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর ;
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর !

জীবনরস পরিপূর্ণভাবে পান করিবার, সর্ব্ববিধ জীবলীলা উপলব্ধি করিবার ব্যাকুলতা ধ্বনিত হইয়াছে 'বসুন্ধরা'-য়। মানুষের নানা সমাজে বিভিন্ন অবস্থায় বিচিত্র জীবনের, এমন কি যে জীবন ব্যক্তাব্যক্তভাবে পশু-পক্ষী বৃক্ষ-তৃণ পাষাণ-মৃত্তিকার মধ্যে স্পন্দমান, সেই অতীত জীবনসত্তার বিচিত্র অনুভূতি কবিকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। এইখানে কবিচেতনা যেন স্পষ্টভাবে বিশ্ব-জগতের সহিত অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। বসুন্ধরা কবিতায় এই সর্ব্বভূতে কাব্যময়-ব্রহ্মানুভূতির প্রকাশ হইয়াছে। সর্ব্বোপরি প্রকটিত হইয়াছে পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা।

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল,...

তাই আজি
কোন দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব্ব অঙ্গে সর্ব্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি'
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর ;...
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্ব্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লব নিলয়ে,
আকাশের নীলিমায় !

অনাদিকাল হইতে জীবস্রোত যে বসুন্ধরার "মৃত্তিকাসনে মিশায়েছে অন্তরেব প্রেম", তাহা কবিহৃদয় আপনাব প্রেমে রঙাইয়া নূতন অলঙ্কাবে সাজাইয়া দিবে, এবং এই প্রেমসত্তা মানবের ভবিষ্যৎ জীবনলীলায় একটুখানি অতিরিক্ত আনন্দের যোগান দিবে,—ইহাই কবির অন্তরেব কামনা।

আজ শতবর্ষ পবে
এ সুন্দর অরণ্যেব পল্লবের স্বরে
কাঁপিবে না আমার পরাণ ? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধরে'
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি ?

'মায়াবাদ,' 'খেলা,' 'বন্ধন,' 'গতি,' 'মুক্তি,' 'অক্ষমা,' 'দরিদ্রা' ও 'আত্মসমর্পণ' —এই আটটি সনেটে রূপরসগন্ধস্পর্শধ্বনির পৃথিবীর প্রতি কবির আকর্ষণ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

মানব-আত্মার গর্ব্ব আর নাহি মোর,
চেয়ে তোর স্নিগ্ধ শ্যাম মাতৃমুখ পানে,

ভালবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর !
জন্মেছি যে মর্ত্য-কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে !

সোনার-তরীর শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-য়[১] মানসসুন্দরী কবির জীবন-তরণীর কাণ্ডারী রূপে দেখা দিয়াছে। তাহার হাসিটুকুতে আশা রাখিয়া এবং মৌন ইঙ্গিতে নির্ভর করিয়া কবিচিত্ত সোনার তরীতে পাড়ি জমাইয়াছে। শুধু আশঙ্কা এই,

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।

৩

'চিত্রা' (ফাল্গুন ১৩০২)[২] কাব্যে সোনার-তরীর রূপক একটি বিশিষ্ট রূপ লইয়াছে। কবি-মানসসুন্দরী জীবনদেবতারূপে প্রেয়সী রাজ্ঞীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার জীবনের নিগূঢ় প্রেরণা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন এবং তাঁহার সকল সফলতাবিফলতার পূজোপহার গ্রহণ করিতেছেন। কবি তাঁহার ভক্তিমাত্র নয় জীবনও অন্তর্যামিনীর দাস্যে নিয়োগ করিয়াছেন।

রচনাকাল হিসাবে চিত্রার প্রথম কবিতা 'সুখ'। ইহা সোনার-তরীর সময়ে রচিত ও প্রকাশিত।[৩] এই কবিতায় চিত্রা কাব্যের প্রথম স্তরের কবিতাগুলির বিশিষ্ট সুর—অন্তরের প্রশান্তি ও প্রকৃতির সরল সৌন্দর্যে নিরাবিল সুখানুভূতি—ধ্বনিত হইয়াছে। 'জ্যোৎস্নারাত্রে'[৪] কবিতায় প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্য্যানুভূতির

[১] ৮ পৌষ ১৩০০। [২] একমাস পূর্বে (২২ মাঘ ১৩০২) বালকপাঠ্য ক্ষুদ্র কাব্য 'নদী' প্রকাশিত হইয়াছিল বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ-উপহার রূপে। ইহা পরে শিশু কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। [৩] রচনাকাল ১৩ চৈত্র ১২৯৯, প্রথমপ্রকাশ সাধনা আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০০। [৪] প্রথমপ্রকাশ সাধনা জ্যৈষ্ঠ ১৩০২, রচনাকাল মাঘ ১৩০০। প্রথম আট ছত্র সাধনায় প্রকাশিত হয় নাই।

পিছনে যে গভীরতর রসসৌন্দর্য্য লুক্কায়িত আছে তাহারই উপলব্ধি ব্যক্ত হইয়াছে। মানসীর ‘মেঘদূত’-এ যে বিরহিণীর জন্য ঈপ্সা, চিত্রার ‘জ্যোৎস্নারাত্রে’ বাসকসজ্জা-রূপিণী সেই সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীরই বন্দনা।

নন্দনবনের মাঝে
নির্জন মন্দিরখানি,—সেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা, রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা ;
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা !

জীবনদেবতার প্রেমমহিমা কবিহৃদয়কে অপরিসীম গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে—ইহাই ‘প্রেমের অভিষেক’[১] কবিতার মর্ম্মকথা। ‘জ্যোৎস্নারাত্রে’ সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর সমীপে কবিহৃদয় মালা লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এখন কবিহৃদয় পাইল প্রেমাভিষেক ও তাঁহার সিংহাসনে স্থান। দিনে বাহিরে সে দরিদ্র তরুণ কেরাণী তাহার অবহেলা-লাঞ্ছনার পরিসীমা নাই, কিন্তু সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিলে সে রাজা প্রিয়ার প্রেমরাজ্যে।

আমার নন্দনভূমি
একান্ত আমার ! দুর্লভ পরশখানি
দুর্ম্মূল্য দুকূল, সর্ব্বাঙ্গে দিয়েছি টানি'
সগৌরবে, আলিঙ্গন কুঙ্কুম চন্দন
সুগন্ধ করেছে বক্ষ ;—অমৃত চুম্বন
অধরে রয়েছে লাগি ;—স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে
সুধাস্নাত দেহ ![২]

[১] প্রথমপ্রকাশ ফাল্গুন ১৩০০ ; চিত্রায় অর্দ্ধাংশের বেশি পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং নায়ককে বাদ দিয়া কবিতাটির বাস্তবতা হ্রাস করা হইয়াছে। [২] সাধনা পৃ ৩৪৮ ; চিত্রায় এই অংশটুকু এইভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, "নিত্য মোরে আছে ঢাকি...পূর্ণ করি"।

আধুনিক রাজধানী,
আমি তারি আধুনিক ছেলে, ঘরে আনি
চাকুরীর কড়ি, ফিরে আসি দিনশেষে
কর্ম্ম হতে ; জন্মিয়াছি যে কালে যে দেশে
না হেরি মাহাত্ম্য কিছু, কোন কীর্ত্তি নাই,
তবু খ্যাতিহীন আমি কত সঙ্গী পাই
কত গৌরবের ![1]

চিরন্তন রোমান্সের রাজ্যে তাহার প্রবেশ অবাধ, যেখানে "দময়ন্তী সতী বিচরে নলের সনে," "পুরুরবা ফিরে অহরহ বনে বনে"। নির্জন নিশার সমস্ত সৌন্দর্য্যসম্ভার তাহাদের দুইজনের জন্যই উপচিত।

হের সখি গৃহছাদে
জ্যোৎস্নার বিকাশ ! এত জ্যোৎস্না এত সাধে
আর কোথা আছে ! প্রভুত্বের সিংহাসন
রুদ্ধদ্বার অন্ধকারে করিছে যাপন
কর্ম্মশালে কর্ম্মহীন নিশি ! এ কৌমুদী
আমাদের দুজনের ![2]

সোনার-তরীর 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় বসুন্ধরায় স্নেহাশঙ্কিনী বাংসল্য মূর্ত্তি দেখিয়াছি, চিত্রার 'সন্ধ্যা'[3] কবিতায় সন্ধ্যার ম্লানায়মান পটে তাঁহারি বিষাদ-ভারাক্রান্ত উদাসী হৃদয়ের বেদনা গাঢ়তর হইয়াছে।

গৃহকার্য্য হল সমাপন—
কে এই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায় !

[1] সাধনা পৃ ৩৫১। [2] ঐ পৃ ৩২৩। [3] প্রথমপ্রকাশ সাধনা মাঘ ১৩০১।

অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা; দিবসের কর্ম্ম অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
দিনান্তের পানে ;

জীবধাত্রী জননীর অন্তর্গূঢ় ব্যথা কবি হৃদয়কে কল্পনাবিলাসের আলস্যশয্যা হইতে কর্ম্মচঞ্চল জীবনসংগ্রামে ডাক দিল। 'এবার ফিরাও মোরে'[১] কবিতায় এই আহ্বানের প্রস্তুতি। স্বধর্ম্মে থাকিয়া স্বকর্ম্মের দ্বারাই কবি এই আহ্বানে সাড়া দিবেন।

যে দিন জগতে চলে আসি
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে এনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা !—সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্ম্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্ত্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি.—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।

'স্নেহস্মৃতি,' 'নববর্ষে', 'দুঃসময়' ও 'ব্যাঘাত'[২]—এই চারিটি কবিতা এবং 'বিকাশ,' 'বিস্ময়,' 'বন্দনা,' 'মনের কথা,' 'আত্মোৎসর্গ,' 'অতিথি', 'নব-জীবন,' 'মানস বসন্ত' এবং 'টঙ্গ'—এই নয়টি গান চিত্রার প্রথম সংস্করণে ছিল না;

[১] প্রথমপ্রকাশ চৈত্র ১৩০০। [২] কবিতাগুলির রচনাকাল যথাক্রমে বর্ষশেষ ১৩০০, নববর্ষ ১৩০১, ৫ বৈশাখ ১৩০১ ও ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১।

ঐগুলি শুধু কাব্য-গ্রন্থাবলীতে (১৩০৩) সংযুক্ত হইয়াছিল। 'স্নেহস্মৃতি'-র প্রথম তিন স্তবক 'শিশু'-তে স্থান পাইয়াছে। পুরানো [illegible] স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে এই কবিতায়। এই স্মৃতি কবিচিত্তে যে বেদনা নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিল তাহারি বিষাদভার অপর তিনটি কবিতাকে ভারাক্রান্ত করিয়া[illegible]। 'মৃত্যুর পরে'[1] কবিতায় এই বেদনা কবিচিত্তে মরণরহস্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। জীবনই শেষ নহে, জীবনের অকৃতার্থতা ও অসমাপ্তিও চরম নহে; মরণের মধ্য দিয়া মানবাত্মা জন্মান্তরের পথে পরম সার্থকতার দিকে আগাইয়া চলে—ইহাই কবিতাটির মর্ম্মকথা।

জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি।
হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময়
অনিত্য চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব্ব নূতনরূপে
হয় সে সফল।

'অন্তর্যামী' মানসসুন্দরী ও জীবনদেবতার মধ্যবর্ত্তী রূপ। কবিজীবনে যিনি সৌন্দর্য্যের প্রেরণা জাগাইয়া দিয়া ঈপ্সিতের আসন গ্রহণ করিয়াছেন তিনি মানসসুন্দরী। কবিজীবনের মধ্য দিয়া যিনি নিজেকেই পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছেন তিনি জীবনদেবতা। আর যিনি কবির মননের ও করণের মধ্য দিয়া নিজেকেই প্রকাশ করিতেছেন তিনি অন্তর্যামী। মানসসুন্দরী কবিজীবনের কর্ণধার হইয়াছেন সোনার-তরীর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-য়। 'অন্তর্যামী'-তে তিনি কবির অন্তরবাহির অধিকার করিয়া বসিয়াছেন; কবিহৃদয় যন্ত্রের মত তাঁহারি বিচিত্র লীলাচাপল্যের অনুরণন করিতেছে।

[1] রচনাকাল ৫ বৈশাখ ১৩০১, প্রথমপ্রকাশ সাধনা জ্যৈষ্ঠ ১৩০১।

অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

অন্তর্যামী লীলাদুর্ললিত। আনন্দের প্রশান্ত রাগ শুধু নয় ব্যথার চঞ্চল রাগিণীও তাঁহার সমান প্রিয়। আনন্দ ও বেদনা, হাসি ও কান্না, উভয় ছন্দেই তাঁহার বিলাস। 'চিত্রা' কবিতায় তাঁহার আনন্দরসঘন মূর্তিটিই প্রতিফলিত হইয়াছে।

ধীর গম্ভীর গভীর মৌন-মহিমা,
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ন-নীলিমা,
স্থির হাসিখানি উষালোক সম আসীনা
অয়ি প্রশান্ত-হাসিনী!
অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

কবিতাটিতে জগতের বিচিত্রসৌন্দর্য্যকে যেন অন্তরের ধ্যানলোকে দেবীমূর্ত্তি রূপে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। 'সাধনা'-য়[১] কবি অন্তর্যামীর সমীপে তাঁহার কৃতাকৃত ঈপ্সিতানীপ্সিত সমস্ত নিবেদন করিয়া দিতেছেন।

দেবি, এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি অনেক গান,
পেয়েছি অনেক ফল;
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,
ভরেছি ধরণীতল।
যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
দিতেছি চরণে আসি—
অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনারাশি।

১ প্রথমপ্রকাশ সাধনা অগ্রহায়ণ ১৩০১।

'শেষ উপহার'-এ হৃদয়-অর্ঘ্য উজাড় করিয়া দিয়া কবি অন্তর্যামীর বরমাল্যখানি প্রার্থনা করিতেছেন।

'সাধনা'-র চারি মাস পরে লেখা হইল 'ব্রাহ্মণ'।[১] প্রাচীন ভারতের মহৎ ও উদার আদর্শের দিকে কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। অতঃপর দুইটি কবিতায়—'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি'—অবজ্ঞাত অনাদৃত ও নির্যাতিত মানুষের কোমলকরুণ অন্তঃকরণ সরল কাব্যসৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইল। 'শীতে ও বসন্তে'-র প্রথমার্দ্ধ সরস দ্বিতীয়ার্দ্ধ গম্ভীর—উভয় মিলিয়া বেশ উপভোগ্য।

মানসীর 'দুরন্ত আশা'-য় বাঙ্গালী-জীবনের নীচতা-সঙ্কীর্ণতার প্রতি ধিক্কার বাজিয়া উঠিয়াছে দৃপ্ত ভাষায়, আর চিত্রার 'নগর সঙ্গীত'-এ[২] নগরজীবনের অকারণ ব্যস্ত আবিলতা এবং জননেতৃত্বের কঠিন স্বার্থপরতা ফুটিয়াছে সংযত ও উজ্জ্বলভাবে। কবিতাটির আরম্ভে প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্য্যের অপস্রিয়মান যবনিকা।

কোথা গেল সেই মহান্ শান্ত
নব নির্ম্মল শ্যামল কান্ত
উজ্জ্বলনীল বসন প্রান্ত
সুন্দর শুভ ধরণী।

তাহার পরেই দেখা দিল কোলাহলকুৎসিত নগরের অন্ধবৎ মৃত্যুমুখে ধাবমান জনসংঘট্ট,

করুণ রোদন, কঠিন হাস্য,
প্রভূত দম্ভ, বিনীত দাস্য,
ব্যাকুল প্রয়াস, নিঠুর ভাষ্য
চলিছে কাতারে কাতারে।

১ রচনাকাল ৭ ফাল্গুন ১৩০১; প্রথমপ্রকাশ সাধনা ফাল্গুন ১৩০১। ২ প্রথমপ্রকাশ সাধনা ১৩০২ আশ্বিন-কার্ত্তিক।

এই জনযজ্ঞের হোতার হৃদয়ে ক্ষণিক শক্তিমদমত্ততা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে,

আমি নির্ম্মম, আমি নৃশংস,
সবেতে বসাব নিজের অংশ,
পরমুখ হতে করিয়া ভ্রংশ
তুলিব আপন কবলে।...
তবে দাও ঢালি—কেবল মাত্র
দু চারি দিবস, দু চারি রাত্র,
পূর্ণ করিয়া জীবনপাত্র
জন-সংঘাত মদিরা।

'পূর্ণিমা'-য় কবিহৃদয় আবার প্রকৃতির শান্তসৌন্দর্য্যে স্নান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। 'আবেদন'-এ[১] যেন 'প্রেমের অভিষেক'-এর অনুবৃত্তি হইয়াছে। তাহার পরদিন লেখা হইল 'উর্ব্বশী', কমনীয় পরিপূর্ণ নারীসৌন্দর্য্যের মহিম্নস্তোত্র।

চিরন্তন-নারীর দুই রূপ—প্রেয়সী ও শ্রেয়সী, অর্থাৎ মোহিনী ও গেহিনী। প্রেয়সী বা মোহিনী দেবীর পরিপূর্ণতার অপ্রত্যক্ষ প্রতীক উর্ব্বশী,—সৃষ্টির আদি যুগ হইতে যাহার তীব্ররূপে পুরুষের বাসনাবারিধি উদ্বেল হইয়া আসিয়াছে, যে অনাদি অতৃপ্তি মানবের সৌন্দর্য্যপিপাসার মধ্যে সর্ব্বদা জাগিয়া থাকে। মানব-হৃদয়ের নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য্যপিপাসার এই অব্যক্ত ব্যাকুলতা 'উর্ব্বশী' কবিতায় পৌরাণিককল্পনার সমগ্র ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব রসশ্রী লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশী সৌন্দর্য্যের বিশুদ্ধ আদর্শ মাত্র নয়, সে আরও কিছু। মানবহৃদয়ের চিরন্তন কামনা যে সৌন্দর্য্যময়ীকে তিলে তিলে গঠন করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশী সেই তিলোত্তমা সৌন্দর্য্যকামনার প্রতিমা।[২]

বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।

১ রচনাকাল ২২ অগ্রহায়ণ ১৩০২। ২ উর্ব্বশী শব্দের মৌলিক অর্থও কতকটা অনুরূপ,—"উরু-বশী," অর্থাৎ বহুলোক যাহাকে বাসনা করে অথবা যাহার বাসনা অসীম।

পৌরাণিক দেবলোকের অন্তর্ধানের সঙ্গে উর্ব্বশীও অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন সে আর কোনো পুরূরবার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়া পলাইবে না। তবুও বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যসমারোহের মাঝখানে সেই অধরা সৌন্দর্য্যপিপাসা জাগিয়া উঠে মূঢভাবে। সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির মধ্যে যে অতৃপ্তি জাগিয়া থাকে তাহাই উর্ব্বশীর স্মৃতি-বেদনা।

তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি,
ঝরে অশ্রুরাশি।

'উর্ব্বশী' লিখিবার পরদিন রচিত হইল 'স্বর্গ হইতে বিদায়,' উর্ব্বশীর বিপরীত চিত্র। যে চিরন্তন প্রেয়সী বা গেহিনী নারী আশা দিয়া ভাষা দিয়া নিজের অন্তরের বেদনা মথিত করিয়া তাহার সবটুকু অমৃত যোগাইয়া পৃথিবীর বক্ষে মানবজীবনকে পালন করিয়া আসিতেছেন সেই প্রত্যক্ষ কল্যাণী মানবীর বন্দনা গীত হইয়াছে এই কবিতায়। উর্ব্বশী স্বর্গের অপ্সরা, তাহার জীবন ভোগের উৎসব মাত্র, তাহাতে হৃদয়ের সুখদুঃখের ছায়াপাত হয় না। এই হৃদয়হীন সৌন্দর্য্য-প্রতিমা মানবের লালসা জাগায়, ভোগের প্রতিশ্রুতি দেয়, প্রেম জাগাইতে পারে না—যে প্রেম ভীরু ও করুণ। সেই প্রেমসুধা মানবীহৃদয়েই সঞ্চিত আছে গুপ্তভাবে।

ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোন এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে।

বাসনার স্পর্শমাত্রবিরহিত মহিমময় নারীসৌন্দর্য্যের অনবদ্য প্রতিমা 'বিজয়িনী'।[১] মনে হয়, বাণভট্টের মানসী মহাশ্বেতাকে স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিজয়িনীকে আঁকিয়াছেন। অচ্ছোদ-সরোবরে স্নান করিয়া সোপান বাহিয়া তীরে উঠিয়া সুন্দরী দাঁড়াইয়াছেন,

ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মত রহিল পড়িয়া ;
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া।

নির্জনসুন্দর পরিবেশের মধ্যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের এই নিরাবরণ মহিমার সম্মুখে কামনা-বাসনা জাগিতে পারে না। তাই

সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি পরে
জানু পাতি বসি, নির্ব্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

আরাধ্য জীবনদেবতা বিচিত্র অনুভূতি-উপলব্ধির মধ্য দিয়া কবিকে পরিপূর্ণতার দিকে আগাইয়া লইয়া যাইতেছেন। অন্তর্যামীতে তিনি প্রভু, 'জীবনদেবতা'-য় তিনি স্বয়ংবরা,—উপনিষদের "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ ;"

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে।

[১] রচনাকাল ১ মাঘ ১৩০২।

জীবনে পরিপূর্ণতার আদর্শ সব সময়ে উপলব্ধি করিতে না পারায় কবিহৃদয়ে অনুতাপের উচ্ছ্বাস উদ্বেল হইয়াছে।

যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার,
হে কবি তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি।[১]

তোমার কাননে সেবিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি।[২]

নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

এই প্রার্থনায় উত্তর মিলিল চিত্রার শেষ কবিতায় 'সিন্ধু পারে'।[৩] অজানা রমণীর ছদ্মবেশে জীবনদেবতা কবি-আত্মাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া মরণ-অভিসারের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া নবজীবনলোকে আত্মপ্রকাশ করিলেন জীবনস্বামী রূপে।

সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি, সেই সুধাভরা আঁখি,—
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।
খেলা করিয়াছে চিরদিন মোর সব সুখে সব দুখে,
এ অজানা পুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে।

কবিতাটিতে যেন রূপকের স্ফটিকপাত্রে রূপকথার রোমান্স-রস উছলিয়া পড়িতেছে।

[১] তুলনীয় 'অন্তর্যামী'। [২] তুলনীয় 'আবেদন'। [৩] রচনাকাল ২০ ফাল্গুন ১৩০২।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জীবন্মুক্তি

১

চিত্রার অব্যবহিত পরে স্বল্পসময়ের মধ্যে 'চৈতালি'-র[১] কবিতাগুলি লেখা হয়। চৈতালির চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ একটু বাঁক ফিরিয়াছে। জীবনরসের নিটোল অনুভূতি কবিকে মুক্তি দিয়াছে আবেগাবিলতা ও কর্মচাঞ্চল্যস্পৃহা হইতে। জীবনের সহজ আনন্দ ও প্রকৃতির সরল সৌন্দর্য্য কবিচিত্তে এই রসপরিপূর্ণতা জাগাইয়াছে। চৈতালিব প্রথমরচিত কবিতায়[২] প্রকৃতির প্রসাদলব্ধ আনন্দমুক্তির কৃতার্থতা প্রকাশিত দেখি।

> ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো
> ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো।

জগৎকে ভালোবাসার এই আনন্দানুভূতিতে ক্ষণিকতার বেদনা দুর্লভতাব মোহ-রঙ লাগাইয়াছে। জীবনের ও জগতের ক্ষণভঙ্গপ্রবাহে দুঃখসুখ হইয়াছে সমানভাবে স্পৃহণীয়।

> সবি বলে, যাই যাই, নিমেষে নিমেষে,
> ক্ষণকাল দেখি বলে দেখি ভালোবেসে।[৩]

এই অস্থিরপ্রবাহ যে স্থিরপারাবারে মিশিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতেছে সেই সত্যশিবসুন্দরের প্রতীক্ষায় কবিচিত্ত চঞ্চল, উদ্বেলব্যাকুল।

> শুধু মনে হয় চিরজীবনের সুখ
> এখনি দিবেক দেখা লয়ে হাসিমুখ।
> কত স্পর্শ কত গন্ধ কত শব্দ গান,
> কাছ দিয়ে চ'লে যায় শিহরিয়া প্রাণ।

১ কাব্য-গ্রন্থাবলীতে (আশ্বিন ১৩০৩) প্রথম প্রকাশিত। কবিতাগুলি ১১ই চৈত্র ১৩০২ হইতে ১৫ই শ্রাবণ ১৩০৩ মধ্যে রচিত। ২ 'প্রভাত'। ৩ 'ধরাতল'।

দৈবযোগে ঝলি উঠে বিদ্যুতের আলো,
যারেই দেখিতে পাই তারে বাসি ভালো ;[১]

এখনি বেদনাভরে ফাটি গিয়া প্রাণ
উচ্ছ্বসি উঠিবে যেন সেই মহাগান !
অবশেষে বুক ফেটে শুধু ব'লে আসি—
হে চিরসুন্দর, আমি তোরে ভালোবাসি।[২]

এই আনন্দানুভূতি মুক্তি দিল রূপক-রোমান্সের জটিল অভিসার হইতে। কাব্যসাধনাও ছন্দ-অলঙ্কারের বাঁকা পথ ছাড়িয়া নির্ভূষণতার সরল পথ ধরিল। কবিচিত্ত এখন উপলব্ধি করিল, জীবনদেবতাকে বাহিরে খুঁজিয়া বেড়ানো নিরর্থক কেন না তিনিই তো চিরকাল কবিচিত্তপদ্মে অধিষ্ঠান করিয়া কাব্য-প্রেরণা দিয়া আসিতেছেন।

হে প্রেয়সী, হে শ্রেয়সী, হে বীণাবাদিনী,
আজি মোর চিত্তপদ্মে বসি একাকিনী
ঢালিতেছ স্বর্গসুধা ,[৩]

তোমার মহিমাজ্যোতি তব মূর্ত্তি হ'তে
আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।···
তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।[৪]

গাঢ় প্রশান্তির মাঝখানে ধীরে ধীরে কবিচিত্তে প্রাচীন ভারতের সৌম্যশান্ত আদর্শ প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ইহার পরিচয় পাই চৈতালির অনেকগুলি কবিতায়।[৫] কালিদাসের কাব্যে কবি নূতন সৌন্দর্য্য ও সান্ত্বনা লাভ করিলেন।[৬] আশে পাশে জীবজগতের লীলা এবং জড়প্রকৃতির নীরব মহত্ত্ব ও গভীর সৌন্দর্য্য

[১] 'প্রেম'। [২] 'শেষ কথা'। [৩] 'প্রেয়সী'। [৪] 'প্রিয়া'। [৫] 'বনে ও রাজ্যে,' 'সভ্যতার প্রতি,' 'বন,' 'তপোবন,' ও 'প্রাচীন'। [৬] 'ঋতুসংহার,' 'মেঘদূত,' 'কালিদাসের প্রতি,' 'কুমারসম্ভব গান,' 'মানস লোক,' ও 'কাব্য'।

কবিচিত্তকে সমানভাবে টানিতেছিল।[১] রোমান্টিক কবিকল্পনা এখন দেশকালের সীমানা ছাড়াইয়া অনাদ্যন্ত জীবনপ্রবাহের বিচিত্র ধারার অনুসরণে উৎসুক। যেমন 'অনন্ত পথে' কবিতায়,—নৌকার জানালা হইতে নদীতীরে কর্ম্মরত একটি ছোট মেয়েকে দেখিয়া অলস কবিকল্পনা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনসূত্রের জাল বুনিয়া চলিল,

আজি আমি তরী খুলি যাব দেশান্তরে;
বালিকাও যাবে কবে কর্ম্ম-অবসানে
আপন স্বদেশে; ও আমারে নাহি জানে,
আমিও জানিনে ওরে; দেখিবারে চাহি
কোথা ওর হবে শেষ জীবসূত্র বাহি'।
কোন্ অজানিত গ্রামে কোন্ দূর দেশে
কার ঘরে বধূ হবে, মাতা হবে শেষে,
তার পরে সব শেষ,—তারো পরে, হায়,
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায়।

রোমান্টিক-রসদৃষ্টিমাধুর্য্যের উৎস হইতেছে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে নির্লিপ্ততা। দেশ-কালের দূরত্ব-রূপ দূরবীনে নিতান্ত তুচ্ছ বস্তুও রোমান্সের রঙীন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়। 'সামান্য লোক' কবিতায় তাই কবি বলিয়াছেন,

আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।

রবীন্দ্রনাথের গভীরতর রসদৃষ্টিতে এমন একটি স্বাভাবিক নিঃসঙ্গতার ও নির্লিপ্ততার আবরণ ছিল যাহাতে নিকটবর্ত্তী ও সমসাময়িক বিষয় ও বস্তু স্বতই কবির রোমান্টিক দৃষ্টির লক্ষ্যকেন্দ্রে অবস্থান করিত। এইজন্য শুধু কালিদাসের কল্পলোকের স্রোতোবহা মালিনী নয় সমসাময়িক বাস্তব ইচ্ছামতী নদীও তাঁহার

[১] 'কর্ম্ম,' 'দিদি,' 'পরিচয়,' 'পুঁটু' 'হৃদয়ধর্ম্ম,' 'দুই বন্ধু,' 'সঙ্গী,' 'সতী,' 'স্নেহদৃশ্য,' 'করুণা' ও 'ভক্তের প্রতি'।

কাব্যলক্ষ্মীর অর্ঘ্য আহরণ করিয়াছে। 'পুঁটু' ও 'হৃদয়-ধর্ম্ম' কবিতা দুইটিতে এই রোমান্‌স-রসদৃষ্টির পূর্ণ প্রকাশ।

দুইচারিটি কবিতায় উপদেশাত্মকতা প্রকট।[১] "কণিকা" বা epigram-জাতীয় কবিতা আছে দুইটি।[২] নারী ও প্রেম ঘটিত কবিতাগুলি কল্পনা-রসসমৃদ্ধ, এবং রূপকের আবরণে আবৃত হইলেও একেবারে নৈর্ব্যক্তিক নয়।

২

চৈতালিতে কবিদৃষ্টির প্রধানত দুই কোণ দেখা গিয়াছিল, তির্য্যক অর্থাৎ তাত্ত্বিক আর সরল অর্থাৎ রোমান্টিক। তাত্ত্বিক দৃষ্টির প্রকাশ 'কণিকা'-র[৩] কবিতাকণায়, 'কথা'-র[৪] মহৎ-চিত্রাবলীতে এবং 'কাহিনী'-র[৫] নাট্যকবিতাগুলিতে। কথার চব্বিশটি কবিতার মধ্যে চারিটি রচিত হইয়াছিল ১৩০৪ সালের কার্ত্তিক মাসে এবং বাকি বিশটি ১৩০৬ সালের আশ্বিন-কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে। কাহিনীর সাতটি কবিতার মধ্যে দুইটি হইতেছে সাধারণ, পাঁচটি নাট্যকবিতা। শেষ কবিতাটি গ্রন্থপ্রকাশের অব্যবহিতপূর্ব্বে রচিত। অপরগুলি ১৩০৪ সালের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে লেখা।

কথার ও কাহিনীর কবিতায় পাই ত্যাগের উচ্চ আদর্শের জয়গান। এই ত্যাগ মনুষ্যধর্ম্মের জয়ঘোষণা করিয়াছে সমাজধর্ম্মের ও স্বভাবধর্ম্মের উপর। কবিতাগুলির বিষয়বস্তু জোগাইয়াছে প্রাচীন পুরাণকাহিনী অথবা প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা এবং কিংবদন্তী। 'গান্ধারীর আবেদন,' 'সতী,' 'নরকবাস' ও 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' এই নাট্যকবিতাগুলিতে লিরিক ও নাটকীয় গুণের দুর্লভ সমাবেশ ঘটিয়াছে। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর রচনা। কবিতাটির বিষয় সরস, ভাষা সরল, ছন্দ লঘু।

[১] 'দেবতার বিদায়,' 'পুণ্যের হিসাব,' 'বৈরাগ্য,' 'পর-বেশ,' 'সমাপ্তি,' 'বর্ষশেষ,' 'সভ্যতার প্রতি,' 'স্বার্থ'। [২] 'দুই উপমা,' 'তত্ত্বজ্ঞানহীন'। [৩] মুদ্রণ ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩০৬। [৪] ঐ ১লা মাঘ ১৩০৬। [৫] ঐ ২৪শে ফাল্গুন ১৩০৬।

চৈতালিতে কবিদৃষ্টি প্রাচীনভারতের মহিমমধুর স্বপ্নবিজড়িত। 'কল্পনা'[১] কাব্যের অনেকগুলি কবিতায় এই রোমান্টিক দৃষ্টিতে অধিকন্তু প্রেমের ঘোর লাগিয়াছে। কল্পনার অধিকাংশ কবিতা ও গান লেখা হইয়াছিল ১৩০৪ সালের প্রথমার্দ্ধে, অল্প কয়েকটি ১৩০৫-১৩০৬ সালে।

কল্পনার অধিকাংশ কবিতা বর্ণসুষম চিত্রধর্ম্মী। ছন্দের ধীরগম্ভীর স্পন্দন এই বাণীচিত্রকলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কল্পনার প্রথম কবিতা "দুঃসময়"-এ এই শব্দমুখর বর্ণাঢ্যতা প্রকট হইয়াছে বিষয়বস্তুর ক্ষীণতা ছাপাইয়া।

> এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্ব্বরী,
> ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে ;
> বিশ্ব-জগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি
> স্তব্ধ-আসনে প্রহর গণিছে বিরলে ,
> সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি
> দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা ;
> ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
> এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা।

'বর্ষামঙ্গল'-এ জলোচ্ছ্বাসের মন্দ্রধ্বনি তরঙ্গিত হইয়াছে ছন্দের চৌতালে। 'মদনভস্মের পূর্ব্বে' এবং 'মদনভস্মের পর' কবিতা দুইটিতে জয়দেবের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" পদের ছন্দ অনুকৃত হইয়াছে অপূর্ব্বভাবে। 'পসারিণী'-র[২] প্রেরণা আসিয়াছিল বৈষ্ণব গীতিকাব্য হইতে। 'ভ্রষ্ট লগ্ন'-এ[৩] সোনার-তরীর 'প্রত্যাখ্যান' কবিতার রূপক দেখা দিয়াছে। 'প্রণয় প্রশ্ন'-এ[৪] ক্ষণিকার পূর্ব্বাভাস পাই।

কয়েকটি কবিতায় ও গানে দেশভক্তির ও দেশসেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হইয়াছে। 'বঙ্গলক্ষ্মীতে'[৫] কবিহৃদয়ের দুঃখক্ষোভ যেন মাতৃমূর্ত্তির

[১] মুদ্রণ ২৩শে বৈশাখ ১৩০৭। [২] প্রথমপ্রকাশ• ভারতী কার্ত্তিক ১৩০৬। [৩] প্রদীপ ১৩০৬ আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত ; রচনাকাল ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪। [৪] পুণ্য ১৩০৬ আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত ; রচনাকাল ১০ই আশ্বিন ১৩০৪। [৫] প্রদীপ ১৩০৫ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

কল্যাণসৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতে শান্ত অশ্রুধারায় বিগলিত হইয়াছে। দেশের ও সমাজের যাঁহারা নেতা তাঁহাদের সম্মানহীন আচরণে কবিহৃদয়ের তীব্র ক্ষোভের ব্যঞ্জনা পাই 'উন্নতি লক্ষণ'-এ।[1]

কল্পনার শেষ অংশের কয়েকটি কবিতায় রোমান্টিক রসতন্ময়তার ঊর্দ্ধে গভীরতর অনুভূতির প্রকাশ দেখি। চৈতালির প্রশান্ত পরিবেশের অবসানে মুক্তির যে শান্তরস কবিহৃদয়কে আপ্লুত করিয়াছিল তাহা দূর হইয়া গেল জীবনের নূতনতর সাধনার রুদ্র আহ্বানে। 'অশেষ'[2] কবিতায় সেই আহ্বানের সাড়া। এ সাধনা নবনিযুক্ত ভৃত্যের শ্রমদুর্ভর কর্ম্মচাঞ্চল্য নয়, ইহা বিশ্বস্ত সেবকের লীলাসাহচর্য্য।

সেবক আমার মত রয়েছে সহস্র শত
তোমার দুয়ারে।
তাহারা পেয়েছে ছুটি, ঘুমায় সকলে জুটি
পথের দুধারে।
শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাইনে দেবী,
ডাক ক্ষণে ক্ষণে ;
বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি প্রাণপণে।

'বর্ষশেষ'-এ[3] কালবৈশাখীর উন্মাদনৃত্যে কবিহৃদয় সর্ব্ববিধ জড়তা ও সংস্কার হইতে মুক্তির দুর্জয় আহ্বান স্বীকার করিয়াছে।

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

ভুবনডাঙ্গার দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের শুষ্কশষ্প রক্তকঙ্করময় বক্ষে বৈশাখ-মধ্যাহ্নের দীপ্ত দাহ উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে বিষাণপাণি রুদ্র-মূর্ত্তিতে 'বৈশাখ' কবিতায়।

[1] প্রথমপ্রকাশ ভারতী অগ্রহায়ণ ১৩০৬। [2] প্রথমপ্রকাশ ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬। [3] "১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত।"

ভাষার ও ভাবের সৌষম্যে, শব্দচিত্রের মুখরতায় এবং ছন্দের বৈচিত্র্যে কবিতাটি কল্পনার শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম।[১]

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,
পদ্মাসনে বস আসি রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে,
শুষ্কজল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষ্ণাদীর্ণ মাঠে
উদাসী প্রবাসী
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী।

রৌদ্রালোকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রবল আকর্ষণ ছিল। এই কবিতায় কবির রৌদ্রপ্রীতিরসের প্রথম কবিত্বপূর্ণ প্রকাশ দেখিলাম। অনেককাল পরে লেখা "যৌবন বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি" কবিতাটি 'বৈশাখ'-এর সঙ্গে তুলনীয়।

কল্পনায় প্রকাশিত 'চৌর-পঞ্চাশিকা' আর ১৩০৬ সালের ভাদ্র-সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত 'চৌর-পঞ্চাশিকা' দুইটি স্বতন্ত্র কবিতা। 'মানসপ্রতিমা' গানটির প্রথম পাঠ ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।[২] 'চৈত্ররজনী' ও 'বসন্ত' চৈত্র-সংখ্যা এবং 'প্রকাশ' অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ভারতীতে (১৩০৬) প্রথম প্রকাশিত হয়। জড় ও মানস প্রকৃতির রসসৌন্দর্যের গোপনরহস্যগভীর প্রেমের বিদ্যুৎচঞ্চল ইঙ্গিত 'প্রকাশ'-এর লঘু রূপকে মণ্ডিত হইয়া লঘুতর ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে।

৩

কল্পনা প্রকাশিত হইয়াছিল বৈশাখের শেষে, 'ক্ষণিকা' বাহির হইল শ্রাবণের প্রথমে (১৩০৭)। ক্ষণিকার প্রায় সব কবিতাই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় এই দুই মাসের মধ্যে লেখা। শুধু এই কালগত ঐক্য নয় ভাবগত এবং রচনারীতিগত ঐক্যও ক্ষণিকার কবিতাগুলিকে একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্রতা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অন্য

[১] বলাকার অসম ছন্দের পূর্বাভাস ইহাতে লক্ষণীয়। [২] আষাঢ় ১৩০৩। প্রথম ছত্র এইরূপ—
"তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার নিভৃত সাধনা।"

কোন প্রধান কাব্যে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন-ঐক্যমূলক স্বাতন্ত্র্য নাই। ক্ষণিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার নিরাবরণ প্রকাশ।

ক্ষণিকায় শারদপ্রসন্নতা যতই থাকুক ইহার রস কিন্তু শরৎকাব্যকথাশ্রয়ী নয়। বরং ইহাকে প্রৌঢ়বর্ষার কাব্য বলা যাইতে পারে। রোমান্টিক 'কল্পনা'-র দাবদগ্ধ বৈশাখের অবসানে আষাঢ়ের স্নিগ্ধ প্রাণসম্ভাবনা যখন ঘনাইয়া আসে তখন নবরূঢ় তৃণাঙ্কুর যে জীবন-উল্লাস বহন করিয়া মৃত্তিকাগর্ভ হইতে মুক্তিলাভ করে সেই জীবন্মুক্তির হর্ষ স্পন্দিত হইয়াছে ক্ষণিকায়।

শেষ অংশের কয়েকটি কবিতায় নববর্ষার অগ্রদূত অকালবসন্তের অকারণ পুলকের চঞ্চল সুর বাজিয়াছে। ক্ষণিকায় কবিসত্তা এক নবতর মুক্তি-আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছে। মানবপ্রকৃতির ও বহিঃপ্রকৃতির অখণ্ডতা এবং তাহার সহিত কবিসত্তার একাত্মতা-উপলব্ধি এই জীবন্মুক্তির প্রেরণা যোগাইয়াছে। শুধু চোখে নয় সমস্ত অনুভূতি দিয়া বহিঃপ্রকৃতিকে অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে এক করিয়া দেখিয়া কবিসত্তা শুদ্ধ-অস্তিত্বমাত্রবোধের নির্বন্ধন আনন্দ অনুভব করিয়াছে। তাই মেঘলা দিনে পাড়াগাঁয়ের মাঠে কালো মেয়েকে দেখিয়া কবিচিত্তে অকারণ পুলকের সাড়া জাগিয়াছিল।

এম্‌নি করে শ্রাবণ রজনীতে
হঠাৎ খুসি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।[১]

মানসবন্ধন ছিঁড়িয়া কবিসত্তা আপনাকে বিস্তার করিয়া দিয়াছে দিক্‌বিদিকের সীমাহীন অবকাশে।

আপ্‌নারে হায় চিত-উদাস গানে
উড়িয়ে দিলে অজানিতের পানে,
চিরদিন যা ছিল নিজের দখলে
দিয়ে দিলে পথের পান্থ-সকলে।[২]

[১] 'কৃষ্ণকলি'। [২] 'সম্বরণ'।

ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির নব নব রূপ, দিবারাত্রির প্রহরে প্রহরে নব নব বেশ. কোন রূপবেশই চরম নয়, প্রত্যেকের মধ্যেই প্রত্যেকের সার্থকতা। বহিঃপ্রকৃতির এই ক্ষণভঙ্গরস কবিচিত্তে যে মৌহূর্ত্তিক আনন্দ এবং কবিসত্তায় যে সংস্কারমুক্তির উল্লাস আনিয়াছিল তাহা তাহা ক্ষণিকার প্রথম অংশের কবিতাগুলির মধ্যে পরিস্ফুট। মুক্তিবোধের প্রতিক্রিয়া দুইরকম—এক বন্ধনহীনতার কারণহীন সুখ, আর সর্ব্ববিধ বন্ধনবিমুখতা। ক্ষণিকার মূল সুরে কবিচিত্তের এই দুই প্রতিক্রিয়া দ্বন্দ্বনৃত্য করিয়াছে। 'ক্ষণিকা,' 'যথাসময়,' বোঝাপড়া,' 'অচেনা,' 'বিদায়,' 'সেকাল,' 'সম্বরণ,' 'উদাসীন,' 'শেষ' ইত্যাদি কবিতার প্রধান সুর হইতেছে চল্‌তি-মুহূর্ত্তের নিরাসক্ত-আনন্দবোধ। শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কার, স্মৃতি আচার ও শিষ্টতা, শান্তি ও নির্ভরতা, যশ, ক্ষমতা, ভবিষ্যতের আশা ইত্যাদি যাহা কিছু মানুষকে বাঁধিয়া রাখে সমাজশৃঙ্খলে, পরিবারগোষ্ঠীতে ও ব্যক্তিবন্ধনে, সে-সকলের বিরুদ্ধে কবিমানসের বিদ্রোহ প্রকাশ পাইয়াছে 'মাতাল,' 'যুগল,' 'শাস্ত্র,' 'অনবসর,' 'অতিবাদ,' 'কবির বয়স,' 'পরামর্শ,' 'ক্ষতিপূরণ,' 'জন্মান্তর,' 'বিলম্বিত' ইত্যাদি কবিতায়।

ইতিহাসের গণ্ডীতে বদ্ধ ও সংস্কারের ছাঁচে গড়া ভালমন্দর বাছবিচার ছাড়িয়া কালবন্ধননির্মুক্ত হইয়া কবিচিত্ত ক্ষণিকার অখণ্ডসত্যকে সহজমনে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

মনেরে আজ কহ, যে
ভাল মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

অখণ্ডসত্যকে স্বীকার করিলে সকলেই স্বীকার করা হয়, কাহারো সহিত সংঘর্ষের সম্ভাবনামাত্র থাকে না।

তোমার মাপে হওনি সবাই,
তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়
কেউ বা মরে তোমার চাপে ;—

তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি ?
তেমন করে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।[১]

ক্ষণিকার তত্ত্বকথা মায়াবাদের ঠিক উল্টা ;

জগৎটা যে জীর্ণ মায়া
সেটা জানাব আগে
সকল স্বপ্ন কুড়িয়ে নিয়ে
জীবন-রাত্রি ভাগে।
ছুটি আছে শুধু দু দিন
ভালবাসবার মত,
কাজের জন্য জীবন হ'লে
দীর্ঘ জীবন হ'ত।[২]

অতএব সারসত্য এই,

থাকব নাই ভাই থাকব না কেউ
থাকবে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে চল রে ছুটে
কালের পিছু পিছু।[২]

গভীরতর অনুভূতি গম্ভীরভাবে প্রকাশ করিতে গেলে তাহার রহস্যটুকু যায় বাদ পড়িয়া, ভাষার আড়ম্বরে ভাবের গাম্ভীর্য্য যায় তলাইয়া। তাই আমাদের দেশের কবিসাধকেরা তাঁহাদের ধ্যানধারণার অনুভূতি-উপলব্ধি চিরকালই রূপক-উৎপ্রেক্ষার অন্তরালে আপাতবিরোধের আবরণে লঘু ভাষায় ও চলিত ভঙ্গিতে রাখিয়া ঢাকিয়া প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। ইহার দুই উদ্দেশ্য— প্রথমত বক্তব্য উপলব্ধিকে সাধারণ জ্ঞানের আদর্শ বা analogy দ্বারা সহজভাবে প্রকাশ করা, যাহাতে টীকাটিপ্পনীর অরণ্যে দিশাহারা হইতে না হয় ; দ্বিতীয়ত

[১] 'বোঝাপড়া'। [২] 'শেষ'।

পণ্ডিতের নির্লজ্জ কৌতূহল ও অনধিকারীর ভ্রান্ত দুরাশা হইতে তাঁহাদের সাধনা ধারাকে বাঁচাইয়া রাখা উত্তরকালের অধিকারীর প্রতীক্ষায়। ক্ষণিকায় প্রতিবিম্বিত কবিচিত্তের অনুভূতি নিছক আধ্যাত্মিক নয়, তাহা আধিভৌতিকও বটে, এবং কোন সাধনাধারালব্ধ নয়। তবুও "গভীর সুরে গভীর কথা" শুনাইয়া দিবার সাহস না পাইয়া অজানিতেই কবি এই কাব্যে লঘু ভাষায় হালকা ভঙ্গিতে প্রচলিত সংস্কারবন্ধনকে তুচ্ছ করিয়া অতি গভীর অনুভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা আধিভৌতিক রূপকে ছাড়াইয়া আধ্যাত্মিক রসের কোঠায় পৌঁছিয়াছে। সেইজন্য আমাদের দেশের প্রাচীন মিষ্টিক সাধকদিগের সঙ্গে তাঁহার অন্তরের যোগ দুর্লক্ষ্য নয়। যদিও ক্ষণিকায় কবিচিত্তের প্রকাশ লঘুতম ভঙ্গিতে, তথাপি ইহাতে প্রাচীন সাধককবিদের সঙ্গে আশ্চর্য্য ও অনপেক্ষিত মিল দেখিতেছি। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সিদ্ধাচার্য্য কাহ্নু যে ভাবাবেগে বলিয়াছিলেন, "কাহ্নু বিলসই আসব-মাতা," অনুরূপ মনোভাব লইয়া বিংশ শতাব্দীর আরম্ভক্ষণে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

উচ্ছ্বসিত মদের ফেনা দিয়ে
অট্টহাসি শোধন করি নিব!
ভদ্রলোকের তকমা-তাবিজ ছিঁড়ে
উড়িয়ে দেবে মদোন্মত্ত হাওয়া!
শপথ ক'রে বিপথ-ব্রত নেব—
মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া![১]

সত্যমিথ্যা সংস্কারের সৃষ্টি। কালের দুই সীমানা অতীত-অনাগতকে উড়াইয়া দিলে সত্যমিথ্যার পার্থক্য যায় ঘুচিয়া। তাই কবি বলিয়াছেন,

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনমতেই
বলবনাক সত্য কথা!

১ 'মাতাল'।

ক্ষণপরিচিতির লঘুতা ও বন্ধনহীনতা ক্ষণিকার প্রেমের-কবিতাগুলিতে নূতনতর বাস্তবরস জমাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা কখনো কোন হৃদয়বন্ধন স্বীকার করে নাই, প্রেমেরও নয়। (এখানে অবশ্য তাঁহার কবিসত্তার মৌলিক-অবলম্বন কিশোরপ্রেম বা জীবনদেবতার কথা উঠে না, কেন না তাহাতে বাস্তবের সূত্র নিতান্ত ক্ষীণ, কবির হৃদয়াবেগই তাহাকে মূর্ত্ত করিয়াছিল।) অনেককাল পরে 'শেষের কবিতা'-য় যে-প্রেমের জয়গান শুনি সে-প্রেমের আভাস পূর্ব্বে ক্ষণিকা ছাড়া আর কোথাও নাই।

একটু দেওয়া, একটু বাখা,
একটু প্রকাশ, একটু ঢাকা,
একটু হাসি, একটু সরম,
দু'জনের এই বোঝাবুঝি।
তোমার আমার এই যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি।[১]

এ-প্রেমের আয়োজন স্বল্প ; দূরসান্নিধ্যই যথেষ্ট। বিরহের অবকাশে এ-প্রেম পাখা মেলে।

আমরা দু'জন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ।
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখী
তাহার গানে আমার নাচে বুক।[২]

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে একই গান সে
শোনায় নিরবধি।[৩]

[১] 'সোজাসুজি'। [২] 'এক গাঁয়ে'। [৩] 'দুই তীরে'।

একান্তভাবে রোমান্টিক কবিতাগুলিতেও শুনি বর্ত্তমানমুহূর্ত্তের সাধারণ সরল-জীবনের জয়জয়ন্তী।

আপাতত এই আনন্দে
গর্ব্বে বেড়াই নেচে,
কালিদাস ত নামেই আছেন
আমি আছি বেঁচে।[১]

সোনার-তরীর 'প্রত্যাখ্যান'-এ পথিক প্রিয় ও গৃহবাসিনী প্রিয়ার রূপক প্রথম পাই। ক্ষণিকার কয়েকটি কবিতায় সেই রূপকের জের চলিয়াছে।[২] সোনার-তরীর নৌকা-ধানের রূপকেরও অনুবৃত্তি দেখি দুইএকটি কবিতায়।[৩] চিত্তগহনের স্বপ্নচারিণী প্রিয়া দেখা দিয়াছেন শুধু 'নষ্ট স্বপ্ন'-এ।

ক্ষণিকার শেষের দিকের কবিতায় কালের ঐকের মধ্যে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে সত্তার একত্ববোধের মধ্যে।

হোক্ রে তিক্ত মধুর কণ্ঠ;
হোক্ রে রিক্ত কল্পলতা।
তোমার থাকুক্ পরিপূর্ণ
একলা থাকার সার্থকতা।[৪]

জীবনের বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে উৎকর্ণ কবিচিত্ত যে-অভিসারিকার পদধ্বনি শুনিয়া আসিয়াছে, একদিন অপ্রত্যাশিত শুভক্ষণে তাহারি দর্শন পাওয়া গেল।

আস নাই তুমি নব ফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায়;
এস এস ভরা বরষায়।[৫]

ক্ষণিকায় কবি বর্ত্তমানকালের পথিক, চলতি-পথের রূপরস তাঁহার মন ভরাইয়া তুলিতেছে। কিন্তু এই রসদৃষ্টিসঞ্জাত আনন্দবোধের গহনতলে রহিয়াছে অন্তরতমের উপলব্ধি।

[১] 'সেকাল'। [২] 'অতিথি,' 'বিরহ,' 'ক্ষণেক দেখা,' 'দুই বোন' ও 'ভৎ'সনা'। [৩] 'যাত্রী' ও 'যৌবন-বিদায়'। [৪] 'শেষ হিসাব'। [৫] 'আবির্ভাব'।

বলিনে ত কারে, সকালে বিকালে
তোমার পথের মাঝেতে
বাঁশি বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি
বেড়াই ছদ্ম-সাজেতে।
যাহা মুখে আসে গাই সেই গান,
নানা রাগিণীতে দিয়ে নানা তান,
এক গান রাখি গোপনে।
নানা মুখ পানে আঁখি মেলি চাই
তোমা পানে চাই স্বপনে।[1]

চঞ্চলমুহূর্তে যাহা বহু-রূপে দেখা দেয় অচঞ্চল ধ্যানে তাহারি রসপরিণতি 'অন্তরতম'।

পথে যতদিন ছিনু, ততদিন
অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হ'ল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।[2]

ক্ষণিকার কবিতাগুলির বিষয়বস্তুতে কবিসত্তার ও কবিদৃষ্টির যে মুক্তি-উল্লাস ঘটিয়াছে তাহা ভাষায় ও ছন্দে সমানভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। তদ্ভব (অর্থাৎ খাঁটি বাঙ্গালা) শব্দের সঙ্গে তৎসম (অর্থাৎ খাঁটি সংস্কৃত) শব্দ বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে চলিত-ভাষার কাঠামোয়। বেপরোয়া ভাবের শক্তিশালী বাহন হইয়াছে বেপরোয়া ভাষা। রবীন্দ্রসাহিত্যেও এ বড় বিস্ময়াবহ নূতনত্ব। আরও বিস্ময়কর হইতেছে হাল্‌কা ছন্দের ঝঙ্কার। সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে লঘুগুরু তাল রাখিয়া চলিয়াছে বাঙ্গালা শব্দের নৃত্যচাপল্য। যেমন,

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে—

[1] 'অন্তরতম'। [2] 'সমাপ্তি'।

ঠেক্‌ল কখন তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিণীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।[১]

৪

ক্ষণিকার শেষে কবি অন্তরতমকে পাইয়াছিলেন নিশীথে একান্তে, প্রশান্ত রস-উপলব্ধিতে—"সব শেষ হল যেখানে সেথায় তুমি আর আমি একা।" 'নৈবেদ্য' (আষাঢ় ১৩০৮) কাব্যে তাঁহাকে পাইলেন ধ্যানে, কর্ম্মচঞ্চল নিখিলের মাঝখানে।

তখন সহসা দেখি মুদিয়া নয়ন
মহা জনারণ্যমাঝে অনন্ত নির্জন
তোমার আসনখানি,—কোলাহল মাঝে
তোমার নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধে বিরাজে।
সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘরে ঘরে,
সব চিত্তে, সব চিন্তা সব চেষ্টা পরে,
যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা।[২]

এই সুনিবিড় উপলব্ধি কবিকে জীবনের মহৎ কর্ত্তব্যের পথে জীবনের মুক্তি-সাধনায় অগ্রসর হইবার প্রেরণা দিল। এই মুক্তি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্রহ্মনির্বাণ নয়, ইহা লীলাবাদী রসিকের ব্রহ্মসাযুজ্য।

সকল সংসারবন্ধে বন্ধনবিহীন
তোমার মহান্ মুক্তি থাক্ রাত্রিদিন।[৩]

[১] 'ক্ষতিপূরণ'। [২] কবিতাসংখ্যা ২২। [৩] ঐ ২৮।

কবি ভক্তিতীর্থের যাত্রী। বৈষ্ণব রসিকভক্তের মতই তিনি পরমাত্মার নিত্যলীলার অধিকার হারাইতে চাহেন না। নিখিল বিশ্বকে যিনি লীলাপ্রপঞ্চ দ্বারা অহরহ অজস্রভাবে জয় করিতেছেন, তাঁহারি লীলায়িত কবিচিত্তকে বিচিত্রভাবে আকর্ষণ করিতেছে। এই আকর্ষণকে স্বীকার করা, মনপ্রাণ সর্ব্বাঙ্গ দিয়া এই বিচিত্র লীলারস সম্ভোগ করা কবির জীবনসাধনা।

তোমার ভুবন-মাঝে ফিরি মুগ্ধ সম
হে বিশ্বমোহন নাথ! চক্ষে লাগে মম
প্রশান্ত আনন্দঘন অনন্ত আকাশ;
শরৎমধ্যাহ্নে পূর্ণ সুবর্ণ-উচ্ছ্বাস
আমার শিরার মাঝে করিয়া প্রবেশ
মিশায় রক্তের সাথে আতপ্ত আবেশ।[১]

মনে শক্তি ও প্রাণে ভক্তি না থাকিলে দুঃখকে লীলারস বলিয়া অনুভব করা যায় না। তাই কবির প্রার্থনা,

আমি তাই চাই ভরিয়া পরান
দুঃখেরি সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মোর মাথার মানিক
সাথে যদি দাও ভকতি।[২]

নৈবেদ্যের প্রথম অংশে কবির ধ্যানজীবনের আদর্শ অভিব্যক্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় অংশে কর্ম্মজীবনের। এই অংশকে একহিসাবে চৈতালির তাত্ত্বিক অংশের পরিণতি বলা চলে। এইসময়ে রবীন্দ্রনাথ অন্তরে এক মহৎ কর্ম্মচাঞ্চল্য অনুভব করিতেছিলেন। যেন সমগ্র দেশের সুপ্ত শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া কবিচিত্তে পুনঃপুন প্রেরণা দিতেছিল নিরাসক্ত ভাবজীবন দূরে রাখিয়া জীবন-সাধনাকে কর্ম্মে রূপায়িত করিয়া তুলিতে।

[১] ঐ ৩১। [২] ঐ ২০।

দেশের মূঢ়তা ও তজ্জনিত লাঞ্ছনা-যন্ত্রণা কবিকে উত্তেজিত করিল মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ঈশ্বরের যথার্থ পূজা করিতে। যেখানে মনুষ্যত্বের অবমাননা পদে পদে সেখানে দেবতার আরাধনা নিষ্ফল, কেন না মানুষের মধ্যেই তো দেবতার বাস। আমাদের দেশে প্রচলিত ধর্ম্মে লোকে বিশ্বদেবতাকে খণ্ড-মূর্ত্তিতে দেখিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া আসিয়াছে, অখণ্ড-মানবদেবতার প্রতি তাই লক্ষ্য পড়ে নাই। সেই মূঢ়তার ফলে আজ এই দুর্দ্দশা।

তোমারে শতধা করি ক্ষুদ্র করি দিয়া
মাটিতে লুটায় যারা তৃপ্ত সুপ্ত হিয়া
সমস্ত ধরণী আজি অবহেলাভরে
পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।[১]

যাঁহারা শুদ্ধ ভক্তিপথের পথিক তাঁহারা মানবমহাতীর্থের কঠিন সাধনাপথ হইতে পাশ কাটাইয়া ভাবাবেগে অন্ধ হইয়া আছেন। তাঁহাদেব হৃদয়াবেগ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীব মধ্যে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদিগকে বৃহত্তর জীবনের বাহিরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা পথ দেখাইবেন কি করিয়া?

দুর্গম পথের প্রান্তে পান্থশালাপরে
যাহারা পড়িয়াছিল ভাবাবেশভরে
রসপানে হতজ্ঞান; যাহাবা নিয়ত,
রাখে নাই আপনারে উদ্যত জাগ্রত,—···
তারা আজ কাঁদিতেছে! আসিয়াছে নিশা,
কোথা যাত্রী, কোথা পথ, কোথায় রে দিশা।[২]

একমাত্র পথ হইতেছে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের পথ, যাঁহারা বিশ্বচরাচরের মধ্যে বিশ্ব-দেবতার অভয়মূর্ত্তি দেখিয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ঋষিদের এই পরম বাণী,

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ:
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

[১] ঐ ৫০। [২] ঐ ৫২।

সম্বল করিয়া আমাদিগকে

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জ্জনা! ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে,
এই কর্ম্মধামে![1]

শুধু জ্ঞানযোগে বা কর্ম্মযোগে সিদ্ধি নাই, ভক্তিযোগও চাই। বিশ্বদেবতার কৃপা অন্তরে শক্তিসঞ্চার না করিলে কিছুই হইবে না, কেননা "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"। সেবিষয়েও কবিচিত্তে ভরসার অন্ত নাই।

আছ তুমি অন্তর্যামী এ লজ্জিত দেশে,
সবার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে হৃদয়ে
গৃহে গৃহে রাত্রিদিন জাগরূক হয়ে
তোমার নিগূঢ় শক্তি করিতেছে কাজ!
আমি ছাড়ি নাই আশা, ওগো মহারাজ![2]

কবি বুঝিয়াছেন শিক্ষিতসমাজে পাশ্চাত্য-অনুকরণের হীনতার মূলেও সমাজের প্রাণহীন আচারপরায়ণতা।

ধর্ম্ম প্রাণহীন
ভার সম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন!
তাই আজি দলে দলে চাই ছুটিবারে
পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে
লুকাতে প্রাচীন দৈন্য![3]

কিন্তু পাশ্চাত্যসভ্যতার বীভৎস অন্তঃসারশূন্যতা প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে সাম্রাজ্যলিপ্সার রণনীতিতে। এ বিষয়ে কবির উক্তি বিংশ শতাব্দীর দুই মহাযুদ্ধের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী বলিয়া লইতে পারি।

[1] ঐ ৬১। [2] ঐ ৬২। [3] ঐ ৬৩।

দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে,
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি' তীব্র বিষে।
জাতিপ্রেম নাম ধরি' প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।[১]

সমগ্র ভারতবর্ষের বাণীমূর্ত্তি-কবির অন্তর হইতে এই প্রার্থনা উঠিয়াছে,

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত,...
যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় ;...
নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্মচিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।[২]

প্রাচীন ভারতের যে সাধনা রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ১৩০৮ সালে পৌষ মাসে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠায় কর্ম্মপ্রেরণা পাইল।

নৈবেদ্যের শতসংখ্যক কবিতার মধ্যে আটাত্তরটি[৩] হইতেছে চতুর্দ্দশপদী। প্রথম একুশটি কবিতা গানের ধরণে লেখা। এগুলি গান হিসাবেই প্রচলিত। এই গান বা কবিতাগুলি গীতাঞ্জলির পূর্ব্বাভাস। রবীন্দ্রনাথের সনেট-রচনাপদ্ধতি নৈবেদ্যে নূতনতর রূপ লইয়াছে পয়ারের মিলে। কতকগুলি সনেট একটানা লেখা, এগুলিকে সনেটগুচ্ছ বলা যাইতে পারে।

১ ঐ ৬৪। ২ ঐ ৭২। ৩ ঐ ২২-৯৯।

ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে স্নেহসম্পর্ক যতই গভীর হউক না কেন তাহা রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রেরণাকে কখনই উদ্বুদ্ধ করে নাই, যতক্ষণ না তাহা ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অতীত হইয়া আদর্শাশ্রিত না হইত। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবন সম্পূর্ণ পৃথক্ স্তরে ছিল। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়বৃত্তির আলম্বন ইহজীবনের পরিধি ছাড়াইয়া কবিচিত্তে রসস্মৃতিরূপে স্থিরভূমি লাভ করিলে তবে তাঁহার কাব্য-প্রতিভার অর্ঘ্যলাভের যোগ্য হইত। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাঁহার পরিচিত কোন ব্যক্তির বাস্তবচিত্র বড় দেখা যায় না। যে-মানুষ তাঁহার কাব্যে দেখা দিয়াছে তাহা প্রধানত তাঁহার অন্তরের রসলোকেরই অধিবাসী, ইহজগতের নয়। কেবল 'স্মরণ'[1] কাব্যে ইহার একটু ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে। পরলোকগত[2] পত্নীর স্মৃতিতর্পণরূপে স্মরণের কবিতাগুলি লেখা হইয়াছিল। মুখ্যভাবে ব্যক্তিগত জীবনকে উপলক্ষ্য করিয়া কাব্য (অর্থাৎ পারম্পরিক কবিতা) রচনা এইই প্রথম এবং শেষ। তবুও স্মরণ কাব্যে রবীন্দ্রকাব্যরীতির সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হয় নাই। কবিপত্নী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি কবির কাব্যে কোন স্থান পান নাই। কবির জীবনের অনেক ক্ষেত্রেও তাঁহার স্থান ছিল না।[3] কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে পতিপত্নীর অন্তরের যোগ যে কত নিবিড় ও গভীর ছিল তাহার পরিচয় পাই এই কাব্যে।

জীবনের মিলন সম্পূর্ণতা লাভ করিল মৃত্যুতে। জীবৎকালে কাব্যের উপেক্ষিতা মৃত্যুর তোরণ দিয়া কাব্যলক্ষ্মীরূপে কবির অন্তরের ধ্রুব আসনটি অধিকার করিয়া বসিল।

> মিলন সম্পূর্ণ আজি হ'ল তোমা সনে
> এ বিচ্ছেদবেদনার নিবিড় বন্ধনে!
> এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি দেশকাল
> হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি' অন্তরাল।[4]

[1] মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের ষষ্ঠভাগে প্রথম সঙ্কলিত (১৩১০)। প্রথম দুইটি ছাড়া স্মরণের কবিতাগুলি প্রথমে বঙ্গদর্শনে ১৩০৯ সালে অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। [2] মৃত্যু ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯। [3] চিঠিপত্র প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৩ দ্রষ্টব্য। [4] 'মিলন' (৮)।

মরণের সিংহদ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া,—
আজি বাজে নাই বাদ্য, ঘটে নাই জনতা-উৎসব,
জ্বলে নাই দীপ-মালা ; আজিকার আনন্দ গৌরব
প্রশান্ত গভীর স্তব্ধ বাক্যহারা অশ্রু-নিমগন।
আজিকার এই বার্ত্তা জানে নি শোনে নি কোনোজন।
আমার অন্তর শুধু জেলেছে প্রদীপ একখানি,
আমার সঙ্গীত শুধু একা গাঁথে মিলনের বাণী ![1]

বিরহিহৃদয়ের সুগভীর বেদনা কবির রসানুভূতির উপর বাস্তবশোকের মহান গাম্ভীর্য্যের আবরণ টানিয়া দিয়াছে।

আপনার পানে চেয়ে বসে ভাবি এই কথা—
কত তব রাত্রিদিন কত সাধ মোরে ঘিরে আছে,
তাদের ক্রন্দন শুনি ফিরে ফিরে ফিরিতেছ কাছে ![2]

আনিছে সে দৃষ্টি তব, তোমার প্রকাশহীন বাণী,
মর্মরি তুলিছে কুঞ্জে তোমার আকুল চিত্তখানি।
মিলনের দিনে যারে কতবার দিয়েছিনু ফাঁকি,
তোমার বিচ্ছেদ তারে শূন্যঘরে আনে ডাকি ডাকি ![3]

হৃদয়ের গভীর ক্ষত ক্রমশ পূরিয়া আসিলে কবিচিত্ত নিখিল সৌন্দর্য্যানুভূতিতে বিদেহিপ্রিয়ার মুগ্ধদৃষ্টির অনুসরণ দেখিয়া সান্ত্বনা পাইল।

আজি এ উদার মাঠে আকাশ বাহিয়া
তোমার নয়ন যেন ফিরিছে চাহিয়া।
তোমার সে হাসিটুক,
সে চেয়ে দেখার সুখ
সবারে পরশি চলে বিদায় গাহিয়া
এই তালবন গ্রাম প্রান্তর বাহিয়া।[4]

[1] 'নব পরিণয়' (১১)। [2] 'সন্ধান' (১৬)। [3] 'বসন্ত' (১৯)। [4] 'সম্ভোগ' (২৭)।

সংসারের সঙ্গিনী দেখা দিলেন মর্ম্মের অর্দ্ধাঙ্গিনী রূপে। পতিপত্নী দুই জনের জীবনের আকৃতি যেন একজনের জীবনে সার্থকতা খুঁজিতে লাগিল।

আমার জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ!
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচ!
যেন আমি বুঝি মনে
অতিশয় সঙ্গোপনে
তুমি আজ মোর মাঝে আমি হয়ে আছ!
আমারি জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ![1]

স্মরণের কোন কোন কবিতায় অতীতদিনের অবজ্ঞাত মুহূর্ত্ত ও অবকাশগুলির জন্য অনুশোচনার বেশ শোনা যায়। ইহাতে কবিতাগুলি শোচক-কাব্যের উন্নত মর্য্যাদা পাইয়াছে।

তোমার সকল কথা বল নাই, পার নি বলিতে,
আপনারে খর্ব্ব করি রেখেছিলে, তুমি হে লজ্জিতে,
যতদিন ছিলে হেথা। হৃদয়ের গূঢ় আশাগুলি
যখন চাহিত তারা কাঁদিয়া উঠিতে কণ্ঠ তুলি
তর্জ্জনী-ইঙ্গিতে তুমি গোপন করিতে সাবধান
ব্যাকুল-সঙ্কোচ বশে, পাছে ভুলে পায় অপমান।[2]

বাক্যহীন শেষবিদায়ের বেদনা কবির বীণায় একটি নূতন তার চড়াইয়া দিল এই কাব্যে।

দুজনের কথা দোঁহে শেষ করি লব
সে-রাত্রে ঘটেনি হেন অবকাশ তব!
বাণীহীন বিদায়ের সেই বেদনায়
চারিদিকে চাহিয়াছি ব্যর্থ বাসনায়।
আজি এ হৃদয়ে সর্ব্ব ভাবনার নীচে
তোমার আমার বাণী একত্রে মিলিছে।[3]

[1] ঐ। [2] 'কথা' (১০)। [3] 'মিলন' (৮)।

৬

রবীন্দ্রনাথের শৈশবকল্পনার উপর তাঁহার কাব্যপ্রতিভার ভিত্তি স্থাপিত এবং তাঁহার কবিকল্পনা শৈশবকল্পনার দ্বারা ওতপ্রোত, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাৎসল্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে তাঁহার কাব্যসৃষ্টি ধ্রুবরূপ ধারণ করিতে শুরু করিয়াছিল তাহাও কড়ি-ও-কোমলের প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। কড়ি-ও-কোমলের 'বিষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর' ও 'সাত ভাই চম্পা' কবিতায়[১] রবীন্দ্রনাথের শৈশবকল্পনা সহজসরল অথচ দুরূহ কবিত্বে মণ্ডিত হইয়া সার্থক প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। সনাতন বাঙ্গালী-শিশুর অস্ফুট ছেলেভুলানো ছড়া ও অবাস্তব রূপকথা এই দুই কবিতায় অমরত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার পর রবীন্দ্রনাথের বাৎসল্যদৃষ্টির নূতন কোণ দেখা গেল চিত্রার 'যেতে নাহি দিব' কবিতায়। এটি যদিও শিশু-কবিতা নয়, তবুও 'শিশু' কাব্যের করুণ মর্ম্মকথাটি ইহার মধ্যে লুকানো আছে। শিশুর অনির্দ্দেশ্য চপল সৌন্দর্য্যের মধ্যে চঞ্চল বিশ্বজগতের সৃষ্টিবেদনার ব্যাকুল কারুণ্যের রহস্য নিহিত আছে। কবি এক শুভ-মুহূর্ত্তে ব্যথাতুরা শিশুকন্যার মুখচ্ছবিতে আদিজননী বসুন্ধরার মাতৃহৃদয়ের করুণ-বাৎসল্য নিরীক্ষণ করিয়া কবিতাটি রচনা করিবার প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। চঞ্চলকে ধরিয়া রাখিবার অযৌক্তিক ব্যাকুলতা, স্নেহাস্পদকে অঞ্চলপ্রান্তে লুকাইয়া রাখিবার অসম্ভব বাসনা, যাহা মানবপ্রকৃতির মর্ম্মের কামনা তাহা এই কবিতায় বিশ্বপ্রকৃতির উপর আরোপিত হইয়াছে। বিরহচ্ছায়ানিবিড় কবিহৃদয় সন্তানবাৎসল্যের মধ্যে নিখিল প্রকৃতির মাতৃহৃদয়ের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছেন। এখানে সন্তান উপলক্ষ্য-মাত্র, মাতাই প্রধান। এ এক অভিনব বাৎসল্যভক্তি।

'শিশু'[২] কাব্যে এই দৃষ্টিরই বিপরীত ভঙ্গি লক্ষ্য করি। এখানে শিশুর মধ্যে

[১] প্রথমপ্রকাশ বালক ১২৯২ বৈশাখ ও আষাঢ়। [২] মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের সপ্তম ভাগ রূপে প্রকাশিত (১৩১০)। উপক্রমণিকা সমেত বাহাত্তরটি কবিতার মধ্যে শেষের তিরিশটি পূর্ব্বপ্রকাশিত কোন কোন গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। তাহার মধ্যে একটি 'নদী' ১৩০২ সালের মাঘ মাসে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম ব্রিশটি কবিতাই শিশু কাব্যের মৌলিক অংশ। কাব্য বলিতে আমরা এই কয়টি কবিতাই বুঝিব। শিশুর নূতন কবিতার অধিকাংশ

নিখিল বিশ্বকে না দেখিয়া কবি নিখিল বিশ্বের মধ্যে যেন চিরন্তন শিশুকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

নিখিল শোনে আকুলমনে
নূপুর-বাজনা।
তপন-শশী হেরিছে বসি'
তোমার সাজনা।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে
নয়ন-মাজনা।
নিখিল শোনে আকুলমনে
নূপুর-বাজনা।[1]

পত্নীবিয়োগব্যথা, মাতৃহীন কনিষ্ঠ শিশুপুত্রের অকথিত বেদনা, সর্বোপরি বালিকা মধ্যমকন্যার মরণান্তিক পীড়া কবিচিত্তে এই নূতনতর বাৎসল্যরসের প্রস্রবণ বহাইয়া দিল।

শিশুর কোন কোন কবিতায় বৈষ্ণব পদকর্তাদের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির ধ্বনি শোনা যায়। জগৎপারাবার তীরে যে চিরন্তন শিশু

বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর
ঝিনুক নিয়ে খেলা।
বিপুল নীল সলিল পরি
ভাসায় তা'রা খেলার তরী,
আপন হাতে হেলায় গড়ি'
পাতায় গাঁথা ভেলা।[2]

কবি লিখিয়াছিলেন আলমোড়ায়, ১৩১০ সালের শ্রাবণ মাসে। [বিশ্বভারতী পত্রিকা ফাল্গুন ১৩৪৯ পৃ ২২৫-২২৬, ৫২৯-৫৩১ দ্রষ্টব্য]।

[1] 'খেলা'। কবিতাটি প্রথমে 'শিশু' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল [বঙ্গদর্শন ১৩১০ ভাদ্র পৃ ২৪১-৪৮]। ইহাই কবিতাটির যথার্থ নাম। [2] উপক্রমণিকা বা উৎসর্গ কবিতা।

মানবসংসারের গোকুলবৃন্দাবনে যাহার নূপুরঝঙ্কার নিখিল বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে, বিশ্বসংসারের বহিঃপ্রাঙ্গনে যাহার ধূলিমলিন বিরলবাস দেহচ্ছন্দ তপনশশিতারকার অনিদ্রিত চক্ষু মন্ত্রার্পিত করিয়া রাখিয়াছে—সেই নিত্যকালের শিশুটির হাসিকান্নার সুর বাঁধা পড়িয়াছে এই কবিতাগুলির মধ্যে।

শিশুর কবিতাগুলিকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—বাৎসল্যতত্ত্বাশ্রিত, তত্ত্বে রস-ঘটিত, শিশু-বোধ এবং শিশু-কল্পনা। প্রথম দুই শ্রেণী কবির কথা, শেষ দুই শ্রেণী শিশুর কথা।

প্রথম শ্রেণীতে পড়ে তিনটি মাত্র কবিতা—'জন্ম কথা,' 'খোকার রাজ্য' এবং 'ভিতরে ও বাহিরে'। প্রথম কবিতার শেষ স্তবকে 'যেতে নাহি দিব' কবিতার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখ্‌তে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে' দাঁড়ালে।
জানিনে কোন্ মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখ্‌ব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু দুটির আড়ালে।

অপর দুইটি কবিতায় কবিচিত্ত শিশুমনের অগাধরহস্য তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হইতেছে 'খেলা,' 'খোকা,' 'ঘুমচোরা,' 'অপযশ,' 'বিচার,' 'চাতুরী,' 'নির্লিপ্ত' ও 'কেন মধুর'। ঘুমপাড়ানি ছড়ার সমস্ত রূপরসরহস্য বিশ্বপ্রকৃতির মর্ম্মবাণী রূপে ধ্বনিত হইয়াছে 'ঘুমচোরা'-য়। রূপের রসের ও ধ্বনির সামঞ্জস্য কবিতাটিকে অত্যন্ত মনোরম করিয়াছে। মা যখন "জল নিতে ও-পাড়ার দীঘিটিতে গিয়েছিল ঘট কাঁখে করিয়া" তখন সেই ফাঁকে ঘুমচোর ঘরে ঢুকিয়া খোকার ঘুম চুরি করিয়া আকাশে উড়িয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া মা অবাক হইয়া দেখেন, খোকা ঘরময় হামাগুড়ি দিয়া ফিরিতেছে। তখন ঘুমচোরের সন্ধানে বাহির হইবার কল্পনা করিতে লাগিল কবির মাতৃহৃদয়,

যাব সে গুহার ছায়ে কালো পাথরের গায়ে
কুলুকুলু বহে যেথা ঝরণা।
যাব সে বকুলবনে নিরিবিলি যে বিজনে
ঘুঘুরা করিছে ঘরকরণা।
যেখানে সে বুড়া বট নামায়ে দিয়েছে জট
ঝিল্লি ডাকিছে দিনে দুপুরে,
যেখানে বনের কাছে বনদেবতারা নাচে
চাঁদিনীতে রুমুঝুমু-নূপুরে,
যাব আমি ভরা সাঁঝে সেই বেণুবন মাঝে
আলো যেথা রোজ জ্বলে জোনাকি,
শুধাব মিনতি ক'রে আমাদের ঘুমচোরে
তোমাদের আছে জানাশোনা কি ?

'প্রশ্ন,' 'সমব্যথী,' 'ব্যাকুল,' 'সমালোচক,' 'জ্যোতিষ শাস্ত্র' ও 'বৈজ্ঞানিক' এই ছয়টি কবিতা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। শিশুর মন সংসারের সংস্কারনিগড়ের যৌক্তিকতা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহার নিজের জগৎ আধা-বাস্তব ও আধা-কাল্পনিক। বয়স্ক মানুষের সংসারেও তাহাই দেখিতে চাওয়া তাহার পক্ষে সঙ্গত এবং স্বাভাবিক।

মনে কর্ না উঠ্‌ল সাঁঝের তারা,
মনে কর্ না সন্ধ্যে হ'ল যেন !
রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুর বেলা রাত হবে না কেন ? [১]

চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে চৌদ্দটি কবিতা—'বিচিত্র,' 'মাষ্টার,' বাবু,' 'বিজ্ঞ.' 'ছোট বড়,' 'বীরপুরুষ,' 'রাজার বাড়ি,' 'মাঝি,' 'নৌকাযাত্রা,' 'ছুটির দিনে,' 'বনবাস,' 'মাতৃবৎসল,' 'লুকোচুরি,' 'দুঃখহারী' ও 'বিদায়'। এই কবিতা

[১] 'প্রশ্ন'।

গুলিতে রবীন্দ্রনাথের শৈশবকল্পনার উঁকিঝুঁকি দেখা যায়; কবি এখানে নিজের অতীত শিশুরূপকে যেন ফিরিয়া পাইয়াছেন। 'মাতৃবৎসল,' 'লুকোচুরি' ও 'বিদায়'—এই তিনটি কবিতায় অপূর্ব্ব কল্পনায় সঙ্গে অনির্ব্বচনীয় কারুণ্যের সংযোগ হওয়ায় লিরিক কাব্যকলায় একটি চরম উৎকর্ষ দেখা দিয়াছে।

তার চেয়ে মা আমি হব ঢেউ,
তুমি হবে অনেক দূরের দেশ!
লুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে
কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ![1]

পূজোর সময় যত ছেলে
আঙিনায় বেড়াবে খেলে,
বল্‌বে—খোকা নেই যে ঘরের মাঝে!
আমি তখন বাঁশির সুরে
আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে![2]

শিশুর কবিতাগুলির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে একটু বিশেষ দরদ ছিল, কেন না ইহার মধ্যে কবিমানসের বৈয়ক্তিক অনুভূতি অনেকটাই ধরা পড়িয়াছে। তাই পুস্তকাকারে বাহির হইবার পূর্ব্বে কবিতাগুলিকে মাসিকপত্রের হাটে যাচাই ও অনুকরণ করিতে দিবার বাসনা তাঁহার আদৌ ছিল না। আলমোড়া হইতে একটি পত্রে কবি লিখিয়াছিলেন, "এ কবিতাগুলি কোনো মাসিকপত্রে দিয়ে আমি নষ্ট করতে ইচ্ছা করিনে…বেশ তাজা টাট্‌কা অবস্থায় বইয়েতে বেরবে এই আমার অভিপ্রায় নইলে মাসিকপত্রের পাঠকদের হাতে হাতে যেখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে অনুকরণকারীদের কলমের মুখে ঠোকর খেয়ে খেয়ে কবিতার জেল্লা সমস্ত চলে যায়।"[3] তিন দিন পরে আর একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "এই ত ২২টা হল। কিন্তু শৈলেশের হাত থেকে এগুলিকে রক্ষা করবেন। সে যদি

[1] 'মাতৃবৎসল'। [2] 'বিদায়'। [3] বিশ্বভারতী পত্রিকা ফাল্গুন ১৩৪৯ পৃ ৫৩০-৫৩১।

এগুলিকে বঙ্গদর্শনের পিলোরিতে চাপিয়ে দেয় তাহলে শুকিয়ে মারা যাবে—এবা নিতান্ত অন্তঃপুরের খেলাঘরের জিনিষ—হাটবাটের জিনিষ নয়।"

বঙ্গদর্শনে একটি মাত্র কবিতা বাহির হইয়াছিল।

৭

কবি রবীন্দ্রনাথকে পিছনে ফেলিয়া মানুষ রবীন্দ্রনাথ সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন নৈবেদ্যে। কর্ম্মজীবনের একটা সুস্পষ্ট আদর্শ তাঁহার কাছে প্রকটিত হইয়াছে এবং তিনি চিন্তায় কর্ম্মে সেই আদর্শটিকে অবলম্বন করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠায় এবং গানে প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় দেশের চৈতন্য উদ্বুদ্ধ করিবার প্রচেষ্টায় তাহার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের মধ্যে মানুষটির অপেক্ষা কবিটিই ছিলেন গুরুতর, তাই অচিরে কবি রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। কর্ম্মের বন্ধন শ্লথ হইয়া আসিল এবং কল্পনার শাখা ডালপালা মেলিয়া ধরিতে লাগিল। পত্নীর ও মধ্যমকন্যার মৃত্যু কবি-চিত্তের আত্মপ্রকাশ দ্রুততর করিয়াছিল।

'উৎসর্গ'[১] কাব্যে যে কবিতাগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশে কবিস্বরূপের পুনরাত্মপ্রকাশপ্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। নৈবেদ্যের অব্যবহিত পরে রচিত কবিতাগুলিতে নৈবেদ্যেরই ভাবানুসরণ দেখা যায়।[২] তখনো কবি তত্ত্বদৃষ্টি একেবারে বর্জ্জন করেন নাই, দ্বৈতাদ্বৈতবাদের রহস্য তখনো কবিচিত্তে কুতূহল জাগাইয়া রাখিয়াছে।[৩] নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যেও কবি এই দ্বৈতরূপের সন্ধান পাইয়াছেন,—একটি মানুষ, অপরটি কবি বা অতিমানুষ। শেষের রূপেই তাঁহার

[১] ১৩২১ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। তৎপূর্ব্বে কাব্যগ্রন্থের (১৩১০) বিভিন্ন অংশে প্রকাশিত। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৩০৮-১০। অধিকাংশ কবিতা ১৩০৮-১০ সালে বঙ্গদর্শনে এবং দুইএকটি ১৩০৯-১০ সালে সমালোচনী ইত্যাদি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকগুলি কবিতা মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন অংশের প্রবেশক রূপে রচিত হইয়াছিল। রচনাকাল হিসাবে 'উৎসর্গ' স্মরণ ও শিশু কাব্যের সমসাময়িক। ভাবের দিক দিয়া ইহা নৈবেদ্য ও খেয়া কাব্যের মাধ্যমিক। [২] কবিতাসংখ্যা ১৬, ২১, ২২, ২৪-৩০। প্রথমটি ও শেষের সাতটি কবিতা কাব্যগ্রন্থের 'স্বদেশ' অংশেও সঙ্কলিত আছে। [৩] কবিতাসংখ্যা ২২ ('কবির বিজ্ঞান' বঙ্গদর্শন ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যা)।

যথার্থ পরিচয় নিহিত আছে, এই রূপেই কবিসত্তা অতিমর্ত্ত্য নিখিলের অংশ, বিশ্বলীলার রসিক।

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে,
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদধান্যে যে আভা আভাসে নাচে
কিরণে কিরণে হসিত হিরণে-হরিতে,
সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া,
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া,
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া ;—
আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে ?[1]

স্বপনবিহারী কবিচিত্ত জনতারণ্যে দীপ্তমধ্যাহ্ন-আলোকে বিশ্বদেবতাকে আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারিল না, তাঁহাকে আহ্বান করিল প্রদোষের অন্ধকারে অন্তরের নির্জ্জন নিভৃত একান্তে।

মোর কিছু ধন আছে সংসারে
বাকি সব আছে স্বপনে
নিভৃত স্বপনে।...
রাজপথ দিয়া আসিয়ো না তুমি
পথ ভরিয়াছে আলোকে
প্রখর আলোকে।...
এস প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে
এসোনা পথের আলোকে
প্রখর আলোকে ![2]

বিশ্বদেবতার মধ্যে জীবনদেবতাকে ধরাছোঁয়া যায় না। একান্তভাবে আপনার অন্তরের ধন জীবনদেবতা লীলাচুর্ললিত, ক্ষণে ক্ষণে ধরা দিয়া তিনি ক্ষণে ক্ষণে

[1] ঐ ২১ ('কবিচরিত' বঙ্গদর্শন ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যা)। [2] ঐ ৩।

লুকাইয়া পড়েন। জীবনদেবতার এই রহস্যলীলা কবির অন্তরকে টানিতেছে অনিবার আকর্ষণে।

তোমারে পাছে সহজে ধরি
কিছুরি তব কিনারা নাই,
দশের দলে টানি গো পাছে
বিরূপ তুমি, বিমুখ তাই।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব
ছলনা,
যে পথে তুমি চলিতে চাও
সে পথে তুমি চল না![1]

অন্তরতমের জন্য অবোধ ব্যাকুলতা অন্তরের মধ্যে হাহাকার জাগাইতেছে, অধরাকে ধরিবার জন্য কবিচিত্ত সুদূরের পিপাসা বক্ষে লইয়া আপন গন্ধে পাগল কস্তুরীমৃগের মত বনে বনে উন্মনা হইয়া ফিরিতেছে। অস্ফুট বাসনার মধ্যে সাধনার যে চকিত আভাস মিলে তাহাও চরিতার্থ হইবার নয়।

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম!
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে
বক্ষে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না![2]

কবির অন্তরে যেন এক বিরহিণী নারী দিন গুণিতেছে অজানা প্রিয়ের প্রতীক্ষায় অশান্তচিত্তে।

দিন চলে যায়, সে কেবল হায়
ফেলে নয়নের বারি।

[1] ঐ ৪। [2] ঐ ৭।

"অজানারে কবে আপন করিব"
কহে বিরহিণী নারী।[১]

অজানা-প্রিয় কিন্তু অচেনা নয়।

তোমায় জানি না চিনি না এ কথা বল ত
কেমনে বলি?
খনে খনে তুমি উঁকি মারি' চাও
খনে খনে যাও ছলি![২]

বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যপ্লাবনে আচম্বিতে তাহার ঘোমটা খসিয়া পড়ে, অন্তরের অকারণ বেদনা-আনন্দ মুহূর্তের জন্য তাহার আবির্ভাব ঘোষণা করে। এই চকিত উপলব্ধি কবি কাব্যে-গানে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সে চেষ্টার সার্থকতা সম্বন্ধে সংশয় ঘুচিতেছে না।

তোমায় খনে খনে আমি বাঁধিতে চেয়েছি
কথার ডোরে।
চিরকাল তরে গানের সুরেতে
রাখিতে চেয়েছি ধরে'।
সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ
বাঁশীতে ভরেছি কোমল নিখাদ,
তবু সংশয় জাগে—ধরা তুমি
দিলে কি?[২]

এই সংশয়ের সান্ত্বনা কবি অন্তরেই অনুভব করেন;

ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।[৩]

শুধু অন্তরপ্রকৃতিতে নয় বহিঃপ্রকৃতির মধ্যেও কবিচিত্ত সান্ত্বনাবাণী অনুভব

[১] ঐ ১০। [২] ঐ ৬। [৩] ঐ ৯ ('অস্ফুট,' সমালোচনী আশ্বিন ১৩০৯)।

করিয়াছে।[1] শুক্লসন্ধ্যার চন্দ্রালোক রাজহংসের শুভ্রপক্ষ বিস্তার করিয়া কবি-চিত্তদময়ন্তীর নিকট প্রিয়পরিচয়বার্তা বহন করিয়া আনিল।

আর কিছু বুঝি নাই, শুধু বুঝিলাম
আছি আমি একা।
এই শুধু জানিলাম
জানি নাই তার নাম
লিপি যার লেখা।
এই শুধু বুঝিলাম
না পাইলে দেখা
রব আমি একা।[2]

অন্তরতমের সঙ্গে সম্বন্ধ আজিকার নয়, উভয়ে co-eternal; সৃষ্টির আদিকাল হইতে উভয়ের অন্তরঙ্গ মিলন ঘটিয়া আসিয়াছে। অন্তরতমই কবির আত্মায় নিজেকে নূতননূতনভাবে প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন।

হে চির-পুরাণো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া;
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া।[3]

কবির অন্তর ও তাঁহার অন্তরতম উভয়ে উভয়ের মধ্যে চরম সার্থকতা খুঁজিতেছে। অন্তরতমের মধ্যে অন্তরের পূর্ণতা এবং অন্তরের মধ্যে অন্তরতমের রসায়ন।[4] পরমাত্মা আসিতেছেন ভাব হইতে রূপে, জীব যাইতেছে রূপ হইতে ভাবে। এই দ্বৈতছন্দেই বিশ্বলীলার দোল।

প্রলয় সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,

[1] ১১ ('চিঠি', বঙ্গদর্শন ভাদ্র ১৩১০)। [2] ঐ ২৩ ('শুক্লসন্ধ্যা', বঙ্গদর্শন আশ্বিন ১৩০৯)।
[3] ঐ ১৩।

বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।[১]

জন্মমৃত্যুও এই লুকোচুরি-খেলার অঙ্গ।

ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া
কি যে কর কেবা জানে![২]

ব্যক্তিগত সুখদুঃখ-লাভক্ষতি-বোধের অতীত হইয়া নিরাসক্ত দর্শকের আসন গ্রহণ করিলে বিশ্বলীলানৃত্যের রহস্যে প্রবেশ করা যায়।

ওরে মন আয় তুই সাজ ফেলে আয়,
মিছে কি করিস্ নাট-বেদীতে?
বুঝিতে চাহিস্ যদি বাহিরেতে আয়
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে!...
নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি![৩]

এই মহানাটকের নাটশালার তোরণদ্বারে কবির উপর ভার পড়িয়াছে বাঁশি বাজাইবার। বিশ্বরাসের আনন্দরসাস্বাদ পাইয়া কবি তাহাই বিলাইয়া দিতেছেন তাঁহার কাব্যে, গানে ও সুরে। যাহারা এই নাটশালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত অচেতন তাহাদের চিত্তও কবির বাঁশির সুরে ক্ষণকালের জন্য উতলা হয়।

বাঁশি লই আমি তুলিয়া।
তারা ক্ষণতরে পথের উপরে
বোঝা ফেলে বসে ভুলিয়া।[৪]

১ ঐ ১৭। ২ ঐ ২১ ('বিশ্ব-দোল,' বঙ্গদর্শন পৌষ ১৩০৯)। ৩ ঐ ৪০। ৪ ঐ ১৯ ('বাদক,' সমালোচনী কার্ত্তিক ১৩০৯)।

বর্ষারম্ভের মেঘোদয়ে কবিচিত্ত প্রিয়সমাগমপ্রত্যাশায় উৎকণ্ঠ হইয়া উঠে, কবিচিত্ত-আকাশ জুড়িয়া বলাকাদল অজানা কোন্ দূর সমুদ্রপারের উদ্দেশে উড়িয়া যায়। নবীন মেঘরাশি যখন বাহিরের জগৎকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনে তখন কবিচিত্তে জন্মজন্মান্তরের সুপ্তস্মৃতি জাগ্রত হইয়া সার্থকতা খুঁজে।

কত প্রিয়মুখের ছায়া
কোন দেহে আজ নিল কায়া,
ছড়িয়ে দিল সুখদুখের রাশি,
আজকে যেন দিশে দিশে
ঝড়ের সাথে যাচ্চে মিশে
কত জন্মের ভালবাসাবাসি।[১]

বর্ষায় কবিচিত্তে ঘনাইয়া উঠে প্রিয়মিলনের উৎকণ্ঠা, আর গ্রীষ্মের দিগন্তবিস্তৃত রৌদ্রপ্লাবনে আসে রোমান্টিক স্বপ্নালসতা। তখন জীবনের দুঃখসুখ আশানিরাশা প্রেমবৈরাগ্য কিছুই তাঁহাকে আকৃষ্ট করে না। নদীকূলে তৃণসমাকীর্ণ তরুচ্ছায়ায় নিলীন হইয়া কবিচিত্ত উৎকর্ণ হইয়া শোনে

দূর আকাশের ঘুমপাড়ানি মৌমাছিদের মনহারানি
জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান,
জলের গায়ে পুলক-দেওয়া ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে-নেওয়া
চোখের পাতে ঘুম-বোলানো তান![২]

এই স্বপ্নবিলাস অকস্মাৎ কিশোরপ্রেমস্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করিল।[৩] এই স্মৃতিচিত্রে কবিকল্পনায় ব্যাকুলবেদনার ম্লানিমা ঘনাইয়াছে। এমনটি ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই।

[১] ঐ ৩৬ ('মেঘোদয়ে,' বঙ্গদর্শন আষাঢ় ১৩১০)। [২] ঐ ৩৮ ('চৈত্রের গান,' বঙ্গদর্শন বৈশাখ ১৩১০)। [৩] ঐ ৪৩ ('যাত্রিণী,' বঙ্গদর্শন জ্যৈষ্ঠ ১৩১০), ঐ ৩৯ ('সন্ধ্যা,' বঙ্গদর্শন জ্যৈষ্ঠ ১৩১০)।

৮

গতজীবনের ক্লান্তি-অবসাদের মধ্যে আগামী জীবনের পূর্ণতার জন্য ধ্যানস্তব্ধ আত্মমুখী প্রতীক্ষা 'খেয়া'[১] কাব্যের মর্ম্মকথা। কাব্যটির মূল সুর বাজিয়াছে 'পথের শেষ'-এ। ক্ষণিকার পথের নেশা,—

নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ,
বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক,
প্রতিপদেই অন্তর উৎসুক
অজানা কোন নিরুদ্দেশের তরে,—

ছুটিয়া গিয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন,

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়া-তরী ভাসা।
জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি,
ছেড়েছি আজ অকস্মাতের আশা।

আনন্দরূপের মধ্যে সুখ আছে দুঃখও আছে। দুঃখবেদনার ও ত্যাগের মধ্যেই আনন্দের অমৃতরূপ প্রকাশিত হয়। খেয়ার অধিকাংশ কবিতায় জীবনের বিচিত্র ব্যথাবেদনার মধ্য দিয়া চরম প্রেয়োলাভের ব্যাকুলতার প্রকাশ। 'শেষ খেয়া,' 'ঘাটের পথ,' 'শুভক্ষণ,' 'বিদায়,' 'দীঘি' ইত্যাদি কবিতায় ইহা মিষ্টিক রূপ ধরিয়াছে। অন্তরতম-প্রিয় হইতেছেন পথিকরাজা আর কবিচিত্ত হইতেছে গৃহকোণে প্রতীক্ষমানা দীনা বাসকসজ্জা বধূ—ইহাই খেয়া কাব্যের প্রধান রূপক।

[১] ১৩১৩ সালে প্রকাশিত। কবিতাগুলি আষাঢ় ১৩১২ হইতে আষাঢ় ১৩১৩ মধ্যে রচিত।

'আগমন,' 'দুঃখমূর্তি,' 'প্রভাতে,' 'দান' ইত্যাদি কবিতায় চরম দুঃখের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির আনন্দ কবিকল্পনার বিচিত্র রাগে প্রতিফলিত হইয়াছে।

তুমি যে আছ বক্ষে ধ'রে
বেদনা তাহা জানাক্ মোরে,
চা'ব না কিছু, ক'ব না কথা,
চাহিয়া র'ব বদনে হে!
নয়নে আজি ঝরিছে জল,
ঝরুক্ জল নয়নে হে![1]

উৎসর্গে কবিচিত্তের সংশয়ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে অন্তরতমের সুস্পষ্ট পরিচয় না পাইয়া। খেয়ায় অপরিচয়ের সংশয় কাটিয়া গিয়াছে, সব অশান্তি ব্যাকুলতা স্থির হইয়া আসিয়াছে স্তব্ধ উৎকর্ণ প্রতীক্ষায়।

আমি এখন সময় করেছি—
তোমার এবার সময় কখন্ হবে?
সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি—
শিখা তাহার জালিয়ে দেবে কবে?
নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা,
তরী আমার বেঁধে এলেম ঘাটে,—
পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা
কেনাবেচা নানান্ হাটে হাটে।[2]

রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে বর্ষার মেঘমেদুরতা যেমন প্রিয়াগমনসম্ভাবনার উৎকণ্ঠা আনিয়া দেয় শেষবসন্তের ও গ্রীষ্মের আলোকপ্লাবন তেমনি স্বপ্নালসতার সঞ্চার করে। খেয়াতেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। চৈত্র-বৈশাখে রচিত 'নিষ্ক্রমণ,' 'কুয়ার ধারে,' 'জাগরণ,' 'বৈশাখে,' 'দীঘি' ইত্যাদি কবিতায় নৈসর্গিক আনন্দময়

[1] 'দুঃখমূর্তি'। [2] 'প্রতীক্ষা'।

পরিবেশে কবিচিত্তে স্বপ্নালসতার স্পর্শ লাগিয়াছে। কর্ত্তব্যের আহ্বান পুনঃপুন আসিলেও উৎসাহের সঞ্চার হইতেছে না।

ওগো ধন্য তোমরা সুখের যাত্রী,
ধন্য তোমরা সবে!
লাজের ঘায়ে উঠিতে চাই,
মনের মাঝে সাড়া না পাই,
মগ্ন হলেম আনন্দময়
অগাধ অগৌরবে,—
পাখীর গানে, বাঁশীর তানে,
কম্পিত পল্লবে![১]

দীর্ঘ দিনমানে প্রাত্যহিক তুচ্ছ কর্ত্তব্যের দাহ, "বাক্যহারা স্বপ্নভরা" কর্ম্মহীন রাত্রিতে অন্তরতমের প্রতীক্ষা। ইহার মধ্যে শুধু গোধূলির সময়টুকুতেই কবিচিত্তের অভিসারের অবকাশ;

তারি মাঝে দীঘির জলে যাবার বেলাটুকু,
একটুকু সময়,
সেই গোধূলি এল এখন, সূর্য্য ডুবুডুবু,
ঘরে কি মন রয়?[২]

'দীঘি' কবিতায় পাই কবিচিত্তের এই ক্ষণিক স্নিগ্ধালসতার বর্ণদীপ্ত, ব্যঞ্জনাময় চিত্র।

দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ঐ পারে
জলের কিনারায়,
পথ চল্‌তে বধূ যেমন নয়ন রাঙা ক'রে
বাপের ঘরে চায়।

[১] 'নিরুদ্যম'। [২] 'দীঘি'।

বর্ষাঘটিত কবিতাগুলিতে প্রতীক্ষমাণ বিরহিণী-কবিচিত্তের ভাবোচ্ছ্বাস অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথায় শান্ত হইয়া আসিয়াছে। গ্রীষ্মের দাবদাহ যখন বর্ষাধারায় জুড়াইয়া আসে তখন কবিচিত্তের সমস্ত হৃদয়ভার ঝরিয়া পড়ে গানের সুরে।

আমার এ গান শুন্‌বে তুমি যদি
শোনাই কখন বল ?
ভরা চোখের মত যখন নদী
ক'রবে ছল-ছল।[১]

তখন অন্তর ভরিয়া উঠিবে অন্তরতমের উপলব্ধিতে,

আষাঢ়-রাতের সভায় তব
কোনো কথাই নাহি ক'ব
বুক দিয়ে সব চেপে ল'ব
নিখিল আঁকড়ি।[২]

কবিচিত্তের এই আনন্দরসই বর্ষাপ্রভাতের অপরূপ সৌন্দর্য্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।[৩]

ওগো পারিজাতের কুঞ্জবনে
স্বর্গপুরীতে
মৌমাছিরা লেগেছিল
মধু-চুরিতে।
আজ প্রভাতে একেবারে
ভেঙেছে চাক সুধার ভারে,
সোনার মধু লক্ষধারে
লাগে ঝুরিতে।

[১] 'গান শোনা'। [২] 'বর্ষা-সন্ধ্যা'। [৩] 'বর্ষাপ্রভাত'।

বর্ষণধৌত আলো-ঝলমল বর্ষাপ্রভাতের সৌন্দর্য্যের রহস্যটুকু কবি ধরিয়া দিয়াছেন অপূর্ব্ব উৎপ্রেক্ষায়,

ওকি সুরপুরীর পর্দ্দাখানি
নীরবে খুলে
ইন্দ্রাণী আজ দাঁড়িয়ে আছেন
জানালা-মূলে ?

এই প্রশান্ত আনন্দবোধই কবিচিত্তকে পৌঁছাইয়া দিল রসের স্বর্গলোকে, যেখানে

নীল আকাশের হৃদয়খানি
সবুজ বনে মেশে,
যে চলে সেই গান গেয়ে যায়
সব-পেয়েছির দেশে।[১]

খেয়ার কবিতায় ভাষার ললিতসরল মাধুর্য্য ও ছন্দের লঘু চাপল্য ভাবের সম্পূর্ণ অনুগত।

১ 'সবপেয়েছির দেশ'।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গীতোচ্ছ্বাস

১

রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্মের প্রকাশ কবিতায়, জীবধর্ম্মের প্রকাশ গানে। তাঁহার কবিধর্ম্ম ও জীবধর্ম্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং তাঁহার কবিতা ও গান অনেকটা সমধর্ম্মী। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে সব সময়ে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। তবে মোটামুটি এই কথা বলিতে পারা যায় যে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্মের মধ্যে প্রতীক্ষানম্রতা বা passivity আছে, অভিসরণ বা quest নাই, এবং তাঁহার গানে চিত্তের অভিসরণশীলতা প্রতীক্ষানম্রতাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি
বাহির মনে,
চিরদিবস মোর জীবনে।[১]

অন্তরবেদনা গাঢ়তর হইলে কবিধর্ম্মের উপরে জীবধর্ম্ম প্রবল হইয়া ইষ্টের উদ্দেশে গানে-সুরে উৎসারিত হয়।

গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা?
কোন্ সে তাপস আমার মাঝে
করে তোমার সাধনা?
চিনি নাই তো আমি তা'রে,
আঘাত করি বারে বারে,
তা'র বাণীকে হাহাকারে
ডুবায় আমার কাঁদনা।[২]

নৈবেদ্যে রবীন্দ্রনাথের নিগূঢ় জীবধর্ম্মের প্রকাশ দেখিয়াছি, এবং সেখানেও গানের প্রাচুর্য্য। উৎসর্গে আর খেয়াতে কবিধর্ম্মের প্রাধান্য ফিরিয়া আসিলেও জীবধর্ম্মেরও প্রকাশ রহিয়াছে। গান লেখা চলিয়াছিল প্রচুরভাবে এই সময়েও।[৩]

[১] গীতাঞ্জলি কবিতা সংখ্যা ১৩২। [২] গীতিমাল্য ঐ ১০৫। [৩] "গান' (১৯০৯) গ্রন্থে সঙ্কলিত।

ইতিমধ্যে (১৩১৪ সালের মাঝামাঝি) কনিষ্ঠ পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুজনিত শোকে কবিধর্ম্ম একেবারে চাপা পড়িয়া গেল কিছু দিনের মত। কবিচিত্তের গূঢ় বেদনা উৎসারিত হইল ভক্তিরসে। 'গীতাঞ্জলি'-তে[1] তাহার মুখ্য প্রকাশ। গীতাঞ্জলির রচনাগুলি গানও বটে কবিতাও বটে। দুইটি ছাড়া[2] সবই গানের ছাঁদে লেখা।

কয়েকটি গানে কবির তত্ত্বদৃষ্টির প্রকাশ লক্ষণীয়। ইহাতে জীবনসাধনার যে গম্ভীর মর্ম্মকথাটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা পূর্ব্বতন সাধকদের রচিত কোন কোন পদে ও গানে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। জীবনের সহজ-অনুভূতির মধ্যেই যে পরম উপলব্ধির চকিত স্পর্শ পাওয়া যায় তাহা বৈষ্ণব-বাউল-সহজিয়া-মরমিয়া সাধকের সাধনার মৌলিক তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের বাণীতে এই তত্ত্ব পরম কবিত্বময় প্রস্ফুট রূপ লাভ করিয়াছে।

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতন আশা করি।[3]

রূপের মধ্যে অরূপের সাধনা কবিরই, সাধারণ জীবধর্ম্মীর নয়। রূপরসের তৃপ্তিতেই কবির সাধনার পূর্ণতা।

অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
এমন সুমধুর।[4]

জীবধর্ম্মের সাধনায় তৃপ্তি নাই; সেখানে অপরিপূর্ণতার বেদনা, জন্ম হইতে জন্মান্তরের আকূতি।

জীবনে যত পূজা
হল না সারা,
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা।[5]

[1] ১৩১৭ সালে প্রকাশিত। গীতাঞ্জলির অধিকাংশ (১০০) কবিতা বা গান ১৩১৭ সালে ২৯শে শ্রাবণের মধ্যে রচিত। অনেকগুলি ১৩১৬ সালে লেখা, কয়েকটি ১৩১৩-১৫ সালে।
[2] কবিতাসংখ্যা ১০৬, ১০৮। [3] ঐ ৪৭। [4] ঐ ১২০। [5] ঐ ১৪৭।

রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের আশংসা,

জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দ-গান বাজে,
সে-গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া মাঝে।
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা সাজে।[১]

তাঁহার জীবধর্ম্মের আকুতি,

নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।[২]

বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যও রবীন্দ্রনাথকে দুইভাবে টানিয়াছে, কবিভাবে এবং জীবভাবে। কবিভাবে রবীন্দ্রনাথ দিবালোকে শরৎসৌন্দর্য্যে তাঁহার অন্তরতমের নয়নভুলানো রূপ অন্তরে বাহিরে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

কোথায় সোনার নূপুর বাজে,
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে, সকল কাজে,
পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে।[৩]

[১] ঐ ১৫। [২] ঐ ৪। [৩] ঐ ১৩।

আর মানুষভাবে কবি গভীর নিশীথে নক্ষত্রাবলীর নির্ণিমেষ নেত্রে, শ্রাবণের বারিধারায়, মানবসংসারের দুঃখসুখে এবং নিজের অন্তরে, অন্তরতমেরই বিরহের উদাস বেদনা অনুভব করিয়াছেন।

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।...
সারানিশি ধরি তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লবদলে শ্রাবণধারায়
তোমারি বিরহ বাজে হে।...
সকল জীবন উদাস করিয়া
কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমারি বিরহ উঠিছে ভরিয়া
আমার হিয়ার মাঝে হে।[১]

২

'গীতিমাল্য'[২] গীতাঞ্জলির ঠিক অনুবৃত্তি নয়। গীতিমাল্যে কবিতাসংখ্যাও গীতাঞ্জলির অপেক্ষা বেশি। গীতাঞ্জলির সব গানে যেমন অন্তরতমকে সাক্ষাৎভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে, গীতিমাল্যে তেমন নয়। গীতিমাল্যে মধ্যে মধ্যে, বিশেষ করিয়া প্রথম অংশে শিলাইদহে লিখিত কবিতাগুলিতে, কবিধর্মের প্রকাশ মুখ্যতর।

এই যে তোমার আড়ালখানি
দিলে তুমি ঢাকা,
দিবানিশির তুলি দিয়ে
হাজার ছবি আঁকা ;—

১ ঐ ২৫। ২ ১৩২১ সালের প্রথম দিকে প্রকাশিত। দুইটি কবিতা ১৩১৬ সালে, একটি কবিতা ১৩১৭ সালে, বাকিগুলি ১৩১৮-১৩২২ (৩ আষাঢ়) মধ্যে রচিত।

এরি মাঝে আপনাকে যে
বাঁধা রেখে ব'সলে সেজে
সোজা কিছু রাখলে না, সব
মধুর বাঁকে বাঁকা।[১]

রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতব্যক্তিত্বে কবিধর্ম জীবনরসের, জীবধর্ম মরণবেদনার, কবিধর্ম মিলনের, জীবধর্ম বিরহের। গীতিমাল্যের কয়েকটি কবিতায় কবিধর্মের সঙ্গে জীবধর্মের দ্বন্দ্ব প্রকটিত হইয়াছে। 'অস্তিনাস্তি'র এই দ্বন্দ্ব গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয়। কবিধর্মের কাছে যে-অনুভূতি সহজ-আনন্দের মধ্য দিয়া ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাত হয় তাহাকে চিরদিনের জন্য ধরিয়া রাখিবার কঠিন সাধনাই জীবধর্ম। তাই কবি বলিয়াছেন,

সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।
বড় কঠিন সাধনা, যার
বড় সহজ সুর।[২]

অন্তরের পরম বেদনার 'নাস্তি'র ক্রন্দন যখন বিশ্বপ্রপঞ্চের 'অস্তি'র সুরে মিলিয়া যায় তখনি দ্বন্দ্ব যায় মিটিয়া চিরদিনের জন্য।

"এই যে তুমি" এই কথাটি
বলব আমি ব'লে
কত দিকেই চোখ ফেরালেম
কত পথেই চ'লে।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষধারায়
"আছ-আছ"-র স্রোত ব'হে যায়
"কই তুমি কই" এই কাঁদনের
নয়নজলে গলে।[২]

[১] কবিতাসংখ্যা ১৫। [২] ঐ ১৪।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের দ্বৈতমধ্যে যিনি কবি তিনি যেন তপস্যানিরত super-ego বা অন্তর্যামী-পরমাত্মা, আর যিনি মানুষ তিনি যেন ego বা জীবনদেবতা-জীবাত্মা। একটি গানে এই দ্বৈতদ্বন্দ্বের অনুভূতির পরিচয় পাই।

গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা?
কোন সে তাপস আমার মাঝে
করে তোমার সাধনা?
চিনি নাই তো আমি তা'রে,
আঘাত করি বারে বারে,
তা'র বাণীকে হাহাকারে
ডুবায় আমার কাঁদনা।[১]

গীতিমাল্যের কবিতায়-গানে জীবনরস ভক্তিরসের উপরে ছাপাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাই জীবনরসদৃষ্টিতে কচিৎ আসন্ন বিচ্ছেদের ম্লান ছায়া পড়িয়াছে।

একদা কোন্ বেলাশেষে
মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার
মুখের পানে চাবে।
পথের ধারে বাজ্‌বে বেণু
নদীর কূলে চ'র্‌বে ধেনু
আঙিনাতে খেলবে শিশু
পাখীরা গান গাবে।[২]

এই সুর রবীন্দ্রকাব্য-ইতিহাসের পরবর্তী যুগে ক্রমশ প্রবলতর হইয়াছে।

[১] ঐ ১০৫। [২] ঐ ৪০।

৩

'গীতালি'[1] কাব্যে গানেরই অনুবৃত্তি চলিয়াছে। শেষের দুইটি কেবল কবিতা। গানের মধ্যে নূতন কোন দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিনবত্ব নাই। শেষের দিকের একটি কবিতায় কবির জীবন্মুক্তিলীলাদৃষ্টির প্রকাশ দেখি। জীবনকে খণ্ডিত, ব্যক্তিগত ভাবে দেখিলেই বন্ধন আর অখণ্ড, সমষ্টিগত ভাবে দেখিলেই মুক্তি

জীবন আমার দুঃখে সুখে
দোলে ত্রিভুবনের বুকে,
আমার দিবানিশির মালা
জড়ায় শ্রীচরণে।
আপন মাঝে আপন জীবন
দেখে যে মন কাঁদে।
নিমেষগুলি শিকল হয়ে
আমায় তখন বাঁধে।[2]

ভাবে রচনাভঙ্গিতে ও ছন্দে শেষের কবিতা দুইটি গীতালির গানগুলি হইতে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক্। এগুলি "বলাকা'-র অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। গীতালির গানে যে কবিচিত্তের অকুণ্ঠিত প্রকাশ হয় নাই তাহার কারণ এই যে ইতিমধ্যে তাহার কবিসত্তা স্বতন্ত্র পথ ধরিয়াছে কবিতারচনায়। বলাকার প্রথম কবিতাগুলি গীতিমাল্যের শেষ কয়টি গানের সমসাময়িক এবং গীতালির রচনা শেষ হইবার পূর্বেই বলাকার একটি বিশিষ্ট কবিতা লেখা হয়। বলাকা কাব্যে রবীন্দ্র-কাব্যজীবনে পশ্চিমের পথ শুরু হইয়াছে। গীতালির শেষ কবিতা দুইটিতে শুনি এই যাত্রারম্ভের স্বস্তিবাচন।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা,

[1] ১৩২১ সালের মাঝামাঝি প্রকাশিত। গান কবিতাগুলি শ্রাবণ হইতে ৩রা কার্ত্তিকের মধ্যে রচিত। শেষ নয়টির রচনাস্থান এলাহাবাদ। [2] কবিতাসংখ্যা ১০৪।

অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া,
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।[১]

৪

বাউল-গানের প্রভাব পড়িয়াছিল পূর্ব্ব হইতেই। শৈশবে শ্রুত গানের টুকরা, "তোমায় বিদেশিনী কে সাজায়ে দিলে", এবং যৌবনে বোলপুরের পথে শোনা ছত্র, "খাঁচার মাঝে অচিন পাখী কম্‌নে আসে যায়," কবি কখনো ভুলিতে পাবেন নাই। 'সাধনা'-র যুগে উত্তর-মধ্যবঙ্গে নদীতীরে বাস করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ বাউল-বৈষ্ণব-দরবেশদের গান শুনিয়াছিলেন প্রচুর এবং তাহাদের সঙ্গীতরস-সাধনার পরিচয় পাইয়াছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির যুগে রবীন্দ্রনাথ উত্তরপশ্চিম ভারতের মরমিয়া কবিদের রচনার পরিচয় লাভ করিলেন। মরমিয়া-বাউল কবিদের মানসপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রসদৃষ্টির সাধর্ম্ম্য ছিল নিবিড়। এখন সেই সাধর্ম্ম্য প্রকাশ-অবসর পাইল রচনায়। নিম্নে উদ্ধৃত জ্ঞানদাস বঘেলির পদটির ভাবের ও উৎপ্রেক্ষার আভাস রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে ও কবিতায় দেখা যায়।

ফজর মে জব আয়া যল্‌চী
পুশাক সুন্‌হলী তেরী,
গমক ভর জব শাঁস লগায়া
চীত জগায়া মেরী।
ধূপমে হম কো কিয়া উদাসা
ক্যা পীড় দূর সমায়া,
গায়া গেরুয়া সুর মগরবী
মরণ সা রৈন আয়া।

[১] কবিতাসংখ্যা ১০৭।

কাগজ কালা হরফ উজালা
ক্যা ভারী খৎ পায়া
ইত্তী রৌনক কেঁ্যা রে ম্যল্‌চী
তুঁহী যাদ ভুলায়া।
ভারী জলসা আজ়ম দাবত
তুঁহী ইক মেহ্‌মান,
খল্‌ক্‌ খল্‌ক্‌ মে খৎ হৈ ফৈলী
মঘ্‌রুর হম ফরমান॥

এই পদটিরও ভাব রবীন্দ্রনাথের রচনায় বহুস্থানে ছড়াইয়া আছে,

চরণ-কবঁল কে লাল পরশ পর
সব সুর সুরভি খেলৈঁ,
পৌন কাঁপত কাঁপত কবঁলবা
মৌন কোইল সব বোলৈঁ।
অথাহ হিরদকে তিবিঁর পরশ পর
সব তার সিতার জাগৈঁ,
বেলি-চমেলিকে মহক ফিরি ফিরি
সব উর পরবেশ মাগৈঁ॥

তুলনীয়,
বুকের কাছে প্রাণের সেতার
গুঞ্জরি নাম কহে যে তা'র,...
শুনেছি সেই একটী বাণী
পথ দেখাবার মন্ত্রখানি
লেখা আছে সকল আকাশ মাঝে গো;[১]

[১] গীতিমাল্য, কবিতাসংখ্যা ১১।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মানসোৎক

১

'বলাকা' (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথের রসদৃষ্টিতে ও কাব্যকলায় নূতন দিক্‌পরিবর্ত্তন সূচন করিল। পূর্ব্বে ক্ষণিকায় এক দিক্‌পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি। সেখানে ভাব যেমন প্রসন্ন সরোবরের মত অগাধ হইয়াও গভীরত্ব গোপন করিয়া আছে ভাষাও তেমনি চটুলশফরোদ্বর্ত্তনের মত লীলাচঞ্চল। বলাকার ভাবকে ঘনবনানীবলয়িত শৈবালাচ্ছন্ন দীঘির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। শৈবালে ও তীরতরুচ্ছায়ে দীঘির গভীরত্ব যেমন অগাধতর বলিয়া প্রতীয়মান হয় বলাকা কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় তেমনি ভাষার ঐশ্বর্য্য ও কাব্যশ্রীর অভিনব চারুতা ভাবগাম্ভীর্য্য বাড়াইয়া দিয়াছে। বস্তুত তত্ত্বের হিসাবে ক্ষণিকার তুলনায় বলাকা দুরূহতর নয়। তবে ক্ষণিকায় কবির আত্মতৃপ্তি ভাষার ও ভাবের উপর প্রসন্নতার আবরণ টানিয়া দিয়াছে আর বলাকায় কবিচিত্তের অতৃপ্তি-উৎকণ্ঠার স্পর্শে ভাব বক্রিমসুর্ভগ এবং ভাষা ওজস্বী হইয়াছে। বলাকার তত্ত্ব ক্ষণিকার তত্ত্বের ঠিক বিপরীত। ক্ষণিকায়ও কবি পথিক, কিন্তু সেখানে পথই লক্ষ্য, পথই চরম, পথের শেষে গন্তব্য স্থানের কোন নির্দ্দেশ অথবা প্রয়োজনীয়তা নাই। বলাকায় কবি-পথিক উন্মনা হইয়াছে পথের শেষের যে ধ্রুবলোক বিরাজ করিতেছে তাহার জন্য, যদিও সে ধ্রুবলোক ধ্যানধারণার সুস্পষ্ট লক্ষ্যপথে আসে নাই। ক্ষণিকায় কবিচিত্তকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিশ্বপ্রকৃতি আবর্ত্তন করিয়াছে সৌরমণ্ডলের মত, আর বলাকায় কবি-আত্মা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সৌরমণ্ডলের মত চলিয়াছে এক বৃহত্তর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অভিমুখে। ক্ষণিকা প্রৌঢ়-যৌবনের কাব্য, তাই ইহার একমাত্র রস হইতেছে মধুর। বলাকা গতযৌবন-জীবনসীমান্তের কাব্য, সেইজন্য কারুণ্যরস ইহার কেন্দ্রীয় কবিতাগুলিকে বৈরাগ্যের ধূসরশ্রীমণ্ডিত করিয়াছে।

ইউরোপে কবির কাব্যপ্রতিভার সমাদর, ইউরোপীয়-জীবনের বিচিত্র কর্ম্মপ্রেতি এবং বিশ্বযুদ্ধের হিংস্র-উন্মাদনা কবিচিত্তে নূতন আহ্বান বহন করিয়া আনিল। সনাতন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও কবি এখন ভারতীয়মানবত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবত্বের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভারতবর্ষ নিজের শিক্ষাদীক্ষা স্বাতন্ত্র্য লইয়াও বিশ্বের দরবারে তাহার বাণীকে জয়যুক্ত করিবে—এই আদর্শ তাঁহার কর্ম্মপ্রেরণাকে নূতন পথে চালিত করিল। ইহার ফলে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিশ্বভারতীতে পরিণতি। বিশ্বমানবত্বের দোহাই দিবার জন্য কবিকে বহুবার ধিক্কার খাইতে হইয়াছে, কিন্তু যাহারা ধিক্কার দিয়াছে এবং এখনো দিতেছে তাহারা কবির বাণী বোঝে নাই, কখনো বুঝিতে পারে না। তাঁহার বিশ্বমানবত্বের ধ্যানধারণার মূলে ছিল ভারতবর্ষের সাধনা, ভারতবর্ষের সর্ব্বভূমিক কল্যাণকামনা। কিন্তু তিনি বাঙ্গালাদেশের কবি, ভারতবর্ষের সাধক হইলেও তাঁহার প্রতিভা মানবসংসারের সর্ব্বত্র ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছে। তাই মানবাত্মার নিপীড়ন, মানুষের অবমাননা যেখানে হউক না কেন তাঁহার অন্তরের কোমলতম স্থানে গিয়া আঘাত করিয়াছে। বলাকা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের আত্মার মধ্যে অতীত-ভবিষ্যতের সমগ্র মানবাত্মার, এমন কি চরাচরাত্মার আকূতি অনুভব করিয়াছেন।

বলাকার কেন্দ্রীয় কবিতা হইতেছে 'বলাকা' (৩৬)। বিষম পয়ারছন্দের উদাত্ত তরঙ্গে, বর্ণনার বিচিত্র বর্ণচ্ছটায়, উৎপ্রেক্ষার অভাবনীয় দীপ্তিতে, কবি-অনুভূতির সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় এবং ভাবের অসামান্য গভীরতায় এই কবিতাটি অতুলনীয়। "সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি" ঝিলমের বক্ষে সন্ধ্যার আঁধার যখন ঘনাইয়া আসিতেছে তখন গিরিতটতলে অস্পষ্ট অন্ধকারে দেওয়ার তরুশ্রেণী মূক আকূতি কবির গূঢ়-অনুভবের রুদ্ধদ্বারে আঘাত হানিল,

> মনে হ'ল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
> বলিতে না পারে স্পষ্ট করি,
> অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে মরিছে গুমরি।

এমন সময় অকস্মাৎ বলাকাপক্ষস্পন্দনে জন্মজন্মান্তরের স্মৃতির বন্ধ দ্বার খুলিয়া:

গেল। বিধুর সন্ধ্যার মৌন শান্তির মধ্যে হংসদূতের বাণী ইতিপূর্বে একাধিব কবিচিত্ত স্পর্শ করিয়াছিল বটে কিন্তু তখন সে বাণীর অর্থ উপলব্ধি হয় নাই, না তখনও কবিচিত্তে জীবনশেষের বৈরাগ্যপ্রস্তুতির সম্ভাবনা জাগে না এখন চিত্ত তো প্রস্তুত ছিলই, উপরন্তু আহ্বানও তীব্রতর।

শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে .
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।···
ঐ পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী,
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।

মূঢ় বিশ্বপ্রকৃতির যে মূক আকৃতি স্তব্ধতার আবরণে নৈঃশব্দ্যের অতলে ছিল তাহা যেন একমুহূর্তে উদ্দাম ধ্বনিতে বাজিয়া উঠিল।

বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্ খানে।"

সৃষ্টির জঙ্গমতা হইতেছে চরমতার অভিমুখে অশ্রান্ত অভিসার—হংসদূতের অকথিত বাণী কবির অন্তর স্পর্শ করিল। আপন অন্তর দিয়া কবি অ মানবের উদ্দাম কামনা অনুভব করিলেন,

তৃণদল
মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা—

১ তুলনীয় রন্ধ্রবিহীন অন্ধকারে পাখার শব্দ মেলে
গেল বকের ঝাঁক। [খেয়া, 'দীঘি'].
দিনের শেষে মলিন আলোয়
কোন নিরালা নীড়ের টানে
বিদেশবাসী হাঁসের সারি
উড়েছে সেই পারের পানে। [গীতিমাল্য, কবিতাসংখ্যা ৪]

মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

বলাকার বিশিষ্ট ভাবানুভূতি দেখা দিল 'ছবি' (৬) কবিতায়।[১] কবিজীবনের আবর্তনের কেন্দ্রস্থলে যে ধ্রুবতারাটি বিরাজ করিতেছে সে তাঁহার কিশোর-প্রেমস্মৃতি, তাঁহার প্রাণের অন্তরতম সুর, তাঁহার কবিত্বের উৎস ; তাঁহার ধ্যানবস্তু তাহারই পরিণাম।

নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ,
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

বিশ্বজগতের স্থিতিকেন্দ্রিক গতিপ্রবাহ কবিচিত্তে যেভাবে আবর্তিত হইয়াছে তাহার প্রথম পরিচয় পাই এই কবিতায়। মরণের কিঙ্কিণী বাজাইয়া যে দুরন্ত প্রাণ-নির্ঝরিণী সহস্রধারায় ছুটিতেছে তাহার তলে তলে একটি স্থির আনন্দরস প্রবহমান। পথের প্রেমে মাতিয়া কবি জীবনস্রোত বাহিয়া চলিয়াছেন, আর তাঁহার কিশোর-প্রেমের আলম্বন জীবনপথ হইতে কোন্ দিন নামিয়া গিয়া মৃত্যুর আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে—আছে শুধু "স্থির রেখার বন্ধনে" বদ্ধ ছবি মাত্র। বাহিরের দৃষ্টিতে এ কথা যতই সত্য হোক্ কবিদৃষ্টিতে একথা মিথ্যা। সে-প্রেম কবিচিত্তে যে অনির্বাণ দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে তাহারই আলোকে কবি জীবনের যাত্রাপথে আগাইয়া চলিয়াছেন পুরানো প্রেমকে নবনব উপলব্ধিতে পূর্ণতরভাবে উপভোগ করিতে করিতে।

মানবাত্মার অভিসারপথে সব কিছুই বর্জন করিয়া যাইতে হয়, এমন কি প্রেমও। কিন্তু প্রেমের মধ্যে অমরতা আছে ; তাহা জীবনের পথের জঞ্জাল নয়, দীপ। কবির অন্তরে কিশোরপ্রেমস্মৃতি যে দীপ্তি দিয়া আসিয়াছে তাহাকে তিনি

[১] রচনাকাল ৩ কার্ত্তিক ১৩২১।

অমরতা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন কাব্যে-গানে। আর সম্রাট শাহজাহান তাঁহ প্রেমের স্মৃতিকে কালজয়ী স্থাপত্য-রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন তাজমহলে।[১] কবি প্রেম, তাঁহার অন্তরের ধন, জীবনের মূলে বাসা লইয়াছে; তাহা ভুলিলেও ভুলিবা নয়।

অন্যমনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল।
ভুলিনে কি তারা
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।[২]

কিন্তু শাহজাহান কবি নন। তিনি সম্রাট, তাঁহার কর্ত্তব্যে নাই

বিলাপের অবকাশ
বারোমাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।[৩]

কবির কাছে "ছবি"-র যে মূল্য শাহজাহানের কাছে তাজমহলের মূল্য তাহাব চেয়ে অনেক বেশি। ইহা প্রেমের স্মারকমাত্র নয়, প্রেমের পুষ্পাঞ্জলিও বটে। শিল্পের অমর মহিমা প্রাপ্ত হইয়া এই প্রেমপুষ্পাঞ্জলি আজ দেশকালের অতীত হইয়া নিখিল নরনারীর প্রেমের স্মারক হইবার অসীম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে।

আজ সর্ব্বমানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষাণ সুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধনা।[৪]

১ 'শা-জাহান' (৭; 'তাজমহল', সবুজপত্র অগ্রহায়ণ ১৩২১)। ২ 'ছবি'। ৩ 'শা-জাহান'।
৪ 'তাজমহল' (৯)।

শাহজাহানের ঐশ্বর্য্যবিলাসের মধ্যে কোন্ দিন তাঁহার চিত্তে ক্ষণকালের জন্য প্রকৃত প্রেমের অমর মহিমা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল,

কখন সহসা

উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।[১]

তাঁহার সেই অন্তরের প্রেম বাহিরে রূপলাভ করিয়াছিল তাজমহলে, অমর প্রেমের অমর স্মৃতিতে। তাজমহল শুধু শাহজাহানের স্থাপত্যকীর্ত্তিমাত্র নয়, এমন কি তাঁহার প্রেমের স্মৃতিচিহ্নমাত্রও নয়। ইহা সেই নির্বন্ধন মানবাত্মার অভিসারপথের পরিত্যক্ত পান্থশালামাত্র।

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,

রুধিল না সমুদ্র পর্ব্বত।…

স্মৃতি-ভারে আমি পড়ে আছি

ভারমুক্ত সে এখানে নাই।[১]

কবির সৃষ্টি কিন্তু অচল তাজমহল নয়।

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,

যেথায় জন্মেছে সেথা আপনারে করেনি অচল।[২]

কবির অন্তরের গভীর ধ্যানোপলব্ধিতে যাহা ক্ষণে ক্ষণে দীপ্ত হইয়া উঠে সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দরস মাটির বুকে ফুলের মতই সহজে ফুটিয়া উঠিয়াছে কাব্যে গানে।

আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,

দেখা দেয় মিলায় পলকে।

বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে

চলে যায় চকিতনূপুরে।[৩]

সম্রাট্ শাহজাহানের পিছুটান, প্রেমের বিরহানন্দ, "সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে" অচল রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু কবির প্রেম তাঁহাকে পশ্চাতে

১ 'শা-জাহান'। ২ 'আমার গান' (১৫)। ৩ 'উপহার' (১০)।

টানে নাই, নবনব জীবনের পথে আগাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাই কবির প্রেমস্মৃতি ধরণীর আনন্দচ্ছবি যুগে যুগে "অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে ঢাকা" "কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে" ফোটা মাধবী ফুলের মত

> কোনো দূর যুগান্তরে বসন্ত-কাননে
> কোনো এক কোণে
> একবেলাকার মুখে একটুকু হাসি
> উঠিবে বিকাশি—
> এই আশা গভীর গোপনে
> আছে মোর মনে।[১]

'ক্ষণিকা'-র পথ বাহিয়া কবি-আত্মা পৌঁছাইয়াছিল 'খেয়া'-ঘাটে। সেখানে বসিয়া কবি-আত্মা-দময়ন্তী যেন বলাকাদূতের পক্ষস্পন্দনে প্রিয়ের উদ্দেশ পাইল। কবির জীবননাবিক, তাঁহার অন্তরতম প্রিয়, তাঁহার দিকে আগাইয়া আসিতেছেন নৌকা বাহিয়া।

> মত্ত সাগর পাড়ি দিল গহন রাত্রিকালে
> ঐ যে আমার নেয়ে।
> ঝড় বয়েছে ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
> আসছে তরী বেয়ে।[২]

কবিচিত্ত-বধূও অভিসার করিয়াছে অজ্ঞাত প্রিয়ভবনের উদ্দেশে।

> আনন্দ-গান উঠুক তবে বাজি
> এবার তবে ব্যথার বাঁশিতে।
> অশ্রুজলে ঢেউয়ের পরে আজি
> পারের তরী থাকুক ভাসিতে।[৩]

কিন্তু আনন্দের সুর তো চিত্তে সব ক্ষণ বাজে না, রস-উপলব্ধিও ভঙ্গ হইয়া

১ 'মাধবী' (১৪)। ২ 'পাড়ি' (৫)। ৩ 'যাত্রাগান' (২০)।

তাই দেহতরী বাহিতে বাহিতে ওপারের ভাবনা মনে দ্বন্দ্ব জাগাইয়া ল কখনো ভয়ের কখনো ভরসার।

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দুদিনের নদী হব পার গো।
তার পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেব ভেলা।
তার পরে তার খবর কী যে ধারিনে তার ধার গো,
তার পরে সে কেমন আলো কেমন অন্ধকার গো।[১]

বলাকায় কবিজীবনের একটি মূলগত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে স্পষ্ট হইয়া। কবি জীবনরসের রসিক, ধরণীর রূপরস পাকে পাকে জড়াইয়া তাঁহার জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছে। অবশেষে

এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন, আর
আমার ভুবন।[২]

তাই যৌবনের সীমান্ত পার হইয়া গিয়া কবি যখন জীবনের অস্তাচলের সম্মুখীন হইলেন তখন শব্দস্পর্শরূপরসের ধরাতল ছাড়িয়া যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে বুঝিয়া এই মনোবেদনা কঠিনভাবে বাজিতে লাগিল কবিচিত্তে,

মোর বাণী
এক দিন এ বাতাসে ফুটিবে না
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,…
মোর কানে কানে
রজনী ক'বে না তার রহস্যবারতা,
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।[২]

এই বেদনা মৃত্যুভয়জনিত নয়, মৃত্যুর সঙ্গে তো কবির বোঝাপড়া অনেকদিন হইয়া গিয়াছে। এ হইতেছে আসন্নপতিগৃহগমনা নববধূর পিতৃগৃহের স্নেহনীড়

[১] 'অজানা' (৩০)। [২] 'জীবন মরণ' (১৯)।

পরিত্যাগের বিদায়ব্যথা। পতিগৃহের প্রতি যতই আগ্রহ ঔৎসুক্য থাকুক ত এখনো অজানা, তবে ভরসা এই যে সেখানে সান্ত্বনার অতিরিক্ত চরিতার্থ অপেক্ষা করিতেছে। কবিচিত্তও জানে যে মৃত্যুর ওপারে সিংহদ্বারে নবজীবন প্রস্তুত।

উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সঙ্গীতের ইঙ্গিতের সাথে

জীবনদেবতার আমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছে এই আশ্বাস বহন করিয়া—

ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারংবার
জীবনের এপার ওপার।[১]

তবুও এপারের বন্ধন ছিন্ন করা তো বড় সহজ নয়।

এই জনমের এই রূপের এই খেলা
এবার করি শেষ;
সন্ধ্যা হোলো, ফুরিয়ে এল বেলা,
বদল করি বেশ।
যাবার কালে মুখ ফিরিয়ে পিছু
কান্না আমার ছড়িয়ে যাব কিছু,
সামনে সে-ও প্রেমের-কাঁদন-ভরা
চির নিরুদ্দেশ।[২]

বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসতাণ্ডবের মধ্যে কবিচিত্ত মৃত্যু-আহ্বানেরই দুর্জ্জয় প্রতিধ্বনি শুনিল। মৃত্যু জীবনের বিচারভূমি ও সংশোধন ক্ষেত্র, মৃত্যুবেদনার মধ্য দিয়াই বিধাতার ক্ষমা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করা যায়, তা সে জাতিই হোক বা ব্যক্তিই হোক। বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়তাণ্ডবে কবি রুদ্রেরই মার্জ্জনাদণ্ডাঘাত লক্ষ্য করিয়াছেন।[৩] তাঁহার অন্তরের বিশ্বাস, এই যে আত্মত্যাগ, এই যে দুঃখের

১ 'যৌবনের পত্র' (১৩)। ২ 'পথের প্রেম' (৪৩)। ৩ 'বিচার' (১১)।

অগ্নিপরীক্ষা, এ-তপস্থার মূল্যে স্বর্গও বিক্রীত হইয়া যায়। সুতরাং

বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না

এত ঋণ ?

রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।

নিদারুণ দুঃখরাতে

মৃত্যুঘাতে

মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা

তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?[১]

২

বলাকার মৃদঙ্গাঘাতগম্ভীর ছন্দ 'পলাতকা' কাব্যে (১৩২৫) তুলিয়াছে একতারার করুণ গুঞ্জন। বলাকাদূতের দূরযাত্রার আহ্বানে মানবাত্মা

সবাই যেন পলাতকা

মন টেকে না কাছের বাসায়।

দলে দলে পলে পলে

কেবল চলে দূরের আশায়।[২]

এই সুদূরের অভিসার শুধু দৈহিক মরণের মধ্য দিয়াই নয় মরণাধিক জীবন্মরণ—মুক্ত প্রাণের তিলে তিলে নিষ্পেষণ, মানবাত্মার চরম অবমাননা—তাহার ভিতর দিয়াও পূর্ণ পরিণতির পথ চলিয়াছে। পলাতকার কাহিনীগুলিকে আশ্রয় করিয়া নির্যাতনমুক্ত পলাতকা মানবাত্মার উদ্দেশে জীবধাত্রীর স্নেহবন্ধন-ব্যাকুলতা যেন কবিহৃদয়ের বেদনাশ্রুতে গলিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। জীবনের এপার-ওপারের বোঝাপড়া হইয়াছে হৃদয়ের গভীরতর রসানুভূতিতে।

যে-কথাটা কান্না হয়ে বোবার মতন ঘুরে বেড়ায় বুকে

উঠল ফুটে বাঁশির মুখে।

বাঁশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া,

যে-পাওয়াটি যায় না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই-পাওয়া।[৩]

[১] 'ঝড়ের খেয়া' (৩৭)। [২] শিশু ভোলানাথ, 'দূর'। [৩] পলাতকা, 'কালো-মেয়ে'।

৩

'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে (১৩২৯) কবিহৃদয় ভিড়ের জগতের বন্দীশালা হইতে পলাইয়া যেন নূতন করিয়া শৈশবের মুক্ত ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে ছুটি পাইল। "আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম।...প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে-শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোক-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।"[১] 'শিশু' রচনাকালে কবিকল্পনার যে বাস্তবভূমিকা ছিল, 'শিশু ভোলানাথ' রচনাকালে তাহা ছিল না, সুতরাং শিশু-ভোলানাথে মানবীয়তা সর্বত্র স্পষ্ট নয়। অনেকগুলি কবিতায় শিশুর দেখা পাই না, শিশুতত্ত্বের স্বরূপ জানিতে পারি। যেমন 'শিশু ভোলানাথ,' 'শিশুর জীবন,' 'দূর,' 'দুই আমি' ইত্যাদি। এগুলিতে কবি যেন নিজের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তত্ত্বদৃষ্টিতে।

বাল্য দিয়ে যে-জীবনের
আরম্ভ হয় দিন,
বাল্যে আবার হোক্ না তাহা সারা।[২]

'বাউল' কবিতায় বাউলের রূপটি জাগিয়া উঠিয়াছে স্পষ্ট করিয়া। বাউলের গৃহবন্ধনহীন মুক্তজীবন কবিহৃদয়ের ব্যাকুলবাসনাকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে সুদূরের প্রতি।

অনেক দূরের দেশ
আমার চোখে লাগায় রেশ
যখন তোমায় দেখি পথে।

তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে কয়েকটি কবিতায় শিশুহৃদয়ের যথার্থ [illegible]ঙ্কার অনাবিল মানবরসের অবতারণা করিয়াছে। এইধরণের কবিতায় মধ্যে শ্রেষ্ঠ

[১] যাত্রী, 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'। [২] 'শিশুর জীবন'।

হইয়াছে 'মর্ত্ত্যবাসী'। জীবনরসের পরমরসিক কবিচিত্তের গোপনকথাটি চিরশিশুর মনের কথায় ধরা পড়িয়াছে।

তোমরা বলো, স্বর্গ ভালো,
সেথায় আলো
রঙে রঙে আকাশ রাঙায়,
সারা বেলা
ফুলের খেলা
পারুলডাঙায়!
হোক্‌না ভালো যত ইচ্ছে—
কেড়ে নিচ্ছে
কেই বা তাকে বলো, কাকী?
যেমন আছি
তোমার কাছেই
তেমনি থাকি।

৪

'পূরবী' (শ্রাবণ ১৩৩২) কাব্যের দুই অংশ, 'পূরবী' ও 'পথিক'।[১] পূরবী অংশে অল্প যে কয়টি কবিতা আছে তাহার অধিকাংশ ১৩৩০ সালে লেখা। বাকিগুলি ১৩২৪, ১৩২৮ ও ১৩২৯ সালের রচনা। 'পথিক' পূরবী মুখ্য অংশ।[২] এই অংশের কবিতাগুলি লেখা হইয়াছিল দক্ষিণ আমেরিকায় এবং দক্ষিণ আমেরিকা গমনাগমনপথে সমুদ্রবক্ষে, কেবল শেষ কবিতাটির রচনাস্থান মিলান (ইটালি)। ইতিপূর্ব্বে সমুদ্রবক্ষে জাহাজে রবীন্দ্রনাথের এমন কবিতাস্ফূর্ত্তি আর দেখা যায় নাই। জাহাজের সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনে তাঁহার প্রতিভা পীড়িত হইত। কিন্তু হারুনা-মারু জাহাজে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ প্রত্যুষে সমুদ্রবক্ষে মেঘমেদুর পূর্ব্বদিগন্তে ম্লান সূর্য্যালোকে অকস্মাৎ কবিচিত্তে কাব্যরসধারা নামিয়া আসিল; কবিচিত্ত

[১] প্রথম সংস্করণে আর একটি অংশ ছিল, 'সঞ্চিতা'। [২] কবিতাসংখ্যা ৬০।

অসম্ভাবিতভাবে নূতন করিয়া সাবিত্রীদীক্ষা লাভ করিল, যে-দীক্ষা কবি প্রথম পাইয়াছিলেন জন্মদিনের ব্রাহ্মমুহূর্তে। কিন্তু এ তো প্রাতঃ-সাবিত্রী নয়, সন্ধ্যা-সাবিত্রী—অধিবাস-আবাহন নয়, নীরাজন-বিসর্জ্জন।

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হ'লো শেষ,
বুকে লও তারে।
শান্তি-অভিষেক হোক্, ধৌত হোক্ সকল আবেশ
অগ্নি-উৎস-ধারে।
সীমন্তে, গোধূলি-লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দূর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর
তা'র স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্ত-সঙ্গীত-ধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক্ সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে।[১]

কিন্তু পূরবীর আসল সুরটি ইহার পূর্ব্বেই বাজিয়াছিল 'শেষ অর্ঘ্য' কবিতায়। যে-কবিতায় বলাকার পূর্ব্বাভাস সেই 'ছবি'-র অনুবৃত্তি হইয়াছে এই কবিতায়। ঘুরিয়া ফিরিয়া কিশোরপ্রেমের স্মৃতিই অনুরণিত হইয়াছে পূরবী কাব্যে। যে সুন্দরী আনিয়া দিয়াছিল

ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে

আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে কবিচিত্ত তাহারি সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িতে ব্যাকুল হইয়াছে।

বলাকার নিরুদ্দিষ্ট অব্যক্ত উৎকণ্ঠা পূরবীর তানে আসন্নবিচ্ছেদব্যাকুলতার অশ্রুধারায় বিগলিত হইয়াছে। একদিকে জীবনের ক্লান্তিভার,

কিন্তু আমি তারি লাগি', অন্তর তৃষিত—
কত দূরে আছে সেই খেলা-ভরা মুক্তির অমৃত।[২]

[১] 'সাবিত্রী'। [২] 'শেষ'।

অপর দিকে

নীলকান্ত আকাশের থালা,

তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা[১]

পরিত্যাগ করিয়া যাইবার দিন আসন্ন হইয়া আসিতেছে বলিয়া মনোবেদনা,—"ইমনে আজ বাঁশী বাজে মন যে কেমন করে"। তাই আজ সুদূর বিদেশে পৃথিবীর অপর প্রান্তে প্রবাসী কবিচিত্তে পরিচিত-অপরিচিত তুচ্ছতম বস্তু পরম মহার্ঘ্যতার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়াছে। কোন্ এক বিস্মৃত সন্ধ্যায় ভুবনডাঙ্গার মাঠে তুচ্ছ আকন্দ ফুলের করুণ ভীরু গন্ধ পরীর কণ্ঠে বিনাভাষার বাণী বাতাসে বাজাইয়া দিয়া আনমনা কবিকে ক্ষণিকের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল এবং কবিও স্বীকার করিয়াছিলেন, "তোমার আসন কাব্যে দেবো পেতে।" বহুকাল পরে

সেই কথা আজ প'ড়্‌লো মনে হঠাৎ হেথায় এসে

সাগর-পারের দেশে,—

মন-কেমনের হাওয়ার পাকে অনেক স্মৃতি বেড়ায় মনে ঘুরে'

তারি মধ্যে বাজ্‌লো করুণ সুরে[২]—

তখন "কাব্যের দুয়োরাণীর" উদ্দেশ্যে তাঁহার সকৃতজ্ঞ অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া কবি কৃতজ্ঞতার বোঝা লঘু করিলেন।

অবজ্ঞায় নির্জ্জনতা তোমারে দিয়েছে কাছে আনি,'

সন্ধ্যার প্রথম তারা জানে তাহা, আর আমি জানি।

নিভৃতে লেগেছে প্রাণে তোমার নিঃশ্বাস মৃদুমন্দ,

নম্র-হাসি উদাসী আকন্দ।[২]

'লিপি' কবিতায় ধরণীর মধ্যে কবিচিত্তবিরহিণী নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখিতেছে। যৌবনসাধনার দিনে জীবনরসে উপচীয়মান কবিচিত্ত বসুন্ধরাকে আদিজননীরূপে কল্পনা করিয়া তাহার বিরাট প্রাণের মাঝে নিজের হৃৎস্পন্দন অনুভব করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল। কবিচিত্ত আর ধরণীর একদেশ নয়, সমগ্র ধরণীকে

১ 'পঁচিশে বৈশাখ'। ২ 'আকন্দ'।

আত্মসাৎ করিয়াছে। ধরণী এখন আর মাতৃরূপিণী নয়, এখন সে পিতৃগৃহ-প্রবাসিনী বিরহিণী বধূর মত প্রিয়প্রেমলিপির উত্তর কিছুতেই মনের মত করিয়া লিখিতে পারিতেছে না। মাটির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমুদ্রদোলায় দুলিতে দুলিতে কবি ধরণীর সহিত একাত্মতা অনুভব করিতেছেন,

তোমারি মনের কথা আমারি মনের কথা টানে,
চাও মোর পানে।
চকিত ইঙ্গিত তব, বসনপ্রান্তের ভঙ্গীখানি
অঙ্কিত করুক মোর বাণী।

'মুক্তি' কবিতায় কবিচিত্তে মুক্তিরসোপলব্ধির কল্পনা। জীবনে মুক্তির আনন্দ কবিচিত্তে সাড়া জাগায় সঙ্গীতের মধ্য দিয়া, কবিচিত্ত পরিপূর্ণতার সুধাস্বাদ লাভ করে সুরের সুরলোকে,

সেথা আমি খেলা-ক্ষ্যাপা বালকের মত লক্ষ্মীছাড়া,
লক্ষ্যহীন নগ্ন নিরুদ্দেশ।
সেথা আমি চিরনব, সেথা মোর চিরন্তন শেষ।

যেদিন কবিসত্তার সুর চিরন্তনশেষের গানে একতানে মিলিয়া যাইবে বিশ্বরাস-নৃত্যের তালে, সেদিন চরমমুক্তির সঙ্গমতীর্থে কবির সাধনা সিদ্ধিলাভ করিবে সেদিন

নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
ছন্দে তালে ভুলিব আপনা,
বিশ্বগীত পদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্ত ভাবনা।···
সেদিন আমার রক্তে শুনা যাবে দিবসরাত্রির
নৃত্যের নূপুর।
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশ-যাত্রীর
আলোক-বেণুর।
সেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত,
আমার হৃদয় হবে কিংশুকের রক্তিমা-লাঞ্ছিত;

সেদিন আমার মুক্তি, যবে হবে, হে চির-বাঞ্ছিত,
তোমার লীলায় মোর লীলা,—
যেদিন তোমার সঙ্গে গীত-রঙ্গে তালে তালে মিলা।

কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের রসদৃষ্টির গভীরতা প্রকাশ পাইয়াছে অপূর্ব্ব ভাষায় ও অপূর্ব্বতর কল্পনায়।

যে-উপলব্ধি হইতে ঋষি-কবির বাণী উদ্গীত হইয়াছিল, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" সেই-উপলব্ধি হইতে রবীন্দ্রনাথ অতিমৃত্যু জীবনের জয়গান করিয়াছেন 'কঙ্কাল'-এ,

ভেবেছি জেনেছি যাহা, ব'লেছি শুনেছি যাহা কানে,
সহসা গেয়েছি যাহা গানে
ধ'রেনি তা মরণের বেড়া-ঘেরা প্রাণে,
যা পেয়েছি, যা ক'রেছি দান
মর্ত্ত্যে তার কোথা পরিমাণ ?···
আমি-যে রূপের পদ্মে ক'রেছি অরূপ-মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।

'তপোভঙ্গ'[১] কবিতায় কালিদাসের কুমারসম্ভবের আভাস লইয়া রবীন্দ্রনাথ চির-সুন্দরের জয়গান গাহিয়াছেন। কবিতাটিতে উদাত্ত কবিকল্পনার সঙ্গে ছন্দঃস্পন্দ, ধ্বনিসাম্য ও বাক্‌প্রৌঢ়ির অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে। যেমন,

কালের রাখাল তুমি সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।

[১] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৩০ "যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি" নামে।

নির্জ্জন প্রান্তর তলে
আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।
চঞ্চল মুহূর্ত্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিবদ্ধ হ'য়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
শান্ত হয়ে আসে।

কবিতাটি কল্পনার 'বৈশাখ'-এর পরিপূরক।

'প্রবাহিণী' (অগ্রহায়ণ ১৩৩২) গানের বই। 'লেখন' (কার্ত্তিক ১৩৩৪) কবির স্বহস্তলিপিতে ছাপা। ইহাতে কণিকার ধরণের অনেকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা আছে। কতকগুলি ইংরেজি ছত্রও আছে, তাহাব অনেকগুলি বাঙ্গালার অনুবাদ। বাঙ্গালা ও ইংরেজি কবিতাগুলি প্রধানত অটোগ্রাফ হিসাবে রচিত হইয়াছিল।[১] এই দুইচাবিছত্রের কবিতাকণাগুলিতে রবিরশ্মি ঠিকরাইয়া উঠিয়াছে তীব্র উজ্জ্বলতায়। যেমন,

ভারী কাজের বোঝাই তরী কালের পারাবাবে
পাড়ি দিতে গিয়ে কখন্ ডোবে আপন ভারে।

[১] ভ্রমক্রমে প্রিয়ম্বদা দেবীর সাড়ে পাঁচটি কবিতা লেখনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (পত্র ২৩)। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য দ্রষ্টব্য ['লেখন,' প্রবাসী কার্ত্তিক ১৩৩৫ পৃ ৩৮-৪০]। "তোমারে ভুলিতে মোর," "ভোর হতে নীলাকাশ," "আকাশ গহন মেঘে," "প্রভু, তুমি দিয়েছ,' ও "শুধু এইটুকু সুখ" ইত্যাদি কণিকাগুলি যথাক্রমে 'অভীষ্ট,' 'কল্পনা-সম্বল,' 'শুভক্ষণ,' 'দুর্বলের অপরাধ' ও 'বিসর্জ্জন' নামে ১৩০৯ সালের বঙ্গদর্শনের শ্রাবণ, আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায় স্বাক্ষরবিহীনভাবে প্রথমপ্রকাশিত হইয়াছিল। তখন রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদক। যাঁহার নির্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভুল করিয়া কণিকাগুলিকে লেখনে স্থান দিয়াছিলেন তিনি বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে বঙ্গদর্শনের স্বাক্ষরবিহীন সব রচনাই বুঝি রবীন্দ্রনাথের। 'বিসর্জ্জন' কবিতার মাঝের দুই ছত্র মাত্র লেখনে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'পত্রলেখা'-র পাণ্ডুলিপি পড়িবার অনেককাল পূর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন-সম্পাদক হিসাবে প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতাগুলির রস আস্বাদন করিয়াছিলেন।

তার চেয়ে মোর এই ক'খানা হাল্কা কথার গান
হয়তো ভেসে রইবে স্রোতে তাই করে যাই দান ॥

অথবা

আকাশের নীল
বনের শ্যামলে চায়।
মাঝখানে তার
হাওয়া করে হায় হায় ॥

'কণিকা'-র স্পষ্ট নীতি-উপদেশাত্মকতা না থাকায় লেখন কাব্যাংশে উৎকৃষ্টতর।

৬

'মহুয়া' (আশ্বিন ১৩৩৬) কাব্যের কবিতাগুলি প্রধানত নারীবন্দনা। দুই-একটি কবিতায় কিশোরপ্রেমের স্মৃতিগুঞ্জন শোনা যায়।[১] মহুয়ার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'নাম্নী' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছ। বিশেষ বিশেষ নারীপ্রকৃতির মধ্যে নারীমাধুর্যের যে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা প্রতিফলিত হয় তাহাই এই কবিতাগুলিতে অসীম সহৃদয়তার সহিত চিত্রাপিত হইয়াছে। এই কবিতাগুলিকে বিশ্বসাহিত্যের নায়িকারত্নমালা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কবিহৃদয়ের প্রথম অর্ঘ্য পাইয়াছে তাঁহার মানসীপ্রতিমা, শ্যামলী।

সে যেন গ্রামের নদী
বহে নিরবধি
মৃদুমন্দ কলকলে;
তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, আবর্তের ঘূর্ণি নাই জলে।

'নববধূ'-তে কবিচিত্ত যেন নিজেকেই জীবনাস্তের বধূরূপে কল্পনা করিয়াছে। শুভযাত্রারম্ভে নববধূর মত তাঁহারো

উৎসবের বাঁশিখানি কেন-যে কে জানে
ভরেছে দিনান্তবেলা ম্লান মূলতানে,

১ যেমন 'দূত' ও 'নিশান্ত'।

এবং কবির অন্তরের বাণীই বধূর মুখে প্রতিধ্বনিত হইয়া আজ গোধূলির প্রতীক্ষা স্তব্ধ আকাশে আশ্বাস বিছাইয়া দিয়াছে,

আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আলো,
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো।

'বনবাণী' (আশ্বিন ১৩৩৮) কাব্যের প্রধান অংশ বৃক্ষবন্দনা। প্রকৃতির প্রাণোচ্ছ্বাস বৃক্ষলতা কবির অর্ঘ্য পাইয়াছে এই কবিতাগুলিতে। আর তিন অংশ হইতেছে 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা,' 'বর্ষামঙ্গল' ও 'নবীন'। 'নবীন' স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩৩৭)। এগুলি আবৃত্তি ও অভিনয়যোগ্য গীতিমালা।

'পরিশেষ' (ভাদ্র ১৩৩৯) কাব্যে শুধুই স্মৃতির গুঞ্জন নাই, জীবনের সার্থকতার কৃতজ্ঞতাও উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। পরিশেষকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনস্মৃতি বলিলে ঠিক হয়। প্রথম কবিতা 'প্রণাম'-এ সুদীর্ঘ কবিজীবনের সাধনা ও সিদ্ধি ধীরগম্ভীর ছন্দে উদাত্তভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। জীবনের যাত্রাপথে কবে কবি "নানাবর্ণে চিত্র করা বিচিত্রের নর্ম্মবাঁশিখানি" কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, তাহাই সম্বল করিয়া তিনি জনজীবনস্রোত হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। "দুর্লভ ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্ব্বত" ও "দুস্তর সাগর" উত্তরণ তাঁহার হইল না, শুধু রাত্রিদিন "আনমনে পথ-চলা হোল অর্থহীন।"

গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয়নি সঞ্চয় করা, অধরার গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরীতে ভরিয়াছি প্রাণের নিঃশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে।...

যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোক-বন্দনা-মন্ত্র জপে—[১]

সেই বিরাটের প্রাণস্পন্দন অনুভব করিয়াছেন কবি আপনার হৃৎস্পন্দনে। তাঁহার নবযৌবনের ক্ষণিকা—

যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোর-কোরক মাঝে স্বপ্ন-স্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি'—

তাহারি সংশায়িত বেদনা কবির কলস্বনিত বাঁশরীর অজস্র গীতিতে উৎসারিত হইয়াছে। শুধু আপন অন্তরবেদনা নয় অনন্তের আনন্দবেদনাও কবির বীণার রুদ্রতালে, "আপন ছন্দের অন্তরালে," মূর্তিলাভ করিয়াছে।

নিখিলের অনুভূতি
সঙ্গীত সাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।

এখন জীবনসঙ্গীতের শমের কাছাকাছি আসিয়া কবিহৃদয় তাহার বিচিত্র কলগানের অধিনেতা নিখিলমানবচিত্তমন্দিরের একমাত্র দেবতা অন্তরতমের পদপ্রান্তে বাঁশিখানি সন্ধ্যারতিরূপে অঞ্জলি দিয়া নিজেকে মহানৈঃশব্দ্যের মধ্যে সমর্পণ করিয়া দিতেছে ;

এই গীতিপথপ্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ;—একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম।

পরিশেষের বাক্‌প্রৌঢ়িতে নবমাধুর্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে, বলাকার ওজস্বিতার সঙ্গে ক্ষণিকার ঋজুতার সমন্বয় হইয়াছে। ভাষার শিল্পে রস-রূপের অপরূপ মিলন হইয়াছে। যেমন,

[১] তুলনীয় লেখনে

ফুরাইলে দিবসের পালা
আকাশ সূর্য্যেরে জপে লয়ে তারকার জপমালা।

আমার স্মৃতি থাক্‌না গাঁথা
আমার গীতি মাঝে,
যেখানে ঐ ঝাউয়ের পাতা
মর্ম্মরিয়া বাজে।
যেখানে ঐ শিউলিতলে
ক্ষণহাসির শিশির জলে,
ছায়া যেথায় ঘুমে ঢলে
কিরণ-কণা-মালী ;
যেথায় আমার কাজের বেলা
কাজেব বেশে করে খেলা,
যেথায় কাজের অবহেলা
নিভৃতে দীপ জ্বালি
নানা রঙের স্বপন দিয়ে
ভরে রূপের ডালি।[১]

পরিশেষে চৌদ্দটি কবিতা আছে মিলহীন বিষম পয়ার ছন্দে।[২] এগুলি "গদ্যকবিতা" নামে চলিলেও যথার্থ গদ্যকবিতা নয়, কেন না এগুলির যতি মোটামুটি সমমাত্রিক এবং ছন্দঃস্পন্দ সুষম। বলাকা-পলাতকার ছন্দে মিল্ না থাকিলে যাহা হয় এই ছন্দ ঠিক তাহাই। যেমন,

ধলেশ্বরী | নদীতীরে | পিসিদের | গ্রাম। ||
তাঁর দেওরের মেয়ে, ||
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক। |

১ 'দিনাবসান,' প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।

২ 'খেলনার মুক্তি,' 'পত্রলেখা,' 'অগোচর,' 'খ্যাতি,' 'বাঁশি,' 'উন্নতি,' 'আগন্তুক,' 'জয়ন্তী-প্রাণ,' 'সাথী,' 'বোবার বাণী,' 'আঘাত,' 'ভীরু,' 'আতঙ্ক'।

৮

'পুনশ্চ' (আশ্বিন ১৩৩৯),[১] 'শেষ সপ্তক' (২৫ বৈশাখ ১৩৪২), 'পত্রপুট' (২৫ বৈশাখ ১৩৪৩)[২] ও 'শ্যামলী' (ভাদ্র ১৩৪৩) কাব্যের প্রায় সব রচনাই গদ্যকবিতা। যথার্থ গদ্যকবিতার লক্ষণ—বিষমমাত্রিক যতি, অসম ছন্দঃস্পন্দ, এবং গদ্যোচিত বাগ্‌ভঙ্গি—এগুলির মধ্যে আছে। গদ্যের সঙ্গে গদ্যকবিতার তফাৎ পঙ্‌ক্তি সাজাইবার ভঙ্গিতে নয়, প্রধানত ছন্দের দোলে এবং অপ্রধানত বাগ্‌ভঙ্গিতে। গদ্যছন্দ আর পদ্যছন্দের মাঝখানে গদ্যকবিতার ছন্দ। গদ্যছন্দ বাক্যার্থকে অনুসরণ করে, তাহার যতি পড়ে বাক্যের পর্বে যেখানে অর্থের সঙ্গে শ্বাসবায়ুর সাময়িক বিরাম হয়, এবং পর্বের মধ্যে তাল বা মাত্রা-সমতার প্রশ্নই ওঠে না। পদ্যছন্দ অনুসরণ করে মাত্রার বা তালের সমতাকে, সেখানে বিরাম আছে নির্দিষ্ট মাত্রার বা তাল-পরিমাণের পর। গদ্যকবিতায় যতি পড়ে অর্থের সঙ্গে শ্বাসবায়ুর স্বল্পবিরামে গদ্য-ছন্দের মত, উপরন্তু সুদৃঢ় মাত্রাসমত্ব না থাকিলেও পর্বের মধ্যে তালের বেশ অনুভূত হয়। অর্থাৎ গদ্যছন্দ অতিতাল, পদ্যছন্দ সমতাল এবং গদ্যকবিতাছন্দ বিষমতাল। যতিভাগ করিয়া উদাহরণ দিতেছি রবীন্দ্রনাথের একধরণেরই রচনা হইতে।

গদ্যছন্দ

আজি ঐ বাঁশি শুনিয়া | প্রাণের একজায়গা | কোথায় হাহাকার করিতেছে। এখন কেবল মনে হয়, | বাঁশি বাজাইয়া | যে-সব উৎসব আরম্ভ হয় | সে-সব উৎসবও | একদিন | শেষ হইয়া যায়! | তখন আর | বাঁশি বাজে না! ‖ ·· বাঁশির গানের মধ্যে, | হাসির মুখে, | লোকজনের আনন্দের মধ্যে, | চারিদিকের ফুলের মালা | ও দীপের আলোর মধ্যে | সেই ছোট মেয়েটি | গলায় হার পরিয়া | পায়ে দুগাছি মল পরিয়া | বিরাজ করিতেছিল।[৩]

[১] প্রথম সংস্করণে কবিতাসংখ্যা ৩৭, দ্বিতীয় সংস্করণে (ফাল্গুন ১৩৪০) ৫০। এই অতিরিক্ত তেরটি কবিতার মধ্যে ছয়টি পরিশেষ থেকে নেওয়া। [২] দ্বিতীয় সংস্করণে (২৫ কার্তিক ১৩৪৫) দুইটি কবিতা সংযুক্ত হইয়াছে। [৩] 'পুষ্পাঞ্জলি', ভারতী বৈশাখ ১২৯২ পৃ ৯।

পদ্যছন্দ

হঠাৎ | সন্ধ্যায় |
সিন্ধু বারো|য়াঁয় লাগে | তান— ||
সমস্ত আ|কাশে বাজে ||
অনাদি কা|লের— | বিরহ বে|দনা— | ||...
হঠাৎ— | খবর পাই | মনে— ||
আকবর | বাদশার | সঙ্গে— ||
হরিপদ | কেরাণীর | কোন ভেদ | নেই—।
বাঁশির— | করুণ ডাক | বেয়ে— |
ছেঁড়া ছাতা | রাজছত্র | মিলে চোলে | গেছে— ||
এক বৈকু|ণ্ঠের দিকে। ||

এ গান যে|খানে সত্য ||
অনন্ত গো|ধূলি লগ্নে ||
সেইখানে ||
বহি চলে | ধলেশ্বরী, ||
তীরে তমা|লের ঘন | ছায়া,— ||
আঙ্গিনাতে
যে আছে অ|পেক্ষা কোরে, | তার— ||
পরণে ঢা|কাই শাড়ি, | কপালে সিঁ|দুর— | ||

গদ্যকবিতাছন্দ (গদ্যপংক্তি)

বাঁশির বাণী | চিরদিনের বাণী | — শিবের জটা থেকে | গঙ্গার ধারা | — প্রতি-দিনের মাটির | বুক বেয়ে চলেছে ; || অমরাবতীর শিশু | নেমে এল | ধূলি নিয়ে | স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে। ||... যখন সেখানকার | মালাবদলের গান | বাঁশিতে— | বেজে উঠল[১] তখন এখানকার | এই কনেটির দিকে | চেয়ে দেখলেম, || তার

১ 'বাঁশি।'

গলায় | সোনার হার, | তার পায়ে | দু'গাছি মল, সে যেন | কান্নার সরোবরে | আনন্দের | পদ্মটির উপরে | দাঁড়িয়ে ॥ —[1]

গদ্যকবিতাছন্দ (পদ্যপংক্তি)

বাঁশিওয়ালা,

বেজে ওঠে | তোমার বাঁশি, —

ডাক পড়ে | অমর্ত্যালোকে ;

সেখানে— | আপন গরিমায় |

উপরে উঠেছে | আমার মাথা।

সেখানে— | কুয়াশার | পর্দা-ছেঁড়া |

তরুণ-সূর্য্য | আমার জীবন। [2]

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতারচনার প্রথমপ্রচেষ্টার পরিচয় আছে 'লিপিকা'-র প্রথম অংশে। পদ্যের মত পংক্তি ভাঙিয়া ছাপা না হইলেও এগুলির মধ্যে যে প্রকৃত গদ্যকবিতার ঝঙ্কার আছে তাহা উপরে উদ্ধৃত অংশটুকু হইতে বোঝা যাইবে। "ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।"[3] বাঙ্গালায় পদ্যপংক্তি-গদ্যকবিতারচনায় প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন রাজকৃষ্ণ রায়।[4]

গদ্যকবিতার স্বরূপ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি খাঁটি কথা বলিয়াছেন পুনশ্চর ভূমিকায়, "গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হোতে পারে। অসঙ্কুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।"

[1] 'বাঁশি', লিপিকা পৃ ১৫-১৬। [2] 'বাঁশিওয়ালা,' শ্যামলী পৃ ৫০। [3] ভূমিকা, পুনশ্চ।
[4] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৪৫৮ দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস যথার্থ। তাঁহার গদ্যকবিতায় বাঙ্গালা-কাব্যকলার শক্তি দূরপ্রসারিত হইয়াছে, ইহা সত্য। পুনশ্চর গদ্যকবিতাগুলিতে রেখাচিত্রের যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও ভাবের যে বলিষ্ঠ প্রকাশ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা পদ্যকবিতায় হইলে ছন্দের বর্ণবহুল ঐশ্বর্য্যে, ভাষার পেলবতায় ও হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসে নিশ্চয় অনেকটা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। পদ্যকাব্য আশ্রয় করিয়া পুনশ্চর 'ছেলেটা' লেখা যাইতে পারিত বলিয়া মনে হয় না। ছেলেটা

গেরস্ত-ঘরে ঢুকলেই সবাই তাকে দূর দূর করে,
কেবল তাকে ডেকে এনে দুধ খাওয়ায় সিধু গয়লানি।···
ছেলেটার নতুন নতুন দৌরাত্মি এই গয়লানি মাসির পরে,
তার বাঁধা গোরুর দড়ি দেয় কেটে,
তার ভাঁড় রাখে লুকিয়ে,
খয়েরের রং লাগিয়ে দেয় তার কাপড়ে।
দেখি না কী হয়, তারই বিবিধ রকম পরীক্ষা।··
অন্যদিকে মাষ্টার আমার কাছে দুঃখ করে গেল—
"শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো
পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই,
এমন নিরেট বুদ্ধি।
পাতাগুলো দুষ্টুমি কোরে কেটে রেখে দেয়,
বলে ইঁদুরে কেটেছে।
এত বড়ো বাঁদর।"
আমি বল্লুম, "সে ত্রুটি আমারই,
থাকতো ওর নিজের জগতের কবি,
তা হোলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হোতো তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।
কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে,
আর সেই নেড়ী কুকুরের ট্রাজেডি।"

৯

'বিচিত্রিতা' (শ্রাবণ ১৩৪০) কাব্যের কবিতাগুলির বিষয়বস্তু যোগাইয়াছে কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীর ছবি, তাহার মধ্যে কবিরও আছে। সেই ছবিগুলিও এইসঙ্গে ছাপা হইয়াছে। বিচিত্রিতার একটি কবিতা 'পসারিণী'। এই কবিতার সঙ্গে 'কল্পনা' কাব্যের 'পসারিণী' কবিতা মিলাইয়া পড়িলে রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের প্রাঙ্মুখীন ও পরাঙ্মুখীন যুগের পার্থক্য ধরা পড়িবে। কল্পনার পসারিণী হাটে যাইবার যাত্রী, সে চলিয়াছে পসরা লইয়া, তাহার থামিবার প্রয়োজন হয়ত আছে কিন্তু অবকাশ নাই। কবিচিত্তই তাহাকে আহ্বান করিতেছে বিশ্রামের প্রলোভন দেখাইয়া। বিচিত্রিতার পসারিণী হাট-ফিরতির যাত্রী, পসরা বেচিয়া সে কড়ি লইয়া ফিরিতেছে। গাছের তলায় তাহার বিশ্রাম কবিচিত্তের প্রার্থনায় নয়, নিজেরই মনের গরজে। প্রথম কবিতায় পসারিণী কবিচিত্তের দয়িতা, দ্বিতীয় কবিতায় সে কবিরই আত্মপ্রকাশ। হাট-যাত্রী পসারিণীর মন পড়িয়াছে বেচাকেনার দিকে, তাই জগতের রূপরসের আকর্ষণ—কবির আহ্বান—তাহার মনে সাড়া জাগাইতেছে না,

থাক্ তব বিকি-কিনি ওগো শ্রান্ত পসারিণী
এইখানে বিছাও অঞ্চল।

হাট-ফেরতা পসারিণীর কাছে বেচাকেনার মূল্য তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে,

লাভের জমানো কড়ি
ডালায় রহিল পড়ি,'
ভাবনা কোথায় ধেয়ে চলে।

যাবার মুখে ডাক ছিল বাহিরের, তাই তাহা হইয়াছিল ব্যর্থ। এখন ফিরিবার মুখে জলস্থল-আকাশের বাণী তাহার মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ছড় টানিতেছে। এ অবস্থায় সে এড়াইয়া যাইবে কি করিয়া।

এই মাঠে, এই রাঙা ধূলি
অঘ্রাণের রৌদ্রলাগা চিক্কণ কাঁঠাল-পাতাগুলি,

শীত বাতাসের শ্বাসে
এই শিহরণ ঘাসে,
কী কথা কহিল তোর কানে।
বহুদূর নদীজলে
আলোকের রেখা ঝলে,
ধ্যানে তোর কোন্ মন্ত্র আনে।

১০

'বীথিকা' (ভাদ্র ১৩৪২) কাব্যের প্রথম কবিতা 'অতীতের ছায়া'-য় কাব্য-গ্রন্থটির মর্মকথা প্রকাশ পাইয়াছে। "নিমীলিত বসন্তের ক্লান্তগন্ধে" যেখানে মহা-অতীত "গাঁথিয়া অদৃশ্যমালা পরিছে নিবিড় কালো কেশে,"

যেখানে তাহার কণ্ঠহারে
দুলায়েছে সারে সারে
প্রাচীন শতাব্দীগুলি শান্ত-চিত্তদহন বেদনা
মাণিক্যের কণা।

সেখানে কবিচিত্ত বসিয়া আছে

··· কাজ ভুলে'
অস্তাচলমূলে
ছায়া-বীথিকায়।

অনিত্যকালের বহির্দ্বারে আসিয়া শান্ত প্রতীক্ষারত কবিচিত্ত ভাবিতেছে,

আজি আমি তোমার দোসর,
আশ্রয় নিতেছি সেথা যেথা আছে মহা অগোচর।
তব অধিকার আজি দিনে দিনে ব্যাপ্ত হয়ে আসে
আমার আয়ুর ইতিহাসে।

'উদাসীন' কবিতার মিলের বৈচিত্র্য অভিনব।

বীথিকায় একটি গল্পকবিতা[১] ও দুইটি সরস ছড়া-কবিতা[২] আছে। একটি কবিতায়[৩] সরসতার সঙ্গে ভাবগভীরতার মিলন হইয়াছে, যেমন 'ক্ষণিকা'-য় দেখা গিয়াছিল।

তুমি দাবী করো কবিতা আমার কাছে,
মিল মিলাইয়া দুরূহ ছন্দে লেখা,
আমার কাব্য তোমার দুয়ারে যাচে
নম্র চোখের কম্প্র কাজল রেখা। ...
যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে
লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে,
মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে
কোন্ দূর যুগে তারিখ ইহার কবে।

ক্ষণিকার 'অন্তরতম'-এ নবমিলনের সলাজ সঙ্কোচ, বীথিকার 'অন্তরতম'-এ আসন্নবিরহের নিবিড় ব্যাকুলতা।

সে ভাষা মোর বাঁশিই শুধু জানে,—
এই যা দান গিয়েছে মিশে' গভীরতার প্রাণে,
করিনি যার আশা,
যাহার লাগি বাঁধিনি কোনো বাসা,
বাহিরে যার নাইকো ভার যায় না দেখা যারে
বেদনা তারি ব্যাপিয়া মোর নিখিল আপনারে।

১১

ছেলেভুলানো ছড়া রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভায় এবং কাব্যশিল্পে যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সে কথা বলিয়াছি। শেষবয়সে কবি যথার্থ ছড়ার

[১] 'মিলন-যাত্রা'। [২] 'আধুনিকা' ও 'পত্র'। [৩] 'নিমন্ত্রণ'।

শৈলীতে কবিতা লিখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। মুখ্যত ছেলেদের জন্য লেখা হইলেও এই কবিতাগুলির রস পরিণতমনেরই উপভোগ্য। যেগুলির ভাব ও ভাষা অত্যন্ত লঘু সেগুলির মধ্যেও ছন্দের বৈচিত্র্য ও কল্পনার নিরঙ্কুশতা ছেলে-বুড়ো উভয়েরই মনোহরণ করে। 'খাপছাড়া'-র (মাঘ ১২৪৩) ছোট ছোট ছড়া-কবিতাগুলিতে এইরূপ অদ্ভুত-কৌতুকরস উপচাইয়া উঠিয়াছে। উদাহরণরূপে প্রথমেই "ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির" কালনা-নিবাসিনী পঞ্চ-ভগিনীর নিতান্ত অসঙ্গত অথচ যুক্তিযুক্ত আচরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা-সিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে ব'লে
রেখে দেয় খোলা জাল্‌নায়,
নুন দিয়ে তারা ছাঁচিপান সাজে
চুন দেয় তারা ডাল্‌নায়।

কিংবা জগতের টেরিটি-বাজারে যাহার সন্ধান পাওয়া আকস্মিক হইলেও অসম্ভাবিত নয় সেই "গোবা-বোষ্টমবাবা"-র আদর্শ সাত্ত্বিক ব্যবহার, সংযম ও অতুলনীয় ব্যবসায়বুদ্ধির পরিচয়,

শুদ্ধ নিয়ম মতে
মুরগিরে পালিয়া
গঙ্গাজলের যোগে
রাঁধে তার কালিয়া;
মুখে জল আসে তার
চরে যবে ধেনু।
বড়ি ক'রে কৌটায়
বেচে পদরেণু।

৩২

'ছড়ার ছবি'-র (আশ্বিন ১৩৪৪) কবিতাগুলি সবই ছড়া-কবিতা নয়। ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন, "এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়, রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয়নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে, তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।"

ছড়ার-ছবির কবিতাচিত্রের অনেকগুলিতে কবির বাল্য ও যৌবন স্মৃতি স্থান লাভ করিয়াছে।[১] কয়েকটি কবিতার ব্যঞ্জনা অতি গভীর। 'পিস্‌নি' কবিতায় মানবজীবনসন্ধ্যার আলো-আঁধারির যে উদাস ছবি আঁকা হইয়াছে তাহা অতুলনীয়। মনগুরের আশাকে মনে আঁকড়িয়া ধরিয়া নিঃসঙ্গ পিস্‌নি বুড়ি যখন বার্দ্ধক্যের শেষ সীমান্তে আসিয়া পড়িয়াছে তখন সুদূরের ডাকে যে গ্রাম ছাড়িয়া চলিতে উদ্যুক্ত হইল। তাহার মনে ক্ষণে ক্ষণে স্মৃতিবিস্মৃতির ঢেউ খেলিয়া যায়, দূরপ্রবাসী আত্মীয় যাহারা তাহার সহিত স্নেহসম্পর্ক বহুদিন চুকাইয়া নিজের নিজের জীবন-প্রবাহ বাহিয়া চলিয়াছে তাহাদের নাম-ধাম কখনো মনে পড়ে কখনো মনে পড়ে না। মানবমনের জীবন-মৃত্যুর মধ্যবর্তী এই no man's land-বাসিনী বৃদ্ধার করুণ ছবির মধ্যে মানবজীবনের মৌলিক ট্রাজেডি ধরা পড়িয়াছে।

গ্রাম-সুবাদে কোন্‌কালে সে ছিল যে কার মাসি,
মণিলালের হয় দিদিমা, চুনিলালের মামি,
বলতে বলতে হঠাৎ সে যায় থামি,'
স্মরণে কার নাম যে নাহি মেলে!
গভীর নিশাস ফেলে
চুপটি ক'রে ভাবে
এমন ক'রে আর কতদিন যাবে।

১ 'কাঠের সিঙ্গি,' 'প্রবাসে,' 'পদ্মায়,' 'বালক,' 'আতার বিচি,' 'আকাশ'।

অস্তাচলগামী রবির অনুরাগ ধরণীর তুচ্ছতাকে দুর্লভতর, রঙিনতর করিয়াছে 'পিছু ডাকা'-য়।

কিন্তু যখন চেয়ে দেখি সামনে সবুজ বনে
ছায়ায় চরছে গোরু,
মাঝ দিয়ে তার পথ গিয়েছে সরু,
ছেয়ে আছে শুক্‌নো বাঁশের পাতায়,
হাট করতে চলে মেয়ে ঘাসের আঁঠি মাথায়,
তখন মনে এই বেদনাই বাজে
ঠাঁই রবে না কোনোকালেই ঐ যা-কিছুর মাঝে।
ঐ যা-কিছু ছবির আভাস দেখি সাঁঝের মুখে
মর্ত্যধরার পিছু-ডাকা দোলা লাগায় বুকে।

১৩

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া কবির চিত্তপটে চেতনাবচেতনের আলো-আঁধারিতে যে বিচিত্র অনুভূতির আলিম্পন অঙ্কিত হইয়াছিল তাহারি প্রকাশ 'প্রান্তিক' কাব্যে (পৌষ ১৩৪৪)। চেতনা যখন ধীরে ধীরে অবচেতনার মাঝে অবলুপ্ত হইয়া আসিতেছে তখনকার অনুভূতি কবি উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন,

দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্রকরা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি।[১]

দেহের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের আসন্নমুহূর্ত্তে অতীতের অবচেতন বাসনা ও বর্ত্তমানের রূপরসতৃষ্ণা যেন প্রেতমূর্ত্তি ধরিয়া পিছু লইয়াছে।

১ কবিতা সংখ্যা ৯।

পশ্চাতের নিত্য সহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুনগুন গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে।[১]

এতদিন জগৎলক্ষ্মী যে পূর্ণতার আনন্দ পরিবেশন করিয়াছেন তাহাতে যেন তৃপ্তি হয় নাই, বিকাররোগীর পিপাসার মত কবিচিত্তের আশা মিটিয়াও মিটিতেছে না। তাই কাতর প্রার্থনা,

হে সংসার
আমাকে বারেক ফিরে চাও; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জ্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।[২]

কিন্তু পরক্ষণেই যেন বিকারের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে,

এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে
বিকারের রোগী সম অকস্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া
আপনার আবেষ্টন হতে।
ধন্য এ জীবন মোর—
এই বাণী গাব আমি, প্রভাতে প্রথম-জাগা পাখি
যে সুরে ঘোষণা করে আপনাতে আনন্দ আপন।[৩]

মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কবি যেন গতজন্মের নির্মোক ত্যাগ করিয়া আনন্দলোকে নবজন্ম লাভ করিলেন।

আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, ···
সন্ধ্যা গেছে নামি'

[১] ঐ ৫। [২] ঐ ৬। [৩] ঐ ১৫।

সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন ; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। [১]

কবিচিত্তে আনন্দ ও বেদনা এক হইয়া গিয়া মুক্তির প্রশান্তি আনয়ন করিয়াছে।

আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ সম। [১]

১৪

'সেঁজুতি' কাব্যে (ভাদ্র ১৩৪৫) স্মৃতির আলোড়ন নাই। রোগমুক্তির কবিচিত্তে নবীনতা আসিয়াছে, তাই দৃষ্টিও অতীতের গুহা হইতে ফিরি আসিয়াছে। আসন্ন বিদায়ব্যথাও যেন তীব্র নয়।

আর রবে পশ্চাতে আমার, নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
এপারের ভালবাসা···[২]

'প্রহাসিনী'-র (পৌষ ১৩৪৫) কবিতাগুলি লঘু ও সরস। শেষ কবিতাটিতে আধুনিক তথাকথিত "প্রোলেটারিয়েট সাহিত্য"-রসিকদের উপর যে কটাক্ষ আ: তাহা উপভোগ্য।

'আকাশ-প্রদীপ' কাব্যে (বৈশাখ ১৩৪৬) কবিচিত্ত পুরানো দিনের স্মৃতি দেওয়ালি সাজাইয়া আছে।

দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা
নয়ন ছলোছলো,
এবার তবে ঘরের প্রদীপ
বাইরে নিয়ে চলো। [৪]

[১] ঐ। [২] 'জন্মদিন'। [৩] 'মান্যতত্ত্ব'। [৪] 'আকাশ-প্রদীপ'।

দীর্ঘজীবনের "পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন" পশ্চিমদিগন্তে লীন হইয়া গিয়াছে, এখন বিদায়ের দিন যত ঘনাইয়া আসিতেছে চোখে চলমান রূপ এবং মনে সঞ্চিত রস ততই পিছুটান দিতেছে। তাই আজ

চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাবণ্য ঘনালো,
আশ্বিনের আলো
বাজাল সোনার ধানে ছুটির সানাই।
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশ স্বপ্নেতে বোঝাই।[১]

কলিকাতা শহরের নিঝুম মধ্যাহ্নের নৈর্ব্যক্তিক শব্দ শিশুকবির মানসপটে জটিল স্বপ্নকল্পনার ইন্দ্রজাল অঙ্কিত করিয়া তাঁহার যে বিচিত্র ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার অপূর্ব্ব চিত্র ফুটিয়াছে 'ধ্বনি'-তে। কবির যে-সব আধুনিকতম বিরুদ্ধ সমালোচক তাঁহার কাব্যসৃষ্টিকে কালবারিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়া প্রকারান্তরে নিজেদের তুচ্ছ কৃত্রিম রচনাকে উচ্চ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল তাহাদের সে অভিযোগ স্বীকার করিয়া লইবার ছলে কবি 'সময়হারা'-য় ছড়ার শৈলীতে হালকা চালে তাহাদের ব্যর্থতাকে ধিক্কার দিয়া সত্য কাব্যসৃষ্টির কালজয়ী মাহাত্ম্যের ডঙ্কা বাজাইয়াছেন।

পাসনি খবর বাহান্ন জন কাহার
পালকি আনে, শব্দ কি পাস তাহার।

'নবজাতক' (বৈশাখ ১৩৪৭) কাব্যের অনেকগুলি কবিতায় রাষ্ট্র ও সভ্যতার আবর্জ্জনার উপর এবং দেশের ঘৃণ্য মূঢ়তা ও বিদেশের বীভৎস ক্রূরতার উপর কবিচিত্তের নির্ম্মম ধিক্কার বর্ষিত হইয়াছে। 'প্রায়শ্চিত্ত'-এ কবিতায় পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার অন্তর্গূঢ় বর্ব্বরতা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ আলো—
নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—

১. 'শ্যামা'। এই কবিতায় এবং সর্ব্বশেষের গদ্যকবিতা 'কাঁচা আম'-এ কবির কিশোরপ্রেমের একটু বাস্তব ইঙ্গিত পাইয়েছি।

ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।

ধর্ম্মকে বাহিরে স্বীকার করিয়া আজ কোন কোন শক্তিমদমত্ত জাতি আচরণে ধর্ম্মকে পদদলিত করিয়া চলিয়াছে, ইহার প্রতি কবি শ্লেষ করিয়াছেন 'বুদ্ধভক্তি'-তে। 'হিন্দুস্থান'-এ মুসলমান-যুগে ভারতবর্ষের অতীত ঐশ্বর্য্যের প্রেতচ্ছবি কবিচিত্তকে ক্লিষ্ট করিয়াছে। 'রাজপুতানা'-য় অধুনাতন দেশীয় রাজাদের অবলুপ্ত পূর্ব্বতন মহিমার বাহ্য আড়ম্বরের হীন অভিনয়ের লজ্জিত বেদনায় কবিচিত্ত নিরতিশয় পীড়া বোধ করিয়াছে। দিল্লী-সাম্রাজ্যের মত রাজপুতানা যদি এখন স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইত তবে রোমান্সের রাজ্যে তাহার স্থান অবিনশ্বর হইয়া থাকিত। বর্ত্তমানের দৈন্য কবিকল্পনার অকৃত্রিম আনন্দলোকে তাহাকে লাঞ্ছিত করিতেছে পদে পদে।

তাই ভাবি হে রাজপুতানা
কেন তুমি মানিলে না যথাকালে প্রলয়ের মানা,
লভিলে না বিনষ্টির শেষ স্বর্গলোক ; ··
শংকরের তৃতীয় নয়ন হতে
সম্মান নিলে না কেন যুগান্তের বহ্নির আলোতে।

মহাকাল বিশ্বে ধ্বংস-সৃজনের মালা গাঁথিয়া চলিয়াছেন। ধ্বংসের অপচয়ে সৃজনের ও জীবনের কবি ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, "কিন্তু কেন ?" এই প্রশ্ন জড়িত আছে নিজের জীবনের চরম অস্তিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে। রসানুভূতিতে ও ধ্যানদৃষ্টিতে কবি একদা অনুভব করিয়াছিলেন,

বহু যুগযুগান্তের কোন্ এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা

সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।

জীবনসায়াহ্নে এখন সংশয় জাগিতেছে, গ্রহনক্ষত্রনীহারিকার মত অস্তিত্বের এই সংহতি কি কালের স্রোতে অনস্তিত্বের আবর্তে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে?

প্রশ্ন মনে আসে আরবার
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয় পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার—
ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন।
কিন্তু কেন।[১]

অনুরূপ সংশয়ের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল পরিশেষের 'অপূর্ণ' কবিতায়।

মানুষ যেখানে কুশ্রীতা-কদর্যতা-তুচ্ছতা-নিরানন্দ-নিরর্থকতার বেড়া দিয়া আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত ও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে, মানবাত্মার দীপ যেখানে মুহূর্তের জন্যও জলে নাই, মানবের সেই আত্মবিস্মৃত গৌরবহীন জীবনে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারেন নাই তাঁহার শুচি রুচি ও স্পর্শকাতর মন লইয়া। এখন যাবার বেলা এই অনাস্বাদিত কটুতিক্তকষায় জীবনরসের আস্বাদ লইতে কবিচিত্ত উৎসুক হইয়াছে। এই অচরিতার্থতার খেদের ইঙ্গিত পাওয়া গেল 'এপারে-ওপারে' কবিতায়। "ঘনীভূত জনতায় বিচিত্র তুচ্ছতা এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে" যে "নানা শব্দ নানা রূপ জাগিয়ে তুলেছে দিনরাতে" ক্ষণে ক্ষণে তাহারি সংঘর্ষে কবিচিত্ত ব্যগ্র হইয়া জাগিয়া ওঠে "সর্বব্যাপী সামান্যের সবল স্পর্শের লাগি।" কিন্তু হায়,

আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।

১ 'কেন'।

রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তরাজহংসকে মানবজীবনসরোবরের পঙ্কিলতা স্পর্শ করিতে পারে না ; রোমান্সের সূর্য্যালোকে কবিচিত্তমুকুল রহিয়াছে সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত। 'সানাই' কাব্যের (আষাঢ় ১৩৪৭) 'অনসূয়া' কবিতায় কবি স্বীকার করিয়াছেন, "এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোম্যান্টিক"। বর্ত্তমান বিশ্বযুদ্ধারম্ভের আকস্মিক তাণ্ডবডিণ্ডিম কবিচিত্তে যে রূঢ় আঘাত হানিয়াছিল তাহার অনবদ্য পরিচয় 'আঘাত'-এ।

'রোগশয্যায়' (পৌষ ১৩৪৭) কাব্যের অনেকগুলি কবিতায় 'প্রান্তিক'-এর ভাবের অনুসরণ দেখা যায়। তবে এখানে অনুভূতিতে পূর্ব্বতন প্রগাঢ় বাস্তবতা নাই, এবং ক্লান্তির সুরও স্পষ্টতর। অধিকাংশ কবিতা মিলহীন। 'আরোগ্য' (ফাল্গুন ১৩৪৭) কাব্যের সঙ্গে 'সেঁজুতি'-র তুলনা করা চলে। একটি ক্ষুদ্র কবিতায় কবি আপন সাহিত্যসৃষ্টির গভীর রহস্যের সন্ধান দিয়াছেন।

> বিরাট মানবচিত্তে
> অকথিত বাণীপুঞ্জ
> অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে
> মহাশূন্যে নীহারিকা সম।
> সে আমার মনঃসীমানার
> সহসা আঘাতে ছিন্ন হয়ে
> আকারে হয়েছে ঘনীভূত,
> আবর্ত্তন করিতেছে আমার রচনা-কক্ষপথে ॥[১]

রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্য 'জন্মদিনে' (১ বৈশাখ ১৩৪৮)। অর্থাৎ ইহা তাঁহার জীবিতকালে শেষপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। ইহার অধিকাংশ কবিতায় জন্মদিন উপলক্ষ্য করিয়া কবি আপন জীবনের সার্থকতা সশ্রদ্ধকৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়াছেন। এ যেন জীবনের শেষ হিসাব-মিলানো।

নবজাতকের 'এপারে-ওপারে' কবিতায় সাহিত্যসৃষ্টির যে আংশিক অচরিতার্থতার খেদ ধ্বনিত হইয়াছিল জন্মদিনের একটি কবিতায় তাহা স্পষ্টতর হইয়াছে।

১ কবিতাসংখ্যা ২৫।

কবি খেদ করিয়াছেন,

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার উঠিবে তখনি।
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।

তবুও কবি বঞ্চিত হন নাই,

কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান
কত না নিস্তব্ধক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।

রূপে যে আনন্দের সাক্ষাৎ পান নাই তাহা রসে, গানের সুরে ভোগ করিয়াছেন।

গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ
নিখিলের সঙ্গীতের স্বাদ।

নিখিল জীবনের ঐক্যতান শুনিবার অপরিসীম সৌভাগ্য লাভ করিলেও কবি তাহার বিচ্ছিন্ন সব সুর নিজের বাঁশিতে ধরিতে পারেন নাই, কাব্যে সেই মানুষের মনের কথাটি প্রকাশ করিতে পারেন নাই

সব-চেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।

তাই নিজ সৃষ্টির বিচিত্র বিপুলতার মধ্যেও কবি অপূর্ণতা অনুভব করিয়াছেন,

আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

এ ক্ষোভ নিরর্থক। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা শুধু চিরন্তন মানবজীবনকেই নয় বিশ্বপ্রকৃতির মহাপ্রাঙ্গণকেও উদ্ভাসিত করিয়াছে আনন্দালোকে। যে গুহায় সে আলোক পৌঁছায় নাই তাহার জন্য আক্ষেপ করা বৃথা।

শেষ কবিতায় কবিচিত্ত নিজ মরণমহোৎসবের আভাস দিয়া শেষবারের মত বিদায় লইতেছে। ইহজীবনের শেষ অনুষ্ঠান ভাবী জীবনের জন্মাষ্টমী।

সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভ শঙ্খধ্বনি।

নবম পরিচ্ছেদ

নাট্যনিবন্ধ

. ১

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনা তাঁহার কাব্যসৃষ্টির অঙ্গ হইলেও তাহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি যেমন আত্যন্তিকভাবে individualistic বা বৈয়ক্তিক নাট্যরচনা তেমনি বিশেষভাবে idealistic বা আদর্শিক। এইভাবে দেখিলে তাঁহার গল্প-উপন্যাসসৃষ্টিকে বলা চলে প্রধানত realistic বা বাস্তবিক, যদিও কোন কোন উপন্যাসে আদর্শবাদের অসদ্ভাব নাই।

রবীন্দ্র-নাট্যরচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ঘটনার সংঘাত নয়, আদর্শের সংঘাত এবং ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। এইজন্য যাঁহারা নাটকে ঘটনাবাহুল্য ও passion-সঙ্কুলতা দেখিতে অভ্যস্ত তাঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রাণহীন ও কাব্যধর্মী বলিয়া বোধ হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যখন শিশু তখন তাঁহাদের বাড়ী সঙ্গীত-নাটক-অভিনয়রসে মশগুল। জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ী যে সেকালে নাট্যরচনার ও অভিনয়ের কতটা পোষকতা করিয়াছিল তাহা অন্যত্র বলিয়াছি। কিন্তু এই নাটক ও অভিনয় বালক রবীন্দ্রনাথের মনে নাট্যাভিনয়ের প্রতি অনুরাগ প্রবর্দ্ধন ছাড়া আর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। প্রথমবার বিলাতে গিয়া সেখানকার পারিবারিক মণ্ডলে স্বাধীনতা ও আনন্দচর্চার পরিচয় পাইয়া তিনি যখন নিজেদের পরিবারে অনুরূপ অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হইলেন তখনি তাঁহার চিত্তে নাটগীত-অভিব্যক্তির প্রথম অনুপ্রেরণা জাগিল। ইহারই ফলে 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্য (ফাল্গুন ১৮০২ শকে, ১২৮৭ সালে) মুদ্রিত ও (১৬ ফাল্গুন ১২৮৭ শনিবার তারিখে) "বিদ্বজ্জন-সমাগম" উপলক্ষ্যে অভিনীত হইয়াছিল। বাড়ীর ছেলেমেয়ে-বন্ধুবান্ধবেরাই পাত্রপাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

বাৎসল্য ও তৎসম্ভূত কারুণ্য বাল্মীকি-প্রতিভার মুখ্য রস। কৈশোরক-যুগের অন্যান্য কাব্যেও ইহার অস্তিত্ব পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছি। বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর সারদামঙ্গল কাব্যের প্রভাব শেষের দিকে সুস্পষ্ট। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বাল্মীকি-প্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সঙ্গীতের দুই এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।" "(আমার) কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা!" এবং 'হৃদয়ে রাখ গো চরণ তোমার।"—এই দুইটি গানে সারদামঙ্গল হইতে যথাক্রমে তিন ও পাঁচ ছত্র গৃহীত হইয়াছে। আরও দুইটি গানে সারদামঙ্গলের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। "একি এ, একি এ, স্থির চপলা!"—এই গানের প্রথম দুই ছত্রের সঙ্গে তুলনীয় সারদামঙ্গলের এই তিন ছত্র,

কিরণে কিরণময়
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবি-ছবি ভুবন উজ্জ্বল!

"এই যে হেরি গো দেবী আমারি!"—এই গানে সারদামঙ্গলের উপোদ্‌ঘাত-সঙ্গীতের রেশ আছে।

রচনাভঙ্গি ধরিয়া বিচার করিলে "এখন কর্ব্ব' কি বল্!," "তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়," এবং "কালী কালী বলো রে আজ"—এই তিনটি গান অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর লেখা বলিয়া মনে করি।

বাল্মীকি-প্রতিভায় গীতিনাট্যের একটি নূতন রূপ দেখা গেল। সাধারণ গীতিনাট্যের গান এখানে কথার প্রতিধ্বনি করে না; গান ও সংলাপ তুল্যরূপে নাট্যরস জমাইয়াছে।

দ্বিতীয় গীতিনাট্য 'কাল-মৃগয়া' (অগ্রহায়ণ ১২৮৯) প্রভাত-সঙ্গীতের সমসাময়িক রচনা। ইহারও মূলসুর বাৎসল্যকারুণ্য, তবে এখানে শোকদহনের ভিতর দিয়া ক্ষমাসংযমের আদর্শ দেখান হইয়াছে। কাল-মৃগয়াও "বিদ্বজ্জন-সমাগম" উপলক্ষ্যে রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। কাল-মৃগয়ার গানগুলির রচনায় পরিপক্কতা দেখা দিয়াছে। প্রথম দৃশ্যে 'প্রকৃতির পরিশোধ'-এর পূর্ব্বাভাস

পাই। পঞ্চম দৃশ্যে বনদেবীদের গানে বিদ্যাপতির "হামারি দুখের নাহি ওর" এই বিখ্যাত পদটির অনুসরণ হইয়াছে।

কাল-মৃগয়া পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। ইহার অনেকগুলি গান বাল্মীকি-প্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণের (ফাল্গুন ১২৯২) অন্তর্ভুক্ত হয়।

'প্রকৃতির পরিশোধ' (১২৯১) ছবি-ও-গানের সমসাময়িক। এই নাট্য-কাব্যটিতে রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের প্রথম স্তরের অবসান ঘটিল। এই স্তরের মর্ম্মকথা হইতেছে অজ্ঞান-মূঢ়তার দ্বারা রুদ্ধ বাৎসল্যপ্রস্রবণের মুক্তিতে ও প্রেমের আবির্ভাবে চিত্তে প্রশান্তিলাভ এবং প্রেম ও কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্যে মানবজীবনের চরিতার্থতা। হৃদয়বৃত্তির নিরোধের দ্বারা দুঃখকে এড়াইয়া, সংসার হইতে দূরে থাকিয়া নহে দুঃখসুখকে সমানভাবে দেখিয়া, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতিকে মিলাইয়া লইলেই তবে মানুষ জীবন্মুক্তির অধিকারী হয়—এই বিশেষ তত্ত্ববাণী, যাহা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবনদর্শন, হইতেছে প্রকৃতির-পরিশোধের মূলকথা। এইভাবে দেখিলে প্রকৃতির-পরিশোধ রবীন্দ্রনাথের প্রথম fundamental নাট্যকাব্য।

কারোয়ারে থাকিবার সময় প্রকৃতির-পরিশোধ লেখা হয়। কয়েকটি গান পরে লেখা হইয়াছিল। গদ্যাংশ অল্পই।

'নলিনী' (১২৯১) ক্ষুদ্র গদ্যনাট্য। ইহার কাহিনী ভগ্নহৃদয় হইতে কল্পিত। দিশাহারা প্রেমের আত্মনিপীড়ন এবং চরম দুঃখের মধ্য দিয়া মিলন, ইহার মর্ম্মকথা। গান চারিটিমাত্র।

'মায়ার খেলা' (অগ্রহায়ণ ১৮১০ শক, ১২৯৫) নলিনীরই গীতিনাট্য-রূপ। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ।"

২

'রাজা ও রাণী' (২৫ শ্রাবণ ১২৯৬) পঞ্চাঙ্ক ট্রাজিক নাটক। অধিকাংশই পদ্য। গদ্যাংশ অল্প; ইহা শুধু নাট্যকাহিনীতে সরসতার সঞ্চার উদ্দেশ্যেই দেওয়া

রবীন্দ্রনাথ (১৮৯০)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

[পৃ ২০৩

হইয়াছে। হৃদয়ের ধনকে দেহের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিবার নিষ্ফল কামনা রাজা-ও-রাণীর ট্রাজেডি। মানসীর 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় নাটকটি বীজ নিহিত আছে। নায়ক বিক্রমদেবের অবুঝ প্রেমাবেগ আত্মপর-নিপীড়নের কারণ হইয়াছে। সুমিত্রার প্রেম শান্ত, সংযত, কর্ত্তব্যপরায়ণ। বিক্রমের প্রেমোচ্ছ্বাসে সে-প্রেম থই পাইতেছে না। রাজকর্ত্তব্যের অবহেলা সুমিত্রার প্রেমের প্রকাশকে রুদ্ধ, কুণ্ঠিত করিয়াছে।

ছিছি মহারাজ,
এ কি ভালবাসা? এ যে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন ক'রে মধ্যাহ্ন-আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব!...
আমারে দিও না লাজ;
আমারে বেসোনা ভাল রাজশ্রীর চেয়ে!

বিক্রম সুমিত্রাকে ভুল বুঝিয়াছে। তাহার ধারণা,

ঐশ্বর্য্য আমার
বাহিরে বিস্তৃত—শুধু তোমার নিকটে
ক্ষুধার্ত্ত কঙ্কালসার কাঙাল বাসনা!
তাই কি ঘৃণায় দর্পে চলে যাও দূরে
মহারাণী রাজরাজেশ্বরী?

স্বামীর কর্ত্তব্যের ত্রুটি সংশোধনের ভার নিজ হাতে লইয়া সুমিত্রা ট্রাজেডির জট ভালি করিয়া পাকাইয়া দিল। স্বামিগৃহ পরিত্যাগ না করিলে বিক্রমের মোহজাল দূর হইবে না ভাবিয়া রাণী পিতৃগৃহের উদ্দেশে চলিল। বিক্রমের ঘোর ভাঙ্গিল বটে কিন্তু প্রতিক্রিয়া হইল গুরুতর। প্রেমের উচ্ছ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া হিংসার তাণ্ডবে পরিণত হইল।

এ প্রবল হিংসা ভাল, ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে!
প্রলয় ত বিধাতার চরম আনন্দ!

হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধন-মুক্তির
স্থখ !

কুমারসেন-স্থমিত্রাকে ভস্ম করিয়া তবে এই প্রেমবিকৃতিদাবানল নির্বাপিত হইল।

কুমারসেন-ইলার প্রেমলীলা বিক্রম-স্থমিত্রার প্রেমসম্পর্কের ঠিক বিপরীত। কুমারসেনের প্রেম স্থমিত্রার প্রেমের মত স্থির ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। আর ইলার প্রেম বিক্রমের প্রেমের মত অধীর। কুমারসেন-ইলার আখ্যান প্রধান নাট্যকাহিনীকে ব্যাহত তো করেই নাই, উপরন্তু বৈপরীত্যের বৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছে। তবে এই অংশটুকু কম হইলে হয়ত ভাল হইত। কুমারসেন-স্থমিত্রার সৌহার্দ্য বৌঠাকুরাণীর-হাটের উদয়াদিত্য-বিভার সৌহার্দ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজা-ও-রাণীর অন্যান্য ভূমিকাও যথাসম্ভব ফুটিয়াছে। দেবদত্ত মধ্যস্থ চরিত্র, সে যেন রাজারই শুভবুদ্ধি। সংস্কৃত-নাটকের বিদূষক ভূমিকার ইহা এক অপূর্ব্ব পরিণতি। রেবতী-চরিত্রে লেডি ম্যাকবেথের ভাব থাকিলেও স্বাভাবিকতার হানি হয় নাই।

উপসংহার একটু চমকপ্রদ হইলেও রাজা-ও-রাণীর প্লটের নাটকীয়তা অসামান্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আখ্যানবস্তুর পরিকল্পনা ও পরিণতি নাট্যোচিত এবং স্থসঙ্গত। প্রধান চরিত্রগুলি স্থপরিস্ফুট। রাজা-ও-রাণী বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ নাটক।

১৩০১ সালে রাজা-ও-রাণীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে সঙ্গীত ও গদ্যাংশ কিছুকিছু পরিত্যক্ত হয়।[১] তৃতীয় অর্থাৎ কাব্য-গ্রন্থাবলী

[১] নিত্যকৃষ্ণ বসুর ডায়েরিতে আছে, "রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সংস্করণ 'রাজা ও রাণী' দেখিলাম। সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের প্রয়াস দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু সকল স্থলে, সংশোধনগুলি সমীচীন নহে। বর্ত্তমান সংস্করণে সঙ্গীত ও গদ্যাংশগুলি প্রায়শঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহা মন্দ নহে। গ্রন্থের পদ্যাংশে কোনও পরিবর্ত্তনই সংসাধিত হয় নাই।" ['সাহিত্যসেবকের ডায়েরী' (২৮শে শ্রাবণ), সাহিত্য বৈশাখ ১৩১১, পৃ ৭২-৭৩।] দাসী মে ১৮৯৬ পৃ ২৪৬ দ্রষ্টব্য। আমার নিকট আখ্যাপত্রবিহীন (১৫৩ পৃষ্ঠা) একটি সংস্করণ আছে। ইহার আকার ও মুদ্রণ আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত (১২৯৮-১৩০৬) বইয়ের অনুরূপ। সংস্করণটি সর্ব্বাংশে তৃতীয় অর্থাৎ কাব্য-গ্রন্থাবলী

সংস্করণে (১৩০৩) একটি ছাড়া সব গানই দেওয়া হইয়াছে, গদ্যাংশও কিছুকিছু বাদে পুনঃসংযুক্ত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের তিনটি দৃশ্য—চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য এবং পঞ্চম অঙ্ক সপ্তম ও দশম দৃশ্য—তৃতীয় সংস্করণে বাদ গিয়াছে এবং দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য তৃতীয় দৃশ্যে যুক্ত হইয়াছে। প্রথম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যের কিছু গদ্যাংশ, দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের শেষ অংশ এবং পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের কিছু পদ্যাংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম ও একাদশ দৃশ্যের পদ্যাংশ স্থানে স্থানে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহাই তৃতীয় সংস্করণের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

৩

রাজা-ও-রাণী নাটকের কুমারসেন-ইলার প্রেমকাহিনী-অংশ বাদ দিয়া এবং উপসংহার বদলাইয়া রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পরে 'তপতী' (ভাদ্র ১৩৩৬) রচনা করেন। নাটকটি আদ্যোপান্ত গদ্যে লেখা। ইহাতে অনেকগুলি চমৎকার গান আছে। ট্রাজেডির গুরুভার এই গানগুলির মধ্য দিয়া অনেকটা লঘু হইয়া গিয়াছে।

তপতী স্বতন্ত্র নাটক, ইহা রাজা-ও-রাণীর সংশোধিত সংস্করণমাত্র নয়।[১] বস্তুত তপতীতে নায়কনায়িকার প্রাধান্যের বিপর্য্যাস হইয়াছে। রাজা-ও-রাণীতে সুমিত্রার ভূমিকা অনেকটা passive বা গৌণ, আর তপতীতে একমাত্র সুমিত্রাই নাটকীয় ঘটনা পরিচালিত করিতেছে। বিক্রম-চরিত্র অনেকটা স্ফুটতর হইয়াছে, কিন্তু অত্যন্ত ব্যাখ্যাপরায়ণ হওয়াতে, অর্থাৎ নিজের মনোভাব পদে পদে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করায়, নাট্যরসের হানি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। রাণীর গৃহত্যাগের উদ্দেশ্য তপতীতে যেভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহাতে সুমিত্রা-চরিত্রের দৃঢ়তা ও মহত্ত্ব সূচিত হইলেও মানবীয়তা কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

সংস্করণের অনুরূপ। এমন কি ভুলেরও মিল আছে। যেমন, দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ স্থলে "পঞ্চম" দৃশ্য। কেবল পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে গানটি ("মরের দুয়ার খোলা পেয়ে") নাই। এই সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে পারে, চতুর্থ সংস্করণও হইতে পারে। হিতবাদী প্রকাশিত গ্রন্থাবলী সংস্করণে ভুলের সংশোধন হইয়াছে এবং গানটি নাই। সুতরাং বইটি চতুর্থ সংস্করণ হওয়াই অধিকতর সম্ভব।

[১] তপতীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

শঙ্কর ও অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকা নিতান্ত অবান্তর হইয়া গিয়াছে। দুইটি নূতন ভূমিকা—বিপাশা ও নরেশ—দেখা দিয়াছে। এই দুই ভূমিকা যোগাযোগের মোতির মা ও নবীনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কুমারসেন-সুমিত্রার সৌভ্রাত্র রাজা-ও-রাণীর নাট্যপরিণতির একটা প্রধান নিমিত্ত। তপতীতে এই স্নেহ-সম্পর্ককে তেমন প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই।

৪

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার প্রথম স্তরে দেখিয়াছি বাৎসল্যের ও প্রেমের আলোকে আত্মনিপীড়নরূপ হৃদয়ারণ্য হইতে নিষ্ক্রমণ সূচনা। দ্বিতীয় স্তরে দেখিতেছি কর্ত্তব্যের সঙ্গে প্রেমের, রূপের সঙ্গে রসের, সংসারের সঙ্গে সত্যের সংঘর্ষ। রাজা-ও-রাণী-তপতীতে এই বিরোধের অবসান ঘটিয়াছে আত্মবিসর্জ্জনে। 'বিসর্জ্জন' নাটকে শুধু আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারা সমস্যা এড়ানো হয় নাই, তাহারো উপরে কঠোরতর ত্যাগের মধ্য দিয়া বিরোধের অবসান দেখান হইয়াছে।

বৌঠাকুরাণীর-হাটে যেমন রাজা-ও-রাণীতে তেমনি প্রেমের সুমহৎ বেদনা ও শ্রান্তি সৌভ্রাত্রের মেঘমেদুর ছায়ায় আশ্রয় পাইয়া অপনোদিত হইয়াছে। আর রাজর্ষিতে এবং বিসর্জ্জনে শুষ্ক কর্ত্তব্যের কঠোর তৃষা মিটিয়াছে বাৎসল্যের নবধারাবর্ষণে।

'বিসর্জ্জন' (২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭) রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট অর্থাৎ representative নাটক। অভিনয়ের দিক দিয়াও বিসর্জ্জনের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। নাট্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ শেষ অবধি নূতন নূতন form বা রূপ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; পুরাতন form তাঁহাকে কখনো তৃপ্তি দেয় নাই। কবিতায় ও গানে যেমন রচনার রূপ প্রথম হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে সুস্পষ্ট আকার লইয়াছিল নাটকে তেমন নয়। কিন্তু বিসর্জ্জনে ইহার ব্যতিক্রম পাই। প্রধানত অভিনয়ের খাতিরেই ইহাতে পুনঃপুন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৩০৩ সালে কাব্য-গ্রন্থাবলীতে বিসর্জ্জন যেরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহাই নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণ। আবা

১৩০৬ সালে মুদ্রিত "২য়" সংস্করণ প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় সংস্করণ। তাহার পর সংস্করণ হয় ১৩৩৩ সালে। পঞ্চম বা শেষ সংস্করণ বর্ত্তমানে চলিত আছে।

রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ লইয়া বিসর্জ্জনের আখ্যানবস্তু পরিকল্পিত। রাজর্ষির নায়ক গোবিন্দমাণিক্য, বিসর্জ্জনের নায়ক জয়সিংহ। তাই জয়সিংহের আত্মহত্যা নাট্যকাহিনীতে যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। প্রথম সংস্করণে রাজর্ষির কাহিনীর সঙ্গে যোগ ছিল বেশি। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে হাসির ও কেদারেশ্বরের ভূমিকা বাদ যাওয়ায় এই যোগ কতকটা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের আরও দুইটি ভূমিকা—একটি অন্ধ বৃদ্ধ ও পরিচারিকা—দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ধ্রুবর ও অপর্ণার ভূমিকাও ছোট করা হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণে প্রায় সব দৃশ্যই ছিল দীর্ঘতর। প্রথম সংস্করণের যে-যে অংশ দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০৩) বাদ গিয়াছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের প্রথম অংশ (অপর্ণা ও গোবিন্দমাণিক্য, পরে জয়সিংহ, এবং হাসি ও ধ্রুব), শেষ অংশ (গুণবতী, হাসি, ধ্রুব ও গোবিন্দমাণিক্য), দ্বিতীয় দৃশ্য (কুটীরে অপর্ণার অন্ধ পিতা ও জয়সিংহ) এবং তৃতীয় দৃশ্য সম্পূর্ণভাবে (মন্দিরে জনতা, জয়সিংহ ও অপর্ণা, কেদারেশ্বর, হাসি, গোবিন্দমাণিক্য, ধ্রুব, রাজবৈদ্য); দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের প্রথম অংশ (নয়নরায় ও চাঁদপাল, পরে মন্ত্রী),[১] পঞ্চম দৃশ্যের প্রথম অংশ (জয়সিংহ ও অপর্ণা), ষষ্ঠ দৃশ্যের শেষ অংশ (চাঁদপালের স্বগতোক্তি),[২] সপ্তম দৃশ্য সম্পূর্ণভাবে (কুটীরে অপর্ণা ও অন্ধ পিতা, জয়সিংহ); তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য সম্পূর্ণভাবে (অন্তঃপুরে গুণবতী, চাঁদপাল ও নক্ষত্ররায়),[৩] চতুর্থ দৃশ্যের স্থানে স্থানে (ধ্রুব ও গোবিন্দমাণিক্য, ধ্রুব, অপর্ণা ও জয়সিংহ),[৪] চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের মধ্যে গদ্যাংশ (চাঁদপাল ও জনতা), দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম অংশ (রঘুপতি ও চাঁদপাল),[৫] তৃতীয় দৃশ্যের প্রথম অংশ

[১] শেষ অংশ হইল প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য। [২] দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দৃশ্য মিলিয়া হইল প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য। [৩] তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য হইল দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। দ্বিতীয় সংস্করণে দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য নূতন রচনা। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য হইল দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য। [৪] তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য হইল দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য। [৫] চতুর্থ অঙ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্য মিলিয়া হইল তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য।

(ধ্রুব, গোবিন্দমাণিক্য ও চাঁদপাল) ও মধ্য অংশ (ধ্রুব, গোবিন্দমাণিক্য ও নক্ষত্ররায়),[১] ষষ্ঠ দৃশ্য সম্পূর্ণভাবে (প্রাসাদে গোবিন্দমাণিক্য ও বাতায়নতলে অপর্ণা), সপ্তম দৃশ্যে অপর্ণার ও ধ্রুবর ভূমিকা;[২] পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের স্থানে স্থানে (গোবিন্দমাণিক্যের স্বগতোক্তি, জয়সিংহ গোবিন্দমাণিক্য ও নয়নরায়, নয়নরায় ও গোবিন্দমাণিক্য), চতুর্থ দৃশ্য সম্পূর্ণভাবে (প্রান্তরে রাত্রি ও ঝড়বৃষ্টি — অপর্ণার স্বগতোক্তি), পঞ্চম দৃশ্যের স্থানে স্থানে (অপর্ণার উক্তি)।[৩]

বিসর্জ্জনের নাট্যরস জমিয়াছে অন্ধ সংস্কার, মূঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ভ্রান্ত অধিকারবোধের সঙ্গে গভীর হৃদয়বৃত্তি, উদার জ্ঞান ও জীবনরসের সংঘর্ষে। এই দ্বন্দ্ব তীব্র দেখা দিয়াছে শুধু নায়ক জয়সিংহের মনে। অন্যথা একপক্ষে রঘুপতি ও গুণবতী অপর পক্ষে গোবিন্দমাণিক্য ও অপর্ণা। গোবিন্দমাণিক্যের ও অপর্ণার মনে সংশয় নাই, কেন না গভীর ইমোশনের মধ্য দিয়া জ্ঞানের আলোক তাহারা পাইয়াছে। রঘুপতির চরিত্রদার্ঢ্যের প্রতিষ্ঠাভূমি হইতেছে তাহার অন্ধনিষ্ঠা। গুণময়ী দোল খাইয়াছে প্রেম ও সংস্কারের মধ্যে বারেবারে। সে সন্তানহীন, তদুপরি স্বামীর উপর কর্ত্তৃত্বহানির আশঙ্কায় অভিমানিনী। তাহার এই স্বাভাবিক চরিত্রদৌর্বল্যের ছিদ্রপথেই কাহিনী আগাইয়া গিয়াছে নাটকীয় পরিণতির দিকে।

প্রথম সংস্করণে অপর্ণার ভূমিকা ছিল দীর্ঘতর, তাহাতে জয়সিংহের সহিত তাহার সম্পর্কের একটা পটভূমিকা ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০৩) তাহা ছাঁটিয়া ফেলায় নাটককাহিনী সংহততর এবং নাট্যকৌতূহল তীব্রতর হইয়াছে। হাসির ভূমিকা একেবারে বাদ দেওয়ায় এবং ধ্রুবর ভূমিকা ছোট করায় দ্বিতীয় সংস্করণে গোবিন্দমাণিক্যের ভূমিকা অধিকতর ট্রাজিক এবং নাট্যোচিত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষতি হইয়াছে এই যে গুণবতীর ভূমিকার মানবীয়তা কমিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ গুণবতীর ট্রাজেডি কতকটা অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে। মোট কথা হইতেছে যে

[১] চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম দৃশ্য হইল তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্য। [২] চতুর্থ অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য হইল তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্য হইল চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্য। [৩] পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য হইল পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় সংস্করণে বিসর্জ্জন নাটকে বাৎসল্যরসের প্রাধান্য কমিয়া গিয়াছে। ছন্দে অনেক উন্নতি হইয়াছে।

আবাল্যমাতাপিতৃহীন জয়সিংহ মানুষ হইয়াছে দেবীমন্দিরে রঘুপতির আশ্রয়ে। ব্রহ্মচারী তপস্বী পূজারী রঘুপতিকে ছাড়া তাহার শিশুহৃদয় আর কোন দ্বিতীয় স্নেহাবলম্বন পায় নাই। একটু বড় হইয়া রঘুপতির দৃষ্টি লাভ করিলে দেবীভক্তি তাহার মনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। আরো একটু বড় হইলে গোবিন্দ-মাণিক্যের চরিত্রমাধুর্য্য তাহার কিশোর মনের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিল।

মনে রেখো, দেবী আর গুরুদেব,
আর রাজা গোবিন্দমাণিক্য, এ দাসের
তিনটি দেবতা।[১]

মন্দির-আশ্রমে প্রকৃতির অকৃত্রিম পরিবেষ্টনে জয়সিংহের কিশোর মন বাড়িয়া উঠিয়াছে দেবীপ্রতিমার কল্পনায় ও অনুধ্যানে, সঙ্গী মূক তরুলতার মতই সারল্যে ও নীরব নিষ্ঠায়।

নবযৌবনের অজ্ঞাত বেদনা তাহার মনে ক্ষণে ক্ষণে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতেছে। মনের মধ্যে কিসের যেন অভাব ভক্তিরসের শান্ত সুষুপ্তির মধ্যে অতৃপ্তির কাঁটা বিঁধাইতেছে।

উদাসীন
বাতাসের মত, উতলা পরাণ, হুহু
চলে যায়—কোন্ ছায়ামুগ্ধ কুঞ্জবনে,
কোন্ স্বপ্নলোকে! যেন খেলাইতে ডাকে
কে আমার আপন বয়সী,[১]

অপর্ণার মর্ম্মবেদনার ঢেউ আসিয়া আঘাত করিল জয়সিংহের সুপ্ত হৃদয়ে।

তোমার হৃদয়ব্যথা আমার হৃদয়ে
এসে পেয়েছে চিরজীবন।[১]

[১] প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য।

এই ব্যথার রাখী দুইটি হৃদয়ের মধ্যে অদৃশ্য বন্ধন বাঁধিয়া দিল। অপর্ণার সাহচর্য তাহার গান জয়সিংহের মানসপ্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিল, তাহার প্রাণে সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া দিল। জয়সিংহ এখন বুঝিল,

শুধু ধরা দেও তুমি মানবের মাঝে,
মন্দিরের মাঝে নয়![1]

গোবিন্দমাণিক্য দেবীপূজায় বলি নিষেধ করিয়াছেন, রঘুপতির নিকট ইহা শুনিয়া জয়সিংহ হৃদয়ে প্রথম আঘাত পাইল। ইহাতে দেবীর প্রতি ভক্তি এবং রঘুপতির উপর নিষ্ঠা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

তিনটি দেবতা ছিল, এক গেল! শুধু
দুটি আছে বাকি![2]

কিন্তু মন ত যুক্তির বশ নয়। গোবিন্দমাণিক্য তাহার মনে যে শ্রদ্ধাপ্রীতির আলো জ্বালিয়া দিয়াছিল তাহা তো দেবীর মুখও উজ্জ্বলতর করিয়াছিল। এখন সে দীপ নিভিয়া গেলে ভক্তির উজ্জ্বলতাও কমিয়া আসিল; জয়সিংহের দেবীভক্তিতে সংশয়ের কুশাঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইল।

কই নিলে তুমি হৃদয়ের
যে অংশ উজাড় হয়ে গেল? মনে হয়
তুমিও সরিয়া গেছ দূরে![2]

জয়সিংহের চিত্তের ইমোশনাল স্থিতিভূমিতে এই আঘাত তাহাকে ক্ষণেকের জন্য অপর্ণার প্রতিও উদাসীন করিল।

তাহার মনে দ্বিতীয় এবং প্রচণ্ডতর আঘাত লাগিল রাজরক্তের জন্য রঘুপতির ভ্রাতৃহত্যাষড়যন্ত্র। ইহাতে যুগপৎ দেবীর মাহাত্ম্য ও রঘুপতির অভ্রান্তত্বের উপর তাহার সংশয় জাগিল, সংস্কার ও সদ্বুদ্ধির দ্বন্দ্ব শুরু হইল। রঘুপতির উপর বিশ্বাস জয়সিংহের জীবনের ভিত্তি। রঘুপতিকে ভ্রাতৃহত্যাপাপের অংশভাগী সে হইতে দিবে না, রাজরক্ত সে নিজেই আনিয়া দিবে। আপাতত

[1] ঐ প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য। [2] ঐ দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য।

সংস্কারের কাছে সদ্‌বুদ্ধির পরাজয় ঘটিল বটে কিন্তু তাহার মধ্যেও উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিল তাহার গুরুভক্তি। মনের দ্বন্দ্ব কিন্তু ঘুচিল না। অপর্ণার গান তাহার মনে জীবনের সহজ আনন্দের সাড়া জাগাইয়া তুলিল ক্ষণিকের জন্য।

আয়, সখি,
দুই জনে মিলে চিরদিন চলে যাই
সংসারের পর দিয়ে—শূন্য আকাশের
পথে দুই মেঘখণ্ড সম।[1]

রঘুপতি আসিয়া এই আনন্দস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। অপর্ণা শাপ দিল,

নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ! ধিক্
থাক্ ব্রাহ্মণত্বে তব! আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে![2]

রাজ্যরক্তপাতের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে গোবিন্দমাণিক্য যখন রঘুপতির ছলনা ধরাইয়া দিলেন তখন জয়সিংহ যেন পাগল হইয়া গেল।

কেবলি সংশয় হতে সংশয়ের মাঝে
নামিতে পারিনে আর![3]

ধ্রুবর শিশুলীলা জয়সিংহকে সঙ্কল্পচ্যুত করিল, এবং তাহার হৃদয় শূন্য হইয়া গেল।

এ কি হল! এ কি হল পলকেতে দেবী
গুরু যাহা ছিল বিসর্জ্জন দিনু—বিশ্বে
কিছু রহিল না আর![4]

রঘুপতির ভর্ৎসনা—

আপন বুদ্ধিরে
করিলি সকল হতে বড়! আজন্মের
স্নেহঋণ শুধিলি এমন করে![5]—

[1] ঐ দ্বিতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য। [2] ঐ তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য; বর্ত্তমান সংস্করণ দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য (পাঠান্তর "শূন্য নভস্তলে দুই লঘু")। [3]ঐ; ঐ। [5] প্রথম সংস্করণ তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য; বর্ত্তমান সংস্করণ দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য।

তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিল। জয়সিংহের পদতল হইতে জীবনের ভিত্তিভূমি সরিয়া গিয়াছে, সুতরাং সে আত্মহত্যা স্থির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল,

আমি এনে দিব রাজরক্ত, শ্রাবণের
শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।[১]

জীবনরঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে জয়সিংহ তাহার জীবনের একমাত্র অবশিষ্ট দেবতা গোবিন্দমাণিক্যের কাছে বিদায় মাগিতে গেলে গোবিন্দমাণিক্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাবে ?" জয়সিংহ বলিল,

কোথা যাব ?
কে বলিতে পারে তাহা ? বহু-বহু দূরে !
শুধায়ো না মোরে আর কোন কথা ! প্রভু,
নিষেধ কোরো না মোরে, তোমার নিষেধ
হলে এ যাত্রা হবে না শুভ ! আশীর্ব্বাদ
কর, হেথা যে সংশয় আছে সেথা যেন
দূর হয় সব ![২]

দেবীর নিষ্ঠাবান্ সেবক রঘুপতি। আচারমূলক শাস্ত্রে তাহার অপরিসীম নিষ্ঠা। ব্রাহ্মণের অধিকার সম্বন্ধে তাহার বোধ অত্যন্ত সচেতন। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে দেবীপূজা করাই তাহার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন করিবার কোন সুযোগ সে পায় নাই। তদুপরি শুষ্ক অন্ধ কর্ত্তব্যের কঠিন পথ অনুসরণ করিতে করিতে তাহার হৃদয়ের উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। জয়সিংহের উপর তাহার স্নেহ দেবীপূজার ফাঁকে ফাঁকে বাড়িয়া উঠিলেও জয়সিংহকে সে দেবীর ভক্ত সেবক এবং আপনার অনুরক্ত পুত্রকল্প শিষ্য বলিয়াই জানে। কর্ত্তব্যের পাষাণচাপা খণ্ডস্রোত এই স্নেহের যে একটা স্বতন্ত্র মর্য্যাদা ও মূল্য আছে একথা সে ভাবিবার কোন অবসরই পায় নাই। মানবের বৃহত্তর কর্ত্তব্যবোধ যে দেবপূজার প্রচলিত বিধিকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে এ ভাবনাও

[১] ঐ। [২] প্রথম সংস্করণ পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য।

তাহার পক্ষে অভাবনীয়। দেবতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অর্থ হইতেছে ব্রাহ্মণের অধিকার হরণ—ইহাই তাহার ধারণা। এই বিশ্বাস ও নিষ্ঠা রঘুপতি-চরিত্রের মেরুদণ্ড।

দেবীপূজায় জীববলি নিষিদ্ধ হইলে রঘুপতি রাজাকে বলিয়াছিল, "শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে!" গোবিন্দমাণিক্য শাস্ত্রের উপরে দেবীর আদেশের—অর্থাৎ তাহার দৈবী উপলব্ধির—দোহাই দিলে রঘুপতি যাহা বলিয়াছিল তাহা প্রকৃতপক্ষে নিজের বেলাই খাটে।

একে ভ্রান্তি, তাহে অহঙ্কার! অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই?[1]

গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে রঘুপতির দ্বন্দ্ব এক হিসাবে ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ শক্তির দ্বন্দ্ব বলা যাইতে পারে, অন্তত রঘুপতির মতে।

বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী পরে![2]

গুণবতীও সেইরূপ বুঝিয়াছে,

সেইমত আজ্ঞা
কর নাথ! ব্রাহ্মণ ফিরিয়া পাক নিজ
অধিকার, দেবী নিজ পূজা,[3]

গোবিন্দমাণিক্যের উপর রঘুপতির বিদ্বেষের গূঢ় কারণ—যাহা তাহার নিজেরও অজ্ঞাত ছিল—তাহা হইতেছে ঈর্ষ্যা। গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি জয়সিংহের আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তি আত্মসর্ব্বস্ব রঘুপতি ভালচোখে দেখে নাই। জয়সিংহ তাহার হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন; জয়সিংহের হৃদয়বৃত্তির অংশমাত্রও অপরে

[1] প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য; বর্ত্তমান সংস্করণ প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য। [2] প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য, বর্ত্তমান সংস্করণ প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য। [3] প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য, বর্ত্তমান সংস্করণ প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য (পাঠান্তর লক্ষণীয়)।

পাইবে ইহা তাহার অসহ্য। এই কারণেই অপর্ণাও রঘুপতির বিষনেত্রে পড়িয়াছিল। অপর্ণা নারী, তাই ব্রাহ্মণের অন্তরের এই গূঢ়রহস্য তাহার অজ্ঞাত রহিল না। যে-বন্ধন ধীরে ধীরে শ্লথ হইয়া আসিতেছিল সে-বন্ধনের বেদনা রঘুপতির চিত্তে জাগিয়া উঠিল প্রথমে অপর্ণার শাপে। মর্ম্মের গোপন দ্বারে ঘা পড়ায় ব্রাহ্মণের হৃদয়ের কঠিন কপাট ক্ষণেকের জন্য উন্মুক্ত হইল।

> আমি আজন্মের বন্ধু, হৃদণ্ডের
> মায়াপাশ ছিন্ন হয়ে যায় যদি, তাহে
> এত ক্লেশ![1]

রঘুপতির আসল ট্রাজেডি হইতেছে,

> জয়সিংহ, কিছুতে পাইনে তোর মন,
> এত যে সাধনা করি নানা ছলে বলে![1]

রঘুপতি ক্ষমতাপ্রিয় প্রতিমাপূজক প্রতারক নয়, নিজের কাছে সে খাঁটি। সত্যকে সে দেখিতে চায় নিজের বুদ্ধির দৃষ্টিতে। এই দৃষ্টি শাস্ত্রের অনুশাসনে সঙ্কীর্ণ এবং সংস্কারের গণ্ডীতে কুণ্ঠিত, তাই দেশকালাতীত চিরন্তন সত্যকে গ্রহণ করিতে সে অক্ষম। দেবীপ্রতিমার সাহায্যে প্রতারণাময় অভিনয় রঘুপতির কাছে মিথ্যাচার বা পাপ নয়। কেন না তাহার বিশ্বাস,

> দেবতার অসন্তোষ
> প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পায়। কিন্তু
> মূর্খদের কেমনে বুঝাব? চোখে চাহে
> দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়।
> মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
> মূর্খ! তোমার আমার হাতে সত্য নাই!...
> সত্য কোথা আছে, কেহ
> নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে!

১ প্রথম সংস্করণ তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য, বর্ত্তমান সংস্করণ দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য।

সেই সত্য কোটি মিথ্যা রূপে চারিদিকে
কাটিয়া পড়িছে ; সত্য তাই নাম ধরে
মহামায়া, অর্থ তার মহামিথ্যা ![1]

রঘুপতি খাঁটি বৈদান্তিক।

অনতিবিলম্বেই অপর্ণার শাপের ফল অঙ্কুরোদ্গত হইল। রঘুপতির অবচেতন মনে জয়সিংহের ভাবিবিরহ গাঢ় ছায়া ফেলিল, উদ্‌ভ্রান্ত মনে ক্ষণে ক্ষণে জয়সিংহের বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। রঘুপতির মনের হিমশিলা যে গলিতে শুরু করিয়াছে তাহা জানা গেল নিদ্রিত ধ্রুবকে দেখিয়া তাহার স্বগতোক্তিতে,

ওরে দেখে
তার সেই শিশুমুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।[2]

রাজার কাছে নতিস্বীকারের হীনতাজ্বালায় রঘুপতি জয়সিংহের স্নেহের দোহাই দিয়া নাটকের ক্লাইমাক্সের সূচনা করিল। স্নেহের দাবী করিয়া সে স্নেহাস্পদেরই মৃত্যুবাণ হানিল,

কোলে এসেছিল
যবে, ছিল এতটুকু, এ জানুর চেয়ে
ছোট, তার কাছে নত হোক্ জানু ! পুত্র
ভিক্ষা চাই আমি ![3]

জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতির অন্তরের অহঙ্কার-অভিমানের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন জয়সিংহের প্রেমই মধ্যস্থ হইয়া রঘুপতি-অপর্ণার বিরোধের অবসান করাইয়া দুই বিরহিহৃদয়কে স্নেহের নিবিড় বন্ধনে বাঁধিয়া দিল।

[1] প্রথম সংস্করণ চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য ; বর্ত্তমান সংস্করণ তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য।
[2] প্রথম সংস্করণ চতুর্থ অঙ্ক সপ্তম দৃশ্য ; বর্ত্তমান সংস্করণ তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য। [3] প্রথম সংস্করণ পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য, বর্ত্তমান সংস্করণ চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য।

জয়সিংহ মরিয়া গিয়া রঘুপতির মনে আপনার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল, আর তাহার অসম্পন্ন কর্ত্তব্যের ভার তুলিয়া লইল অপর্ণা।

অপর্ণার ভূমিকা রাজর্ষিতে নাই, ইহা বিসর্জ্জনে নূতন সৃষ্টি। জয়সিংহের হৃদয়বৃত্তির উদ্বোধনের জন্য এই ভূমিকাটি আবশ্যক। বাৎসল্যকারুণ্যের বন্ধন এই দুইটি মাতৃহারা কিশোরহৃদয়কে নিতান্ত স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য-ভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। জয়সিংহের সদয় ব্যবহার ও অবুঝ ব্যবধান অপর্ণাকে ব্যথা দিয়া তাহার প্রেম জাগ্রত করিল এবং কল্যাণ-ময় পরিণতির দিকে চালাইল।

> যেথা যাই শুধু দয়া।
> গৃহ আর নেই, শুধু দীর্ঘ রাজপথ।
> তবে ভিক্ষা ভাল, ভিক্ষা ভাল! জয়সিংহ,
> আমি তব তরুলতা নহি! আমি নারী![1]

জয়সিংহের অন্তর্বেদনা যখন অপর্ণা বুঝিতে পারিল তখন সে তাহার নারী-সুলভ মান-অভিমান ভাসাইয়া দিয়া রঘুপতির আদেশ ও জয়সিংহের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। জয়সিংহের নিষ্ঠুর উত্তরে ক্ষুব্ধ না হইয়া অপর্ণা চক্রী রঘুপতিকে উদ্দেশ করিয়া অন্তরের জ্বালাটুকু বাহির করিয়া দিল,

> আমি ক্ষুদ্র নারী
> অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে
> জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে।[2]

মন্দিরে যে আসন্ন ট্রাজেডি ঘনাইয়া উঠিতেছে তাহা অপর্ণার হৃদয় বুঝিতে পারিয়া কেবলি ব্যাকুলভাবে জয়সিংহকে ডাকিতে লাগিল।

> এই বেলা এস,
> জয়সিংহ, এস মোরা এ মন্দির ছেড়ে
> যাই![3]

[1] প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য। [2] ঐ তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য।
[3] প্রথম সংস্করণ চতুর্থ অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য; বর্ত্তমান সংস্করণ তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য।

কিন্তু জয়সিংহের যাইবার স্থান কোথায়? যে রাজত্বে সে আজন্ম বাস করিয়াছে তাহার রাজকর পরিশোধ না করিয়া তাহার যাইবার উপায় নাই।

শ্রাবণের সেই শেষ রজনীতে বহিঃপ্রকৃতির মত অপর্ণার চিত্তও হইয়াছে ব্যাকুল, উদ্‌ভ্রান্ত।

যত, বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ ফলা বারবার
বিদীর্ণ করিছে যামিনীর অন্ধকার
বুক, ভয়ঙ্কর গোপন রহস্যকথা
যেন ছিঁড়িয়া বাহির করিবারে, তত
কেন মনে পড়ে জয়সিংহে।[১]

জয়সিংহের অন্বেষণে সে যখন মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার পূর্ব্বে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে, আর রঘুপতি জয়সিংহের দেহের উপর পড়িয়া বিলাপ করিতেছে। শুষ্কমন রুক্ষমূর্ত্তি ব্রাহ্মণের অন্তরের এই অমৃত-উৎস অপর্ণার হৃদয় স্পর্শ করিল। মুহূর্ত্তে জয়সিংহের উত্তরাধিকার স্বীকার করিয়া অপর্ণা তাহার কণ্ঠের স্নেহসুধা সবটুকু ঢালিয়া বলিল, "পিতা চলে এস।"

নাটকের ধ্রুবচরিত্র রাজা গোবিন্দমাণিক্যের। তাঁহার মনে কোন দ্বন্দ্ব কোন সংশয় নাই। শাস্ত্রজ্ঞানের মধ্য দিয়া নহে, অভিজ্ঞতা ও সংকীর্ণ বুদ্ধির সাহায্যেও নহে, আপন নির্ম্মল অন্তরের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্য সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাই তাঁহার হৃদয়ে সংশয়ের লেশমাত্র নাই। তাঁহার কর্ত্তব্যের পথ কঠিন হইলেও পরিষ্কার। ক্ষোভ শুধু এই,

হায় মহারাণী, কর্ত্তব্য কঠিন হয়ে
ওঠে—তোমরা ফিরালে মুখ।[২]

ঘৃণা কিম্বা ভয়ে
বিমুখ তরঙ্গ-রাশি দুইধারে ভেঙ্গে
গিয়ে পথ করে দেয়—সঙ্কল্পতরণী

[১] প্রথম সংস্করণ পঞ্চম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য। [২] ঐ দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য, বর্ত্তমান সংস্করণ প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য। পাঠান্তর লক্ষণীয়।

দ্রুত চলে যায়, কিন্তু প্রেম ক্ষুব্ধ হয়ে
সম্মুখে দাঁড়ায় যবে সে বড় দুঃসহ
বাধা ![১]

ইহাই গোবিন্দমাণিক্যের ট্রাজেডি।

রাজমহিষী গুণবতীর হৃদয়দ্বন্দ্ব একটু জটিল হইলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রঘুপতির ও গুণবতীর সমস্যার মধ্যে একটু সাম্য আছে। উভয়েই অধিকার-লোপের অভিমানে ক্ষুব্ধ এবং উভয়েই স্নেহপাত্রের স্নেহের সম্পূর্ণ অংশ দাবী করে। সন্তানহীনতার আত্মধিক্কার গুণবতীকে মনে মনে রাজার কাছে হীন করিয়া রাখিয়াছিল। হাসির ও ধ্রুবর প্রতি রাজার অহেতুক বাৎসল্যপ্রীতি এই হীনতাবোধের উপর ঈর্ষার জ্বালা বুলাইয়াছিল।

মাতঃ, কোন পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে ?[২]
রাজহৃদয়ের সুধাপাত্র হতে, তোরা
নিলি প্রথম অঞ্জলি, কে তোরা পথের
ছেলে ![৩]

তৃতীয়ত দেবীপূজার বলিনিষেধে সংস্কারে আঘাত এবং রঘুপতির ভীতিপ্রদর্শন ও সূক্ষ্ম চাটুবাণী।

দেবতা কৃতার্থ
হল তোমারি আদেশ বলে, ফিরে পেলে
ব্রাহ্মণ আপন তেজ ! তোমরাই ধন্য
এই যুগে, যত দিন নাহি জাগে কল্কি-
অবতার ![৪]

স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ এখন বাস্তবরূপ ধরিল। স্বামীর কাছে রানী রাজাজ্ঞা

[১] প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য। [২] ঐ প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য ; বর্ত্তমান সংস্করণ, ঐ। [৩] প্রথম সংস্করণ, প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য। [৪] ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য ; বর্ত্তমান সংস্করণ প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য।

প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলে তাহা যখন প্রত্যাখ্যাত হইল তখন গুণবতীর অভিমানের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

নিয়েছি বুঝিয়া
আপনার স্থান—হয় ধরাধূলিতলে
নতশির—নয় উর্দ্ধফণা ভুজঙ্গিনী
আপনার তেজে ![1]

রাজা-ও-রাণীর মত বিসর্জ্জনেও স্বামী-স্ত্রীর বিবোধ রাজকর্ত্তব্য উপলক্ষ্য করিয়া।

রানীর পূজা দ্বিতীয় বার ফিরাইয়া দেওয়ায় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল।

মহামায়া, তুই নারী,
আমি নারী—দে আমারে তোর শক্তি-অংশ
স্নেহ মায়া দয়া ধরুক সংহার মূর্ত্তি ![2]

এই বজ্রকঠিন অভিমান-অহঙ্কারের মধ্যেও প্রেমের প্রতীক্ষা জাগিয়াছিল। তাই বিবোধের প্রত্যক্ষ হেতু দেবীমূর্ত্তির অপসারণের পর স্বামী-স্ত্রীব মিলন অতি-সহজেই ঘটিয়া গেল।

৫

'চিত্রাঙ্গদা'[3] নাট্যকাব্য। ইহাতে নাটকের সম্পূর্ণতা নাই কিন্তু নাটকীয়তা আছে, অধিকন্তু ইহা গীতিকাব্যের সম্পূর্ণ সুষমামণ্ডিত। নায়িকা চিত্রাঙ্গদাই নাট্য-কাব্যটির পটভূমিকা সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া আছে। অর্জ্জুন তাহার ইমোশনাল অভিব্যক্তির আলম্বন ও উদ্দীপন মাত্র। কিশোরযোদ্ধার বেশধারিণী চিত্রাঙ্গদাকে অর্জ্জুন যখন প্রথম দেখিল তখন তাহার মনে শুধু কৌতুকের তরঙ্গ

[1] ঐ ; ঐ (পাঠান্তর লক্ষণীয়)। [2] প্রথম সংস্করণ তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য।

[3] প্রথম সংস্করণ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলী মণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮ ভাদ্র ১২৯৯)। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১) চিত্রগুলি বাদ যায় ও 'বিদায়-অভিশাপ' যুক্ত হয়। তৃতীয় সংস্করণ কাব্য-গ্রন্থাবলী (১৩০৩)। চতুর্থ সংস্করণ হিতবাদী প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী (১৩১১)। ইহাতে অল্পস্বল্প পাঠপরিবর্ত্তন হইয়াছে।

খেলিয়াছিল। চিত্রাঙ্গদা পূর্ব্ব হইতেই অর্জ্জুনের বীরখ্যাতি শুনিয়া মুগ্ধ ছিল, এখন সাক্ষাৎ দেখিয়া মনপ্রাণ হারাইল।

সেই মুহূর্ত্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি! সেই মুহূর্ত্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।

চিত্রাঙ্গদার ছাইচাপা নারীসংস্কার জাগিয়া উঠিল। সে সাজসজ্জা করিয়া চলিল অর্জ্জুনের মন জয় করিতে। রূপহীনা কিশোরীর প্রণয়নিবেদন ব্যর্থ হইল ব্রহ্মচারিব্রতধারী তৃতীয় পাণ্ডবের কাছে। পার্ব্বতী যেমন শিব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন এও কতকটা তেমনি। কালিদাসের পার্ব্বতী ধিক্কার দিয়াছিলেন তাঁহার রূপকে, কেন না "প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা।" আর রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা ধিক্কার দিল নিজের কর্ম্মকে, নিজের রূপের অভাবকে,

এত দিন পরে
বুঝিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি বৃথা বিদ্যা যত!

কিন্তু চিত্রাঙ্গদা পার্ব্বতী নহে, তাহার রূপ নাই এবং তিলে তিলে অর্জ্জুনের হৃদয় জয় করিবার অবকাশ ও ধৈর্য্যও নাই। তাহার চরিত্রে একটা পুরুষাংশ ছিল —অধৈর্য্য, তাহার উপরে সে আজন্ম স্বেচ্ছাচারিণী।

জানি আমি
এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে;
যে নারী নির্ব্বাক্ ধৈর্য্যে চির মর্ম্মব্যথা
নিশীথনয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,
আজন্ম বিধবা, আমি সে রমণী নহি;
আমার কামনা কভু হবে না নিষ্ফল!

পার্ব্বতী আশ্রয় করিয়াছিলেন তপস্যা, চিত্রাঙ্গদা সাধনা করিল রূপের।

তাহার ভরসা,

> আপনারে বারেক দেখাতে[1] পারি যদি
>
> নিশ্চয় সে দিবে ধরা!

রূপের ফাঁদে অর্জ্জুন অনায়াসেই ধরা দিল। তখন শুরু হইল চিত্রাঙ্গদার অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপহার্য্য ক্ষণিক ভোগসুখের মধ্যে অরূপহার্য্য চিরন্তন প্রেমের পিপাসা। তাই অর্জ্জুনের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিতে তাহার অতি কুণ্ঠা।

যে-মিলন ছলনায় সাধিত হইয়াছে তাহা চিত্রাঙ্গদাকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না। তাহার নারীহৃদয় জাগিয়া উঠিয়াছে সত্যমিলনের জন্য, যাহা "বহুকাল সাধনায় এক দণ্ড শুধু পাওয়া যায়"। রূপের অভিশাপ তাহাকে পলে পলে দগ্ধ করিতেছে।

> দেহের সোহাগে
>
> অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
>
> নরলোকে কে পেয়েছে আর!

কিন্তু রূপেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। নারীরূপের দ্বারা প্রকৃতি নিজের কাজ সারিয়া লয়। তাহার পর আসে নারীহৃদয়ের যথার্থ ফলপরিণতি।

> ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
>
> তখন প্রকাশ পায় ফল।

বর্ষশেষ হইবার পূর্ব্বেই অর্জ্জুনের রূপতৃষ্ণা জুড়াইয়া আসিল এবং শুধু দেহের ভোগে ক্লান্তি দেখা দিল। তাহার পর চিত্রাঙ্গদার সত্য পরিচয় পাইয়া অর্জ্জুনের মনে শ্রদ্ধা জাগিল এবং যথার্থ প্রেমের উদয় হইল। অর্জ্জুনের কাছে চিত্রাঙ্গদার পরোক্ষে আত্মপরিচয়দান-প্রসঙ্গে কুমারসম্ভবের পঞ্চম সর্গের কথা মনে পড়ে। চিত্রাঙ্গদার মহৎ প্রেম আর অর্জ্জুনকে বাঁধিয়া রাখিল না, তাহাকে মহত্তর কর্ত্তব্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিল কোনরকম পিছুটান না রাখিয়া।

[1] পাঠান্তর "একবার দেখাইতে"।

আমি চিত্রাঙ্গদা
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

৬

'বিদায়-অভিশাপ'[১] নাট্যকবিতা। তবে ইহার মধ্যে কাব্যাংশের প্রাধান্য নাট্যাংশকে বহুদূর ছাড়াইয়া গিয়াছে। চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে বিদায়-অভিশাপের কিছু বস্তুগত সাদৃশ্য আছে। চিত্রাঙ্গদায় অর্জ্জুন অভিজ্ঞ প্রৌঢ় প্রণয়ী, এবং চিত্রাঙ্গদা পূর্ব্ব হইতেই তাহার প্রতি অনুরাগ পোষণ করিয়া আসিয়াছে যশ শুনিয়া। বিদায়-অভিশাপের নায়ক-নায়িকা কচ-দেবযানীর প্রেম বাড়িয়া উঠিয়াছে প্রাত্যহিক সাহচর্য্যের মধ্য দিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। কচ ব্রাহ্মণ ও দেবকুমার, সংযম তাহার স্বভাব, এবং ক্ষমা তাহার ধর্ম্ম। প্রেম তাহার অন্তরের বীজমন্ত্র, গোপনধন, তাহা তাহার জীবনের বৃহত্তর সার্থকতার পরিপন্থী হইতে পারে না। তাই ভালবাসার খাতিরেই সে ভালবাসার পাত্রকে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইল।

বল কি হইবে জেনে
ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার,
একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার
আপনার কথা!...

[১] প্রথমপ্রকাশ সাধনা মাঘ ১৩০০। পরে ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে প্রকাশিত হয় (১৩০১)।

স্বর্গ আর স্বর্গ বলে'
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগসম
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্ব্বকার্য্য মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে।

দেবযানী অসুরকুমারী। অভিমান তাহার স্বভাবধর্ম্ম, ক্ষমা নহে; এবং জীবনরসপান ছাড়া মহত্তর কোন আদর্শ তাহার নাই। নারীস্বভাব-অনুসারেই সে প্রণয়নীড় রচনা করিয়া কচকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। কর্ত্তব্য-পালনের গৌরব-অর্জ্জনে একদিন হয়ত কচের হৃদয়ক্ষত শুকাইয়া আসিবে, কিন্তু দেবযানীর সান্ত্বনা কোথায়? শুধু নিষ্ফল প্রণয়ের শূন্য বেদনামাত্র নহে, প্রত্যাখ্যানের দুর্বিষহ লজ্জাই তাহার জীবনের শান্তি এবং সংসারের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া দিবে।

এই বনে
বসে রব নতশিরে নিঃসঙ্গ একাকী
লক্ষ্যহীনা! যে দিকেই ফিরাইব আঁখি
সহস্র স্মৃতির কাঁটা বিঁধিবে নিষ্ঠুর;
লুকায়ে বক্ষের তলে লজ্জা অতি ক্রূর
বারংবার করিবে দংশন।

দেবযানীর অভিশাপ কচ পরিপূর্ণ ক্ষমার সহিত গ্রহণ করিল,

আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে!
ভুলে যাবে সর্ব্বগ্লানি বিপুল গৌরবে!

এইখানেই কচ-চরিত্রের অপূর্ব্বতা।

বিদায়-অভিশাপে কবি অমিত্রাক্ষর ছাড়িয়া মিত্রাক্ষর অবলম্বন করিলেন। তাহাতে ছন্দের মাধুর্য্য ও শক্তি বাড়িল। পরবর্ত্তী নাট্যকাব্যগুলিতে এই রীতিই অবলম্বিত হইয়াছে।

১৭

'মালিনী'[১] নাট্যকাব্যে নাট্যাংশ ও কাব্যাংশের প্রাধান্য প্রায় সমানসমান। এক হিসারে মালিনীকে বিসর্জ্জনের অনুবৃত্তি বলা চলে। তবে ইহাতে মানবীয়তা একটু কমিয়া গিয়াছে। মালিনীর সঙ্গে অপর্ণার এবং সুপ্রিয়-ক্ষেমঙ্করের সঙ্গে জয়সিংহ-রঘুপতির ভাবগত ঐক্য আছে। সুপ্রিয়-ক্ষেমঙ্করের সৌহার্দ্দ্য পরে 'গোরা' উপন্যাসে বিনয়-গোরার সখ্যে অনুবৃত্ত হইয়াছে।

কাশ্যপের নিকট শিক্ষা পাইয়া রাজকন্যা মালিনী বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগিণী হন। মাতামহের ধর্ম্মনিষ্ঠার ও ত্যাগপ্রবণতার উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিল সে। বৌদ্ধমতের অহিংসা ও সেবা-ধর্ম্ম তাহার সুপ্ত অধ্যাত্মবৃত্তিকে জাগাইয়া দিল। রাজান্তঃপুরের সুখের প্রাচীর "সন্ধ্যায় মুদ্রিতদল পদ্মের কোরকে আবদ্ধ ভ্রমরী"-কে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বিপুল সংসারের বৃহৎ আহ্বান তাহাকে জনতার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিল।

শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা, সে দুঃখের লব পরিচয়
তোমাদের সাথে।[২]

সুপ্রিয়র অনুরাগ মালিনীর সুপ্ত নারীহৃদয়কে জাগাইয়া তুলিল, তাহার চিত্তে নবজাগ্রত প্রেমের ভীরুতা ও সঙ্কোচ দেখা দিল।

হায় বিপ্রবর,
যত তুমি চাহিতেছ আমি যেন তত
আপনারে হেরিতেছি দরিদ্রের মত।[৩]

মালিনীর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাই চরম দুঃখের ও পরম পরীক্ষার মুহূর্ত্তে সে অহিংসা-ক্ষমাই আশ্রয় করিয়া রহিল।

ক্ষেমঙ্করের সখ্য ও আনুগত্য ছিল সুপ্রিয়র জীবনের প্রধান অবলম্বন। সুপ্রিয় হৃদয়নিষ্ঠ, কোমলচিত্ত; আর ক্ষেমঙ্কর বুদ্ধিনিষ্ঠ, অটলচিত্ত। সুপ্রিয় শাস্ত্রকে

[১] প্রথমপ্রকাশ কাব্য-গ্রন্থাবলী (১৩০৩)। [২] দ্বিতীয় দৃশ্য। [৩] পঞ্চম দৃশ্য।

গ্রহণ করে হৃদয়ের সঙ্গে মিলাইয়া, ক্ষেমঙ্কর হৃদয়কে পিষিয়া ফেলে শাস্ত্রের রথচক্রতলে। দুইজনের চরিত্রের এই বৈপরীত্যই তাঁহাদের সুদৃঢ় স্নেহবন্ধনের ভিত্তি। সুপ্রিয় ভাবিত,

> বন্ধু, ভাই,
> প্রভু। সূর্য্য সে আমার, আমি তার রাহু,
> আমি তার মহামোহ। বলিষ্ঠ সে বাহু,
> আমি তার লৌহপাশ।[১]

সুপ্রিয়র প্রণয়ের প্রতি দুর্দমনীয় লোভই ক্ষেমঙ্করকে মারের মুখে আগাইয়া দিয়াছিল।

> বন্ধু চিরন্তন,
> তোমারে ডুবাব আমি, ছিল এ লিখন।[১]

ইহাই সুপ্রিয়র ট্রাজেডি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অধিকাররক্ষায় সুপ্রিয় নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু সে কখনুই শাস্ত্রবচনের প্রতিধ্বনি মূর্ত্ত ছিল না।

> যে শাস্ত্রের অনুগামী
> এ ব্রাহ্মণ, সে শাস্ত্রে কোথাও লেখে নাই
> শক্তি যার ধর্ম্ম তার।[২]

কিন্তু শাস্ত্রবিচারে সংশয় থাকিলেও কর্ম্মনিষ্ঠায় সে ছিল সবার অগ্রগণ্য। তাই তাহাকে ক্ষেমঙ্কর কিছুতেই ছাড়িতে চাহে নাই,

> দিব না বিদায়।
> তর্কে শুধু দ্বিধা তব, কাজের বেলায়
> দৃঢ় তুমি পর্ব্বতের মত।[২]

মালিনীকে দেখিয়া সুপ্রিয়র সব সংশয় দূর হইয়া গেল, প্রেম ও ভক্তির দীপ তাহার অন্তরে জ্বলিয়া উঠিল। মালিনীর দৃষ্টি দিয়া সুপ্রিয় নিজের অন্তরকে দেখিতে পাইল। তাই ক্ষেমঙ্করের ব্যঙ্গকণ্টকিত অভিযোগ সে স্বীকার করিয়া লইল।

[১] ঐ। [২] দ্বিতীয় দৃশ্য।

ধর্ম্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল,—নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে,—সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দ বেদনে
চাহি ওই উষারুণ করুণ বদনে।
ওই ধর্ম্ম মোর।[১]

এই যে-ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া সুপ্রিয় বন্ধুর বিশ্বাসহানি করিল তাহার মর্য্যাদা তাহার জীবনের অপেক্ষা, তাহাদের আবাল্য সখ্যের অপেক্ষাও বড়। তাই তাহার কোন সঙ্কোচ বা লজ্জা নাই। এ ধর্ম্মের কাছে সব কিছুই বিসর্জ্জন দেওয়া যায়।

বন্ধু এক আছে
শ্রেষ্ঠতম, সে আমার আত্মার নিশ্বাস,
সব ছেড়ে রাখিয়াছি তাহারি বিশ্বাস,
প্রাণসখে; ধর্ম্ম সে আমার।[১]

তাহার ত্যাগ ক্ষেমঙ্করের প্রাণত্যাগের অপেক্ষা বহুগুণে কঠিন।

ক্ষেমঙ্কর, তুমি দিবে প্রাণ,—
আমার ধর্ম্মের লাগি করিয়াছি দান
প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার প্রণয়,
তোমার বিশ্বাস।[১]

ক্ষেমঙ্করের ধর্ম্মে হৃদয়বৃত্তির কোন স্থান নাই। শাস্ত্রের বাঁধাপথ ছাড়া আর গন্তব্য পথ সে স্বীকার করে না, অন্তত সর্ব্বসাধারণের জন্য। ধর্ম্মমতের বৈচিত্র্য একেবারে অস্বীকার না করিয়া সে সুপ্রিয়কে এই যুক্তি দিয়াছিল,

তোমার অন্তরে
উৎস আছে, প্রয়োজন নাহি সরোবরে,—
তাই বলে ভাগ্যহীন সর্ব্বজন তরে
সাধারণ জলাশয় রাখিবে না তুমি,—

১ পঞ্চম দৃশ্য।

পৈতৃক কালের বাঁধা দৃঢ় তটভূমি,
বহুদিবসের প্রেমে সতত লালিত
সৌন্দর্য্যের শ্যামলতা, সযত্নপালিত
পুরাতন ছায়াতরুগুলি, পিতৃধর্ম্ম,
প্রাণপ্রিয় প্রথা, চির-আচরিত কর্ম্ম,
চিরপরিচিত নীতি ?[১]

ইহাও হৃদয়াবেগেরই দোহাই পাড়া, তবে উল্টা দিকে। এইখানে দেখি রঘুপতির তুলনায় ক্ষেমঙ্কর-চরিত্রের উৎকর্ষ।

ধর্ম্মের ক্ষেত্রে হৃদয়বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া ক্ষেমঙ্কর দৌর্ব্বল্য বলিয়া মনে করে।

হায় হায় সখে,
আপন হৃদয় যবে ভুলায় কুহকে
আপনারে, বড় ভয়ঙ্কর সে সময়—
শাস্ত্র হয় ইচ্ছা আপনার, ধর্ম্ম হয়
আপন কল্পনা।[১]

ক্ষেমঙ্করের আসল ট্রাজেডি রঘুপতির মত, স্নেহাস্পদের স্নেহ হারাইবার আশঙ্কা। বন্ধুর সঙ্গে প্রথমবিচ্ছেদের ক্ষণে এই আশঙ্কাই তাহার মনে জাগিয়াছিল,

বল তুমি, আমারে একাকী
ফেলিয়া কি চলে যাবে মায়ার পশ্চাতে
বিশ্বব্যাপী এ দুর্য্যোগে, প্রলয়ের রাতে ?[১]

৮

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে পাঁচটি নাট্য-কবিতা লিখিয়াছিলেন। সেগুলি 'কাহিনী'-তে (১৯০০) সঙ্কলিত আছে। নাট্য-কবিতাগুলির মধ্যে যেটি দীর্ঘতর, 'লক্ষীর পরীক্ষা,' সেটির প্রধান রস হইতেছে

[১] দ্বিতীয় দৃশ্য।

কৌতুক। ভাষা ও ছন্দ বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ উপযোগী। 'সতী'-র বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক। 'নরকবাস'-এর আখ্যানবস্তু পৌরাণিক। 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' মহাভারত-কাহিনী অবলম্বনে লেখা। শেষের দুইটি কবিতায় প্রাচীন মহাকাব্যের কতকগুলি চরিত্র নবগৌরবে ও ভাস্বরমহিমায় ফুটিয়াছে। আকারে নিতান্ত ছোট হইলেও গান্ধারীর-আবেদনে পৌরাণিক নাটকের সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণ বর্ত্তমান আছে। বাঙ্গালা পৌরাণিক নাট্যসাহিত্যে দুর্যোধন হইতেছে পাষণ্ড এবং ধৃতরাষ্ট্র বর্ণহীন। মূল মহাভারতে তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথ ব্যাসের অঙ্কিত এই চরিত্র দুইটিতে উপযুক্ত বর্ণসম্পাত করিয়া উজ্জ্বলতর করিয়াছেন।

৯

'বালক' পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথ ছোটছোট কৌতুকনাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১২৯২ সালে বালকে এবং ১২৯৩-৯৪ সালে ভারতীতে যে কৌতুকনাট্যগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পরে "হাস্যকৌতুক'-এ (১৩১৪) সংগৃহীত হইয়াছে। এই রচনাগুলির কৌতুকরস উজ্জ্বল নির্ম্মল ও অকৃত্রিম। নিতান্ত ক্ষুদ্র রচনা হইলেও 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রহসনের অন্যতম।

সাধনায় রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি কৌতুকনিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তিনটি কৌতুকনাট্যের শ্রেণীতে পড়ে,—'বিনিপয়সার ভোজ,' 'নূতন অবতার,' এবং 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি'।[১] এই তিনটি রচনা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের ভাষায় ভাণ-শ্রেণীর নাট্যনিবন্ধ, যেহেতু একটিমাত্র পাত্রই অপর সব ভূমিকার হইয়া কথা কহিয়াছে। পরবর্ত্তী কালের ছোট কৌতুকনাট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'বশীকরণ'।[২] এটিকে একটি ছোট প্রহসন বলা চলে।

'গোড়ায় গলদ' (৩১ ভাদ্র ১২৯৯, খ্রি-স ১৮৯৯) রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ

[১] 'ব্যঙ্গকৌতুক'-এ (১৩১৪) সঙ্কলিত। [২] বঙ্গদর্শনে প্রথমপ্রকাশিত (অগ্রহায়ণ ১৩০৮) এবং ব্যঙ্গকৌতুকে সঙ্কলিত।

এবং বৃহত্তম প্রহসন। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (চৈত্র ১৩০৩) আকারে ক্ষুদ্রতর হইলেও প্রকারে হীনতর নয়। গোড়ায়-গলদ ভাঙ্গিয়া পরে 'শেষরক্ষা' (১৯২৮) লেখা হয়।

'চিরকুমার-সভা'[১] বা 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' (১৩০৮) এক বিচিত্র রচনা। ইহাকে বলিতে পারি গল্পনাট্য। ইহাতে কৌতুকনাট্যের সংলাপ পদ্ধতি অবলম্বনে গল্পের পাড়ি জমানো হইয়াছে। অনেককাল পরে রবীন্দ্রনাথ গল্পনাট্যটিকে পূর্ণাঙ্গ নাটকের রূপ দিয়াছিলেন (১৩৩২)। 'কর্ম্মফল'-ও (১৩১০)[২] গল্পনাট্য। তবে আকারে ছোট। কর্ম্মফলের নাট্যরূপ 'শোধবোধ' (১৯২৬)।

গোড়ায়-গলদ, বৈকুণ্ঠের-খাতা এবং চিরকুমার-সভার কয়টি প্রধান ভূমিকায় রচয়িতার কোন কোন আত্মীয়বন্ধুর চরিত্রের ছায়াপাত হইয়াছে। একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিয়াছিলেন, "চন্দ্রমাধব বাবুর চরিত্রে অনেক মিশল আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা কতক রাজনারায়ণবাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্ম্মলাও তথৈবচ—এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা আছে বটে।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্য-প্রহসনগুলির চরিত্রচিত্রণ স্বাভাবিক, এবং কৌতুক-রস স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও অনাবিল। একটু বুদ্ধিগ্রাহ্য বলিয়া হয়ত সর্ব্বত্র সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য নয়। তবে সংলাপের তীক্ষ্ণতা ঔজ্জ্বল্য ও মাধুর্য্য অসাধারণ। বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঘেঁসিতে পারে এমন কেহ নাই। সামাজিক নক্শা হিসাবে মধুসূদনের প্রহসন দুইটির ও দীনবন্ধুর সধবার একাদশীর উৎকর্ষ খাটো করিতে চাহি না কিন্তু বিশুদ্ধ প্রহসন হিসাবে রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে তুলনা চলে না।

১৭

অনেককাল পরে ১৩১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরিবেশে গীতাশ্রয়ী নাট্যরচনার প্রেরণা অনুভব করিলেন। মুখ্যত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের

[১] প্রথমপ্রকাশ ভারতী (১৩০৭-৮) এই নামে। [২] কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য রচিত। [৩] শিলাইদহ সেপ্টেম্বর ১৯০০; বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ৯৬।

অভিনয়ের জন্য 'শারদোৎসব' (১৯০৮) রচিত হইয়াছিল। শারদোৎসবের প্রস্তাবনায় কবি সংস্কৃত নাটকের ভঙ্গির ঈষৎ অনুসরণ করিয়া অভিনবত্বের সৃষ্টি করিলেন। পরবর্তী কয়েকটি অনুরূপ নাট্যরচনায়ও ইহা দেখা যায়। শারদোৎসব প্রথম অভিনীত হয় শান্তিনিকেতনে ১৩১৫ সালের আশ্বিন মাসে। অভিনয়ের জন্য কবি এই নান্দী শ্লোক দুইটি রচনা করিয়াছিলেন সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিতে,

শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্য্যধারে যাঁহার আনন্দ বহি যায়
সেই অপরূপ, সেই অরূপ, রূপের নিকেতন
নব নব ঋতুরসে ভরে দিন সবাকার মন॥
প্রফুল্ল শেফালিকুঞ্জ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি
কাশের মঞ্জরীরাশি যাঁর পানে উঠিছে চঞ্চলি,
স্বর্ণদীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধহাস্যে সেই রসময়
নির্ম্মল শারদরূপে কেড়ে নিন সবার হৃদয়॥

তাহার পর "(ওগো তুমি) নব নব রূপে এস প্রাণে!"—এই গান।[১]

শারদোৎসব লেখার সময়ে গীতাঞ্জলির পালা চলিতেছে। তবে এইসময়ে কাব্যে যে ভক্তিরসগাঢ়তার পরিচয় পাই নাট্যরচনায় তাহা পাই না। কিন্তু কবিদৃষ্টি যে তখন মানুষের হৃদয়লোক ছাড়িয়া রসলোকে গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার প্রমাণ পাই। বস্তুত, বিশুদ্ধ কবিত্বের হিসাবে গীতাঞ্জলির অধিকাংশ কবিতার তুলনায় শারদোৎসব সমৃদ্ধতর। গীতাঞ্জলিতে প্রকট হইয়াছেন প্রধানত কবি-মানুষ রবীন্দ্রনাথ, আর শারদোৎসবে মুখ্যত সহজ-রসিক রবীন্দ্রনাথ।

শারদোৎসবে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকলার ধারাপরিবর্তন ঘটিল। রাজা-ও-রাণী বিসর্জন মালিনী প্রভৃতি নাটক-নাটিকায় ছিল মানুষের ব্যক্তিগত হৃদয়দ্বন্দ্ব, তাহার জীবনের সমস্যা, সংস্কারের সঙ্গে বিচারবুদ্ধির সংঘর্ষ, হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে অহঙ্কার-অভিমানের বিরোধ। গোড়ায়-গলদ ও বৈকুণ্ঠের-খাতা প্রভৃতি প্রহসনে পাইয়া

১ 'নান্দী,' ভারতী কার্ত্তিক ১৩১৫ পৃ ৩৩৫।

ছিলাম সংলাপাশ্রয়ী বিশুদ্ধ কৌতুকরসদীপ্তি। শারদোৎসব হইতে দেখি যে কবিদৃষ্টি পড়িয়াছে মানুষের হৃদয়বৃত্তির সমস্যায় নয় তাহার রসানুভূতির সামর্থ্যের উপর। এখানে ভূমিকাগুলি মানুষের অন্নময় কোষের বা শারীররূপের প্রতিনিধি ততটা নয় যতটা তাহার আনন্দময় কোষের বা রসরূপের। এইভাবে দেখিলে শারদোৎসবে ও পরবর্তী অনেকগুলি নাট্যরচনায় আধ্যাত্মিক রূপকের আভাস মিলে। প্রহসনগুলির প্রভাব দেখা যায় সংলাপের তীব্র ঔজ্জ্বল্যে।

প্রকৃতির ঋতুচক্রে যেমন মানুষের নিগূঢ় ব্যক্তিত্বেও তেমনি সর্বদা দেওয়া-নেওয়ার তালফেরতা চলিয়াছে। দুঃখবেদনাকে এড়াইয়া নয়, তাহাকে মুক্ত প্রাণে স্বীকার করিলেই তবে জগতে আনন্দের অখণ্ড অধিকার লাভ হয় এবং মানবাত্মা বিরাটের রসলীলায় যোগ দিবার যোগ্যতা অর্জন করে। সংসারকে ত্যাগ করিয়া নয়, তাহাকে পদে পদে স্বীকার করিয়া লইয়া দুঃখে সুখে সমদৃষ্টিলাভের সাধনাই এই আনন্দমুক্তির পথ। শরৎকালে প্রকৃতির পটে এই সহজ-আনন্দসাধনার, ভোগের মধ্যে ত্যাগের, রূপটি ভাসিয়া উঠে। ইহাই শারদোৎসবের মর্মকথা। শারদোৎসবের কেন্দ্রীয় পাত্র সন্ন্যাসী ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন ঠাকুরদাদাকে।

> আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য্য সুন্দর কেন? কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ ক'র্‌ছে! বড় সহজে ক'র্‌চে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ ক'রে ক'র্‌ছে! সেই জন্যেই ধানের ক্ষেত এমন সবুজ ঐশ্বর্য্যে ভ'রে উঠেছে, বেতসিনীর নির্ম্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেই জন্যেই এত সৌন্দর্য্য।

ঠাকুরদাদার ভূমিকা নূতন সৃষ্টি। অতঃপর প্রায় সমস্ত নাট্যরচনায় অনুরূপ ভূমিকা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

'ঋণশোধ' (১৯২১) শারদোৎসবের অভিনয়যোগ্যতর রূপ।

'ফাল্গুনীতে'[১] গদ্যাংশের বদলে গানের প্রাধান্য বাড়িয়াছে। বস্তুত. প্রত্যেক

[১] প্রথমপ্রকাশ সবুজপত্র চৈত্র ১৩২১; পুস্তকাকারে ১৫ ফাল্গুন ১৩২২—"সূচনা," 'বৈরাগ্য সাধন,' সমেত। বৈরাগ্যসাধন প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩২২ মাঘ-সংখ্যা সবুজপত্রে।

দৃশ্যের "গীতি-ভূমিকা" বা গানগুলিই মুখ্য, গদ্যাংশ যেন রূপক-ব্যাখ্যা। পরে লেখা "সূচনা"-র একটি স্বতন্ত্র নাট্যরচনার মর্য্যাদা আছে। জন্মমৃত্যুর দিবারাত্রির মধ্য দিয়া যে জীবলীলা চলিয়াছে তাহারই রসানুভূতির রূপক হইতেছে ফাল্গুনীর যৎকিঞ্চিৎ কথাবস্তু। শারদোৎসবে পাই যৌবনের সাধনা, ফাল্গুনীতে শৈশবের সহজসিদ্ধি। ফাল্গুনীতে বসন্তের প্রথম পালা—শীতের বিদায় এবং বসন্তের আগমনী। তাই ইহার গলায় দুলিয়াছে অশ্রুহাস্যের মালা। মৃত্যুকে যখন দেখি শুধু সংহারকর্ত্তারূপে তখন আমাদের মিথ্যাদৃষ্টি, কেননা ইহা মহাকালের খণ্ডরূপমাত্র। আর যখন তাহাকে দেখি নবজীবনের ধাত্রীরূপে তখন আমাদের উপলব্ধি হয় সম্পূর্ণ। ফাল্গুনীতে আদ্যিকালের বুড়োর রূপকে এই কথাটিই বলা হইয়াছে। জীবন ও মৃত্যু এই দুই দ্বারের ভিতর দিয়া প্রসারিত জীবনপথে মানবাত্মার লীলাভিসার—ইহাই ফাল্গুনীর মর্ম্মকথা। "মনের ভিতর বল্‌চে সে যদি আমাকে চায় তবে আমিও বসে' থাক্‌বো না। ফুল যাচ্চে, পাতা যাচ্চে, নদীর জল যাচ্চে—তার পিছন পিছন আমিও যাবো।"

'বসন্ত' (ফাল্গুন ১৩২৯, ১৯২৩) এক হিসাবে ফাল্গুনীর উপসংহার। ইহাতে বসন্তের দ্বিতীয় পালা—প্রকৃতির প্রৌঢ়যৌবনসমৃদ্ধি—অভিনন্দিত হইয়াছে। এখানে গানেরই প্রাধান্য, গদ্যাংশ প্রায় কিছুই নাই। যেটুকু আছে তাহা ফাল্গুনীর ভূমিকার অনুরূপ। সমৃদ্ধির সার্থকতা শুধু প্রাচুর্য্যে হয় না, সেই সঙ্গে চাই ত্যাগের নিরাসক্তি—ইহাই বসন্তের মর্ম্মকথা।

> ফল ফলাব বলে কোমর বেঁধে বস্‌লে ফল ফলে না। মনের আনন্দে ফল চাইনে বল্‌তে পারলে ফল আপনি ফলে ওঠে। আম্রকুঞ্জ মুকুল ঝরাতে ভরসা পায় বলেই তার ফল ধরে।

'শেষ বর্ষণ'-এ (১৯২৫)[১] বর্ষার শেষ পালার, শারদীয় বর্ষার, উদ্বোধন। গদ্যাংশ কিছু নাই, গদ্য সংলাপ গানগুলিকে গাঁথিয়া গিয়াছে মাত্র।

[১] শেষ-বর্ষণ কলিকাতায় ৩ আশ্বিন ১৩৩২ তারিখে প্রথম অভিনীত হয়। সেই উপলক্ষ্যে গদ্যাংশবর্জ্জিত 'শেষ বর্ষণ' প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩৩২)। সম্পূর্ণ বই 'ঋতু-উৎসব'-এ সঙ্কলিত হইয়াছে (১৩৩৩)।

১১

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বালকদিগের অভিনয়ের জন্ম 'মুকুট' (১৩১৫) লেখা হয়। ইহা বালকে প্রকাশিত (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) 'মুকুট' গল্পের নাট্যরূপ। ক্ষুদ্র নাটকটির সঙ্কীর্ণ পরিসরে চরিত্রগুলি ফুটিয়াছে স্বকীয় বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল হইয়া।

'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৬) পঞ্চাঙ্ক নাটক, বৌঠাকুরাণীর-হাট অবলম্বনে রচিত। নাটকটিতে মূল কাহিনীর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত রবীন্দ্রনাথের শেষ বিশুদ্ধ human drama বা মানবভূমিক নাটক। এই নাটকে তাঁহার নাট্যরচনার দ্বিতীয় ধারার পর্য্যবসান এবং তৃতীয় ধারার উপক্রম। বৈরাগী ধনঞ্জয়ের ভূমিকা এই ধারাপরিবর্তন সূচিত করিয়াছে।

প্রায়শ্চিত্তের সংস্কৃত রূপ চতুরঙ্ক 'পরিত্রাণ' (১৯২৯)। পরিত্রাণ নাম সার্থকতর। প্রায়শ্চিত্ত শুধু বসন্তরায়ের, সুতরাং বসন্তরায় নায়ক হইলে প্রায়শ্চিত্ত নাম ঠিক হয়।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকের প্রাণ ধনঞ্জয় বৈরাগী। বৈরাগীর চরিত্রে বোষ্টমীর পূর্ব্বাভাস লাগিয়াছে। বৈরাগীর কথায় বোষ্টমীর আগামী প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যেমন,

> (প্রতাপাদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া) আহা, আহা রাজা আমার, অমন নিষ্ঠুর সেজে একি লীলা হচ্চে! ধরা দেবে না বলে পণ করেছিলে আমরা ধরব বলে কোমর বেঁধে বেরিয়েছি![1]

টলস্টয়ের passive resistance নীতির প্রভাব এবং গান্ধীর নন্-কোঅপারেশন আন্দোলনের পূর্ব্বাভাস পাই ধনঞ্জয়ের কথায় ও আচরণে। উপন্যাসে বসন্তরায়ের যে প্রাধান্য নাটকে তাহা নাই, বৈরাগীর ভূমিকা বসন্তরায়ের ভূমিকাকে অন্তরালে ফেলিয়াছে। বসন্তরায়ের পরিণাম যবনিকার ব্যবধানে থাকায় কাহিনী উন্নত হইয়াছে।

প্রতাপাদিত্যের ভূমিকা রক্তমাংসের মানুষের মত হইয়াছে। তাহার রাজোচিত মহিমাও খর্ব্ব হয় নাই। তাহারো মন অসতর্ক মুহূর্তে নরম হয়,

[1] তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য, পরিত্রাণ দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য।

"বৈরাগী আমার এক একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই ভাল—আমার এই রাজ্যটা কিছু না।"

রাণীর ভূমিকা গৌণ হইলেও বাস্তবতর হইয়াছে। সুরমার ভূমিকা আরও যেন ভাবান্বিত হইয়াছে। উদয়াদিত্যের ও বিভার চরিত্র হইয়াছে দৃঢ়তর।

ধনঞ্জয়ের এই উক্তিতে পরবর্ত্তী ধারা symbolic drama বা রূপক নাট্যের মূল সুরটুকু ধ্বনিত হইয়াছে, "মহারাজ, রাজ্যটাও ত রাস্তা! চল্‌তে পার্‌লেই হল! ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই ত পথিক; আমরা কোথায় লাগি?"

এইসময়ে রবীন্দ্রনাথ উত্তরমধ্যবঙ্গে কতিপয় বাউল-বৈষ্ণবের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, অতঃপর তাই রবীন্দ্রনাট্যে বাউলের বা তদনুরূপ ভূমিকা অপরিহার্য্য হইয়াছে।[১]

১২

'রাজা' (১৩১৭)[২] নাট্যরূপকের কাহিনী পালি সাহিত্যের 'কুশ-জাতক' গল্পের সূত্র অবলম্বনে পরিকল্পিত।[৩] মল্লরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশ ছিল অসাধারণ প্রজ্ঞাবান্ কিন্তু অত্যন্ত কুরূপ। তাহার বিবাহ হইয়াছিল অপূর্ব্ব সুন্দরী মদ্ররাজকন্যা প্রভাবতীর সহিত। পাছে পতিকে দিবালোকে দেখিলে প্রভাবতী তাহাকে ঘৃণা করে এই ভয়ে কুশের মাতা পুত্র-পুত্রবধূকে দিনের বেলা সাক্ষাৎ করিতে দিত না। অবশেষে কুশের আগ্রহে তাহার মা ছল করিয়া প্রভাবতীকে দেখাইল। প্রভাবতী যখন স্বামীকে দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিল তখন সুরূপ দেবরকে দেখাইয়া তাহাকে প্রবোধ দেওয়া হইল। কিন্তু পতিপত্নীর সাক্ষাৎ আর আট্‌কাইয়া রাখা গেল না। প্রভাবতী স্বামীর কুরূপ দেখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গেল। কুশ তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য শ্বশুরালয়ে

১. দ্রষ্টব্য 'আত্মবোধ', শান্তিনিকেতন ত্রয়োদশ খণ্ড। ২ প্রথম সংস্করণে রাজা "কতকটা কাটিয়া ছাটিয়া বদল করিয়া ছাপানো হইয়াছিল।" মূল লেখা অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ (ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ) প্রকাশিত হইয়াছিল। ৩ Fausboll সম্পাদিত The Jataka পঞ্চম খণ্ড পৃ ২৭৮-৩১২।

নীচবৃত্তি করিতে লাগিল, এবং শেষে প্রভাবতীর পাণিপ্রার্থী রাজাদের হাত হইতে শ্বশুরকে উদ্ধার করিয়া পত্নীপ্রেম লাভ করিল।

রাজা নাটকে রূপক এবং কাহিনী দুই অংশ সমান সমান, যদিও নাট্যরসের পক্ষে রূপক-অংশের প্রাধান্য গুরুতর। নায়িকা সুদর্শনা রাজার বাল্যবিবাহিত পত্নী, কিন্তু তাঁহাদের চাক্ষুষ মিলন হয় নাই। গর্ভগৃহের অন্ধকার কক্ষই তাঁহাদের মিলন-স্থান। রাণীর মনে সন্দেহ জাগিল যে রাজা হয় ত দেখিতে সুন্দর নন তাই রাণীর কাছে দেখা দিতে এত সঙ্কোচ। দাসী সুরঙ্গমাকে প্রশ্ন করিলে সে যা উত্তর দিল তাহাতে সংশয় বাড়িয়া গেল। সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে আলোতে দেখিতে চাহিলে রাজা বলিলেন, "আজ বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ো—চেয়ে দেখো—আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখ্‌বার্ চেষ্টা কোর!" উৎসবের জনতা মধ্যে রাজবেশী সুরূপ সুবর্ণকে দেখিয়া সুদর্শনা তাহাকে রাজা মনে করিয়া মুগ্ধ হইল এবং ফুলের উপহারের বদলে তাহার গলার মালা পাইয়া নিজেকে একবার কৃতার্থ আর একবার লাঞ্ছিত বোধ করিতে লাগিল। এদিকে সুবর্ণকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়াছে কাঞ্চীর রাজা সুদর্শনাকে পাইবার জন্য। সেই উদ্দেশ্যে রাণীর প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে আগুন লাগানো হইলে আগুন দেখিতে দেখিতে প্রাসাদের চারিদিক্ ঘিরিয়া ফেলিল। সুদর্শনা সুবর্ণর কাছে আসিয়া বলিল, "রাজা, রক্ষা কর! আগুনে ঘিরেছে।" সুবর্ণ ছলনা স্বীকার করিয়া কাঞ্চীরাজের সঙ্গে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিল। রাণী তখন লজ্জায় ধিক্কারে জলন্ত প্রাসাদে ফিরিয়া গেল আত্মবিসর্জন দিতে। তখন রাজা আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিলেন। আগুনের দীপ্তিতে রাণী রাজার মুখ চকিতের জন্য দেখিতে পাইল—ভয়ানক সে মুখ, কালো—"ধূমকেতু যে-আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মত" কালো, "ঝড়ের মেঘের মত কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মত কালো, তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।" কিন্তু রাণীর নয়নে তখনো রূপের নেশা লাগিয়া রহিয়াছে; সেই ভীষণরমণীয় রুদ্রমধুর দীপ্তি তাহার ভালবাসার মুখ ফিরাইতে পারিল না।

পিত্রালয়ে সুদর্শনার প্রায়শ্চিত্ত শুরু হইল। ওদিকে রাজারা আসিয়াছে

তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়া যাইতে। প্রাসাদবাতায়ন হইতে স্বয়ংবরসভায় আসীন কাঞ্চীরাজের ছত্রধর সুবর্ণকে সুরঙ্গমা দেখাইয়া দিলে সুদর্শনার মনে ধিক্কার জাগিয়া উঠিল, "ওকেই আমি সেদিন দেখেছিলুম? না, না! সে আমি আলোতে অন্ধকারে বাতাসে গন্ধতে মিলে আর একটা কি দেখেছিলুম, ও নয়, ও নয়!" স্বয়ংবরসভায় ডাক পড়িলে সুদর্শনা দেহপাত করিতে প্রস্তুত হইল, "দেহে আমার কলুষ লেগেছে—এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধূলোয় লুটিয়ে যাব—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগেনি বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না?"

স্বয়ংবরসভা জমিবার পূর্ব্বে রণক্ষেত্রে ডাক পড়িল রাজাদের। যুদ্ধশেষে সুদর্শনা অভিমান আশ্রয় করিয়া বসিয়া আছে বিজয়ী স্বামীর প্রতীক্ষায়। এমন সময় ঠাকুর্দ্দা আসিয়া খবর দিল রাজা চলিয়া গিয়াছেন। ক্রমে অভিমানের জমাট অশ্রু গলিয়া গেলে সুদর্শনা সুরঙ্গমাকে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইল রাজার অভিসারে। রাত্রিশেষে সূর্য্য উঠিলে বহুকাল পরে স্বামীস্ত্রীর মিলন হইল সেই অন্ধকার কক্ষে শেষবারের মত। রাণীর প্রেমদৃষ্টি এখন রাজার রূপ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে তাই রাজা তাহাকে বাহিরে আহ্বান করিয়া আনিলেন, "এস, এবার আমার সঙ্গে এস, বাইরে চলে' এস—আলোয়!"

এই হইতেছে নাটকের গল্পাংশ। এখন রূপকের ব্যাখ্যা করা যাক। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে রাজা ও রাণীর এই পূর্ণ মিলনের মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টির, ব্রহ্ম ও জীবের মিলন-অভিসারের তত্ত্বটুকু বিচিত্র কাব্যরূপ পাইয়াছে। পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের তৃষা জীবাত্মার ধর্ম্ম,—বৈষ্ণব কবি-তাত্ত্বিকের কথায় "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম"। কিন্তু এই মিলনাভিসার একতরফা নয়। পরমাত্মাও তাঁহার আনন্দরূপ জীবাত্মার মিলনপিয়াসী। স্রষ্টার আনন্দ রূপ লইয়াছে সৃষ্টির মধ্যে। এই রূপে তিনি মুগ্ধ। —এই তত্ত্বের অপূর্ব্ব কবিত্বময় প্রকাশ পাই রাজার কথায়।

সুদর্শনা। আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখ্‌তে পাও?

রাজা। পাই বৈকি।

সুদর্শনা। কেমন করে' দেখ্‌তে পাও? আচ্ছা, কি দেখ?

রাজা। দেখ্‌তে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে' দাঁড়িয়েছে। তা'র মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার!

"আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি কি সেখানে শুধু তুমি!"—রাজার এই কথায় বৈষ্ণব কবি-দার্শনিকের এই উক্তির প্রতিধ্বনি পাই,

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী,
আস্বাদিতে লোভ হয়…

পরমাত্মার স্বরূপ রূপও বটে অরূপও বটে। সৎ-চিদ্-আনন্দসাগরের উপরে খেলিতেছে রূপের ঢেউ আর ভিতরে লুকাইয়া আছে অরূপের সুগভীর ধ্যানমৌন অন্ধকার। রসের সাধনা শুধু রূপের নয়, অরূপেরও। অরূপের সাধনায় সিদ্ধ হইলেই তবে রূপসাগরে ডুব দিবার যোগ্যতা লাভ হয়। সুদর্শনা, সাধক জীবাত্মা, অরূপের ধ্যান এড়াইয়া রূপের মধ্যেই রসোপলব্ধি চায়।—"এখানে নয়, এখানে নয়। যেখানে আমি গাছপালা পশুপাখী মাটিপাথর সব দেখ্‌চি সেইখানেই তোমাকে দেখ্‌ব।"

অরূপ যিনি, "লোকে যাকে বলে সুন্দর তিনি তা নন।" তিনি শান্তও বটেন রুদ্রও বটেন। তাঁহাকে শুধু সুন্দর রূপে দেখার মধ্যে বিপদ আছে। "আমরা অনেক জিনিষকে বাদ দিয়ে, অনেক অপ্রিয়কে দূরে রেখে, অনেক বিরোধকে চোখের আড়াল করে দিয়ে নিজের মনোমত একটা গণ্ডীর মধ্যে সৌন্দর্য্যকে অত্যন্ত সৌখীন রকম করে দেখ্‌তে চাই,—তখন বিশ্বলক্ষ্মীকে আমাদের সেবাদাসী করতে চেষ্টা করি, সেই অপমানের দ্বারা আমরা তাঁকে হারাই এবং আমাদের কল্যাণকে সুদ্ধ হারিয়ে ফেলি।"[১] সুদর্শনা প্রথমে এই ভুলই করিয়াছিল। অবশেষে দুঃখের আঘাতে অহঙ্কারের পরাজয় ও অভিমানের ক্ষয় হইলে সে রাজার স্বরূপ পরিচয় পাইল। "যাকে কাছে এসে ভাগ করে দেখলে এমন ভয়ঙ্কর, তারই অংশও

১ 'সুন্দর,' ভারতী আষাঢ় ১৩১৮ পৃ ২০৯।

সত্যরূপ কি পরম শান্তিময় সুন্দর!"[১] তখনি সে রূপের লীলায় অধিকার পাইল, মিলন হইল সম্পূর্ণ।

সুরঙ্গমা সুদর্শনার গুরু নয়। এ-সাধনায় গুরু অচল। "তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে; কেউ তোমাকে বলে' দেবে না—আর বলে' দিলেই বা বিশ্বাস কি!" এই সাধনার পথে সুরঙ্গমা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। তাহার সিদ্ধি দাস্যভক্তি-রসের, তাই সে সুদর্শনাকে সাহায্য করিতেছে উত্তরসাধিকা রূপে।

ঠাকুর্দা-ভূমিকার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নাই নাট্যকাহিনীর পক্ষে, কিন্তু রূপককাহিনীর পক্ষে তাহার আবশ্যকতা আছে। ঠাকুর্দা সহজরসসিদ্ধ। রাজার অন্তরঙ্গ পরিচয় তাহারি আছে, রসের লীলায় তাহার অকুণ্ঠ অধিকার। তাই সে জানে,

আমার প্রভুর পায়ের তলে,
শুধুই কিরে মাণিক জ্বলে?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা।

রাজার পরিচয় পাইয়াও যখন সুদর্শনা অভিমান আশ্রয় করিয়া প্রতীক্ষমাণ রহিল তখন ঠাকুর্দা তাহাকে চরম উপদেশ দিয়াছিল আভাসে,

> দিদি তোমার বয়স অল্প—জেদ করে' অনেক দিন পড়ে' থাকতে পার—কিন্তু আমার যে এক মুহূর্ত্ত গেলেও লোকসান বোধ হয়! পাই না পাই একবার খুঁজ্‌তে বেরব!

এই অভিসারের পথেই তো মিলন আগাইয়া আসিতেছে।

রাজার অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইতেছে 'অরূপরতন' (১৩২৬, ১৯২০)। ভূমিকায় সংক্ষেপে রূপকটি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৩

'রাজা' ও 'অচলায়তন' (১৯১১) নাটক দুইখানি লেখা হয় শিলাইদহে আট নয় মাসের মধ্যে। এইসময়ের অধিকাংশ নাট্যরচনার মত অচলায়তন বৌদ্ধকাহিনী

১ ঐ পৃ ২০০।

অবলম্বনে লেখা না হইলেও বৌদ্ধ-তান্ত্রিকসাধনার পরিবেশে পরিকল্পিত হইয়াছে। সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে পূর্ব্বভারতে মহাযান-বৌদ্ধমতে তান্ত্রিক দেবদেবীর উপাসনার্থ ও তন্ত্রমন্ত্রাদির বাহুল্য ঘটিয়াছিল।* সেইসময়কার একটি বৌদ্ধমঠের যে কল্পনাচিত্র অচলায়তনে আঁকা হইয়াছে তাহা অপরিসীম বাস্তব এবং রসোজ্জ্বল। কল্পনার ঐশ্বর্য্যের এবং কবিত্বের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যার গাম্ভীর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় ইহার মধ্যে পাই।

অচলায়তনের রূপক-অংশ আখ্যানবস্তুর অনুগামী। রূপকটুকু বাদ দিলে নাট্যকাহিনী খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বটে কিন্তু প্রধান ভূমিকাগুলির মাহাত্ম্য খর্ব্ব হইয়া যায়। রাজার রাজা ও ঠাকুর্দ্দা মিলিয়া অচলায়তনের গুরু-দাদাঠাকুর হইয়াছেন, ফাল্গুনীর চন্দ্রহাস ও দাদা এখানে পঞ্চক ও মহাপঞ্চক রূপে নবজন্ম লাভ করিয়াছে।

সুদূর অতীতে একদা অদীনপুণ্যকে আচার্য্য করিয়া আর্য্যের গুরু যে জ্ঞান ও শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা কালক্রমে হৃদয়হীন অভ্যাসের ও জ্ঞানহীন সংস্কারের স্তূপে ভরাট হইয়া পাষাণকায় অচলায়তনে পরিণত হইল। জ্ঞান ও বিদ্যার মুক্ত ক্রীড়াক্ষেত্র হইল জড়তার ও তুচ্ছ আচারবিচারের অন্ধকারা। এই জড়তা ক্রমে জ্ঞানী বৃদ্ধ আচার্য্যকেও শক্তিহীন করিয়া তুলিল। কিন্তু ভয়ের ও সংস্কারের এই আওতার মধ্যেই মাথা তুলিল পঞ্চক,—পাষাণ ফাটিয়া গিয়া যেন তৃণাঙ্কুর দেখা দিল। পঞ্চকের প্রাণে মুক্ত জীবনরসের স্পর্শ লাগিয়াছে, অচলায়তনের শিক্ষা ও সংস্কার তাহা দাবাইতে পারিল না, ধরিয়া রাখিতেও পারিল না। অচলায়তনের বাহিরে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ দর্ভক-শোণপাংশুদের পল্লীতে গিয়া সে দাদাঠাকুরের সঙ্গলাভ করিল।

পঞ্চকের দাদা মহাপঞ্চক সম্পূর্ণ বিপরীতপ্রকৃতির। সংস্কার-অভ্যাসের বাহিরে সে বুদ্ধির অধিকার মানে না। সে-ই অচলায়তনের স্থূলতম ভিত্তি, সেই-তে তাহার মনের জোর। শেষ পর্য্যন্ত এই মনের জোরই তাহাকে মুক্তির পথ দেখাইয়াছে। মালিনীর ক্ষেমঙ্কর ও রাজার কাঞ্চীরাজ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

শিশু সুভদ্রের প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষ্যে যেদিন অচলায়তনের পাপ চরম হইয়া দেখা দিল সেদিন আর্য্যের গুরু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অনার্য্যের

দাদাঠাকুর-বেশে রুদ্রমূর্তি ধরিয়া দর্ভক-শোণপাংশুদের সাহায্যে অচলায়তন ভূমিসাৎ করিয়া দিলেন। রসতৃষ্ণ সত্যজ্ঞানী আচার্য্য পাইলেন বহুকালবাঞ্ছিত ছুটি। পঞ্চকের উপর ভার পড়িল নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার।

আর্য্য সমাজ ও সংস্কারের উত্থানপতনের ইতিহাস অতি সুকৌশলে অভিব্যক্ত হইয়াছে অচলায়তনের রূপকের মধ্য দিয়া। অনার্য্য-সংস্কৃতি ও অন্ত্যজ সমাজকে স্বীকার না করিলে যে হিন্দু-সংস্কৃতির বিনাশ অপরিহার্য্য তাহারো ইঙ্গিত আছে। এত বড় একটা বিরাট রূপক এত অল্প পরিসরে এমন সার্থকভাবে ফুটাইয়া তোলা পরম শিল্পদক্ষতার পরিচায়ক।

'গুরু' (ফাল্গুন ১৩২৪, ১৯১৮) অচলায়তনের সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত ও অভিনয়-যোগ্য রূপ।

১৪

'ডাকঘর' (১৯১২) অচলায়তনের ছয়-সাত মাসের মধ্যে লেখা। ইহার রচনাস্থান শিলাইদহ নহে, শান্তিনিকেতন। জীবনস্মৃতির পরে লেখা হয় অচলায়তন, তাহার পরে ডাকঘর। ডাকঘরকে বলা যাইতে পারে জীবনস্মৃতির ভাষ্য, কেননা ইহাতে শিশুকবির বাল্যকল্পনা রূপকরসব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে।

গীতাঞ্জলির শেষ গান লেখা হয় ৩০ শ্রাবণ ১৩১৭, গীতিমাল্যের প্রথম গান ১৫ চৈত্র ১৩১৮।[১] গীতিকাব্য-পালার এই বিশ্রামকালের মধ্যে রাজা অচলায়তন ও ডাকঘর এই তিনখানি রূপকনাট্যে কবিচিত্তগহনের অধ্যাত্ম-এষণা বাণীমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির উদার মহোৎসবের মাঝখানে মানুষ সংসারের সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে অন্ধসংস্কার ও অজ্ঞানের বেড়াজালে থাকিয়া প্রতিদিন বঞ্চিত হইতেছে। মুক্তির আহ্বান তাহার মূঢ়চিত্তের প্রাচীরে আঘাত খাইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে ফিরিয়া যাইতেছে। যিনি আপন অন্তরে এই আনন্দের আহ্বান উপলব্ধি করিতে

[১] গীতিমাল্যের প্রথম তিনটি কবিতা বাদ দিলে। প্রথম কবিতার রচনাকাল ১৪ আশ্বিন ১৩১৫ কিংবা ১৩১৭; দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবিতা লেখা হইয়াছিল ১৩১৩ সালে। এগুলি গীতাঞ্জলির যুগে পড়িবে।

পারেন। তিনি সর্ব্ববিধ সংস্কার, পিছুটান ও জন্মমৃত্যু এড়াইয়া বিশ্বজগতের রসের বৈকুণ্ঠ ক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করেন। ইহাই এই নৈর্ব্যক্তিক রূপকনাট্যগুলির রহস্য।

নাটকের ধরণে লেখা হইলেও ডাকঘরকে ঠিক নাটক বলা চলে না। ইহা episodical বা উপাখ্যানীয়, dramatic বা নাটকীয় নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছিলেন, "এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য লিরিক! আলঙ্কারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা।"

ডাকঘর লিখিবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে এক অহেতুক চাঞ্চল্য আসিয়াছিল। "যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল।" "সমস্ত পৃথিবীর নদী গিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্ছে—আমার চারিদিকে ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্য মন উৎসুক হয়ে পড়েছে।"[১] দোতলার গৃহকোণাবদ্ধ শিশু রবীন্দ্রনাথ গবাক্ষপথে বহিঃপ্রকৃতির রূপরস পান করিয়া কল্পনাকে নিরুদ্দেশে ছাড়িয়া দিতেন। তাহারি পটভূমিকায় প্রৌঢ় কবি তাঁহার অধ্যাত্মরস-কল্পনা অধিক্ষেপ করিয়া অমলের ভূমিকা সৃষ্টি করিলেন। মুমূর্ষু মধ্যম কন্যার ক্ষীণছায়াও বোধ করি মধ্যে মধ্যে পড়িয়াছে। সুতরাং সাধারণ পাঠকের কাছে নাট্যরচনাটি যতই ধোঁয়াটে হউক প্রধান ভূমিকাকে কিছুতেই অবাস্তব বা সৃষ্টিছাড়া বলা চলে না।

ডাক-হরকরার আগমন আমাদের মনের মধ্যে জাগাইয়া তোলে অকস্মাতের আশা, অপ্রত্যাশিতের আনন্দ। চিঠির মধ্যে আছে না জানি কাহার নিমন্ত্রণ অথবা শুভাগমনবার্ত্তা!—ইহাই অন্তরের চকিত আনন্দ-অনুভূতির উপযুক্ত রূপক। ডাকঘর-রচনার অল্পকাল পরে লেখা একটি কবিতায় এই অনুভূতির স্বচ্ছ প্রকাশ দেখিতে পাই,

স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি
মনের মধ্যে অনেক দূরে।
ঘোরাফেরা যায় যে ঘুরে।

[১] রবীন্দ্র-সংগীত, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, পৃ ১৪০-৪২ দ্রষ্টব্য।

গভীরধারা জলের ধারে,
আঁধার-করা বনের পারে,
সন্ধ্যামেঘে সোনার চূড়া
উঠেছে ঐ বিজনপুরে—
মনের মাঝে অনেক দূরে॥
সারাটা দিন দিনের কাজে
হয়নি কিছু দেখাশোনা,
কেবল মাথার বোঝা বহে'
হাটের মাঝে আনাগোনা।
এখন আমায় কে দেয় আনি
কাজ-ছাড়ানো পত্রখানি,
সন্ধ্যাদীপের আলোয় বসে'
ওগো আমার নয়ন ঝুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে॥[১]

ক্ষুদ্র-স্নেহ (মাধব দত্ত) ও সাংসারিক-বিজ্ঞতা (কবিরাজ, মোড়ল) রূপে সংসার সুদূরের পিয়াসী এই অমল শিশুচিত্তটিকে খাঁচায় ধরিয়া রাখিতে চায়। অবুঝ ভীরু প্রেমও (সুধা) তাহাদের সহায়তা করিতেছে অজানিতে। অমল অপেক্ষা করিয়া আছে রাজার চিঠির জন্য। বিচ্ছেদমাত্রেরই বেদনা আছে, সে বেদনা থাকে না তখনি যখন আনন্দের নিমন্ত্রণ আসে। সেই আনন্দটুকু বন্ধনচ্ছেদ সহজ করিয়া দেয়। তাই রাজার চিঠি যখন আসিয়া পড়িল তখন অমল অজানার উদ্দেশে মৃত্যুর দুয়ারটুকু পার হইতে সংশয়মাত্র করিল না।

১৫

ডাকঘরে soul drama বা অধ্যাত্ম-নাটক পর্য্যায়ের অবসান হইল। 'মুক্তধারা'-য় (১৯২২)[২] দেখা দিল প্রধানত জাতি- ও রাষ্ট্র-গত সমস্যা। বর্ত্তমান জগতের

[১] গীতিমাল্য ৪, রচনাকাল ১৫ চৈত্র ১৩১৮। [২] রচনাসমাপ্তি শান্তিনিকেতনে (পৌষসংক্রান্তি ১৩২৮)

[ই]তিহাসে যাহা প্রাচ্যজাতির জীবনমরণের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহারি শুভ [স]মাধানের সঙ্কেত রহিয়াছে এই নাট্যরূপকটিতে। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষের যান্ত্রিক [বু]দ্ধিকে চণ্ড নামাইয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্কীর্ণ জাতীয়স্বার্থচেতনা ও বণিকবুদ্ধি [মি]লিয়া যে পীড়ন যন্ত্র চালাইয়াছে পৃথিবীর বক্ষে, তাহার বিরুদ্ধে মানুষের শুভবুদ্ধি [ও] কল্যাণপ্রেরণা একদিন জাগ্রত ও জয়ী হইবে। ইহাই মুক্তধারার মর্ম্মকথা।

১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের পর হইতে ইউরোপের কোন্ কোন দেশে সঙ্কীর্ণ [জা]তীয়তাগর্ব্ব স্ফীত হইয়া মানুষের সর্ব্বজনিক শুভবুদ্ধিকে চাপা দিয়াছে এবং [তা]হার ফলে বর্ত্তমান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্ব্বনাশ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। মুক্তধারায় [এ]ই আগামী অকল্যাণের ভবিষ্যদ্‌বাণী রহিয়াছে।[১] মুক্তধারা যখন লেখা হয় [ত]খন আমাদের দেশে নন্‌-কোঅপারেশন আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দো-[ল]নের নেতা গান্ধী তখন অশিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে ঈশ্বরের অবতার [প্র]তীয়মান হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে মহাপুরুষদের এই এক মস্ত বিড়ম্বনা। [এ]ই ভয় করিয়াই রবীন্দ্রনাথ, "ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে' জেনেচে" [রণ]জিতের এই কথার উত্তরে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে দিয়া বলাইয়াছেন, "তাই আমাতেই [এ]সে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্য্যন্ত পৌঁছল না। ভিতর থেকে যিনি ওদের [চা]লাতে পারতেন বাহিরে থেকে আমি তাঁকে রেখেচি ঠেকিয়ে।" রণজিৎ যখন [ব]লিল, "তবে আর দেরি কেন? সর না!"—ধনঞ্জয় উত্তর করিল, "আমি সরে' [দাঁ]ড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ডপালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়াও হবে। [ত]খন যে দণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়্‌বে ওদেরি মাথার খুলির উপরে। এই [ভা]বনায় সরতে পারি নে।"

[ধ]নঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকা ও তাহার সংলাপের অনেকটা প্রায়শ্চিত্ত হইতে [গৃ]হীত। মুক্তধারার কাহিনীর ঠাটেও প্রায়শ্চিত্তের প্রভাব আছে। অভিজিৎ [উদ]য়াদিত্যের অনুরূপ আর রণজিৎ-বিশ্বজিৎ যথাক্রমে প্রতাপাদিত্য-বসন্তরায়ের [রূপা]ন্তর। বিভা-সুরমার স্থান গ্রহণ করিয়াছে সঞ্জয়। উদয়াদিত্যের মত

[১] গুরু, ছেলেরা ও রণজিতের সংলাপ দ্রষ্টব্য। জাতীয়তার বিষ এমনি করিয়াই শিশুকাল [হই]তে মনকে জীর্ণ করিতে থাকে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায়।

অভিজিৎ passive ভালোমানুষ মাত্র নয়, আত্মসর্ব্বস্বও নয়, এবং চরিত্রটিতে মানবিকতার কিছু অভাব আছে। আসলে অভিজিৎ কবিরই কোমলে-কঠোর স্বরূপটিকে প্রকাশ করিয়াছে। রাজকুমার সঞ্জয় যুবরাজ অভিজিৎকে তাহার কঠিন সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে ;

সঞ্জয়। কোথায় তোমার ডাক পড়েচে তুমি চলেচ, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন করতে চাইনে। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সন্ধে হয়ে এসেচে রাজবাড়িতে ঐ যে বন্দীরা দিনাবসানের গান ধরলে, এরও কি কোন ডাক নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।

অভিজিৎ। ভাই, তারি মূল্য দেবার জন্যেই কঠিনের সাধনা।

১৬

'রক্তকরবী' (১৯২৪)[1] রবীন্দ্রনাথের শেষ রূপকনাট্য। রূপক-অংশ জোরালো হইলেও কাহিনীর বৈশিষ্ট্য খর্ব্ব হয় নাই। আধুনিক কালের পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা মানুষের মনে ধন ও শক্তির উপর যে দুর্ব্বার লোভ ও মোহ জাগাইয়া তুলিয়াছে তাহাতে প্রকৃতির ও প্রাণের সহজ দান ও সরল সৌন্দর্য্য এবং মানবের জীবনরস একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। 'রক্তকরবী'তে ধনের উপর ধান্যের, শক্তির উপর প্রেমের, এবং মৃত্যুর উপর জীবনের জয়গান গীত হইয়াছে। লোভের অন্ধ খনিতে সুড়ঙ্গ না কাটিয়া যদি জ্ঞান ও শক্তি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মুক্তক্ষেত্রে জীবনের সঙ্গে মিলিত হয় তবেই হয় কল্যাণের সৃষ্টি। ইহাই রক্তকরবীর রহস্য।

অচলায়তনের সঙ্গে রক্তকরবীর একটু মিল আছে। অচলায়তনের গুরু-শিষ্যেরা প্রাণহীন আচারের শৃঙ্খলপাশে বাঁধা, আর রক্তকরবীতে যক্ষপুরীর মজুর-অধিবাসীরা লোভের নেশায় বন্দী। লোভের প্রয়োজনের শেষ নাই, তাই তাহাদের খাটুনিরও অন্ত নাই। রাজা শুষ্কজ্ঞানের চর্চ্চায় নিযুক্ত, হৃদয়বৃত্তি

[1] ১৩৩১ সালের আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীতে প্রথম প্রকাশিত, পুস্তকাকারে ১৩৩৩ সালে।

তাহার একেবারে নিরুদ্ধ। প্রাণের প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়া সে বহির্জগৎ হইতে আপনাকে শক্তিসাধনার জালে তফাৎ করিয়া রাখিয়াছে। নন্দিনী হইতেছে জীবনের সহজ আনন্দ, প্রকৃতির সরল সৌন্দর্য্য। "পৃথিবীর প্রাণভরা খুসিখানা নিজের সর্ব্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, আমাদের ঐ নন্দিনী।" নন্দিনীর খুসির স্পর্শে রাজার মৃতপ্রায় প্রাণে সাড়া জাগে। "নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়া-বীথিকায় নবীনের মায়া-মৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখ্‌তে পাচ্ছেন, ধর্‌তে পার্‌ছেন না, রেগে উঠ্‌ছেন আমার বস্তুতত্ত্বের উপর।" রঞ্জন হইতেছে যৌবনের অভিসার, প্রাণের মুক্তি। মৃত্যুবরণ করিয়া সে যক্ষপুরীর মৃত প্রাণে নবজীবনের ধারা বহাইয়া দিল; শক্তির সঙ্গে আনন্দের মিলন হইল।

বিশুর ভূমিকা পূর্ব্ববর্ত্তী রূপকনাট্যের ঠাকুর্দ্দা বা বৈরাগী স্থানীয়। দুঃখের অভিষেকে সে লাভ করিয়াছে রসের দীক্ষা। রাজার মত সে যক্ষপুরীর পশু বা প্রেত নয়, আর রঞ্জনের মত আনন্দলোকের দেবতাও নয়। সে পরিপূর্ণ মানুষ। নন্দিনীর সঙ্গে তাহার কি যে সম্পর্ক সে বিষয়ে ফাগুলাল স্পষ্ট করিয়া বলিতে বলিলে বিশু বলিয়াছিল,

> বল্‌ছি শোন্, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে-দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে-দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

যক্ষপুরীর সর্দ্দার, মোড়ল, গোসাই প্রভৃতি ব্যঙ্গোজ্জ্বল ভূমিকাগুলি বেশ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে।

১৭

'কর্ম্মফল' গল্প অবলম্বনে 'শোধবোধ' (১৩৩২, ১৯২৫)[১] লেখা। মূল গল্পটিও নাট্যের ভঙ্গিতে রচিত, নাট্যরূপে তাহা বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছে মাত্র।

'গৃহপ্রবেশ'-এর (১৩৩২, ১৯২৫)[২] মূল হইতেছে 'গল্প-সপ্তক'-এর 'শেষের

[১] ১৩৩২ সালে বার্ষিক বসুমতীতে প্রথম প্রকাশিত। পুস্তকাকারে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে।
[২] ১৩৩২ সালের আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীতে প্রথম প্রকাশিত।

রাত্রি'। নাট্যরূপে গল্পটি শুধু বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছে তাহা নহে, রসবৈচিত্র্যও বাড়িয়াছে। মূল গল্পে ডাক্তার-ভূমিকার ইঙ্গিত পাই শুধু একটি ছত্রে। নাট্যরূপে এই ভূমিকাটি পরিস্ফুট হইয়া মাসীর অন্তর্দ্বন্দ্বকে আরো ঘোরালো করিয়াছে। অমূল্যর ভূমিকা নাট্যকাহিনীতে বৈচিত্র্য আনিয়াছে। হিমির ভূমিকা প্রধানত গানগুলির জন্য। শেষের-রাত্রির প্রধান ভূমিকা যতীনের, কিন্তু গৃহপ্রবেশের প্রধান ভূমিকা মাসীর। মণির ভূমিকাও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য পাইয়াছে।

শোধবোধের নাট্যরস গাঢ়, যদিও ঘটনাসংঘাত বলিতে বিশেষ কিছু নাই।

'নটীর পূজা'-য় (১৩৩৩, ১৯২৬) যে ক্ষুদ্র বৌদ্ধ কাহিনী সঙ্গীত-নৃত্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা লইয়া বহুকাল পূর্ব্বে কবি 'পূজারিণী' কবিতা লিখিয়াছিলেন।

বিগত মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপে এবং আমাদের দেশে যে গণজাগরণ দেখা দিয়াছিল তাহা উপলক্ষ্য করিয়া 'রথযাত্রা' (অগ্রহায়ণ ১৩৩০)[১] নামক ক্ষুদ্র রূপকনাট্যখানি লেখা হইয়াছিল। পরে ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া 'কালের যাত্রা'-য় (১৩৩৯, ১৯৩২) পরিণত হয়। গণনেতৃত্বের পরিণাম সম্বন্ধে কবি এই যে ভবিষ্যদ্‌-বাণী করিয়াছেন তাহা বোধ হয় এখনকার দিনে অনেকের ভালো লাগিবে না,

> একদিন ভাব্‌বে ওরাই রথের কর্ত্তা, তখনি মরবার সময় আস্‌বে। দেখোনা, কালই বল্‌তে সুরু কর্‌বে, আমাদেরি হাল লাঙল চরকা তাঁতের জয়।···তখন এঁরাই হয়ে উঠ্‌বেন বল্‌-রামের চেলা, হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।[২]

১৮

'চণ্ডালিকা' (১৩৪০, ১৯৩৩) একটি বৌদ্ধ অবদানকাহিনী লইয়া বিরচিত। ভাব অনেকটা চিত্রাঙ্গদার অনুরূপ। চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনকে প্রথমে রূপের দ্বারা বশ করিতে পারিয়াছিল এবং শেষে গুণের দ্বারা তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। চিত্রাঙ্গদার প্রেমে অর্জ্জুনকে আত্মসম্মান হারাইতে হয় নাই। চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি বুদ্ধশিষ্য শ্রমণ আনন্দকে বশ করিবার জন্য মন্ত্রতন্ত্র-ইন্দ্রজালের প্রয়োগ করিয়াছিল।

১ প্রবাসীতে প্রকাশিত। ২ রথযাত্রা।

উপায় যতই হীন হউক তাহার প্রেম হীন ছিল না, তাই অবশেষে প্রেমাস্পদের মনোবেদনা ও দুর্গতি তাহার চিত্তের বাসনাশৃঙ্খল মোচন করিল। প্রেমের ব্যর্থতাই তাহাকে জীবনের চরম সার্থকতা আনিয়া দিল।

'তাসের দেশ' (১৩৪০, ১৯৩৩) 'একটি আষাঢ়ে গল্প'-এর নাট্যরূপ। 'মুক্তির উপায়'[১] প্রহসনের বিষয়ও গল্পগুচ্ছ হইতে গৃহীত।

১৯

'বাঁশরী' (১৩৪০, ১৯৩৩)[২] রবীন্দ্রনাথের শেষ নাটক। এটি human drama, রূপকনাট্য নয়। এই ঘটনাবর্জ্জিত নাট্যরচনায় নরনারীর হৃদয়দ্বন্দ্বের শ্রেয়ঃসিদ্ধি উদ্দিষ্ট হইয়াছে। গঠনরীতি নাট্যগল্পের মত। এটিকে স্বচ্ছন্দে উপন্যাসে রূপ দেওয়া যাইত। ঘটনার ঘনঘটা ব্যতিরেকেও যে উচ্চ নাট্যরসের সৃষ্টি হইতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাঁশরী।

বাঁশরীর ভূমিকা নাটককাহিনীর সর্ব্বস্ব। "তার প্রকৃতিটা ছিল বৈদ্যুত শক্তিতে সমুজ্জ্বল।" ভালবাসার পাত্রকে আপনার আয়ত্তে না রাখিলে তাহার স্বস্তি নাই। ক্ষিতীশ ঠিকই ধরিয়াছিল, "আমার মনে হয় চকোরীর জাত তোমার নয়, তুমি মিসেস্ রাহুর পদের উমেদার। যাকে নেবে তাকে দেবে লোপ করে, শুধু চঞ্চু মেলে তাকিয়ে থাকা নয়।" এই কারণেই সন্ন্যাসী পুরন্দর বুঝিয়াছিলেন যে বাঁশরী-সোমশঙ্করের মিলন বাঞ্ছনীয় নয় সোমশঙ্করের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের দিক হইতে। "সন্ন্যাসী হয়তো ঠিকই বুঝেছেন। তোমার চেয়েও তোমার ব্রতকে আমি বড়ো করে দেখতে পারতুম না।" শেষে ত্যাগের মধ্য দিয়াই বাঁশরীর ভালবাসা উন্নীত হইল প্রেমে। সুষমা ভিন্নপ্রকৃতির নারী। সে ছিল চকোরীর জাত। তাই পুরন্দরের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া সে স্বচ্ছন্দে সোমশঙ্করকে বরণ করিল।

সন্ন্যাসী পুরন্দর নিরাসক্ত আইডিয়ালিষ্ট। সে বাঁশরীর পুরুষ প্রতিরূপ। বাঁশরী প্রকৃতি, পুরন্দর পুরুষ।

[১] অলকা ১৩৪৫ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত। [২] প্রথমপ্রকাশ ভারতবর্ষ কার্ত্তিক হইতে পৌষ ১৩৪০।

বাঁশরী। মোহ চাই, চাই সন্ন্যাসী, মোহ নইলে সৃষ্টি কিসের।…

পুরন্দর। মোহ নইলে সৃষ্টি হয় না, মোহ ভাঙলে প্রলয় একথা মানতে রাজি আছি। কিন্তু তুমিও একথা মনে রেখো, আমার সৃষ্টি তোমার সৃষ্টির চেয়ে অনেক উপরে। তাই আমি নির্মম হয়ে তোমার সুখ দেব ছারখার করে। আমিও চাইব না সুখ ; যারা আসবে আমার কাছে সুখের দিক থেকে, মুখ দেব ফিরিয়ে। আমার ব্রতই আমার সৃষ্টি, তার যা প্রাপ্য তা তাকে দিতেই হবে। যতই কঠিন হোক।[১]

ক্ষিতীশ অতি-আধুনিক সাহিত্যিক। তাহার অক্ষমতা বাঁশরীর মনে অনুকম্পা জাগাইয়াছে। যে-জ্বালা বাঁশরী মনে অনুভব করিতেছে তাহা সে ক্ষিতীশের কলমের মুখে প্রকাশ করাইতে চায়। কিন্তু ক্ষিতীশের সে বোধশক্তি সে রসদৃষ্টি কই। তাহার কারবার বিদেশী মালের সস্তা অনুকরণ লইয়া। "ক্ষিতীশবাবু ন্যাচারল্ হিস্ট্রী লেখেন গল্পের ছাঁচে। যেখানটা জানা নেই, দগদগে রং লেপে দেন মোটা তুলি দিয়ে। রঙের আমদানী সমুদ্রের ওপার থেকে।"

অতি-আধুনিক সাহিত্যের তথাকথিত রিয়লিজমের উপর রবীন্দ্রনাথ নির্মম কটাক্ষপাত করিয়াছেন, "এথীনা! মিনর্ভা! মরে যাই! ওগো রিয়লিস্ট্, রাস্তায় চলতে যাদের দেখেছ পানওয়ালীর দোকানে, গড়েছ কালো মাটির তাল দিয়ে যাদের মূর্ত্তি, তারাই সেজে বেড়াচ্ছে, এথীনা মিনর্ভা।"

২০

বাঁশরীর পরে রবীন্দ্রনাথ তিনখানি সঙ্গীতনাট্য লিখিয়াছিলেন, 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য' (১৯৩৮) এবং 'শ্যামা (নৃত্যনাট্য)' (১৯৩৯)। এগুলির মধ্যে নূতনত্ব হইতেছে "গদ্যগান," অর্থাৎ গানে মুক্তবন্ধ গ্রহণ ও ছন্দে মিল পরিত্যাগ। নাট্যরচনার আদিযুগে বাল্মীকি-প্রতিভায় একটি মিলহীন গান দেখা গিয়াছিল। তাহার পর এই একেবারে শেষ।

[১] দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য।

রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের আরম্ভ গীতিনাট্যে আর শেষ নৃত্যনাট্যে। গানে যেমন কাব্যরসের চরম পরিণতি, নাট্যে তেমনি রূপরসের—অর্থাৎ অভিনয়-কলার। গীতিনাট্য, সাধারণ নাটক, কাব্যনাট্য, রূপকনাট্য ইত্যাদি বিবিধ নাট্যরচনার form লইয়া আজীবন অনুশীলন করিয়াও রবীন্দ্রনাথের কবিশিল্পিপ্রাণ সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। এবিষয়ে তাঁহার শেষ এবং সার্থক প্রচেষ্টা হইতেছে নৃত্যনাট্য।

দশম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পের স্বরূপ

১

বড়-গল্প আর ছোট-গল্পের মধ্যে আকারের পার্থক্য তত গুরুতর নয়, তাহাদের প্রকারের বিভিন্নতাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বড়-গল্প, ইংরেজিতে novelette, প্রকারে উপন্যাসই কেবল আকারে সবিশেষ সংক্ষিপ্ত। ছোট-গল্প আকারে সাধারণত বড়-গল্পের চেয়ে ছোট, কিন্তু অনেক সময় সমানও হয়। আকার ধরিয়া উভয়ের পার্থক্য বিচার করিলে ভুল করা হইবে।

ছোট-গল্পের কাহিনী ঘিরিয়া একটি অখণ্ড ইমোশন বা ভাবরস জমাট বাঁধিয়া উঠে, অর্থাৎ একটি অখণ্ড ভাবরস পাঠকের চিত্ত অভিষিক্ত করিয়া তোলে, এবং স্বল্পতম আয়োজনে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে ভাবরসের একটি ঘনীভূত চরমতায়। ইহাই ছোট-গল্পের একমাত্র বিশিষ্ট লক্ষণ। ভাবঘন চরমতায় পরিসমাপ্ত হয় বলিয়া ছোট-গল্পের কাহিনী শেষ হইয়া যাইবার পরেও পাঠকের চিত্তে তাহার রেশ বাজিতে থাকে এবং তাহাতেই যেন গল্পের যথার্থ উপসংহার গুঞ্জরিত হয়। অর্থাৎ, "অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সঙ্গে করি মনে হবে শেষ হয়ে না হইল শেষ।" লেখক যেখানে থামিয়া যান পাঠকের চিত্ত যেন তাহার পর অনুবৃত্তি করিতে থাকে। সুতরাং লেখকের ইমোশন পাঠকের হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত না হইলে ছোট-গল্পের রসানুভূতির ব্যাঘাত হয়। আমাদের দেশের গল্প-উপন্যাসের সাধারণ পাঠকদের মন ছোট-গল্পের ভাবরস গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নয় বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পের এতদিন গুণানুরূপ সমাদর হয় নাই। ছোট-গল্পের কাহিনী শেষ হইয়া গেলেও তাহার ভাবরসের পরিপাকক্রিয়া শেষ হইয়া যায় না। সেইজন্য উপন্যাস যেমন অধ্যায়ের পর অধ্যায় একটানা পড়িয়া যাওয়া যায় ছোট-গল্প তেমন না থামিয়া পরের পর পড়া যায় না। তাই বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে ছোট-গল্পের অপেক্ষা উপন্যাসের সমাদর অনেক বেশি, যদিও উৎকর্ষ

বিচার করিলে সাধারণ বাঙ্গালা উপন্যাস সাধারণ বাঙ্গালা ছোট-গল্পের তুলনায় অনেক নীচু দরের।

ছোট-গল্পে গৌণ কাহিনীর কোন স্থান নাই, কেন না গৌণ কাহিনী থাকিলে ছোট-গল্পের রসঘনতা জমিতে পারে না। একান্তভাবে রসৈকাশ্রিত বলিয়া ছোট-গল্পে রসান্তরের স্পর্শ নিতান্ত লঘু হওয়া আবশ্যক। রসান্তরের মধ্যে কৌতুকরসই ছোট-গল্পে বিশেষ উপযোগী। মৃদুহাস্যের লঘু বাষ্পের বাতাবরণে চরিত্রচিত্রণ হয় স্ফুটতর। আসল হিউমার বা কৌতুকরসের স্থান ছোট-গল্পে যেমন এমন আর কোন ধরণের সাহিত্যশিল্পকলায় নয়। স্মিত ও করুণ, এই দুই রসের পাশাপাশি প্রবহমান স্রোতের সঙ্কীর্ণ সীমারেখার মধ্যেই প্রকৃত হিউমার জমিয়া উঠে। ছোট-গল্পে এই দুই রসের অবতারণা সহজ। তাই সকল দেশের সাহিত্যেই কৌতুকরসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাই ছোট-গল্পে।

গীতিকাব্যের মত ছোট-গল্পের রসও লেখক-পাঠকের সহযোগী সহানুভূতির অনুকূল পরিবেশে পরিপূর্ণতা পায়। তাই গীতিকবিতার মত ছোট-গল্পেরও রূপভেদ অসংখ্যেয়। প্রণয়, কৌতুক, অতিপ্রাকৃত ইত্যাদি ভেদ ধরিয়া কেহ কেহ ছোট-গল্পের শ্রেণীবিভাগ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এইরকম শ্রেণীবিভাগ অর্থহীন। ছোট-গল্পের রসকল্পনায় অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত বাঁধাধরা রস অথবা মনোবিজ্ঞানসম্মত বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তি বা psychosis নাও থাকিতে পারে। মানবজীবনের জটিলতা অসামান্য, মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যও অপরিসীম। মানুষের বহুশাখ ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য অবলম্বনে সাহিত্যস্রষ্টা যে রসসৃষ্টি করেন, তাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট ছাপ মারা চলে না। ব্যক্তিত্বের এই অনির্ব্বচনীয় জটিল রস শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্পের প্রাণবস্তু। উদাহরণ দিতে পারি, 'ফেল' অথবা 'মুক্তির উপায়'। 'সমস্যাপূরণ' গল্পের রস বলা যাইতে পারে বাৎসল্যসিক্ত কর্ত্তব্য-রস। বিলাতী ডিটেক্‌টিভ গল্পের রস বলিতে পারি বুদ্ধি-রস। সুতরাং রসের হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করিলে ছোট-গল্পের শ্রেণীর অন্ত পাওয়া যাইবে না।

তবে মোটামুটিভাবে দেখিলে ছোট-গল্প দুই প্রধান শ্রেণীতে পড়ে, প্রাকৃত (বা সাধারণ) এবং অতিপ্রাকৃত। প্রাকৃত ছোট-গল্পের ভাবরসমণ্ডিত বাতাবরণ

স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। অতিপ্রাকৃত ছোট-গল্পে স্থূল অথবা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পারিপার্শ্বিকের প্রভাববশে উত্তেজিত, অথবা উদ্বিগ্ন ও অসুস্থ সচেতন কিংবা অচেতন মন উর্ণনাভের মত কল্পনার লূতাতন্তু বুনিয়া আতঙ্ক-আকর্ষণবিজড়িত অতীন্দ্রিয় দুঃস্বপ্নের বাস্তবকল্প ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে। 'ক্ষুধিত পাষাণ,' 'মণি-হারা' ও 'মাষ্টার মশায়' গল্পে এইরূপ অতিপ্রাকৃত বাতাবরণ বাস্তব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যোগ ও সামঞ্জস্য রাখিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

২

অনেকদিন হইতেই রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে এই অভিযোগ চলিয়া আসিয়াছে যে তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি "বস্তুতন্ত্রতাবিহীন" অর্থাৎ বাস্তবনিরপেক্ষ। ইহার অর্থ, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গল্প একান্তভাবে কল্পনার সৃষ্টি, নরনারীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার দুঃখসুখময় আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনার সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক-বিরহিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির সম্বন্ধে এই অভিযোগের বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক; তাঁহার ছোট-গল্পের সম্বন্ধে একথা একেবারে মিথ্যা। রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্প কিছুতেই কল্পনাবিলাসের রঙীন ফানুস নয়; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অপরোক্ষ অনুভূতির অপূর্ব্ব সমবায়ে কবির মানসে যে গভীরতর সত্যদৃষ্টির সুধারস সঞ্চিত হইয়াছিল তাহারি প্রকাশ এই ছোট-গল্পগুলিতে। সমসাময়িক একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "আমি সমস্ত জিনিষের বাস্তবিকতাটুকু স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই, অথচ তারই ভিতরে, তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা এবং সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যেও আমি একটা অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় রহস্যের আভাস পাই।"[১]

নিরবচ্ছিন্ন অবকাশপূর্ণ প্রকৃতির স্নিগ্ধশ্যাম ক্রোড়ে কুটীরনীড়েই হউক অথবা জনাবিল নগরকারার ইটকাঠের বায়ুরুদ্ধ কোটরেই হউক, যে চিরন্তন মানব-জীবনস্রোত নিতান্ত ঘরোয়া ক্ষুদ্র তুচ্ছ দুঃখসুখের ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদ্‌-ভঙ্গে অনুচ্ছ্বাসিত নিরলসগতিতে একটানা চলিয়াছে, যেখানে চমকপ্রদ বৈচিত্র্যও

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা পৃ ২৩৪।

নাই এবং মহত্ত্বের উচ্চ মহিমা অথবা নীচতার হীন নারকীয়তাও নাই, সেই সনাতন বাঙ্গালীর সর্ব্বজনীন জীবন কবিচিত্তে অপূর্ব্ব বেদনা- ও সহানুভূতি-মণ্ডিত হইয়া শিল্পগরিষ্ঠ প্রতিবিম্বন পাইয়াছে। সাহিত্যশিল্পের সনাতন আদর্শের অনুযায়ী এই প্রতিবিম্বন যথাযথ, কিন্তু সব সময়ে হয়ত তথাকথিত "বাস্তব" নয়। রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পে মানুষের বাহ্য অথবা আন্তর জীবনের শুধু হীন ঘৃণ্য ও জুগুপ্সিত রূপটাই প্রতিফলিত হয় নাই; দোষে-গুণে ভালোয়-মন্দয় দুঃখে-সুখে সিদ্ধি-নৈরাশ্যে বিজড়িত নিখিলজীবনসংহিতার ভাষ্যই তাহাতে শাশ্বত রসরূপ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্প এই হিসাবে পরিপূর্ণ বাস্তব যে ইহাতে কোন টাইপ-গত নয়, নিতান্ত ব্যক্তি-গত গভীরতর মানবত্বটুকু মূর্ত্ত হইয়াছে। তবুও রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্পে এই বাস্তবতাই চরম নয়। ইহার পিছনে এমন একটা কিছু আছে যাহাতে এই গল্পগুলিতে অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্যের স্পর্শ লাগিয়াছে। এই গল্পগুলির মধ্যে চোখ-দেখা মানুষের সুখদুঃখময় যে জীবনখণ্ড আবহমান প্রাণপ্রবাহের বিচ্ছেন্ন ধারামাত্র, তাহারি গভীর আনন্দ স্রোতে মানবজীবনের ক্ষণিক স্নেহ-প্রেম ও আপাত তুচ্ছতা-ব্যর্থতা-বেদনা সবই একটি যেন অলৌকিক সার্থকতায় পৌঁছিয়া চরিতার্থ হইয়াছে, মানব-জীবনের অসার্থকতার ব্যথা বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনার মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে, মানব-প্রেমের বিরহবেদনা বিশ্বচৈতন্যের আনন্দরসে বিলীন হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বাণীশিল্পে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের মিলন হইয়াছে—অমরলোকের অচঞ্চল নক্ষত্রালোক মাটির প্রদীপের ক্ষীণচঞ্চল শিখা চুম্বন করিয়া ধন্য হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোট-গল্পের কাহিনীতে যে ব্যর্থতার করুণ সুর ক্বণিত হইয়াছে অথবা তাহার উপরে যে ব্যথিত বেদনার ছায়া পতিত হইয়াছে তাহা সাধারণ অর্থে ট্রাজিক বা নিষ্করুণ নহে। অজ্ঞাত অখ্যাত নিতান্ত সাধারণ মানুষের ব্যর্থতা-বেদনার "সাতসমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া" যেখানে বিশ্বব্যাপী সমবেদনা অপেক্ষা করিয়া আছে সেখানে পৌঁছিয়াই যেন কাহিনী যথার্থ বিরাম লাভ করিয়াছে। হিউম্যানিটির বা বিশ্বমানবতার গভীরসমবেদনাজাত আনন্দরসই এই সুমহান্ চরিতার্থতা। 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পে রতনের বালিকাজীবনের

ব্যর্থতা এবং অপরিসীম মনোবেদনা যদি শেষ কথা হইত তবে ইহাতে গল্পত্বই থাকিত না। রতনের বালিকাহৃদয়ের অস্ফুট অব্যক্ত মর্ম্মবেদনা সহানুভূতিশীল পাঠকের সমবেদনায় অভিষিক্ত হইয়া বাগতীত রসের আনন্দলোকে অচঞ্চল স্থিতি লাভ করে বলিয়াই এই কাহিনীবিহীন গল্পটি বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্পের মর্য্যাদা পাইয়াছে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পে কোন উপদেশ বা তত্ত্বকথার বীজ না থাকিলেও ইহাতে এমন একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ আছে যাহা পাঠকের মনে অতৃপ্তিবেদনার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃহত্তর সান্ত্বনা আনিয়া দেয়, পাঠক যেন মানসগঙ্গাস্নানের শুচিতা লাভ করে। এইখানেই ছোট-গল্পরচনায় রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা। সংসারবিড়ম্বিত নগণ্য সাধারণ নরনারীর জীবনেব এইরূপ সহজসুন্দর apotheosis বা দেবায়ন শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্পেও ক্বচিৎ মেলে।

রবীন্দ্রনাথ নিজের ভবিষ্যদ্‌বাণী নিজেই সফল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছোট-গল্পে—সভাস্থলে যাহারা কথা কহিতে পারে না, সেখানে তাহারা কথা কহিয়াছে, লোকসমাজে যাহারা একপ্রান্তে উপেক্ষিত হয় সেখানে তাহাদের এক নূতন গৌরব প্রকাশিত হইয়াছে, পৃথিবীতে যাহারা একান্ত অনাবশ্যক বোধ হয় সেখানে দেখি তাহাদেরই সরল প্রেম, অবিশ্রাম সেবা, আত্মবিসর্জ্জনের উপরে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত সেই নব দ্বৈপায়ন, যিনি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে মহাকাব্যের নায়ক ভীষ্ম-দ্রোণ-ভীমার্জ্জুনের যে অখ্যাত অজ্ঞাত আত্মীয় স্বজাতি আছেন—সেই আত্মীয়তা আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়া সাহিত্যশিল্পকে উচ্চতর ভূমিতে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।[১]

রবীন্দ্রনাথ যখন ছোট-গল্পরচনায় হাত দিয়াছেন তখন তাঁহার কবিপ্রতিভায় পূর্ণ জোয়ার। গদ্যে-পদ্যে রবীন্দ্রের মহিমায় তখন বঙ্গসাহিত্যগগন বিচিত্র ও অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ভাগীরথীবক্ষে ভ্রমণ এবং পরে গাজীপুরে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কবির বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছিল। এখন পদ্মার

১ তুলনীয় 'ডায়ারি,' সাধনা ১৩০০ বৈশাখ, পঞ্চভূত।

তীরে কুঠিবাড়ীতে অথবা বোটে থাকিয়া প্রকৃতির শান্ত ও উদ্দাম আবেষ্টনের ভিতরে যে জীবনস্রোত ধীরে একটানা গতিতে চলিয়াছে তাহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইয়া কবির প্রতিভা অভাবনীয়ভাবে স্ফূর্তি পাইল। যে-অবস্থায় থাকিয়া এবং যে-মনোভাব লইয়া রবীন্দ্রনাথ হিতবাদীতে (১২৯৮) ও সাধনায় প্রকাশিত (১২৯৮-১৩০২) গল্পগুলি লিখিয়াছিলেন তাহা একটি সমসাময়িক কবিতায়[১] বর্ণনা করিয়াছেন। এই কবিতার শেষ অংশ গল্পগুচ্ছের উপর রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত ভাষ্য এবং সেইজন্য সমধিক মূল্যবান্।

রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পে নগর ও নগরবাসী এবং জনপদ ও জনপদবাসী তুল্য স্থান পাইয়াছে। মানুষ অবশ্য সর্ব্বত্রই এক, কি নগর কি জনপদ, এবং রবীন্দ্রনাথ যে emotional fundamentals এবং তাহার complexes বা জট লইয়া সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে নাগরিক ও জানপদিক এরূপ শ্রেণীবিভাগ অসম্ভব। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে পল্লীজীবনের অকৃত্রিমতায় মানুষের ভাবপরিমণ্ডল অধিকতর সরল ও সুস্থ থাকিবার সুযোগ পায়, এবং ইহাও ঠিক যে পল্লীর প্রতিবেশ এবং পল্লীর জীবন রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের পল্লীপ্রীতি শহরবাসের প্রতিক্রিয়া-জনিত নহে, ইহার জড় অনেক দূরে। বৃহৎ অট্টালিকার এক কোণে বন্দী শিশুচিত্ত জানালার ফাঁক দিয়া বহিঃপ্রকৃতির যে সঙ্কীর্ণ রূপটুকু দেখিয়া নিজের কল্পনাকে দিগ্‌বিদিকে উধাও করিয়া দিত তাহারি মধ্যে কুটীরমণ্ডিত তরুশ্যাম পল্লীজীবনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের মূল খুঁজিতে হইবে। বহুকাল পরে[২] রবীন্দ্রনাথ বাঁকুড়ায় জনসভার অভিনন্দনের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এই ইতিহাসটুকুর আভাস পাইতেছি,—"আমার মরাইয়ে আজ যা কিছু ফসল জমেছে তার বীজ বোনা হয়েছে সেই প্রথম বয়সে।...বাল্যকালে দিন কেটেছে শহরে খাঁচার মধ্যে, বাড়ির মধ্যে। শহরবাসীর মধ্যেও ঘুরে ফিরে বেড়াবার যে স্বাধীনতা থাকে আমার তাও ছিল না।...বহির্জগতের এই স্বল্প পরিচয় আমার মধ্যে একটা সৌন্দর্য্যের আবেশ সৃষ্টি করত। জানালার ফাঁক দিয়ে যা আমার

১ 'বর্ষা যাপন,' সোনার-তরী ; রচনাকাল ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯। ২ ১৮ ফাল্গুন ১৩৪৩।

চোখে পড়ত তাতেই যেটুকু পেতুম তার চেয়ে যা পাইনি তাই বড়ো হয়ে উঠেছে কাঙাল মনের মধ্যে। সেই না-পাওয়ার একটি বেদনা ছিল বাংলার পল্লীগ্রামের দিগন্তের দিকে চেয়ে।" এই অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একদল সমালোচকের অভিযোগের সমুচিত উত্তর দিয়াছেন। ইঁহাদের মতে রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পে বাঙ্গালাদেশের পল্লীজীবনের খাঁটি রূপটি ধরা পড়ে নাই, কেন না তিনি ধনীর সন্তান, গরীব পল্লীবাসীর সুখদুঃখের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমি বলতে পারি আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন। কি দিয়ে জানেন তাঁরা। অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়। যথার্থ জানায় ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে যে কীট জন্মেছে সে জানে না ফুলকে। জানে, বাইরে থেকে যে পেয়েছে আনন্দ। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি নিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহংকারের মতো শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পল্লীপরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধাবুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না।"

যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ গল্পরচনার প্রথম এবং প্রধানতম আবেগ অনুভব করিয়াছিলেন তাহার একটি অত্যন্ত সাদাসিদা বাস্তব ছবি 'বিসর্জ্জন' নাটকের উৎসর্গ কবিতায় তিনি দিয়াছেন।

বোটে এবং ষ্টীমারে করিয়া গঙ্গায় ভ্রমণ করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা ও শান্তিপুরের মধ্যবর্ত্তী ভাগীরথীতীরের যে পল্লীদৃশ্য দেখিয়াছিলেন তাহাতেই গল্পরচনার অস্ফুট প্রেরণা লাভ করেন। আর তাহারি ফলে তাঁহার প্রথম দুই গল্প-চিত্র—'রাজপথের কথা' এবং 'ঘাটের কথা' লিখিত হয়। 'সরোজিনী-প্রয়াণ' প্রবন্ধে এই দুইটি গল্পের ভূমিকা পাওয়া যাইবে। তাহার পর ছয়-সাত বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ গল্প লেখার প্রথম সজ্ঞান প্রেরণা অনুভব করেন সাজাদপুরে থাকার কালে। তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্প 'পোষ্টমাষ্টার' লেখা হইয়াছিল এই সময়ে সাজাদপুরের কুঠিবাড়িতে এক দুপুর বেলা। এই গল্প রচনার

স্মৃতি অনেককাল ধরিয়া তাঁহার মনে রহিয়া গিয়াছিল। 'পোষ্টমাষ্টার' লিখিবার চারি বৎসর পরে কবি সাজাদপুর হইতে এক চিঠিতে এইকথা লিখিয়াছিলেন, "আমার এই সাজাদপুরের দুপুরবেলা গল্পের দুপুরবেলা। মনে আছে ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে বসে আপনার মনে ভোর হয়ে পোষ্টমাষ্টার গল্পটা লিখেছিলুম। আমিও লিখ্‌ছিলুম এবং আমার চারদিকের আলো, বাতাস আর তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল। এই রকম চতুর্দ্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে নিজের মনের মত একটা কিছু রচনা করে যাওয়ার যে সুখ তেমন সুখ জগতে খুব অল্পই আছে।"[১]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যশিল্প স্বতঃস্ফূর্ত্ত সৃষ্টি। তাহার মধ্যে তাঁহার ছোট-গল্পের স্বতঃস্ফূর্ত্ততা বোধ করি সবচেয়ে নিখুঁত। কবিতা লিখিবার পর এমন কি প্রথম-প্রকাশের পরও রবীন্দ্রনাথ কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জন করিয়াছেন, কিন্তু কোন ছোট-গল্প একবার লিখিয়া আর তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। মনের মধ্যে যে-আনন্দ লইয়া তিনি হিতবাদীর ও সাধনার জন্য এক একটি করিয়া গল্প লিখিয়াছিলেন তাহার স্মৃতি তিনি বহুকাল ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার কবিতার স্থায়ী মূল্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে শেষ অবধি কিছু সংশয় রহিয়া গিয়াছিল বটে, তবে ছোট-গল্প রচনায় নিজের ক্ষমতা বিষয়ে প্রথম হইতেই তিনি এতটুকুও সংশয় পোষণ করেন নাই। একটি চিঠিতে কবি লিখিয়াছিলেন, "আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক এক সময় মনে হয় আমি ছোট ছোট গল্প অনেক লিখ্‌তে পারি এবং মন্দ লিখ্‌তে পারিনে—লেখ্‌বার সময় সুখও পাওয়া যায়।"[২] পরের বৎসরে আর একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "আজকাল মনে হচ্চে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোট ছোট গল্প লিখ্‌তে বসি তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য্য হতে পারলে হয়ত পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখ্‌ব তারা আমার দিন রাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার

[১] ছিন্নপত্র। [২] ঐ, সাজাদপুর হইতে ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩ তারিখে লিখিত।

সময় আমার বদ্ধ ঘরের সঙ্কীর্ণতা দূর করবে, এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে।”[১]

পদ্মাতীরের কুঠিবাড়ীর গবাক্ষপথে অথবা নদীতীরে বাঁধা বজরার ছাদ বা জানালা হইতে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের যে গভীরতর অন্তস্তলবাহী স্রোতের প্রবাহ সন্দর্শন করিয়া সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহারি অখণ্ড শাশ্বত পরিচয় রহিয়া গিয়াছে তাঁহার ছোট-গল্পে। কয়েকটি গল্পের কাহিনীর মধ্যে বাস্তবঘটনা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবে তাঁহার অধিকাংশ গল্পের প্লট হইতেছে সম্পূর্ণভাবে মৌলিক। কিন্তু তাহা হইলেও বহু দৃষ্ট ঘটনা ও নর-নারী কবির মনে যে রেখাপাত করিয়াছিল তাহা অনেকগুলি গল্পে রসাপিত ও রূপায়িত হইয়াছে। উদাহরণ হিসাবে পোষ্টমাষ্টার গল্পটিকে ধরা যাইতে পারে। যখন এই গল্প লেখা হয় তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাজাদপুরে কুঠিবাড়ীতে। সেই কুঠিবাড়ীর একতলাতে ছিল পোষ্ট আফিস। কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময় পোষ্টমাষ্টারবাবু তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতেন ও সম্ভব-অসম্ভব নানারকম গল্প বলিয়া যাইতেন। ইঁহাকে দেখিয়াই রবীন্দ্রনাথ ‘পোষ্টমাষ্টার’ লিখিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু গল্পের পোষ্টমাষ্টারবাবুর সঙ্গে বাস্তব পোষ্টমাষ্টারবাবুর বিশেষ কোন সাদৃশ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না।

‘সমাপ্তি’ গল্পের মৃণ্ময়ী-চরিত্রের আভাস রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছিলেন একদা সাজাদপুরে নদীঘাটে শ্বশুরালয়গামিনী এক বালিকার মূর্তিতে। এবিষয়ে সাজাদপুর হইতে লেখা ৪ জুলাই ১৮৯১ তারিখের পত্রে বিস্তৃত উল্লেখ আছে।[২]

শুধুই করুণসুন্দর চিত্র নয়, অনেক নিষ্ঠুরকঠোর দৃশ্যও কবির চোখে পড়িয়াছিল। নিষ্ঠুরতার মধ্যেও যেখানে মানবের মহনীয়তা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সেখানে রবীন্দ্রনাথের গল্পে তাহার প্রতিফলন হইয়াছে, যেমন ‘শাস্তি’ গল্পে। কিন্তু নিষ্ঠুর যেখানে অসুন্দর হইয়া শুধু মানবের পশুবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে সেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কুণ্ঠিত হইয়া বিমুখ হইয়া ফিরিয়াছে। এইরূপ

১ ঐ, শিলাইদা হইতে ২৭ জুন ১৮৯৪ তারিখে লিখিত। ২ ছিন্নপত্র।

একটি দৃশ্যের বর্ণনা পাইতেছি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সাজাদপুর হইতে লেখা একটি পত্রে।

আমার এই খোলা জানালার মধ্যে দিয়ে নানা দৃশ্য দেখ্‌তে পাই। সবসুদ্ধ বেশ লাগে—কিন্তু এক একটা দেখে ভারি মন বিগ্‌ড়ে যায়। গাড়ির উপর অসম্ভব ভার চাপিয়ে অসাধ্য রাস্তায় যখন গরুকে কাঠির বাড়ি খোঁচা দিতে থাকে তখন আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। আজ সকালে দেখছিলুম একজন মেয়ে তার একটি ছোট উলঙ্গ শীর্ণ কালো ছেলেকে এই খালের জলে নাওয়াতে এনেছে—আজ ভয়ঙ্কর শীত পড়েছে—জলে দাঁড় করিয়ে যখন ছেলেটার গায়ে জল দিচ্চে তখন সে করুণস্বরে কাঁদচে আর কাঁপচে, ভয়ানক কাশীতে তার গলা ঘন্ ঘন্ করচে—মেয়েটা হঠাৎ তার গালে এমন একটা চড় মারলে যে আমি আমার ঘর থেকে তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলুম। ছেলেটা বেঁকে পড়ে হাঁটুর উপর হাত দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌ল, কাশীতে তার কান্না বেধে যাচ্ছিল! তারপর ভিজে গায়ে সেই উলঙ্গ কম্পান্বিত ছেলের নড়া ধরে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল। এই ঘটনাটা নিদারুণ পৈশাচিক বলে বোধ হল। ছেলেটা নিতান্ত ছোট—আমার খোকার বয়সী। এরকম একটা দৃশ্য দেখ্‌লে হঠাৎ মানুষের যেন একটা Ideal-এর উপর আঘাত লাগে—বিশ্বস্তচিত্তে চল্‌তে চল্‌তে খুব একটা হুচট্ লাগার মত। ছোট ছেলেরা কি ভয়ানক অসহায়—তাদের প্রতি অবিচার করলে তারা নিরুপায় কাতরতার সঙ্গে কেঁদে নিষ্ঠুর হৃদয়কে আরো বিরক্ত করে তোলে; ভাল করে আপনার নালিস জানাতেও পারে না। মেয়েটা শীতে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে এসেছে আর ছেলেটার গায়ে এক টুকরো কাপড়ও নেই—তার উপরে কাশী—তার উপরে এই ডাকিনীর হাতে মার![1]

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এইরূপ একান্ত নিষ্ঠুর চিত্রকে গল্পরূপ দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল।

পঞ্চভূতের ডায়ারির একস্থলে[2] তাঁহার যে ঠিকা মুহুরী ছেলেটির কথা আছে,

[1] ছিন্নপত্র। [2] সাধনা ১৩০০ বৈশাখ, 'মনুষ্য' পঞ্চভূত।

সেটিও একটি ছোট-গল্পের মত করুণমধুর। কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয়ের একটি প্রধান দিকের উপর বিশেষভাবে আলোকসম্পাত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পের উৎসের সন্ধান দেয় বলিয়া মূল্যবান্ এই কাহিনীটুকু এখানে সমগ্রভাবে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

একটি যুবক তাহার জন্মস্থান ও আত্মীয়বর্গ হইতে বহুদূরে দু-দশ টাকা বেতনে ঠিকা মুহুরীগিরি করিত। আমি তাহার প্রভু ছিলাম, কিন্তু প্রায় তাহার অস্তিত্বও অবগত ছিলাম না—সে এত সামান্য লোক ছিল! একদিন রাত্রে সহসা তাহার ওলাউঠা হইল। আমার শয়নগৃহ হইতে শুনিতে পাইলাম সে 'পিসিমা' 'পিসিমা' করিয়া কাতরস্বরে কাঁদিতেছে। তখন সহসা তাহার গৌরবহীন ক্ষুদ্র জীবনটি আমার নিকট কতখানি বৃহৎ হইয়া দেখা দিল! সেই যে একটি অজ্ঞাত অখ্যাত মূর্খ নির্বোধ লোক বসিয়া বসিয়া ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া কলম খাড়া করিয়া ধরিয়া এক মনে নকল করিয়া যাইত, তাহাকে তাহার পিসিমা আপন নিঃসন্তান বৈধব্যের সমস্ত সঞ্চিত স্নেহরাশি দিয়া মানুষ করিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্তদেহে শূন্য বাসায় ফিরিয়া যখন সে স্বহস্তে উনান ধরাইয়া পাক চড়াইত, যতক্ষণ অন্ন টগবগ করিয়া না ফুটিয়া উঠিত ততক্ষণ কম্পিত অগ্নিশিখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সে কি সেই দূরকুটীরবাসিনী স্নেহশালিনী কল্যাণময়ী পিসিমার কথা ভাবিত না? এক দিন যে তাহার নকলে ভুল হইল, ঠিকে মিল হইল না, তাহার উচ্চতন কর্ম্মচারীর নিকট সে লাঞ্ছিত হইল, সেদিন কি সকালের চিঠিতে তাহার পিসিমার পীড়ার সংবাদ পায় নাই? এই নগণ্য লোকটার প্রতিদিনের মঙ্গল-বার্ত্তার জন্য একটি স্নেহপরিপূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে কি সামান্য উৎকণ্ঠা ছিল! এই দরিদ্র যুবকের প্রবাসবাসের সহিত কি কম করুণ কাতরতা উদ্বেগজড়িত হইয়া ছিল! সহসা সেই রাত্রে এই নির্ব্বাণপ্রায় ক্ষুদ্র প্রাণশিখা এক অমূল্য মহিমায় আমার নিকটে দীপ্যমান হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিলাম কিন্তু পিসিমার ধনকে পিসিমার নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিলাম না—আমার সেই ঠিকা মুহুরীর মৃত্যু হইল। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন

খুব মহৎ তথাপি এই লোকটিরও মূল্য অল্প নহে। তাহার মূল্য কোনো কবি অনুমান করে নাই, কোনো পাঠক স্বীকার করে নাই, তাই বলিয়া সে মূল্য পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত ছিল না—একটি জীবন আপনাকে তাহার জন্য একান্ত উৎসর্গ করিয়াছিল—কিন্তু খোরাক-পোষাক সমেত লোকটার বেতন ছিল আট টাকা, তাহাও বারোমাস নহে। মহত্ত্ব আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত হইয়া উঠে আর আমাদের মত দীপ্তিহীন ছোট ছোট লোকদিগকে বাহিরের প্রেমের আলোকে প্রকাশ করিতে হয়;—পিসিমার ভালবাসা দিয়া দেখিলে আমরা সহসা দীপ্যমান হইয়া উঠি।

রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রীতির ও জীবনরসের আলোকে নিতান্ত নগণ্য মানুষও অসামান্য দীপ্তি লাভ করিয়া সাহিত্যশিল্পে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। তাহার ব্যক্তিগত দুঃখবেদনা উজ্জ্বলরূপ ধারণ করিয়া সমস্ত মানবসমাজের একটা বৃহৎ অব্যক্ত বেদনার মত সহৃদয় পাঠকের মন মথিত করিতে থাকে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ছোট-গল্পের পরিচয়

১

সাহিত্যশিল্পে রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশেষ স্ফুরণ হইয়াছে কাব্যে এবং ছোট-গল্পে। কাব্যে কবিচিত্তের আত্মপ্রকাশই মুখ্য, আর ছোট-গল্পে মানুষের দুঃখসুখের বিচিত্র অনুভূতি কবিচিত্তে এক গভীরতর আদর্শের দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছে। কাব্যে কবির নিজের কথা অনূদিত হইয়াছে বিশ্বসংসারের ভাষায়; ছোট-গল্পে বিশ্বসংসারের কথা রূপান্তরিত হইয়াছে নিজের কথায়। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের অখণ্ড পরিচয় পাইতে হইলে তাঁহার কাব্য ও গল্প দুইয়েরই সমান অনুশীলন চাই। তাঁহার উপন্যাসের ক্ষেত্র ছোট-গল্পের তুলনায় সঙ্কীর্ণ। কাব্যে-উপন্যাসে কবিচিত্তের প্রকাশ মুখ্যতর।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট গদ্যরচনার মধ্যে ছোট-গল্পের স্থান সকলের উপরে। ছোট-গল্পের রচনায় কবি সে অসাধারণ সৃজননৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহা বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছোট-গল্পলেখকগণও সবসময়ে দেখাইতে পারেন নাই। রুশিয়ার পুশ্‌কিন ও টলষ্টয়, ফ্রান্সের মোপাসাঁ ও মেরিমে, আমেরিকার পোয়ে ও "ও-হেন্‌রি" প্রভৃতি প্রথমশ্রেণীর ছোট-গল্পরচয়িতাদিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আসন সর্ব্বাগ্রে। রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পসৃষ্টির বৈচিত্র্য প্রাচুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বিদেশী শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্পলেখকদের মধ্যে শুধু "ও-হেন্‌রি"-র রচনায় কতকটা পাওয়া যায়। তবে "ও-হেনরি"-র আর্ট ও ষ্টাইল সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের।

২

রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পরচনার সূত্রপাত হয় ১২৯১ সালে। বাল্যরচনা 'ভিখারিণী' ঠিক ছোট-গল্প নয়। ১২৯১ সালে দুইটিমাত্র গল্পচিত্র লিখিয়া কবি চুপচাপ থাকেন প্রায় সাত বৎসর। ১২৯৮ সালে হিতবাদী ও সাধনা পত্রিকা প্রবর্ত্তিত হইলে কবি ছোট-গল্প লেখার যথার্থ প্রেরণা অনুভব করিলেন। এই

সাল হইতে মাস দেড়েক হিতবাদীতে তাহার পর প্রায় পাঁচ বৎসর ধরিয়া সাধনায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যাহ্নপ্রতিভা ছোট-গল্পের কিরণমালা গাঁথিয়া চলিল। সাধনা উঠিয়া গেলে ভারত-প্রদীপ-বঙ্গদর্শন-প্রবাসী-সবুজপত্রে ছোট-গল্পের জের চলিয়া-ছিল কচিৎ ছিন্ন কচিৎ অবিচ্ছিন্ন গতিতে। শেষজীবনেও কবি গল্প-লেখার প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন ১৩৪৫-১৩৪৭ সালে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পসংগ্রহ গ্রন্থ হইতেছে 'ছোট-গল্প' (১৫ ফাল্গুন ১৩০০)। ছোট-গল্পে ষোলটি গল্প ছিল। তাহার পর 'কথা-চতুষ্টয়' (১৩০১), দুই ভাগ 'বিচিত্র গল্প' (১৩০১) ও 'গল্প দশক' (১৩০২)। এই চারিখানি বইয়ে হিতবাদীতে ও সাধনায় প্রকাশিত গল্পগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল। ১৩০৭ সালে শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মজুমদার লাইব্রেরী হইতে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ গল্পসংগ্রহ, অর্থাৎ হিতবাদীতে সাধনায় ভারতীতে ও প্রদীপে প্রকাশিত তাবৎ ছোট-গল্প, 'গল্প' নামে প্রকাশ করেন। 'গল্প' বাহির হইয়াছিল খণ্ডে খণ্ডে, একটানা পৃষ্ঠাঙ্কে। প্রত্যেক খণ্ডের মলাটে নাম ছিল 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ'। ১৩১১ সালে হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী [গদ্যাংশ]' প্রকাশিত হয়। ইহাতেও শীর্ষক ছিল 'গল্প', এবং ইহাতে গল্পগুলি ভাগ করা ছিল এই পর্য্যায়ে,— 'সংসার চিত্র', 'সমাজ চিত্র,' 'রঙ্গ-চিত্র'[১] ও 'বিচিত্র চিত্র'। অতঃপর এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে ছোট-গল্পগুলি 'গল্পগুচ্ছ' নামে পাঁচ খণ্ডে বাহির হয় (১৯০৮-০৯)। ১৩০৯ হইতে ১৩১৮ সালের মধ্যে লেখা এবং নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে, প্রবাসীতে ও ভারতীতে প্রকাশিত চারিটি গল্প 'গল্প চারিটি' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ১৩২১ সালে সবুজপত্রে প্রকাশিত গল্পগুলি গ্রন্থাকারে বাহির হইল 'গল্প সপ্তক' নামে (১৩২৩)। পরে প্রকাশিত 'পয়লা নম্বর' ও 'তপস্বিনী' গল্প দুইটি এবং 'তোতা কাহিনী' ও 'কর্ত্তার ভূত' নামক কথিকা দুইটি 'পয়লা নম্বর' নামে সঙ্কলিত হয় (১৩২৭)। অতঃপর প্রকাশিত গল্পগুলি, শেষের তিনটি ছাড়া, বিশ্বভারতী-সংস্করণ গল্পগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শেষকালে লেখা তিনটি গল্প 'তিনসঙ্গী' নামে সঙ্কলিত হইয়াছে (১৩৪৭)।

[১] চিরকুমার-সভা রঙ্গ-চিত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

৩

রবীন্দ্রনাথের প্রথমপ্রকাশিত গল্প 'ভিখারিণী'[১] চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত বড়-গল্প। গল্পটির ভাব ও বিষয় সমসাময়িক কাব্য বনফুলের ও কবিকাহিনীর অনুরূপ। কাহিনী যতটা অপরিণত ভাষা ততটা নয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার উপক্রমমুহূর্তেই যে পদ্যের তুলনায় গদ্যে অধিক দক্ষতা দেখা দিয়াছিল তাহা বোঝা যায় তাঁহার প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' ও প্রথম উপন্যাস 'করুণা' হইতে। ভিখারিণীর রচনার একটু পরিচয় দিই।

> ঘন-বৃক্ষ-বেষ্টিত অন্ধকার গ্রামটি শৈলমালার বিজন ক্রোড়ে আঁধারের অবগুণ্ঠন পরিয়া পৃথিবীর কোলাহল হইতে একাকী লুকাইয়া আছে। দূরে দূরে হরিৎ শস্যময় ক্ষেত্রে গাভী চরিতেছে, গ্রাম্য বালিকারা সরসী হইতে জল তুলিতেছে, গ্রামের আঁধার কুঞ্জে বসিয়া অরণ্যের ম্রিয়মাণ কবি বউ-কথা-কও মর্মের বিষণ্ণ গান গাহিতেছে। সমস্ত গ্রামটি যেন কবির স্বপ্ন।

৪

রবীন্দ্রনাথ ছোট-গল্পরচনার প্রথম যথার্থ অনুপ্রেরণা পাইলেন ১২৯১ সালের প্রথমে কলিকাতার উজানে ও ভাটিতে গঙ্গাবক্ষে ষ্টীমারে ভ্রমণের ফলে। ভাগীরথীতীরের পল্লীদৃশ্য কবির মন সম্পূর্ণভাবে হরণ করিয়াছিল। 'সরোজিনী প্রয়াণ' প্রবন্ধে[২] ইহার পরিচয় আছে। 'ঘাটের কথা'[৩] ও 'রাজপথের কথা'[৪] গল্পচিত্র দুইটিও ইহারি ফল। গল্পাংশ বিশেষ পুষ্ট না হইলেও চিত্র দুইটিতে ছোট-গল্পের লক্ষণ পরিস্ফুট। দুইটি গল্পই অচেতন জনসমাগমস্থানরূপ মূক সাক্ষীর স্বগতোক্তিরূপে কল্পিত এবং দুইটিতেই বিরহিণী নারীর মৌন অন্তর্বেদনা মুখরিত হইয়াছে। সদ্যঃ-প্রিয়জনবিরহী কবি এই দুই কাহিনীর মধ্যে নিজেরই অন্তর্গূঢ় বেদনার প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন।

[১] ভারতী শ্রাবণ, ভাদ্র ১২৮৪। [২] ভারতী শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ১২৯১। [৩] ভারতী কার্তিক ১২৯১। [৪] নবজীবন অগ্রহায়ণ ১২৯১।

ঘাটের-কথা ও রাজপথের কথা লিখিয়াই রবীন্দ্রনাথের গল্প লিখিবার ক্ষীণ প্রথম অনুপ্রেরণা শেষ হইয়া গেল। তাহার পর দীর্ঘ সাত বৎসর পরে আবার কবি গল্প লিখিবার প্রেরণা লাভ করিলেন। হিতবাদীর প্রথম ছয় সপ্তাহে ছয়টি গল্প বাহির হইল,—'দেনাপাওনা,' 'পোষ্টমাষ্টার,' 'গিন্নি,' 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা,' 'ব্যবধান' এবং 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি'।[১]

বিবাহের পণ লইয়া বরপক্ষের, বিশেষ করিয়া বরের মায়ের নিষ্ঠুরতার কাহিনী 'দেনাপাওনা'। ভদ্র বাঙ্গালীর ঘরের এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিল এই প্রথম। ইহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বৌঠাকুরাণীর-হাটে কিছু আভাস দিয়াছিলেন। প্রায় বাইশ বছর পরে লেখা 'হৈমন্তী' গল্পের ইহারি আর এক রূপ দেখি। দেনাপাওনায় যেমন হৈমন্তীতেও তেমনি পিতা সরলহৃদয় ও কন্যাবৎসল, আর কন্যা নির্বাক্ স্নেহশীল ও দৃঢ়চিত্ত। দেনাপাওনার রচনারীতিতে একটু বিশেষত্ব আছে। বর্ণনা দ্রুতগতি ব্যঙ্গমিশ্র এবং কাহিনীসর্বস্ব। চরিত্রচিত্রণ সবিশেষ বাস্তব।

কাহিনী-অংশ অকিঞ্চিৎকর হইলেও যে উৎকৃষ্ট ছোট-গল্প লেখা যাইতে পারে তাহার চমৎকার নিদর্শন 'পোষ্টমাষ্টার'। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়ে মিলিয়া গল্পটিকে ঘিরিয়া একটি ম্লান বিধুর পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। ধারা-মুখর বর্ষা ঋতু, শ্যামবনানীবেষ্টিত নদীমেখলিত ক্ষুদ্র গ্রাম, সেখানে একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে নূতন স্থাপিত পোষ্ট আপিস, "অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল,"—ইহার মধ্যে কলিকাতাবাসী গৃহনীড়কাতর নবাগত ভদ্রসন্তানের মনোভাব সহজেই কল্পনা করিয়া লইতে পারি। রতনের সঙ্গে পোষ্টমাষ্টারের আর্থিক সামাজিক ও ব্যবহারিক পার্থক্য গুরুতর হইলেও, অবস্থা গতিকে দুইজনের হৃদয় ক্ষণকালের জন্য সমভূমিতে মিলিত হইয়াছিল। বর্ষাপ্রকৃতিপীড়িত নির্জন বন্দীশালায় স্নেহকাতর যুবকের একমাত্র সান্ত্বনাস্থল ছিল অনাথা বালিকা রতনের আত্মীয়াধিক পরিচর্য্যা ও স্নেহবুভুক্ষা। অজ্ঞাতসারে

১ হিতবাদীর পুরাণো সংখ্যাগুলি না পাওয়ায় গল্পগুলির পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা যায় নাই।

ধীরে ধীরে "দাদাবাবু" কিশোরী রতনের নারীহৃদয় উদ্বুদ্ধ করিল। এদিকে দাদাবাবুর মন পড়িয়া আছে সুদূর কলিকাতার এক সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে একটি জীর্ণ গৃহে। রতন সেই গৃহের substitute মাত্র। যতদিন গৃহে ফিরিবার সম্ভাবনা জাগে নাই ততদিনই রতন তাহার হৃদয়ের খানিকটা অংশ অধিকার করিয়াছিল ভাড়াটের মত। কিন্তু রোগশয্যা হইতে উঠিয়া পোষ্টমাষ্টার যখন চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিবার উদ্যোগ করিল তখন রতনকে সঙ্গে লইবার কথা একটিবারও মনে হইল না। নৌকায় করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার মুহূর্ত্তে রতনের জন্য সে মনে ব্যথা অনুভব করিল, এমনও মনে করিল ফিরিয়া যাই, কিন্তু সে দ্বিধা মুহূর্ত্তের জন্য। বয়সের গুণে এবং শিক্ষার বাঁধা বুলির মাহাত্ম্যে মনে সান্ত্বনা পাইতে বিলম্ব হইল না; "কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদী-প্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কি! পৃথিবীতে কে কাহার!" রতন অশিক্ষিত অবোধ পল্লীবালিকা; সংসারের জটিল চক্রান্তের কাছে মূক হৃদয়বৃত্তি অহরহ পরাজয় মানিতেছে,—এ তত্ত্ব সে জানিবে কি করিয়া! তাই "রতনের মনে কোন তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোষ্ট আপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে,—সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না।"

গল্প এইখানেই শেষ হইয়া গেল বটে কিন্তু অবুঝ বালিকার অশ্রুসজল মূক আর্ত্তি যে অশ্রুত ব্যাকুল ক্রন্দনধ্বনি তুলিল তাহা জলে স্থলে অন্তরিক্ষে বিশ্ববেদনার সহিত মিলিত হইয়া গিয়া পাঠকের মুগ্ধচিত্তে একতারার মত ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

স্নেহশীলতা মানুষের অত্যন্ত স্বাভাবিক মনোধর্ম্ম, এবং এই মনোধর্ম্ম তাহার চিত্তবৃত্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে ব্যক্তি উন্মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, শিক্ষা ও সাংসারিকতা যাহার হৃদয়কে কঠিন সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর করিয়া তোলে নাই। কিন্তু যেমন মানুষই হউক তাহার হৃদয়বৃত্তির একটা কিছু আশ্রয়

না থাকিলেও চলে না। তাই রতনের মনের আত্তির প্রতিধ্বনি করিয়া রবীন্দ্রনাথ শেষে এই তত্ত্বকথাটুকু যোগ করিয়া দিয়াছেন,

হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিতর্ক শাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতর প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

'গিন্নি' গল্পে ইস্কুলের হৃদয়হীন পণ্ডিতের কাছে একটি ভীরু লাজুক গৃহপালিত বালকের অযথা লাঞ্ছনার ব্যঙ্গরসায়িত সহৃদয় চিত্র আঁকা হইয়াছে। কাহিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজের বাল্যস্মৃতির ও ছেলেবেলার হৃদয়বেদনার প্রতিধ্বনি থাকায় গল্পটির মূল্য বাড়িয়াছে।

নিজের স্বার্থচিন্তায় অনুদাসীন অতিসাধারণ ব্যক্তির চরিত্রেও অসাধারণ দৃঢ়চিত্ততার এবং মহত্ত্বের স্ফুরণ হইতে পারে,—এমন এক নগণ্য ব্যক্তির কাহিনী লইয়া 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পটি রচিত। ইহাতে ব্যারিষ্টারের যে ক্ষণিক ব্যঙ্গচিত্র পাইতেছি তাহা চমৎকার। রামকানাইয়ের স্ত্রী বরদাসুন্দরী, পুত্র নবদ্বীপ ও তাহার মামাতো ভাইয়ের চিত্রও কঠোর ব্যঙ্গাত্মক। রচনারীতি বর্ণনাময় ও দ্রুতগতি। সম্ভবত দেনাপাওনার ঠিক পরে এই গল্প লেখা হইয়াছিল। ইহার কৌতুকমিশ্রিত কারুণ্যরস উপভোগ্য। পুত্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে আদালতে যথার্থ সাক্ষ্য দিয়া আসিয়া রামকানাই যে অভ্যর্থনা লাভ করিল তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মর্মস্পর্শী। "গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রামকানাইয়ের কঠিন জ্বর বিকার উপস্থিত হইল। প্রলাপে পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই নির্বোধ, সর্ব্বকর্ম-পণ্ডকারী নবদ্বীপের অনাবশ্যক বাপ পৃথিবী হইতে অপসারিত হইয়া গেল— আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ কহিল, 'আর কিছুদিন পূর্ব্বে গেলেই ভালো হইত' —কিন্তু তাহাদের নাম করিতে চাহি না।"

'ব্যবধান' গল্পে পোষ্টমাষ্টারের মত কাহিনী-অংশ যৎসামান্য। দূরসম্পর্কিত

দুই অসমবয়স্ক ভাইয়ের মধ্যে মামলামোকদ্দমা-সঞ্জাত জ্ঞাতিবিরোধের ফলে অদর্শনের প্রাচীর উঠিয়া তাহাঁদের স্নেহবন্ধনে অকস্মাৎ যে ছেদ টানিয়া দিয়াছিল তাহাই গল্পটির বিষয়। হিমাংশুর প্রতি বনমালীর যে ভালবাসা তাহা ভ্রাতৃস্নেহ হইলেও সখ্য নহে, তাহার মধ্যে পুত্রবাৎসল্যের রঙও আছে। বহুকাল পরে লেখা 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পের সঙ্গে এই গল্পটির ভাবের কিছু মিল দেখা যায়।

সাংসারিক বিষয়ে নিতান্ত জ্ঞানহীন অকর্ম্মা অধ্যয়নপরায়ণ পণ্ডিত স্বামীর প্রতি অসীম স্নেহশীল মুগ্ধ নারীর প্রেমবাৎসল্য 'তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি'-কে কৌতুকরসের তুচ্ছতা হইতে বাঁচাইয়া স্নিগ্ধ কারুণ্যে অভিষিক্ত করিয়াছে। কেবলি কন্যাপ্রসব করায় দাক্ষায়ণী মনে মনে নিজেকে তারাপ্রসন্নর কাছে নিতান্ত অপরাধী মনে করিত, সেইজন্য তারাপ্রসন্নর অক্ষমতা ও অপটুতা তাহাকে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ করিতে পারে নাই। পতির পাণ্ডিত্যের জন্য গর্ব্ববোধ তো ছিলই, তাহার উপর পুত্রসন্তান না থাকায় বাৎসল্যস্নেহও পতিপ্রেমের সহিত মিলিত হইয়া দাক্ষায়ণীর মনে তাহার স্বামীর সম্বন্ধে এক অপূর্ব্বরসের সঞ্চার করিয়াছিল। ব্যঙ্গমিশ্রিত কৌতুকরসের সহিত গভীরতর করুণরসের মিশ্রণ হওয়ায় গল্পটিতে প্রকৃত হিউমারের সৃষ্টি হইয়াছে। এইসময়ে রচিত অধিকাংশ গল্পের মত রচনাভঙ্গি বর্ণনাত্মক এবং দ্রুতগতি।

৬

১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে সাধনা পত্রিকা বাহির হইল। ইহার সাধারণত প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করিয়া রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্প প্রকাশিত হইতে থাকে। সাধনায় প্রকাশিত প্রথম গল্প হইতেছে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন'। গল্পের মূল পাত্র রাইচরণের মনোবৃত্তি কতকটা জটিল। মনিবের প্রতি স্নেহ ও কর্ত্তব্যজ্ঞান, নিজের পুত্রের প্রতি স্বাভাবিক বাৎসল্য এবং তাহাকে মনিবের পুত্রহানির কারণ কল্পনা করায় অযৌক্তিক বিদ্বেষ—এই সব বিপরীতমুখী ভাব একসঙ্গে জড়িত হইয়া পুত্রকে নিঃস্বত্বভাবে ত্যাগ করিতে তাহাকে প্ররোচনা

দিয়াছিল। রাইচরণের পুত্র ফেলনার চরিত্র স্বাভাবিক অথচ তীব্র ব্যঙ্গাত্মক। পুত্রের অজানিত হৃদয়হীন ব্যবহার রাইচরণের ট্রাজেডিকে মর্ম্মান্তিক করিয়াছে।

'সম্পত্তি সমর্পণ'[1] গল্পের বিষয় একটু নূতন ধরণের। এককালে আমাদের দেশে কৃপণ ব্যক্তি কচিৎ ভবিষ্যদ্বংশীয়ের জন্য সম্পত্তি "যখ" দিয়া রাখিত। এই নিতান্ত হৃদয়হীন নিষ্ঠুর প্রথা অবলম্বনে গল্পটি লেখা হইয়াছে। অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাসের ভয়ানকরস কাহিনীর পরিবেশকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমেরিকান লেখক পো-র The Cask of Amontillado গল্প এইসঙ্গে তুলনীয়।

সাধনার প্রকাশিত প্রথম দুইটি গল্প সন্তানস্নেহের ভাগ্যাহত পরিণাম দেখান হইয়াছে।

'কঙ্কাল'[2] গল্পে এক তরুণীর চিত্তে প্রেমের জাগরণ, প্রণয়ী কর্ত্তৃক সেই প্রেমের অমর্য্যাদা এবং তাহার নিদারুণ প্রতিফলের কাহিনী পাইতেছি। বাঙ্গালী ঘরের মেয়ের মুখে নিজের প্রণয়কাহিনী ব্যক্ত করা নিতান্ত অসঙ্গত শুনাইত, সেইজন্য গল্পটির বাস্তব উপক্রমণিকায় একটু অতিপ্রাকৃত গোছের পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। গল্পের মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গের সুর বিশেষ উপভোগ্য। এটুকু না থাকলে 'কঙ্কাল' সাধারণ প্রণয়কাহিনীর মত অনেকটা বর্ণহীন হইয়া পড়িত। কঙ্কালের নায়িকার মনোবৃত্তির সঙ্গে 'মানভঞ্জন' গল্পের গিরিবালার narcissism বা আত্মরতি মনোবৃত্তির কতকটা মিল আছে,—"আমি যখন চলিতাম, তখন আপনি বুঝিতে পারিতাম যে একখণ্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারিদিক হইতে যেমন আলো ঝক্‌মক্ করিয়া উঠে, আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে সৌন্দর্য্যের ভঙ্গী নানা স্বাভাবিক হিল্লোলে চারিদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দুখানি নিজে দেখিতাম—পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধত পৌরুষের মুখে রাশ লাগাইয়া মধুরভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে, এমন দুইখানি হাত।"

বৈরাগ্যবিহীন গৃহকর্ত্তব্যবিমুখ ফকিরচাঁদ লঘু আধ্যাত্মিকতার সাময়িক উত্তেজনায় পত্নী এবং গৃহ ত্যাগ করিয়া বিষম বিপদে পড়িয়া গেল। অপর এক স্ত্রী

[1] সাধনা পৌষ ১২৯৮। [2] ফাল্গুন ১২৯৮।

এবং গৃহ তাহাকে নিরুদ্দিষ্ট স্বামী বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল। অবশেষে নিজের স্ত্রী হৈমবতীর সাহায্যে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া ফকিরচাঁদ ঘরে ফিরিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এই ব্যঙ্গাত্মক কৌতুককাহিনী 'মুক্তির উপায়'[১] গল্পের বিষয়। ফকিরচাঁদের মনোভাব আমাদের দেশে একেবারেই বিরল নয়, ঘরের ঝঞ্ঝাট এড়াইবার জন্য সাময়িক সন্ন্যাসগ্রহণও এদেশে অসাধারণ নয়। গল্পটির রচনারীতি লঘু এবং কথ্যভাষাশ্রিত। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ গল্পটিকে নাট্যরূপ দিয়াছিলেন।

অচরিতার্থ প্রেমের বেদনা যে ব্যর্থজীবনেও পরম সান্ত্বনা যোগাইয়া শান্ত মহিমায় মণ্ডিত করিতে পারে তাহার অপূর্ব্ব কাহিনী 'একরাত্রি' গল্পে ব্যঙ্গ-হাস্য-কারুণ্যে উজ্জ্বলসমধুরভাবে ফুটিয়াছে। গল্পাংশে বাহুল্যবর্জ্জিত এই আত্মকাহিনীটি গীতিকবিতার মতই নিটোল এবং ভাবরসঘন। প্রথমযৌবনের উল্লাসগরিমায় মানুষ কত কল্পনাই করে। পরে সংসারে প্রবেশ করিলে তাহা প্রায় সবই মিলাইয়া যায় বুদ্বুদের মত। শুধু তাহাই নয়, যখন আর উপায় থাকে না তখনি সে বোঝে যে, কল্পনার ফানুষের লোভে হাতের কাছে যে শান্তিসুখের প্রদীপটি ছিল তাহা সে কোন্‌কালে না জানিয়া উপেক্ষা করিয়া গিয়া সারাজীবন তাহারি জন্য অন্ধকারে হাতড়াইয়া ফিরিতে হইয়াছে।

'জীবিত ও মৃত'[৩] গল্পের বিষয় কিছু অসাধারণ। মৃত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া শ্মশান হইতে গৃহে ফিরিলে কাহাকেও জীবিত বলিয়া গ্রহণ করা যে সাধারণ কুসংস্কারের পক্ষে কত কঠিন, এমন কি তাহার নিজের বোধের পক্ষেও কত শক্ত, তাহা এই গল্পটির করুণকঠোর কাহিনীতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভাসুরের শিশু-পুত্রের প্রতি সন্তানহারা বিধবা কাদম্বিনীর স্নেহ মাতৃবাৎসল্যের চেয়েও বেশি—"পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরো যেন বেশী হয়, কারণ, তাহার উপরে অধিকার থাকে না।" কাহিনীর মধ্যে ভীতিরসের আমেজে নূতনত্ব আছে। 'মহামায়া' গল্পের সহিত এই গল্পটির ক্ষীণ সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

'স্বর্ণমৃগ'[৪] গল্পের প্রধান পাত্র বৈদ্যনাথ সংসারের পক্ষে অকর্ম্মা, "কাজের মধ্যে

১ চৈত্র ১২৯৮। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯। ৩ শ্রাবণ ১২৯৯। ৪ ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯।

রবীন্দ্রনাথ (১৮৯২)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

[পৃ ২৭০

তিনি গাছের ডাল কাটিয়া বসিয়া বসিয়া বহুযত্নে ছড়ি তৈরি করিতেন। রাজ্যের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছড়ির জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন।" তাঁহার স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী ছিল গরীব ঘরের মেয়ে, কিন্তু সরিকদের শ্রীবৃদ্ধি এবং স্বামীর উদ্যোগহীনতা দেখিয়া তাহার অসন্তোষ ও বিরক্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এই সহানুভূতিহীন পত্নীর প্ররোচনায় বৈদ্যনাথ গুপ্তধনের অন্বেষণে তাহার সামান্য সম্বল খোয়াইয়া ফেলিল। একদিকে অকর্মণ্য অথচ শিল্পিপ্রাণ বৈদ্যনাথের জীবনের ট্রাজেডি, অপরপক্ষে প্রতিবেশীর সমৃদ্ধিদর্শনে ঈর্ষালু কঠোরীভূতচিত্তা মোক্ষদাসুন্দরীর অজ্ঞানিত নিষ্ঠুরতা—এই দুই মিলিয়া গল্পটিকে পরম বাস্তব এবং করুণ করিয়াছে। পত্নীর সুকঠিন হৃদয়হীনতার মাঝখানে বড় ছেলের পিতৃস্নেহের ইঙ্গিতটুকু একটি সকরুণ মাধুর্যের দীপ্তি দিয়াছে। 'তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি' গল্পের বিষয় অনেকটা এই গল্পের অনুরূপ। বৈদ্যনাথ তারাপ্রসন্নেরই জোড়া, মোক্ষদাসুন্দরী দাক্ষায়ণীর কতকটা বিপরীত চরিত্র। 'রাসমণির ছেলে' গল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যও স্ফুট; ভবানীচরণ বৈদ্যনাথজাতীয়ের এক সংস্করণ, রাসমণি মোক্ষদাসুন্দরীর মত আত্মত্যাগশীল এবং দাক্ষায়ণীর মত স্বামীবৎসল।

'জয় পরাজয়'[১] দুর্লভ প্রেমের করুণচিত্র। বিদ্যাপতি-লছিমা কাহিনী এবং কালিদাসের উপাখ্যান মিলাইয়া গল্পটির পরিবেশ কল্পিত হইয়াছে। তাহার সহিত কবির আত্মকথাও কিছু জড়াইয়া আছে; সাধারণ্যে রবীন্দ্রনাথ সমাদর অপেক্ষা উপেক্ষাই বেশি পাইয়া আসিয়াছিলেন,—এই বোধ এই গল্পের মধ্যে নিহিত আছে। অনেক পরবর্ত্তী কালে লিখিত 'বোষ্টমী' গল্প ছাড়া অন্য কোথাও রবীন্দ্রনাথ এতটা আত্মপ্রকাশ করেন নাই। কবি শেখরকে রবীন্দ্রনাথ নিজের ছাঁচে গড়িয়াছেন,—"তরুণ যুবক, রমণীর ন্যায় লজ্জা এবং স্নেহকোমল মুখ, পাণ্ডুবর্ণ কপোল, শরীরাংশ নিতান্ত স্বল্প, দেখিলে মনে হয় ভাবের স্পর্শ মাত্রেই সমস্ত দেহ যেন বীণার তারের মত কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিবে।"

'কাবুলিওয়ালা'[২] গল্পটিতে বাৎসল্যরসের মহাকাব্যের মহিমা আছে। বিশ্বের

[১] কার্ত্তিক ১২৯৯। [২] অগ্রহায়ণ ১২৯৯।

সর্ব্বত্র পিতৃহৃদয় হইতে যে একই স্নেহরস সমানভাবে নিঃসৃত হইয়া থাকে, কলিকাতার সুসভ্যসমাজেই হইক বা আফগানিস্থানের শিলাকঙ্করময় কুটীরেই হউক সকল পুত্রকন্যার পিতার মনের মধ্যে এক সনাতন পিতা বাস করিতেছেন —এই সত্য এমন সহৃদয় কবিদৃষ্টিতে এমন সহজভাবে এমন মধুর করিয়া আর কেহ বলিতে পারেন নাই। বর্ণনা অশেষ কবিত্বপূর্ণ এবং দীপ্তিমান্। কাহিনীটিকে সম্পূর্ণভাবে বাস্তব বলিয়া মনে করিতে ইচ্ছা হয়। সমসাময়িক 'যেতে নাহি দিব' কবিতা এই সঙ্গে তুলনীয়।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে শহরে পড়িতে আসিয়া পড়িল মাতুলের সংসারে। সহানুভূতিহীন মাতুলানীর নির্দ্দয় এবং অপমানজনক ব্যবহারে বালকের অভিমানী কোমল চিত্ত ব্যথাতুর হইয়া মাতৃক্রোড়ের জন্য উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল। অপেক্ষা ছুটির, কিন্তু বিদ্যালয়ের ছুটি হইবার পূর্ব্বেই সে মাতুলের স্নেহযত্ন উপেক্ষা করিয়া একেবারে ইহসংসার হইতে ছুটি পাইয়া গেল। ইহাই 'ছুটি'[১] গল্পের মর্ম্ম। স্নেহশীল স্বল্পভাষী মামা বিশ্বম্ভরের এবং অমর্ম্মজ্ঞ মূর্খ জননীর ছবি বিশেষ সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়াছে। পরের ছেলের ভার লইতে একান্ত অনিচ্ছুক স্বার্থপর মামীর ভূমিকা অত্যন্ত বাস্তব। ছিন্নপত্রে সঙ্কলিত একটি পত্রে ছুটি গল্পের বাস্তবভূমিকায় পরিচয় আছে।

আত্মীয়বোধ এবং ভালবাসার পরিমণ্ডল হইতে নিষ্ঠুরভাবে নির্ব্বাসিত এক মূক বালিকার অব্যক্ত অন্তর্বেদনা 'সুভা'[২] গল্পে একটি গীতিকবিতার রসরূপ গ্রহণ করিয়াছে। মূঢ় বাহিঃপ্রকৃতির চেতনা এবং মূক স্নেহশীল বালিকার মুগ্ধ আত্মবিস্তার পরস্পরের প্রতি সমবেদনার রসে একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে এই গল্পটিতে। "প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখীর ডাক, তরুর মর্ম্মর, সমস্ত মিলিয়া চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি ইহাও

১ পৌষ ১২৯৯। ২ মাঘ ১২৯৯।

বোবার ভাষা—বড় বড় চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার ; ঝিল্লী-রবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সঙ্গীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস।"

বিগত শতাব্দী অবধি প্রচলিত পুরাতন কৌলীন্য ও সহমরণ প্রথা অবলম্বনে 'মহামায়া'[১] প্রণয়কাহিনী কল্পিত হইয়াছে। গল্পাংশ যৎসামান্য, তাহারি মধ্যে মহামায়ার দৃঢ়চিত্ত. ও মৌনমহিমামণ্ডিত সৌন্দর্য্যের দীপ্তি পাঠকের মন অভিভূত করিয়া দেয়। 'উদ্ধার' গল্পের গৌরীর সহিত মহামায়ার চরিত্রের ঐক্য আছে। গল্পটির পরিবেশ বাস্তববৎ জীবন্ত এবং ভীষণ।

'দান প্রতিদান'[২] গল্পের বিষয় অত্যন্ত সাধারণ হইলেও বিশেষ চিত্তাকর্ষক। স্নেহসম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ রক্তসম্পর্কের অপেক্ষা না করিয়াই বাড়িয়া উঠে তাহার পরিচয় গল্পটিতে জাজ্জ্বল্যমান। পাত্রপাত্রীর চরিত্রচিত্রণ এবং psychosis বা মনোবৃত্তি অসাধারণ নৈপুণ্য ও সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। গল্পটির গঠনরীতিতে বৈশিষ্ট্য আছে। গল্পটির আকস্মিক আরম্ভ—"বড় গিন্নি যে কথাগুলো বলিয়া গেলেন, তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেম্নি।"—বাঙ্গালা গল্প-উপন্যাসের টেকনিকে নূতনত্ব প্রবর্ত্তন করিল।

পিতার প্রতি মাতৃহীন শিশুকন্যার স্নেহ ও বাৎসল্য রসের অপূর্ব্ব মিশ্রণে 'সম্পাদক'[৩] গল্পটি সবিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছে। 'দুর্ব্বুদ্ধি' গল্প ইহার সহিত তুলনীয়।

ব্যক্তিমানসের বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া 'মধ্যবর্ত্তিনী'[৪] গল্পটি বিশেষ মূল্যবান্। নিঃসন্তান হরসুন্দরী কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া জীবনরস যেন নূতন করিয়া অনুভব করিতে লাগিল। যে-স্বামী পুরাতন তৈজসের মত চিরাভ্যস্ত ছিল, অসুখের সময় তাহার চিন্তা ও ব্যস্ততা দেখিয়া তাহাকে যেন নূতন করিয়া ভালবাসিল। এই উচ্ছ্বসিত-জীবনরসজনিত কৃতজ্ঞতায় হরসুন্দরী তাহার স্বামী নিবারণকে আবার বিবাহ করিতে ধরিয়া বসিল। "হরসুন্দরী কিছুদিন হইতে এই কথা ভাবিতেছিল। মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ একটা বৃহৎ

[১] ফাল্গুন ১২৯৯। [২] চৈত্র ১২৯৯। [৩] বৈশাখ ১৩০০। [৪] জ্যৈষ্ঠ ১৩০০।

১৮

প্রেমের সঞ্চার হয় তখন মানুষ মনে করে আমি সব করিতে পারি। তখন হঠাৎ একটা আত্মবিসর্জ্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। স্রোতের উচ্ছ্বাস যেমন কঠিন তটের উপর আপনাকে সবেগে মূর্চ্ছিত করে, তেমনি প্রেমের আবেগে, আনন্দের উচ্ছ্বাস একটা মহৎ ত্যাগ, একটা বৃহৎ দুঃখের উপর যেন নিক্ষেপ করিতে চাহে।" ভালমানুষ নিবারণ বালিকা শৈলবালাকে বিবাহ করিয়া আনিলে হরসুন্দরী স্বামী ও সপত্নীকে লইয়া পুতুল খেলা জুড়িয়া দিল। কিন্তু নারীর নবযৌবনের প্রতিপুরুষের একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে, বিশেষ করিয়া যে পুরুষের মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সঞ্চার হয় নাই। অচিরে যখন শৈলবালার সাহায্য নিবারণের কাছে নেশার মত হইয়া দাঁড়াইল তখন হরসুন্দরীর মনে প্রথম আঘাত লাগিল। যাহা স্বেচ্ছায় দান করিয়াছে তাহা ভিক্ষা করিয়া লইবার মত কৃপণতা হরসুন্দরীর ছিল না, তাই মনকে নিগৃহীত করিয়া হরসুন্দরী "নিবারণ ও শৈলবালাকে আপন শয়নগৃহ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন গৃহে একাকিনী গিয়া শয়ন করিল," এবং সপত্নীর মনোভাব বুঝিয়া তাহাকে নিজের সমস্ত গহনা দিয়া দিল। অকালপ্রেমের বন্যায় নিবারণ একেবারে ভাসিয়া গেল, আপিসের কাজে ঘাটতি পড়িতে লাগিল, শেষে চাকরি বজায় রাখা ভার হইল। যখন আপিসের দেনা শুধিবার জন্য গহনার আবশ্যক হইল তখন কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও তাহা শৈলবালার নিকট হইতে আদায় করা গেল না। শৈলবালারই বা দোষ কি? নিবারণের অকাল-উচ্ছ্বসিত প্রেম তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাকে আত্মস্থ থাকিয়া ভালবাসিতে এবং ভালবাসার জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে শিখায় নাই, তাহাকে করিয়াছে একান্ত স্বার্থপর। নিবারণ বাড়ি বেচিয়া নিঃস্ব হইলে হরসুন্দরীর সমস্ত অনুকম্পা তাহার ও শৈলবালার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও শৈলবালার মনে কোন দাগ পড়িল না, তাহার অসন্তুষ্ট মন ধূমায়িত হইতে লাগিল, তাহার দেহও ভাঙ্গিয়া পড়িল। শৈলবালার মৃত্যুতে নিবারণ শোক পাইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মোহপাশ হইতে একটা মুক্তির আনন্দও তাহার মনে উঁকি দিতে লাগিল। চিত্তপট হইতে শৈলবালা-রূপ যবনিকা সরিয়া গেলে নিবারণ দেখিল, "তাহার চিরজীবনের সঙ্গিনী হরসুন্দরী…তাহার সমস্ত সংসার একাকিনী

অধিকার করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের স্মৃতিমন্দিরের মাঝখানে বসিয়া আছে”। আগেকার দিনের মত বহুকাল পরে পতিপত্নীর মিলন হইল, কিন্তু সে মিলনের মাঝখানে শৈলবালার স্মৃতি সূক্ষ্ম কণ্টকের মত অস্বস্তি জাগাইয়া রহিল; “উহারা পূর্ব্বে যেমন পাশাপাশি শয়ন করিত এখনো সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।”

বঙ্কিমচন্দ্র যদি রবীন্দ্রনাথ হইতেন তবে বোধহয় 'বিষবৃক্ষ' 'মধ্যবর্ত্তিনী'-রূপ ধারণ করিত।

'অসম্ভব গল্প'[১] একটি প্রচলিত ছেলে-ভুলানো গল্পের রূপান্তর মাত্র। গল্পটির উপসংহার চমৎকার। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনীর খানিকটা এই গল্পের উপক্রমণিকায় পাই।

সাহিত্যে বাস্তবতা বলিলে সচরাচর যাহা বোঝায় তাহাতে 'শাস্তি'[২] গল্পের স্থান এবং মূল্য বাঙ্গালা সাহিত্যে অসামান্য। ঘটনাচক্রে কাহিনীর যে পরিণতি দেখানো হইয়াছে তাহাতে কঠোর ব্যঙ্গ তীব্রভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তরুণী চন্দরার চরিত্র সৃজনের নিপুণতা অসাধারণ। বয়সে তরুণী হইলেও চন্দরা অন্তরে একরকম বালিকাই; কৈশোরসুলভ কৌতুকপ্রিয়তা, উচ্ছ্বসিত প্রাণপ্রাচুর্য্য ও স্বামীর প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা একত্র বিজড়িত হইয়া চন্দরাকে চিরকালের কিশোরীর প্রতিনিধি করিয়াছে। অদৃষ্টের পাকে তাহাকে যে-অবস্থায় পড়িতে হইল তাহাতে তাহার তারুণ্য তাহার স্বামীর এবং জগতের উপর তাহার নিদারুণ অভিমান আনিয়া দিল, কেবল তাহার অচিরগত শৈশবের স্মৃতি তাহার মাতাকে আঁকড়াইয়া ধরিল।

> জেলখানায় ফাঁসির পূর্ব্বে দয়ালু সিভিল সার্জ্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?”
>
> চন্দরা কহিল, “একবার আমার মাকে দেখতে চাই।”

[১] আষাঢ় ১৩০০; পরে 'অসম্ভব গল্প' নামকরণ হইয়াছে। গল্পটি প্রথমে গল্পগুচ্ছে সঙ্কলিত হয় নাই। [২] শ্রাবণ ১৩০০।

ডাক্তার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব ?"

চন্দরা কহিল, "মরণ !—"

নারীচরিত্রের মৌলিক একগুঁয়েমির ও দুর্জ্ঞেয়তার কি অপূর্ব্ব রসোজ্জ্বল চিত্র।

মাতৃহীন বালিকা পাড়াগাঁয়ে বালকের সঙ্গে ফিরিয়া দুষ্ট ছেলের মত চাপল্য ও দৌরাত্ম্য করিয়া স্বজন-প্রতিবেশী এমন কি অভ্যাগতকেও তিক্ত বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে ; তাহার শিশুমনে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে মুগ্ধ স্বামীর স্নেহদৃষ্টির ও সহৃদয়তার উত্তাপ তারুণ্যশ্রী ও প্রেম সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে রাতারাতি নারীত্বে পত্নীত্বে উন্নীত করিয়া দিল তাহাই 'সমাপ্তি'[১] গল্পের বিষয়। আমেরিকান লেখক ব্রেট হার্টের Mliss গল্পের ম্লিস্ ভূমিকার সঙ্গে এই গল্পের মৃণ্ময়ী ভূমিকার সাধর্ম্ম্য আছে। মৃণ্ময়ীর পিতা ঈশানের চকিত চিত্রে কন্যাবাৎসল্য যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। মৃণ্ময়ীর মন যখন কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করিতেছে না তখন অপূর্ব্বর সহানুভূতি তাহার অন্তরের এমন একটি তারে ঘা দিল যাহা মৃণ্ময়ীর মনে অপূর্ব্বর প্রতি কৃতজ্ঞতার সঞ্চার করিয়া ভবিষ্যৎপ্রেমের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিল।

তাহার পরদিন গভীর রাত্রে অপূর্ব্ব মৃণ্ময়ীকে ধীরে ধীরে জাগরিত করিয়া কহিল, "মৃণ্ময়ী, তোমায় বাবার কাছে যাবে ?"

মৃণ্ময়ী সবেগে অপূর্ব্বর হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল, "যাব"।...

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পৌছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা-কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোট ডেস্কের উপর একখানি চামড়ার বাঁধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃণ্ময়ী ডাকিল, "বাবা!" সে ঘরে এমন কণ্ঠধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই !

আধুনিক কালের "শিক্ষিত" পুত্রের দৃষ্টিতে সেকেলে "অশিক্ষিত" পিতার

[১] আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০০।

নৈতিকচরিত্র অবজ্ঞেয় হইতে পারে, কিন্তু দৃঢ়চিত্ততায় হৃদয়বত্তায় এবং প্রকৃত ধার্ম্মিকতায় সেকেলে পিতা একেলে নীতিবাগীশ পুত্রের অনেক উর্দ্ধে—ইহাই 'সমস্যাপূরণ'[১] গল্পের মর্ম্ম। বৃদ্ধ কৃষ্ণগোপাল স্নিগ্ধশান্ত সৎচরিত্র,—"খালি পা, গায়ে একখানি নামাবলী, হাতে হরিনামের মালা, কৃশ শরীরটি যেন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়! ললাট হইতে একটি শান্ত করুণা বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে।" অছিমদ্দিনের চরিত্র নিতান্ত স্বাভাবিক। মির্জ্জা বিবির ক্ষণিক দর্শনটুকু কাহিনীর মধ্যে একটু বিশেষ মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বিপিনবিহারীর চরিত্রে ব্যঙ্গের রেশ নিরতিশয় উপভোগ্য।

কৃষ্ণগোপাল যখন বিপিনকে বলিয়া গেল যে অছিমদ্দিন তাহার ভাই হয়, তখন "বিপিন কি বলিবে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু এটুকু তাহার মনে উদয় হইল, সেকালের ধর্ম্মনিষ্ঠা এইরূপ বটে! শিক্ষা এবং চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপল্ না থাকার এই ফল!" রামতারণ উকীলের ক্ষণিক চিত্র উজ্জ্বল হইয়াছে উপসংহারের শেষ কয় ছত্রে।

রামতারণ উকীলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন—সে বরাবরই সন্দেহ করিত কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে, ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। যিনি যত মালা জপুন পৃথিবীতে আমার মতই সব বেটা! সংসারে সাধু অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট এবং অসাধুরা অকপট! যাহা হউক কৃষ্ণগোপালের জগদ্বিখ্যাত দয়াধর্ম্মমহত্ত্ব সমস্তই যে কাপট্য ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা দুর্ব্বোধ সমস্যার পূরণ হইল এবং কি যুক্তি অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন স্কন্ধ হইতে লঘু হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল।

কর্ত্তব্যসম্পাদনে কঠোরহৃদয় নিঃসন্তান নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণবিধবাও যে ঘৃণ্য জীবের প্রতি কারুণ্যের বশবর্ত্তী হইয়া দেবায়তনের শুচিতা এবং পল্লীসমাজের

১ অগ্রহায়ণ ১৩০০।

জনমত উপেক্ষা করিবার মত আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক বল দেখাইতে পারে, ইহাই 'অনধিকার প্রবেশ'[১] গল্পের বিষয়।, চরিত্রাঙ্কণে এবং সরসতায় গল্পটি উঁচুদরের।

'মেঘ ও রৌদ্র'[২] গল্পের পরিসর সাধারণ ছোট-গল্পের চেয়ে বড়, সেইহেতু এটিকে বড়-গল্প বলা যাইতে পারে। কিন্তু সমগ্র গল্পটির মধ্যে গীতিকবিতার মত একটি ভাবঘন অখণ্ডতা আছে। শশিভূষণের চরিত্রাঙ্কণ সুনিপুণ। মুখচোরা ভাল-মানুষ ব্যক্তি যেমন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব ধরিয়া থাকিতে পারে, এমন তথাকথিত জবরদস্ত লোকেরাও পারে না,—এই সত্য শশিভূষণের ব্যবহারে পরিস্ফুট হইয়াছে। গিরিবালার ভূমিকা বাস্তব ও মধুর; "গ্রামের পথে একটি ডুরে-কাপড় পরা বালিকা আঁচলে গুটিকতক জাম লইয়া একে একে নিঃশেষ করিতে করিতে" পাঠকের সামনে প্রথম দেখা দিয়াই একেবারে অন্তর অধিকার করিয়া লয়। বাঙ্গালাদেশে "স্বদেশী" বা "জাতীয়" আন্দোলনের কথা সাহিত্যে প্রকাশ এই গল্পে প্রথম পাইলাম। পরবর্ত্তী কালে রচিত একটি উপন্যাসে শশিভূষণ ভূমিকার রূপান্তর বা পরিণমন দেখিতে পাই; গোরা যেন কতকটা শশিভূষণেরই ভাবোন্নয়ন।

অসুন্দরী, মুগ্ধ, স্বামিসর্ব্বস্ব পত্নীর এবং সেই পত্নীর ধনী পিতা ও পরিজনের প্রতি যোগ্যতাহীন অকর্ম্মণ্য বৃথাগর্ব্বিত আত্মসর্ব্বস্ব এক যুবকের হৃদয়হীন ব্যবহার 'প্রায়শ্চিত্ত'[৩] গল্পের বিষয়। অশিক্ষিত এবং স্বামিগতপ্রাণ হইলেও বিন্ধ্যবাসিনীর চরিত্রের দৃঢ়তা এবং মর্য্যাদাবোধ তাহার স্বামী অনাথবন্ধুর আত্ম-সম্মানজ্ঞানহীনতার এবং লঘুচিত্ততার ঊর্দ্ধে উঠিয়া রসঘনতা রক্ষা করিয়াছে। শেষের অত্যন্ত অতর্কিত ক্লাইমাক্স্ বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

সংসারজ্ঞানহীন অপরিপক্কবুদ্ধি বিধবা বালিকাকে এক রূপমুগ্ধ যুবক কিরূপে লালসায় বন্ধন করিয়া তাহাকে নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া গেল, এবং সেখানে সেই তরুণী ধাপের পর ধাপ নামিয়া অবশেষে উদরান্নের দায়ে স্নেহের একমাত্র অবলম্বন সন্তান সহিত আত্মহত্যা করিতে গিয়া অদৃষ্টচক্রে যে-বিচারকের কাছে আনীত

[১] শ্রাবণ ১৩০১। [২] আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০১। [৩] অগ্রহায়ণ ১৩০১।

হইল সে তাহারি সর্ব্বনাশের মূল, তাহার প্রথম এবং একমাত্র প্রণয়ের আস্পদ,—এই হৃদয়হীন মর্ম্মন্তুদ কাহিনী 'বিচারক'[১] গল্পে অসামান্য বাস্তবতা এবং অপরিসীম সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। পতিতা রমণীর এমন করুণরসোজ্জ্বল চিত্রে বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত। নারীত্বের অবমাননা করিয়া যাহারা সমাজে পতিত হইয়াছে তাহারা দোষের ভাগী নয়, যাহারা জানিয়া শুনিয়া অপরিণতবুদ্ধি জ্ঞানহীন তরুণীকে দুদিনের খেলার সামগ্রী করিয়া চিরদিনের জন্য ধূলায় লুটাইয়া দেয় তাহারাই সম্পূর্ণ পাপী। আবার তাহারাই বিচারক রূপে নিরপরাধ অবলার দণ্ডবিধান করিয়া থাকে। প্রকৃত প্রেমের আবির্ভাব হয় বাৎসল্যবৃত্তির জাগরণের পর,—নারীচিত্তের এই গূঢ় তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ অনেক গল্পে উপন্যাসে পাওয়া যায়। বিচারক গল্পেও ক্ষীরোদার মুক্তির উপায় তাহার সন্তানবাৎসল্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-উচিত সত্যদৃষ্টির সহানুভূতিতে ক্ষীরোদাকে ক্ষমা করিয়াছেন, এমন কি মহৎও করিয়াছেন, এবং তাঁহার পুরুষোচিত তথ্যদৃষ্টিতে মোহিতমোহনকে একেবারেই ক্ষমা করিতে পারেন নাই। ব্যঙ্গের কষায় জর্জ্জরিত করিয়া শেষে তাহার উপর শুধু একটু অনুকম্পা করিয়াছেন,—"মোহিত আর একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।"

আত্মাপরাধবোধের উপর তীব্র মানসিক আঘাতের ফলে উৎপন্ন স্নায়বিক বিকার লইয়া অতিপ্রাকৃত পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হইয়াছে 'নিশীথে'[২] গল্পে। অনুরাগ সত্ত্বেও রুগ্ণ স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিতে এবং খাঁটি থাকিতে না পারায়, এমন কি পত্নীহত্যায় প্রকারান্তরে লিপ্ত থাকায় দক্ষিণাচরণ বাবুর মস্তিষ্কে যে আঘাত লাগিয়াছিল সেই মনোবিকারের বাহ্য প্রতিক্রিয়া গল্পটিতে অপূর্ব্ব নৈপুণ্যে এবং গভীরদৃষ্টিতে বিবৃত হইয়াছে। গল্পটির অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে মানসিক বিকারজাত হইলেও ইহা এমন তীব্র ও স্পষ্ট যে দক্ষিণাচরণ বাবুর দ্বিতীয় পত্নীর মত পাঠকও কতকটা অভিভূত হইয়া পড়ে।

[১] পৌষ ১৩০১। [২] মাঘ ১৩০১।

ভালবাসা যতই থাকুক রুগ্ণ পত্নীর পরিচর্য্যায় পুরুষ বেশিদিন অক্লান্ত থাকিতে পারে না. নারীর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণু প্রেম তাহার ধাতে আসে না,—এই কথাটি এই গল্পে এবং 'দৃষ্টিদান'-এ ব্যক্ত হইয়াছে।

যাত্রার দলের অকালপক্ক অথচ বয়সের তুলনায় বুদ্ধিহীন এক কিশোরবয়স্ক বালক নারীহৃদয়ের সস্নেহ পরিচর্য্যায় কেমন করিয়া স্বাভাবিক ভগিনীপ্রীতির ও মাতৃস্নেহের পরিচয় লাভ করিয়া যথার্থ জীবনে জাগরণ লাভ করিল এবং বয়সোচিত ঈর্ষ্যা-অভিমানের বশে ও ভুল বোঝায় এবং কতকটা অপরের সহানুভূতিহীনতায় স্নেহনীড়চ্যুত হইয়া সংসারারণ্যে কোথায় ভাসিয়া গেল,—ইহাই 'আপদ'[১] গল্পের কাহিনী। নিরুদ্ধ-যৌবনোন্মেষ মনোবৃত্তি (psychosis of retarded adolescence) গল্পটিতে বিশেষ দক্ষতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

নীলকান্তর প্রতি কিরণের সহানুভূতি এবং সকরুণ স্নেহ গল্পটিকে আগাগোড়া অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যবর্ত্তিনী গল্পের হরসুন্দরীর মত কিরণও সদ্য রোগশয্যা হইতে উঠিয়াছে, তাই তাহার স্বাভাবিক স্নেহশীলতা এমন বাড়িয়া গিয়াছে যে সে স্নেহাস্পদের জন্য স্বামীর ও পরিবারবর্গের বিরক্তি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছে। নিজের বয়ঃ-উন্মেষের বিচিত্র মনোভাব নীলকান্ত সম্পূর্ণভাবে ও স্পষ্ট করিয়া না বুঝিলেও কিরণের কাছে তাহা একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। নীলকান্তর প্রতি তাহার স্নেহ কঠিন আঘাতেও অনায়াসে বাঁচিয়া গিয়াছে এবং সহানুভূতিহীন চোখের সামনে নীলকান্তর লজ্জা রক্ষা করিয়াছে।

'অতিথি' গল্পের তারাপদর সঙ্গে নীলকান্তর চরিত্রের সাদৃশ্য ও পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

স্বার্থান্ধ কুটিল নিষ্ঠুর স্বামীর ক্রুর চক্রান্ত হইতে পুত্রস্নেহভাগী শিশু ভ্রাতাকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ষীয়সী ভগিনী কর্ত্তব্যজ্ঞানে স্বামীর আশ্রয়ে থাকিয়া নিঃশব্দে কঠিন নির্যাতন ভোগ করিয়া অবশেষে মৃত্যুবরণ করিল—ইহাই 'দিদি'[২] গল্পের করুণ কাহিনী। নীলমণি শশীর ভাই হইলেও তাহার প্রতি যে স্নেহ তাহা একরকম পুত্রবাৎসল্যই। এই স্নেহের জোরে গৃহস্থবধূ শশী প্রবল স্বামীর

১ ফাল্গুন ১৩০১। ২ চৈত্র ১৩০১।

সমস্ত নির্ষাতন উপেক্ষা করিয়া তাহার নিষ্ঠুর গ্রাস হইতে স্নেহের ধন নীলমণিকে তাহারি কল্যাণের জন্ম নিজের বক্ষ হইয়া ছিনিয়া লইয়া বিদেশী রাজকর্ম্মচারীর হস্তে অনায়াসে তুলিয়া দিল। গল্পটির সংযত উপসংহারে মূক ও উপায়হীন' নারীহৃদয়ের সুগভীর ব্যথা উদ্বেলিত হইয়াছে অশ্রুহীন মর্ম্মবেদনায়।

শশীর স্বামী জয়গোপালের সঙ্গে পরবর্ত্তী কালে লেখা 'সৎপাত্র' গল্পের সাধুচরণের তুলনা চলে।

থিয়েটারের অভিনেত্রীদের মোহপাশে আবদ্ধ মূর্খ স্বামীর অনাদরেব জন্ম আত্মরত সুন্দরী তরুণী রঙ্গমঞ্চের দীপ্তির ও অভিনেত্রীদের প্রতি বর্ষিত আদর ও করতালিধ্বনির মোহে পড়িয়া গৃহত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ রঙ্গমঞ্চের রাণী হইয়া দর্শকদের হৃদয় লুট করিয়া লইল, কেবল তাহার স্বামী সেই উৎসব হইতে বঞ্চিত হইল,—এই কাহিনী 'মানভঞ্জন'[১] গল্পের বিষয়। গিরিবালা ও তাহার স্বামী গোপীনাথ উভয়েরই মনোবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যাহাকে Narcissus complex বা আত্মরতি প্রবৃত্তি বলে গিরিবালার মনোবৃত্তি সেই রকমই। "আপন সর্ব্বাঙ্গের এই উচ্ছলিত মদিররসে গিরিবালার একটা নেশা লাগিয়াছে। প্রায় দেখা যাইত, একখানি কোমল রঙীন্ বস্ত্রে আপনার পরিপূর্ণ দেহখানি জড়াইয়া সে ছাদের উপরে অকারণে চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে।" এই মনোভাব লইয়া গিরিবালা যখন লুকাইয়া প্রথম রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতে গেল তখন তাহার মনে হইল এই তো প্রার্থিত আনন্দলোকে আসিয়া পড়িয়াছে। নটীদের নৃত্য এবং দর্শকদের করতালি ও প্রশংসাবাদে গিরিবালাও অন্তরে উন্মাদনা অনুভব করিতে লাগিল। "সেই সঙ্গীতের তানে, আলোক ও আভরণের ছটায়, এবং সম্মিলিত প্রশংসাধ্বনিতে সে ক্ষণকালের জন্ম সমাজ সংসার সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেল—মনে করিল, এমন এক জায়গায় আসিয়াছে যেখানে বন্ধনমুক্ত সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্বাধীনতার কোনো বাধামাত্র নাই।"

ব্যঙ্গ-উপহাসের মধ্য দিয়া প্রবহমান একটি অলক্ষ্য বেদনাস্রোত 'ঠাকুর্দ্দা'[২] গল্পটিকে কারুণ্যস্নিগ্ধ উজ্জ্বল রূপ দিয়াছে। অতীত গৌরব লইয়া প্রমত্ত, দারিদ্র্য-

[১] বৈশাখ ১৩০২। [২] জ্যৈষ্ঠ ১৩০২।

দশাগ্রস্ত, প্রতিবেশীদের ব্যূহ সহানুভূতির এবং আন্তর উপহাসের পাত্র, এক নাতিনী মাত্র সম্বল বৃদ্ধের সজ্ঞান আত্মপ্রবঞ্চনার করুণ এবং মহৎ কাহিনী ইহার বিষয়। গল্পটির গঠননৈপুণ্য এমন অসাধারণ যে নয়নজোড়ের চৌধুরী বংশের একমাত্র বংশধর, সকলের "ঠাকুর্দ্দা", বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্র যে snob নয়, তাহার অতীত-গৌরবের প্রত্যক্ষবৎ আলোচনা ও তদনুযায়ী ব্যবহার যে ভণ্ডামি বা পাগলামি নয়, তাহা যে পূর্ব্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নিজের অতিরিক্ত স্পর্শকাতর মনের আত্মসম্মান রক্ষার কবচমাত্র তাহা গল্পের উপসংহারের পূর্ব্ব অবধি বোঝা যায় না। যাহা প্রার্থনার অতিরিক্ত এমন সৌভাগ্যলাভ করিবামাত্র ঠাকুর্দ্দা ভড়ঙের ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিয়া নিজের দৈন্য অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ এতটুকুও বিলম্ব করিলেন না। নাতনী কুসুম তাহার ঠাকুরদাদার ঠিক বিপরীত। গল্পে সে ঠাকুর্দ্দার অতিরঞ্জনের ভারসাম্য করিয়াছে। বংশকাহিনীর সাড়ম্বর বর্ণনায় তাহার কোনই আস্থা ছিল না তবুও মা যেমন ছেলের সকল কথায় সায় দিয়া তাহাকে ভুলায় কুসুমও তেমনি বৃদ্ধের সকল কথায় পোষকতা করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিত। "বৃদ্ধ অভিভাবকের প্রতি মাতৃহৃদয়া এই ক্ষুদ্র বালিকা"-ই বৃদ্ধের সর্ব্বস্ব, তাহারি সৎপাত্রের কামনায় ঠাকুর্দ্দা অতীতের জীর্ণ গৌরব গায়ে জড়াইয়া চারিদিকের স্মিতমুখ বর্ত্তমানকে পাশ কাটাইতে চেষ্টা করিতেন। হিউমারের অন্তরালে লুকানো এমন কারুণ্যের তুলনা নাই। কেবল ও-হেন্‌রির Duplicity of Hargraves গল্পের সঙ্গে এটির তুলনা চলে।

'প্রতিহিংসা'-র[১] নায়িকা ইন্দ্রাণী অপরূপ রূপসী, সন্তানহীনা। তাহার পিতামহের স্মৃতি, তাহার স্বামী, এবং তাহার পিতামহপ্রদত্ত ও স্বামি-উপহৃত গহনাগুলি তাহার ভালবাসার অবলম্বন। সে উচ্চতর প্রতিহিংসার বশে নিজ প্রাণপ্রিয় অলঙ্কারগুলির বদলে জমিদারদের মূল্যবান্ সম্পত্তি—যাহা তাহারি পিতামহ কিনিয়া দিয়াছিলেন—তাহা উদ্ধার করিয়া প্রভুবংশকে দান করিল। সন্তানহীনা রমণীর কাছে তাহার অলঙ্কার সন্তানতুল্য, এমন কি তাহার অপেক্ষাও প্রিয়তর। এত বড় মহৎ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে মানুষ তখনি, যখন কোন

১ আষাঢ় ১৩০২।

বৃহত্তর ভালবাসার আশ্বাস ও নির্ভয়ের পরিচয় পাইয়াছে। স্বামীর মহত্ত্ব এবং পিতামহের স্নেহের স্মৃতি ইন্দ্রাণীকে এই মহৎত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। "বিরল-শুভ্রকেশধারী, শান্তস্নেহহাস্যময়, ধীপ্রদীপ্ত, উজ্জ্বলগৌরকান্তি" বৃদ্ধ দেওয়ানের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প কথায় জীবন্ত করিয়া পাঠকের চোখের সামনে ধরিয়াছেন। 'মণিহারা' গল্পের মণিমালিকা ইন্দ্রাণীর বিপরীত চরিত্র। মণিমলিকার স্নেহ কাহাকেও আশ্রয় করিয়া উদ্‌গত হইতে পারে নাই, তাই সে মৃত্যু বরণ করিল তবু গহনার মায়া ছাড়িতে পারিল না।

'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর[১] অতিপ্রাকৃত পরিবেশ একান্তভাবে চিত্তবিকারজনিত নয়। অতীত মুসলমান-রাজত্বের ভোগবিলাসপূর্ণ এক প্রাসাদের রুদ্ধদ্বারগবাক্ষ অন্তঃপুরের কক্ষে কক্ষে একদা যে অতৃপ্তির দাহ, যে তীব্র ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা, যে পৈশাচিক প্রতিহিংসা দিনের পর দিন অভিনীত হইয়াছিল তাহাই যেন স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করিয়া অতিলৌকিক অথচ অনুভবগ্রাহ্য প্রাণস্পন্দনময় বাতাবরণের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হইয়া উঠিত। এই পুরাতন প্রাসাদের অন্তঃপুরে বাসনাজালে বদ্ধ দেহহীন লালসাময় রূপসীদের অদৃশ্য অজ্ঞাত প্রভাবের বশে যে সেখানে একাধিক রাত্রিযাপন করিয়াছে তাহার শরীর-মন অল্পে অল্পে সেই প্রাসাদের মোহপাশে জড়িত হইয়া অবশেষে জীবন অথবা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। গল্পের পাত্র—যিনি গল্পটি বলিতেছেন—তাঁহার মন তো পূর্ব্ব হইতেই প্রাসাদে সেকালের রূপ-ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর কল্পনা করিয়া পুলকিত হইয়াছিল, এখন ভয়ে ভয়ে দুইচারি রাত্রি কাটাইবার পরই তিনি অতিপ্রাকৃতের জালে ধীরে ধীরে জড়াইতে পড়িতে লাগিলেন। "কিন্তু সপ্তাহখানেক না যাইতেই বাড়িটার এক অপূর্ব্ব নেশা আমাকে ক্রমশ আক্রমণ করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানো শক্ত। সমস্ত বাড়িটা একটা সজীব পদার্থের মত আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহ-রসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।"

পরিবেশের বাস্তবতায় এবং বাতাবরণের স্পর্শগ্রাহ্যতায় ক্ষুধিত-পাষাণ গো

১ শ্রাবণ ১৩০২।

(Poe)-র গল্পের চেয়ে কোন অংশে হীন নয়। অধিকন্তু কাব্যরসপূর্ণ। সাধারণ কথায় যাহাকে "ভূতের গল্প" বলে সেই হিসাবেও গল্পটি অতিশয় মূল্যবান্। ভয়ানকরসের তীব্রতায় এবং বৈজ্ঞানিকবিচারে ইংরেজ লেখক অ্যাল্‌গারনন ব্ল্যাক্‌উডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প The Black Mass-এর সঙ্গে এই গল্পটির ভাবের মিল আছে। গল্পটি যদি শুধু ভূতের গল্প রূপে উপস্থাপিত হইত তাহা হইলে ভয়ানকরসের আধিক্যে কাব্যরসে প্রলেপ সত্ত্বেও সাহিত্যশিল্পের বিচারে হয়ত মূল্য কিছু কম হইত। রবীন্দ্রনাথ তাই এটিকে ভূতের গল্প করিয়াই ছাড়িয়া দেন নাই। গল্পটি এমন লোকের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যাহার কথাবার্তা এত বিচিত্র যে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও যায় না, সত্য বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করাও শক্ত ; "পৃথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলোপ করিতে লাগিলেন যেন তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন।...আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, সুতরাং লোকটির রকমসকম দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। লোকটা সামান্য উপলক্ষ্যে কখনো বিজ্ঞান বলে, কখনো বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনো পার্সি বয়েৎ আওড়াইতে থাকে ; বিজ্ঞান, বেদ এবং পার্সি ভাষায় আমাদের কোনোরূপ অধিকার না থাকাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।"

এ তো গেল পাঠকদের জন্য সাফাই। গল্পটিকে যদি সত্য বলিয়াই নেওয়া যায়, তাহা হইলে কি উপায় ? এই সমস্যা কঠিনতর। ইহার জন্য পাগলা মেহের আলির অবতারণা হইয়াছে। পুরাতন প্রাসাদের নির্জন ভীষণ রমণীয়তা, সুলতান-অন্তঃপুরের অতীত গরিমার কল্পনা, তাহার সহিত উন্মাদ মেহের আলির ব্যবহার—এই তিন মিলিয়া বক্তার মনকে অতিপ্রাকৃত পরিবেশের প্রতি অনুকূল করিয়াছিল। সুতরাং এখানে ক্লান্ত অথবা অসুস্থ মস্তিষ্কের কল্পনা অথবা ভীতিজনিত অর্দ্ধজাগর স্বপ্ন—এইরূপ ব্যাখার অবসর যে একেবারে নাই, এমন কথাও বলা যায় না। এই সংশয়দোলা গল্পটির ভীষণরমণীয় মাধুর্য্যের উপর নিখুঁত শিল্পনৈপুণ্যের ঔজ্জ্বল্য অর্পণ করিয়াছে।

ক্ষুধিত-পাষাণ হইতে রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পের আকার গেল বাড়িয়া।

'অতিথি'[১] গল্পটি এক আজন্ম-পথিক উদাসীন কিশোরচিত্তের সর্ব্ববিধ স্নেহ-বন্ধনের প্রতি একান্ত নিরাসক্তির এপিক্ কাহিনী। "তারাপদ "ছেলেটি সম্পূর্ণ নূতনতর। বহুসন্তানের ঘরেও তারাপদ অত্যন্ত আদরের ছিল; মা ভাই বোন এবং পাড়ার সকলের নিকট হইতে সে অজস্র স্নেহলাভ করিত। এমন কি গুরুমহাশয়ও তাহাকে মারিত না—মারিলেও বালকের আত্মীয়পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ করিত।" তারাপদর প্রকৃতি ছিল উদাসীন, বন্ধনবিমুখ। তাহার শিরায় শিরায় যে রক্ত প্রবাহিত হইত তাহাতে আদিম পৃথিবীর অবাধ-গতির মুক্ত সুর, বহিঃপ্রকৃতির নিঃসঙ্গ নিরাসক্ত আহ্বান হইত মুখরিত। তাই একদা "সমস্ত গ্রামের এই আদরের ছেলে একটা বিদেশী যাত্রার দলের সহিত মিলিয়া অকাতরচিত্তে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল।" ফিরাইয়া আনিলেও ঘরে-বাহিরের প্রচুরতর আদর এবং বহুতর প্রলোভন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। কোনরূপ বন্ধন এমন কি স্নেহবন্ধনও তাহার সহিত না; "তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে;—সে যখনি দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বত্থগাছের তলে কোন দূর দেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, অথবা বেদেরা নদীর তীরের পতিত মাঠে ছোট ছোট চাটাই বাঁধিয়া বাখারি ছুলিয়া চাঙারি নির্ম্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত।" "তারাপদ হরিণশিশুর মত বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মত সঙ্গীতমুগ্ধ। যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগী করিয়া দেয়। গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্ব্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত।" "কেবল সঙ্গীত কেন, গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি—সকলি তাহাকে উতলা করিত।"

[১] ভাদ্র-আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০২। ইহাই সাধনার শেষ গল্প।

বহিঃসংসারের সঙ্গে যাহার আত্মীয়তা, বাহিরের ডাক যাহাকে ক্ষণে ক্ষণে অধীর করিয়া তোলে তাহাকে গৃহাঙ্গনের এবং গ্রামসীমান্তের স্নেহশৃঙ্খল কতক্ষণ ধরিয়া রাখিবে। যাত্রার দল হইতে পাঁচালীর দল, সেখান হইতে পানের দোকানে খিলি বিক্রয় ও জিমন্‌ন্যাষ্টিকের দল। জিমন্‌ন্যাষ্টিকের দল হইতে নন্দীগ্রামের বাবুদের সখের যাত্রার দলে যোগ দিবার জন্য পলায়নের কালে সস্ত্রীক মতিবাবুর সঙ্গে পরিচয়। এই পরিচয় হইতে তারাপদর বন্ধনের সৃষ্টি হইল—মতিবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণার স্নেহ, কন্যা চারুশশীর ঈর্ষাবিজড়িত ভালবাসা, কুণ্ঠাভীরু সোনামণির শ্রদ্ধা, নূতন সমাজের সঙ্গে পরিচয়, এবং ইংরেজি শিক্ষার আকর্ষণ—এইসব মিলিয়া "এই অনন্তনীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ" তারাপদকে ধরিয়া রাখিল। "নিজের এই নিগূঢ় পরিবর্ত্তন এই আবদ্ধ আসক্তভাব তাহার নিজের কাছে এক নূতন স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল।" মতিবাবু এবং অন্নপূর্ণা গোপনে গোপনে তারাপদর সহিত চারুশশীর বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিলে তারাপদর আত্মীয়েরাও সানন্দে সম্মতি দিল। সকলে এই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ছাড়িল যে বনের পাখী বুঝি অবশেষে পিঞ্জরের বন্ধন স্বীকার করিল। বিবাহের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ; তারাপদর মা ও ভাইকে আনিতে লোক গিয়াছে। এমন সময় অকস্মাৎ তারাপদর ডাক আসিয়া পড়িল,—গৃহহীন সংসারের মোহিনী রাগিণী এবং বৃহৎপ্রকৃতির উদ্দাম আহ্বান। একদিকে—"কুড়ুল-ঘাটার মেলায় যাত্রী কলিকাতার কন্সার্টের দল বিপুল শব্দে দ্রুততালের বাজনা জুড়িয়া দিয়াছে, যাত্রার দল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাহাঃ শব্দে চীৎকার উঠিতেছে, পশ্চিমদেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাগুলো কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মত্ত উৎসাহে বিনা সঙ্গীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে—উদ্দীপনার সীমা নাই।" অপর দিকে—"আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল।···দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব দিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—পূবে বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীরবর্ত্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর

মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল ;—সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে ;—মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে"। গৃহহীন মানবসংসার এবং মুক্ত বিরাটপ্রকৃতির সম্মিলিত আহ্বানের চিরপরিচিত সুরে তারাপদর চিত্ত সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিল না। "পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না। স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারিদিক্ হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্ব্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের অন্তরের ঘরছাড়া নিরুদ্দেশ কবিমানুষটিই তারাপদর মধ্যে রসরূপ লাভ করিয়াছে।

চারুশশী সোনামণির বিরুদ্ধ চরিত্র বড় সুন্দর এবং স্বাভাবিক। 'নষ্টনীড়' গল্পের চারুবালা-মন্দাকিনীর বিরোধ ইহারি অনুরূপ।

ও-হেনরির Whistling Dick's Christmas Stocking গল্পের সঙ্গে অতিথির ভাবগত সাদৃশ্য আশ্চর্য্যরকমের। ডিক্‌ও তারাপদর মত প্রকৃতির সন্তান, তবে তারাপদর মত সে আজন্ম স্নেহসৌভাগ্য লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় নাই, সে ভবঘুরে (tramp), ভিক্ষাজীবীর মত। তারাপদর ভয় স্নেহবন্ধনের, ডিকের আতঙ্ক কর্ম্মবন্ধনের। পরস্পরনিরপেক্ষ দুই বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় লিখিত গল্পের মধ্যে এমন মৌলিক সাদৃশ্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সর্ব্বজনীনতার পরিচায়ক।

৭

চতুর্থ বর্ষ সমাপন করিয়া 'সাধনা' উঠিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও গল্প-রচনায় পড়িল ছেদ। তাহার পর কবি ১৩০৫ সালের মত 'ভারতী' সম্পাদনভার গ্রহণ করিলেন। সেই বৎসর ভারতীতে প্রায় মাসে মাসে তাঁহার একটি করিয়া গল্প প্রকাশিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে ভারতীতে প্রকাশিত গল্পগুলির প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে, রচনা-ভঙ্গীর পল্লবিত ও অলঙ্কৃত ঐশ্বর্য্য এবং ধ্বনিপ্রবাহের অসামান্য মাধুর্য্য, আর ক্লাইমাক্সে অদৃষ্টের অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর পরিহাস। অদৃষ্টের পরিহাস প্রথম দুই গল্পে বিশেষ তীব্র হইয়া ফুটিয়াছে, পরবর্ত্তী গল্পগুলিতে ইহা কতকটা মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে।

নিজ-সম্পাদনায় প্রকাশিত ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প হইতেছে 'দুরাশা'।[১] গল্পটির কাহিনী এই,—মুসলমান আমলের রাজ ঐশ্বর্য্যের ম্লানায়মান পরিবেশের মধ্যে বদ্রাওনের নবাবকন্যার তৃষিত হৃদয় প্রাসাদবাতায়নজালের অন্তরাল হইতে নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া সেনাপতি কেশরলালের তেজোদীপ্তি এবং ব্রাহ্মণ্যনিষ্ঠার প্রতি বিশেষ উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। নবাবপুত্রী তাঁহার হিন্দু দাসীর নিকট "হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত আচার ব্যবহার, দেবদেবীর সমস্ত আশ্চর্য্যকাহিনী, রামায়ণ-মহাভারতের সমস্ত অপূর্ব্ব ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া শুনিয়া সেই অবরুদ্ধ অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া হিন্দু-জগতের" স্বপ্ন দেখিতেন, "মূর্ত্তি প্রতিমূর্ত্তি, শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি, স্বর্ণচূড়াখচিত দেবালয়, ধূপধুনার ধূম, অগুরুচন্দনমিশ্রিত পুষ্পরাশির সুগন্ধ, যোগী-সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা, ব্রাহ্মণের অমানুষিক মাহাত্ম্য, মানুষ-ছদ্মবেশধারী দেবতাদের বিচিত্র লীলা, সমস্ত জড়িত হইয়া" তাঁহার "নিকটে এক অতি পুরাতন অতি বিস্তীর্ণ অতি সুদূর অপ্রাকৃত মায়ালোক সৃজন করিত"। কেশরলালের মধ্যে এই মায়াই যেন মূর্ত্তিলাভ করিয়া তাঁহাকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানিতেছিল। তাহার পর যখন যুদ্ধে আহত মুমূর্ষুপ্রায় কেশরলাল তাঁহার পরিচয় জানিয়া তাঁহার হাতের জলটুকুও নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করিল তখন বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর কন্যা বুঝিলেন যে কঠিন তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণ্যশ্রী অর্জ্জন করিতে না পারিলে তিনি নির্লিপ্ত সুদূর একাকী ব্রাহ্মণ কেশরলালের মনের নাগালটুকুও পাইবেন না। তখন তিনি জ্ঞানের তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণত্বের অধিকার লাভ করিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন। নবাবপুত্রী যে-কেশরলালের অন্বেষণে

[১] বৈশাখ ১৩০৫। যে-প্রসঙ্গে গল্পটির কাহিনী কবির মনে প্রথম আসে তাহা বিপিনবিহারী গুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন [মানসী ও মর্ম্মবাণী ফাল্গুন ১৩২৩ পৃ ১৬]।

সর্বস্ব বিসর্জন দিলেন, যৌবনপাত করিলেন, সে-কেশরলাল তো মানুষ কেশরলাল নয়, সে তাঁহার ধ্যানধারণার কামনাকল্পনার আলম্বন মাত্র। তাঁহার উন্মেষোন্মুখ নারীজীবনের যে-নিষ্ঠা তাঁহাকে নিদারুণ দুঃখের দাহনে জ্বালাইয়া বাহিরে রিক্ত করিয়া অন্তরে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল সে-নিষ্ঠা পুরুষ কেশরলালের মধ্যে অবিচলিত রহিল কই। ব্রাহ্মণ্যতেজের প্রতীক, ক্ষত্রবীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি কেশরলাল যৌবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সমস্ত নিষ্ঠা ও সংকল্প অনায়াসে ভাসাইয়া দিল। দীর্ঘ আটত্রিশ বছরের অন্বেষণক্লেশের পর নবাবকন্যা অকস্মাৎ দার্জ্জিলিঙে কেশরলালের দেখা পাইলেন,—"বৃদ্ধ কেশরলাল ভুটিয়া-পল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্রপৌত্রী লইয়া ম্লান বস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।" নারীহৃদয়ের এ-কি ট্র্যাজেডি। তাঁহার ধ্রুব আদর্শ মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তাঁহার অবিচল নিষ্ঠা ও সুকঠিন তপস্যা লইয়া তিনি কি এই সুদীর্ঘ কাল মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিলেন? এই চরম প্রবঞ্চনার পরম লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়। "হায় ব্রাহ্মণ, তুমি ত তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্ত্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্ত্তে আর এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব?"—নবাবপুত্রীর এই আক্ষেপ-উক্তির মধ্যে মানবজীবনের গভীরতম ব্যর্থতার দীর্ঘনিশ্বাস ঠেলিয়া উঠিয়াছে। নারীহৃদয়ের ট্র্যাজেডি পুরুষহৃদয়ের ট্র্যাজেডির অপেক্ষা গভীরতর। যৌবনে রক্তের তেজ থাকিলে তেজস্বী পুরুষের পক্ষে নিষ্ঠা অবিচলিত রাখা সহজ, কিন্তু বয়োধর্ম্মে যখন তাহার শরীর অপটু হয় এবং মনের দৃঢ়তা কমিয়া যায়, তখন নিষ্ঠায় শৈথিল্য আসিয়া পড়ে। তেজস্বিনী নারীর নিষ্ঠা একান্তভাবে আদর্শ-পরায়ণ; পুরুষের নিষ্ঠার মত দেহবলাশ্রিত নহে বলিয়া তাহা শেষ অবধি অবিচলিত রহিয়া যায়। পুরুষের faith অংশত দেহনিষ্ঠ, নারীর faith সম্পূর্ণভাবে মনোময়।

গল্পটির মধ্যে অসামান্য হিউমারের পরিচয় আছে। মোগল-সাম্রাজ্যের অস্তোন্মুখ মহিমার বর্ণচ্ছটাভাস এই গল্পটিতে যেভাবে স্বল্পাক্ষরে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অতুলনীয়। ক্ষুধিত-পাষাণেও এই ধরণের চিত্র পাই, কিন্তু সে চিত্রের

পরিবেশ স্বতন্ত্র। দুরাশার ছবি আমাদের মনে স্বর্ণাভ গোধূলির করুণ মায়া বিস্তার করিয়া দেয়।—"নবাবজাদীর ভাষামাত্র শুনিয়া সেই ইংরাজ-রচিত আধুনিক শৈল-নগরী দার্জ্জিলিঙের ঘন কুজ্ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোগল-সম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—শ্বেত-প্রস্তর-রচিত বড় বড় অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ, হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণ-ঝালর-খচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেসমের মসলিনের প্রচুরপ্রসর জামা পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারি, জরীর জুতার অগ্রভাগে বক্রশীর্ষ,—সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।"

'পুত্রযজ্ঞ'[১] গল্পে অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা নিদারুণ ব্যঙ্গের সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। মনে মনে পাপের সঞ্চার হইলেও দৈহিকশুদ্ধ গর্ভিণী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া বিবাহের পর বিবাহ করিয়া যজ্ঞকর্ম্ম সন্ন্যাসী-ভোজন ইত্যাদিতে অর্থব্যয়ের কোন ত্রুটি পুত্রকামী বৈদ্যনাথ বাকি রাখিল না। শেষে তাহারি পুত্র ও পরিত্যক্ত পত্নীকে সে অজ্ঞানিতভাবে সাধারণ ভিক্ষুক মনে করিয়া তাড়াইয়া দিল।

গল্পটির অনাড়ম্বর এবং দ্রুত বর্ণনারীতির মধ্য দিয়া ব্যঙ্গ বড় তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। যৌন প্রেমের ইঙ্গিতও ইহার অসাধারণত্ব। 'নষ্টনীড়' গল্পের সঙ্গে এই গল্পের কিছু সাদৃশ্য আছে। সম্পত্তি-সমর্পণের পরিণতির সঙ্গে এই গল্পের পরিণতি তুলনীয়।

'ডিটেক্‌টিভ'-এর[২] সরলতা বিশেষ উপভোগ্য।

তলে তলে ব্যঙ্গোক্তি এবং হিউমারের অপূর্ব্ব মিশ্রণে 'অধ্যাপক'[৩] গল্পটি বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্পে পরিণত হইয়াছে। গল্পটি যাহার আত্মকথা সেই কলেজে-পড়া ছেলের অপক্ব বুদ্ধির ও আত্মাভিমানসর্ব্বস্ব মনোবৃত্তির প্রতিফলন নিখুঁত। "আমাদের একটি তর্কসভা ছিল। আমিই সে-সভার বিক্রমাদিত্য এবং আমিই সে-সভার নবরত্ন ছিলাম। আমরা ছত্রিশজন সভ্য ছিলাম, তন্মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনকে গণনা হইতে বাদ দিলে কোনো ক্ষতি হইত না,

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫। সূচিপত্রে ভুল করিয়া লেখকের নাম দেওয়া আছে সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২ আষাঢ় ১৩০২। ৩ ভাদ্র ১৩০৫।

এবং অবশিষ্ট এক জনের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা উক্ত পঁয়ত্রিশ জনেরও সেইরূপ ধারণা ছিল।" এই অনুরক্তমণ্ডলীর প্রতিনিধি "চিরানুরক্ত ভক্তাগ্রগণ্য" অমূল্যচরণের গৌণ ভূমিকাটুকু নিরতিশয় চমৎকার।

একদিকে হাস্য অপরদিকে কারুণ্য—এই উভয় রসের মধ্যে প্রবহমান হইয়া উচ্চাঙ্গের হিউমার সৃষ্ট হইয়াছে অধ্যাপকে।

ভারতীতে প্রকাশিত গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলী পূর্ব্বাপেক্ষা পুষ্পিততর হইয়াছে। তাহার মধ্যে আবার এই গল্পটির ভাষা বিশেষভাবে পল্লবিত। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গির একটা বিশেষ পদ্ধতির পরিণতি দেখা যায়।

যে-শ্রেণীর বাঙ্গালী ভদ্রলোক সরকারি খেতাবের মোহে আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া সাহেব-সমাজকে সেলাম বাজাইয়া এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপলক্ষ্যে গভর্ণমেণ্ট-সম্পৃক্ত ব্যাপারে মোটা টাকা চাঁদা দিয়া পরম গৌরব বোধ করিয়া থাকেন তাহাদেরি একটি শিক্ষিত যুবকের কৌতুকাবহ কাহিনী লইয়া 'রাজটীকা'[১] লেখা হইয়াছে। রচনাভঙ্গি নিতান্ত সরস ও ব্যঙ্গাত্মক। স্বদেশী-আন্দোলন লইয়া ইহাই রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গল্প।

'মণিহারা'[২] গল্পে একটি একনিষ্ঠ এবং কতকটা নিরুদ্ধ হৃদয়ের একতরফা প্রেমের কাহিনী অলক্ষ্যে অতি স্বাভাবিকভাবে অতিপ্রাকৃতে গিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যে কাঠামো বা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাতে ব্যঙ্গের একটু প্রলেপ থাকায় কাহিনীর অতিপ্রাকৃতত্বের উপর সংশয় আসিয়া উচ্চতর শিল্পসৌন্দর্য্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। অন্যথা ইহা সাধারণ ভূতের গল্পে পর্য্যবসিত হইত। যে-লোকটি জীর্ণবাড়ির গল্প করিলেন তিনি সেখানকার একজন স্কুলমাষ্টার; "তাঁহার ক্ষুধা ও রোগ শীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নীচে এক জোড়া বড় বড় চক্ষু আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায়

[১] আশ্বিন ১৩০৫। [২] অগ্রহায়ণ ১৩০৫? যে-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই "ভূতের গল্প"টির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা বিপিনবিহারী গুপ্তের রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে [মানসী ও মর্ম্মবাণী ফাল্গুন ১৩২৩ পৃ ১৬] দ্রষ্টব্য।

জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ কবি কোল্‌রিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।”

গল্পের নায়ক, “অপুত্রক পিতৃব্য দুর্গামোহনের বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী” ফণিভূষণ ছিলেন কলেজে-পড়া এবং “তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে কলেজে-পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না।” “ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা বিনা চেষ্টায় আদর বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাই সাড়ি এবং বিনা দুর্জ্জয় মানে বাজুবন্ধ লাভ করিত। এইরূপে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে তাহার ভালবাসা নিশ্চেষ্ট হইয়াছিল। সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছু দিত না।” “ঘনপল্লবিত অতি সতেজ লতার মত বিধাতা মণিমালিকাকে নিষ্ফলা করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন। অর্থাৎ তাহাকে এমন একটা কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিন্দুকের মণি-মাণিক্য অপেক্ষা বেশি করিয়া বুঝিতে পারে।” ফণিভূষণের ভালবাসা ছিল ভক্তের পূজার মত, সে দিয়াই সুখী হইত, প্রতিদান যে কিছু থাকিতে পারে তাহা আশাও করে নাই অপেক্ষাও করে নাই। ফণিভূষণের প্রেম যদি অতটা পোষমানা না হইত তবে মণিমালিকার হৃদয়ের কাঠিন্য ভাঙ্গিয়া প্রেমের সাড়া জাগিতে কিছুমাত্র দেরী হইত না। কিন্তু তাহা হয় নাই, এবং সংসারেও তাহার এমন কেহ ছিল না যাহার উপর স্নেহ পড়িতে পারে, সুতরাং এই frigid বা কঠিন-হৃদয়া নারীর সমস্ত টান পড়িয়া ছিল তাহার সযত্ন সঞ্চিত গহনাগুলির উপর। সংসারে টান ছিল না বলিয়া সে কখনো কাজে অবহেলা করে নাই। কিন্তু তাহার কাজ যতই নিখুঁত হউক, তাহাতে মন না থাকায় তাহা ছিল একান্ত রসহীন। হঠাৎ এক সময় ফণিভূষণের ব্যবসায়ে দুই-এক দিনের জন্য মোটা টাকার দরকার পড়িল। ফণিভূষণ নিতান্ত কুণ্ঠিত ও অস্পষ্টভাবে মণিমালিকার গহনার কথা তুলিলে মণিমালিকার অন্তরের কোমলতম স্থানে আঘাত পড়িল, তাহার গহনাগুলি হারাইবার ভয় হইল। সে হাঁ-না কোন উত্তর করিল না। মনে নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া ফণিভূষণ অন্য উপায়ে টাকার যোগাড় করিতে কলিকাতা চলিয়া গেল। গহনায় টান পড়িবার আশঙ্কায় মণিমালার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ফণিভূষণের

এক কর্ম্মচারী মধুসূদন ছিল মণিমালিকার গ্রামসম্পর্কিত অথবা দূরসম্পর্কিত ভাই। তাহারি পরামর্শে মণিমালিকা গহনাগুলি বাঁচাইবার জন্য তাহাকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় চড়িয়া বাপের বাড়ি চলিল। মণিমালিকা নৌকায় উঠিলে মধুসূদন গহনার বাক্সটা নিজের জিম্মায় রাখিতে চাহিল। স্বামীর মনের গভীরতা মণিমালিকার অজ্ঞাত ছিল, কেন না স্বামীর মনের সহিত নিজের মনের কোনই বন্ধন বা সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু মধুসূদনের এই কথায় তাহার স্থূল মনের অন্তস্তল এক মুহূর্ত্তে মণিমালিকার নিকট অনাবৃত হইয়া গেল। "মণিমালিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরিয়াছে—মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত আর স্থান ছিল না। বাক্সে করিয়া গহনা লইলে সে বাক্স হাতছাড়া হইতে পারে এ আশঙ্কা তাহার ছিল। কিন্তু গায়ে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে গহনা কেহ লইতে পারিবে না।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মণিমালিকার ইহজীবনের কথা শেষ করিয়াছেন। সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝিয়া লইতে দেরী হইতে পারে বলিয়া রসহানিভয় সত্ত্বেও মাঝের কথাটা এখানে বলিয়া দিই। ঝড়-তুফানে হউক অথবা মধুসূদনের লোভের ফলে হউক —শেষের ব্যাপারই অধিকতর সম্ভব—মণিমালিকা নৌকাডুবি হইয়া মরিল। মরিবার মুহূর্ত্তে বোধ করি ক্ষণেকের জন্য নিজের ঘরটির নিজের কাপড়-চোপড় ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির এবং হয়ত ফণিভূষণের জন্যও ক্ষোভ অনুভব করিয়াছিল। পরবর্ত্তী ঘটনা বুঝিবার পক্ষে এই অনুমান অপরিহার্য্য।

কলিকাতায় থাকিয়া ফণিভূষণ গোমস্তার পত্র হইতে জানিল যে মধুসূদন কর্ত্রীকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে রওনা হইয়াছে। ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথা বুঝিয়া আরো ক্ষুব্ধ হইল, ভাবিল, "আমি গুরুতর ক্ষতিসম্ভাবনা সত্ত্বেও স্ত্রীর অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তবু আমাকে সন্দেহ! আমাকে আজিও চিনিল না।" দিন কয়েক পরে ফণিভূষণ টাকার যোগাড় করিয়া বাড়ী আসিয়া দেখিল মণিমালিকা নাই। ঘর শূন্য দেখিয়া তাহার "বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল!—মনে হইল সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালবাসা ও বাণিজ্যব্যবসা সমস্তই ব্যর্থ।" ফণিভূষণ স্ত্রীর কোন খোঁজ-খবর

লইতে কিছুমাত্র চেষ্টা করিল না। গোমস্তা ফণিভূষণের শ্বশুরবাড়িতে খবর লইয়া জানিল যে মণিমালিকা অথবা মধুসূদন কেহই সেখানে পৌঁছে নাই। চারিদিকে খোঁজ করিয়াও আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

"সর্ব্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণিভূষণ সন্ধ্যাকালে তাহার পরিত্যক্ত শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেদিন জন্মাষ্টমী, সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোয়ারী যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মুষলধারায় বৃষ্টিপাত শব্দে যাত্রার গানের সুর মৃদুতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে।" ঘরে ঢুকিতেই মণিমালিকার পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলি দেখিয়া তাহার স্মৃতি ফণিভূষণের হৃদয়কে যেন দংশন করিয়া ধরিল,—"আল্‌নার উপরে একটি গামছা ও তোয়ালে, একটি চুড়িপেড়ে ও একটি ডুরে শাড়ি, সদ্য ব্যবহারযোগ্য ভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে, ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবায় মণিমালিকার স্বহস্ত-রচিত গুটিকতক পান শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে।...যে অতি ক্ষুদ্র গোলকবিশিষ্ট ছোট সখের কেরোসিন ল্যাম্প সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে জ্বালাইয়া কুলুঙ্গিটির উপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্ব্বাপিত এবং ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্পটি এই শয়নকক্ষে মণিমালিকার শেষ মুহূর্ত্তের নিরুত্তর সাক্ষী।" বর্ষণমুখর বিজন সন্ধ্যা, দূর হইতে বাদলা-হাওয়ায় ভাসিয়া আসা যাত্রার গান, মণিমালিকার স্মৃতিজালবেষ্টিত শয়নকক্ষ—এই সব মিলিয়া ফণিভূষণের মস্তিষ্ককে তীব্র নেশার অবসাদে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহার মোহাকুল হৃদয় হইতে যেন কাতর আহ্বান বাহির হইতে লাগিল,—"এস মণিমালিকা এস, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো কর, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত সাড়িটি তুমি পর, তোমার জিনিষগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।" এই ব্যাকুল আহ্বানে যেন মণিমালিকার কঙ্কালাবশিষ্ট প্রাণহীন দেহ নদীগর্ভশয্যা হইতে উঠিয়া খট্‌খট্ ঝম্‌ঝম্ শব্দ করিতে করিতে ঘাটের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া বাড়ির রুদ্ধ দেউড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ফণিভূষণের অসুস্থ মস্তিষ্ক নিদ্রা-জাগরণের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা হইতে যেন

এই আগমন অনুভব করিতে লাগিল। যখন তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল তখন দেখিল যে, সে উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে, "তাহার সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত, হাত পা বরফের মত ঠাণ্ডা এবং হৃৎপিণ্ড নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত স্ফুরিত হইতেছে।"

অনুরূপ ঘটনা পরদিন রাত্রিতেও ঘটিল। সেদিন যখন শব্দ শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া ঠেকিয়াছে তখন ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, সে "মণি" বলিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পরের দিন রাত্রিবেলায় যাত্রার কোলাহল চুকিয়া গিয়াছে; দরোয়ান-ভৃত্যদিগকে ছুটি দিয়া শয়নকক্ষের দ্বার খুলিয়া রাখিয়া অপেক্ষা করিতে করিতে আকাশের তারাগুলির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া মণিমালিকার প্রথম যৌবনের পরিপূর্ণ দিনগুলির কথা শান্ত-চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে ফণিভূষণ ঘুমাইয়া পড়িল। যথাসময়ে শব্দ নদী হইতে সিঁড়ি ধরিয়া উঠিল, দেউড়ী পার হইল, অন্তঃপুরের গোল সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল, দীর্ঘ বারান্দা পার হইল, শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে ক্ষণকালের জন্য থামিয়া ঘরে ঢুকিল, ঢুকিয়া "আল্‌নায়, যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে, কুলুঙ্গিতে, যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে, যেখানে পানের বাটায় পান শুষ্ক, এবং সেই বিচিত্র সামগ্রীপূর্ণ আলমারীর কাছে প্রত্যেক জায়গায় এক এক-বার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।" নিদ্রামগ্ন ফণিভূষণের ক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখিল, "তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সীঁথি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝক্‌মক্‌ করিতেছে!...সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব;—সেই কালো তারা, সেই ঘন দীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দৃঢ় শান্ত দৃষ্টি।"

গল্পটির বর্ণনাপদ্ধতি ও বিশ্লেষণরীতি এত নিপুণ, এবং অতিপ্রাকৃত বা "ভৌতিক" রস এত জমাট যে সমস্ত কাহিনীটি যেন বাস্তববৎ প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

কাহিনীতে বাস্তবতার কিঞ্চিৎ স্পর্শ থাকা কিছু মাত্র অসম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ একালে পাটের ব্যবসায় করিয়া কিছু টাকা লোকসান দিয়াছিলেন।

মণিমালিকার মনোবৃত্তির সহিত প্রতিহিংসা গল্পের ইন্দ্রাণীর মনোভাবের কিছু মিল আছে। উভয়েই নিঃসন্তান, উভয়েই অলঙ্কারপ্রিয়। কিন্তু ইন্দ্রাণীর মন মণিমালিকার মনের মত স্নেহবৃত্তির অধ্বষ্য নয়, তাহার পিতামহের স্নেহের স্মৃতি, তাহার স্বামীর সুগভীর ভালবাসা তাহার মনকে সজীব ও সরস করিয়া রাখিয়াছিল।

ফণিভূষণের অন্তঃপ্রবহমান প্রেম 'ঘরে বাহিরে' উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশের প্রেমের অনুরূপ।

এক বুদ্ধিমতী পতিব্রতা ভক্তিমতী সরলহৃদয়া নারীর প্রেমের ও ভক্তির প্রভাবের কাহিনী হইতেছে 'দৃষ্টিদান'[১] গল্পের বিষয়। স্বামীর দোষে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াও কুমুদিনী স্বামীর প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাসপরায়ণতা হারায় নাই। কিন্তু পত্নীর অন্ধত্ব স্বামীর কাছে একটা বড় ব্যবধানের মত বোধ হইতে লাগিল। দৃষ্টিহারার বোধশক্তি স্বভাবতই তীক্ষ্ণতর হয়; তাহার উপর তাহার স্বামীর প্রতি অগাধ ভক্তি ও ভালবাসা,—এই দুই কারণে কুমুদিনীর অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গেল। একে তো পত্নীর অন্ধত্ব তাহারি মূঢ়তার ফল বলিয়া অপরাধের ভারে কুমুদিনীর স্বামীর চিত্ত ভারাক্রান্ত ছিল, তাহাতে কুমুদিনীর সূক্ষ্ম বোধশক্তি তাঁহাকে যেন নীরবে ধিক্কার দিতে লাগিল। যেমন ডাক্তারীতে পসার জমিতে লাগিল অমনি তাঁহার ধর্ম ও নীতিজ্ঞানের দৃঢ়তাও শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। কুমুদিনীর চিত্তে এ ব্যাপার অজ্ঞাত রহিল না। তাহার পর হইল কিশোরী হেমাঙ্গিনীর আবির্ভাব। স্বামীর চিত্ত টলিতেছে বুঝিয়া কুমুদিনী অধীর হইয়া উঠিল। তাহার ভয় সপত্নীর জন্য নয়, স্বামীর প্রতিজ্ঞার জন্য। ব্যাকুল নিষেধ সত্ত্বেও যখন তাহার স্বামী হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করিতে চলিয়া গেল, তখন ঠাকুরঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কুমুদিনী পূজায় বসিল। দৈবের চক্রে কুমুদিনীর স্বামী বিবাহসভায় সময়ে পৌঁছিতে না পারায় কুমুদিনীর দাদার সহিত হেমাঙ্গিনীর বিবাহ হইয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের খুব কম গল্পেই এমন সর্ব্বাংশে আনন্দময় উপসংহার দেখা যায়।

[১] পৌষ ১৩০৫।

সবুজপত্রে প্রকাশিত কোন কোন গল্পে এবং ঘরে-বাহিরে উপন্যাসে যেমন সূক্ষ্ম আত্মবিশ্লেষণ দেখা যায় এই গল্পে তাহার পূর্ব্বাভাস রহিয়াছে। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ অন্ধের মনোবৃত্তির যে নিপুণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত। "এমন মনে হইতে লাগিল দৃষ্টি আমাদের কাজের যতটা সাহায্য করে তাহার চেয়ে ঢের বেশি বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, যতটুকু দেখিলে কাজ ভালো হয় চোখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি দেখে। এবং চোখ যখন পাহারার কাজ করে কান তখন অলস হইয়া যায়, যতটা তাহার শোনা উচিত তাহার চেয়ে সে কম শোনে।"

৭

'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম গল্প হইতেছে 'সদর ও অন্দর'।[১] এই কাহিনীবর্জ্জিত ব্যঙ্গাত্মক ক্ষুদ্র গল্পটিতে নারীচিত্তের দোলাচলবৃত্তির গূঢ় রহস্য এবং তদনুযায়ী পুরুষপ্রকৃতির বিপরীত প্রতিক্রিয়ার প্রকৃত হেতু উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বিপিনকিশোর-ভূমিকার ট্রাজেডি বা কারুণ্য বড় সূক্ষ্ম। পুরুষ এবং নারীর পর্য্যায়ক্রমে অনুরাগ ও বিরাগভাজন হইয়া ধনিবংশের নিঃস্ব সন্তান এই গুণী ব্যক্তিটির নিতান্ত সরল চিত্ত কারণ না বুঝিতে পারিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শেষে যখন আশ্রয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল তখনো সে অনেক ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিল না, কি অপরাধে রাজা-বন্ধুর হৃদ্যতা হারাইল। অগত্যা বিপিন-কিশোর "দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার পুরাতন তম্বুরাটিতে গেলাপ পরাইয়া বন্ধুহীন বৃহৎ সংসারে বাহির হইয়া পড়িলেন—যাইবার সময় রাজভৃত্য পুঁটেকে তাঁহার শেষ সম্বল দুইটি টাকা পুরস্কার দিয়া গেলেন।"

সন্দিগ্ধচিত্ত স্বামীর হাতে পড়িয়া এক স্বল্পবাক্ দৃঢ়চিত্ত আত্মসমাহিত সুন্দরী তরুণী অবস্থা গতিকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিল,—এই নিতান্ত সাধারণ কাহিনী 'উদ্ধার'[২] গল্পের বিষয় হইয়া সাহিত্যে অসাধারণত্বের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। ক্ষুদ্র হৃদয় ও স্থূল বোধশক্তি লইয়া পরেশ তাহার বয়ঃস্থা বধূ গৌরীর

[১] আষাঢ় ১৩০৭। [২] ভারতী শ্রাবণ ১৩০৭।

মনের নাগাল পায় নাই, উপরন্তু তাহার সন্দিগ্ধ মন পদে পদে গৌরীর আত্ম-সম্মানবোধকে ক্ষুণ্ণ করায় স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি ভালবাসার উদ্রেক হইতে পারে নাই। অধিকন্তু সন্তান না হওয়াতে গৌরীর মন সংসারবন্ধনেও জড়াইতে পারে নাই। এমন অবস্থায় গৌরীর মত বাঙ্গালী ঘরের মেয়ের সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই হইল,—গুরু পাকড়াইয়া গৌরী পূজা-অর্চ্চনায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দিল। পরেশের সন্দেহ যখন গুরুর উপরেও গিয়া পড়িল, তখন গৌরীর অবমানিত অভিমানী চিত্ত স্বামীর প্রতি একান্তভাবে বিরূপ হইল। স্বামীর প্রতি বিরাগ বশতই গৌরী গুরুর বাড়ি যাতায়াত আরম্ভ করিল। এদিকে গৌরীর সাহচর্য্যে গুরুর মন গেল টলিয়া। তখন গৌরীর হৃদয় রূঢ় আঘাত পাইল। গুরুর অপরাধের গুরুত্ব তাহার কাছে তাহার স্বামীর নীচতার স্মৃতিকেও মহৎ করিয়া তুলিল, এবং সে ইহাও বুঝিল যে তাহার গুরুর প্রায়শ্চিত্ত তাহাকেই করিতে হইবে। গৌরী বিষ খাইয়া স্বামীর মৃতদেহের পাশে শুইয়া পড়িল। "আধুনিক কালে এই আশ্চর্য্য সহমরণের দৃষ্টান্তে সতীমাহাত্ম্যে সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল।"

গৌরীর চরিত্র মহামায়া গল্পের মহামায়ার সঙ্গে এবং 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের দামিনীর সঙ্গে তুলনীয়। পরেশের ভূমিকা 'সৎপাত্র' গল্পের সাধুচরণের ভূমিকার কতকটা অনুরূপ। গল্পটির বর্ণনারীতি দ্রুতগতি এবং সুসংহত।

নিতান্ত সাংসারিক এবং বেপরোয়া ব্যক্তির হৃদয়ে সুগুপ্ত সন্তানবাৎসল্যের অকাল আবির্ভাব এবং সেই হেতু তাহার সাংসারিক ক্ষতির কাহিনী লইয়া 'দুর্বুদ্ধি'[১] রচিত হইয়াছে। মনের নীচতার এবং নিষ্ঠুরতার সঙ্গে নবজাগ্রত স্নেহের, স্নিগ্ধতার ও ধর্ম্মজ্ঞানের বিপরীত সংঘর্ষের ছবি অতি সুন্দরভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আমাদের দেশের পাড়াগাঁয়ে পুলিসের যে অকথ্য হৃদয়হীন অত্যাচার ও প্রতিশোধস্পৃহা অনিবিচারে রাজত্ব করিতেছে তাহার মর্ম্মান্তিক কঠোর বাস্তবচিত্র এই গল্পে প্রকাশিত হইয়াছে। মাতৃহীন বালিকা কন্যার পিতৃস্নেহ এবং সেই কন্যার মৃত্যুর পরে তাহার স্মৃতির প্রভাব, এই নিষ্ঠুর কাহিনীটিকে করুণ ও স্নিগ্ধ

[১] ভারতী ভাদ্র ১৩০৭।

করিয়াছে। ও-হেন্‌রির Georgia's Ruling গল্পের সহিত 'দুর্ব্বুদ্ধি' গল্পের কিছু ভাবগত ঐক্য আছে।

'ফেল্‌'[1] নিতান্ত সরসভাবে লেখা। জ্ঞাতি ভাইয়ের উপর ঈর্ষালু যথেচ্ছাচারী অশিক্ষিত যুবকের অব্যবস্থিতচিত্ততার হাস্যকর পরিণাম এবং বড়লোকের চাটুকারের দুরবস্থা এই ক্ষুদ্র গল্পটিতে নিরাভরণ ও নিপুণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নলিনের পরাভিমতপ্রেক্ষী, শিশুসুলভ চঞ্চল মনোবৃত্তি আমাদের সকলেরই পরিচিত,—"সব চেয়ে ভালোর জন্য যাহার আকাঙ্ক্ষা, অনেক ভালো তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। কাছাকাছি কোনো মেয়েকেই নলিন পছন্দ করিয়া শুভম কবিতে সাহস করিল না, পাছে আরো ভালো তাহাকে ফাঁকি দিয়া আর কাহারো ভাগ্যে জোটে।"

অবিমৃষ্যকারিতার বিষম ফলভোগ হইতে ঘটনাচক্রে উদ্ধার পাইবার কাহিনী হইতেছে 'শুভদৃষ্টি'[2] গল্পের বিষয়। বয়স যখন কাঁচা থাকে তখন অবাঞ্ছিত ঘটনা হইতে বাঞ্ছিত ফলাহরণ দুঃসাধ্য হয় না। যে সুন্দরী মেয়েটিকে বিবাহ করিতে গিয়া অন্য মেয়ের সহিত বিবাহ হইবার ফলে কান্তিচন্দ্রের দারুণ মনোভঙ্গ হইল সে মেয়েটি কালা এবং বোবা,—এই কথা শুনিবামাত্র কান্তিচন্দ্রের মনে ভার সরিয়া গেল, এবং তৎক্ষণাৎ বধূর প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইল; কান্তিচন্দ্রের "দূরের আশা দূর হইয়া নিকটের জিনিষগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল।"

'প্রতিবেশিনী' হইতেছে এক প্রতিবেশিনী বিধবা বালিকার সহিত বেনামী প্রণয় করিয়া অদৃষ্টের পরিহাসে ঠকিবার পরম সরস কাহিনী। বিচারক গল্পে বিধবা প্রতিবেশিনীর সহিত প্রণয়ের এবং তাহার পরিণামের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা এই চিত্রের ঠিক বিপরীত। গল্পটির প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ও-হেনরির লেখা স্মরণ করাইয়া দেয়।

আমাদের দেশে একসময়ে বিবাহ-সভায় কন্যাপক্ষের উপর অত্যাচার করা বরপক্ষের নিয়মের মত ছিল। এখনো পল্লীগ্রাম অঞ্চলে এই অত্যাচার একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এইরূপ একটি অত্যাচারের কাহিনী লইয়া 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ'[3]

[1] ভারতী আশ্বিন ১৩০৭। [2] প্রদীপ আশ্বিন ১৩০৭।

লিখিত হইয়াছে। ধনিবংশের নিঃস্ব সন্তান যজ্ঞেশ্বরের ও তাঁহার পিসিমাতার ভূমিকা চমৎকার। গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীদের মহৎ মনোবৃত্তি বিশেষ সহানুভূতির সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

জমিদার-গোমস্তার শাসনের এক উজ্জল ক্রূর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে 'উলুখড়ের বিপদ' নামক নিতান্ত ছোট গল্পটিতে। সামনে পদাবনত ভৃত্য, অসাক্ষাতে সাঙ্ঘাতিক শত্রু—এইরূপ কুটিল চরিত্র হইতেছে "বাবুদের নায়েব গিরিশচন্দ্র বসুর।" একটি অল্পবয়সী দাসী গিরিশচন্দ্রের কবল হইতে পলাইয়া গ্রামের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ হরিহর ভট্টাচার্য্যের আশ্রয় লয়। এই অপরাধে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র তো গেলই, উপরন্তু পৈতৃক ভিটাও ছাড়িতে হইল। উকিলের বিশ্বাসঘাতকতায় যেদিন জজকোর্টে আপিলে ব্রাহ্মণের হার হইল তাহার পরদিন নায়েব মহাশয় "লোকজন সঙ্গে লইয়া ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গেল এবং বিদায় কালে উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাসে কহিল—প্রভু তোমারি ইচ্ছা।"

৮

'নষ্টনীড়'[১] আকারে ক্ষুদ্র উপন্যাসের মত হইলেও প্রকারে প্রায় ছোট-গল্পই। এই গল্পটিতে এবং সমকালীন 'চোখের বালি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমাজে যে-সামাজিকসম্পর্ক লইয়া বিপদ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে তাহা অসাধারণ সূক্ষ্মবোধ ও বিশ্লেষণশক্তির সহায়তায় পরম নৈপুণ্যের সহিত প্রকটিত করিয়াছেন। দুই স্থলেই পাত্রপাত্রীর মধ্যে দেবর-ভাজের সম্পর্ক। চোখের-বালিতে ভাজ বিধবা, নষ্টনীড়ে ভাজ সধবা বটে কিন্তু স্বামীর প্রতি অননুরক্ত। কাহিনী দুইটির সূক্ষ্ম দ্যোতনা এবং মনোদ্বন্দ্ব-হৃদয়দ্বন্দ্বের আলোছায়ার ব্যঞ্জনা ও কারুকার্য্য আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকের বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে দুর্নীতিপ্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। যে-দেশের গীতিকাব্যে[২] অনাদ্যহমান কাল হইতে দেবর-ভাজের সম্পর্ক লইয়া অযত্ন অশ্লীল

[১] ভারতী ১৩০৮। হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে ও গল্পগুচ্ছ পঞ্চম ভাগে সঙ্কলিত। [২] গাথা-সপ্তশতী ১-২৮, আর্য্যাসপ্তশতী ৩০২ দ্রষ্টব্য।

পরিহাসের উদাহরণ মোটেই অসুলভ নয় সে-দেশে সনাতন নীতিধর্ম্মের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এই নির্দ্দোষ নিরীহ কাহিনী দুইটির নিরর্থক অপবাদ দুর্বোধ্য বটে।

অমলের স্নেহ লইয়া চারু-মন্দার সংঘর্ষের পূর্ব্বাভাস অতিথি গল্পে চারু সোনামণির ভূমিকায় পাইয়াছি। আপদ গল্পে কিরণ সতীশের মধ্যে যে সম্পর্ক নষ্টনীড়ে চারু-অমলের সঙ্গেও সেই সম্পর্ক, তবে শেষের গল্পে দেবর স্বামীর সহোদর নয়, এবং স্বামীর হৃদয়ে স্থান না পাইয়া চারুর চিত্তে আপনার অজ্ঞাতসারে অমলের প্রতি যে আকর্ষণের সঞ্চার হইতেছিল তাহাও দেবরপ্রীতি বা সৌভ্রাত্র্য মাত্র নয়। চোখের-বালিতে বিনোদিনী সংসারাভিজ্ঞা, কতকটা জ্ঞানপাপিনী; মহেন্দ্র মেরুদণ্ডহীন, দুর্ব্বলচিত্ত; বিহারী সংযত, দৃঢ়চিত্ত। আর নষ্টনীড়ে চারু সরলহৃদয়া, অপাপবিদ্ধা; অমল কৌতুকপ্রবণ, সরলমন। বিহারীর চিত্তের অসাধারণ সংযম তাহাকে বাঁচাইয়া গিয়াছে, অমলের ভ্রাতৃভক্তি ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধ তাহাকে মহিমান্বিত করিয়াছে। ভূপতি-চারুর মধ্যে যে স্নেহ ও ভক্তি তাহা সুকুমার ও মধুর। ভূপতির অসাংসারিক উদার আত্মসমাহিত চরিত্রের ট্রাজেডিটুকু সূক্ষ্মকণ্টকের মত বড় বেদনাদায়ক; তাহার কাছে চারুর অকথ্যবিরহবেদনা লঘুতর হইয়া গিয়াছে।

ভূপতির যখন বিবাহ হয় তখন চারুলতার বয়স নিতান্ত অল্প। বালিকা বধূ চারুলতা যখনি ধীরে ধীরে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিল তখন ভূপতিকে রাজনৈতিক ও সম্পাদকী নেশা জোর করিয়া ধরিয়াছে; ভূপতির সাহচর্য্যের এবং প্রেমোচ্ছ্বাসের উত্তাপের অভাবে চারুর হৃদয়বৃত্তি স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। চারুর সন্তানও হয় নাই, এবং ভূপতির সংসারে এমন আর কেহ ছিল না যাহাকে স্নেহ করিয়া অথবা যাহার স্নেহ লাভ করিয়া চারুর মন সাধারণ পাঁচজন বধূর মতই সংসারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারে। "ধনী গৃহে চারুলতার কোন কর্ম্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফুলের মত পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিন-রাত্রির একমাত্র কাজ ছিল।" সুতরাং "যে সময়ে স্বামী স্ত্রী, প্রেমোন্মেষের

প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চিরনূতন বলিয়া প্রতিভাত হয় দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত প্রত্যূষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত হইয়া গেল।" ভূপতির পিস্‌তুত ভাই অমল আবদার করিয়া তাহাকে দিয়া ছোটখাট কাজ করাইয়া লইত, এবং "এই সকল ছোটখাট সখের খাটুনিতেই তাহার হৃদয়বৃত্তির চর্চ্চা এবং চরিতার্থতা হইত।" এই পথ ধরিয়াই চারুর হৃদয় ধীরে ধীরে অমলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। মন্দার প্রতি ঈর্ষ্যা তাহার এই প্রবৃত্তিতে প্রবলতা দিল।

উপকৃত বন্ধু কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া ভূপতির হৃদয় স্নেহ-সমবেদনার আকাঙ্ক্ষা করিয়া স্বতই চারুর কাছে নিজকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যেখানে দম্পতীর মধ্যে হৃদয়বৃত্তির পারস্পরিকতা নাই এবং যেখানে পত্নীর মন অপর বিষয়ে নিবিষ্ট সেখানে স্বামী হঠাৎ চাহিলেই কি সমবেদনা-সহানুভূতির স্নেহধারার অভিষেক পাইতে পারে? "চারুর কাছ হইতে আশঙ্কাধর্ম্মী ভালবাসার একটা কোন প্রশ্ন একটা কিছু আদর পাইলেই তাহার ক্ষতযন্ত্রণায় ঔষধ পড়িত। কিন্তু 'হ্যাদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া', এক মুহূর্ত্তের প্রয়োজনে প্রীতিভাণ্ডারের চাবি চারু যেন কোনখানে খুঁজিয়া পাইল না। উভয়ের সুকঠিন মৌনে ঘরের নীরবতা অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আসিল।" আসল ব্যাপার ভূপতি বুঝিয়াও বুঝিল না, কিন্তু অমলের কাছে চারুর মনোভাব এক মুহূর্ত্তে দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া গেল।

শুধু দাদাকে খুশি ও নিশ্চিন্ত করিবার জন্যই নয় চারুর কাছ হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্যও বিবাহ করিয়া অমল বিলাতে চলিয়া গেল। তাহাদের দুইজনের যে সামাজিক সম্পর্ক তাহা চারুকে ভাল করিয়া জানাইবার জন্যই যাইবার সময় তাহাদের পরিণামভীষণ সখ্যসম্পর্ক যেন শেষ করিয়া দিয়া "অমল ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল—চারু ছুটিয়া শয়নঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।"

অমল চলিয়া গেলে, কতকটা চারুকে সান্ত্বনা দিবার জন্যও বটে এবং

কতকটা অনুতাপের এবং স্নেহলাভের ব্যাকুলতার জন্যও বটে, ভূপতি চারুকে সাহচর্য্য দান করিতে এবং সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া তাহার প্রশংসা ও প্রীতি লাভ করিতে চেষ্টিত হইল। এইসময়ে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান লোপ পাইতে পারিত যদি চারু অমলের বিরহশোক মনের মধ্যে দিবারাত্র পুষিয়া রাখিয়া বাড়াবাড়ি না করিত। তাহার ও ভূপতির মধ্যে ব্যবধানকে চারুই দুস্তরতর করিয়া তুলিল; "চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না তাহার সমস্ত কর্ত্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুরঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালা-সজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিল সেখানে তাহার স্বামী বা পৃথিবীর আর কাহারও কোন অধিকার রহিল না।" ভূপতির সরলচিত্ত এই ব্যাপার তখনো তলাইয়া বুঝিতে পারিল না। তাহার পর যখন অমলের পত্রপ্রত্যাশায় চারুর ব্যগ্র ব্যাকুলতা ভূপতিকেও বিনাপ্রয়োজনে ছলনা করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গেল তখন তাহার মনে সন্দেহের কীট প্রবেশ করিল। ইহার পর চারুর চেষ্টা-ব্যবহার সবই ভূপতির কাছে নিদারুণ স্পষ্ট হইয়া উঠিল, "অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল, এবং যাহা মুহূর্ত্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল—সংসার একেবারে তাহার কাছে বৃদ্ধ শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল।"

চারুর সম্মুখে আত্মসংবরণ করিতে না পারায় অনতিবিলম্বে ভূপতির মনে অনুতাপ আসিল এবং চারুর বিষাদভারনম্রমূর্ত্তি তাহার মন পীড়িত করিতে লাগিল। আত্মস্থ হইয়া ভূপতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চারুকে বিচার করিয়া দেখিল। দেখিল, "ঐ একটি ক্ষীণশক্তি নারীর হৃদয় কি প্রবল সংসারের দ্বারা চারিদিকে আক্রান্ত হইয়াছে। এমন লোক নাই যাহার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারে, এমন কথা নহে যাহা ব্যক্ত করা যায়, এমন স্থান নাই যেখানে সমস্ত হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিতে পারে,—অথচ এই অপ্রকাশ্য, অপরিহার্য্য, অপ্রতিবিধেয়, প্রত্যহ পুঞ্জীভূত দুঃখভার বহন করিয়া নিতান্ত সহজ লোকের মত, তাহার সুস্থচিত্ত প্রতিবেশিনীদের মত তাহাকে প্রতিদিনের গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইতেছে।" ভূপতির মন সহানুভূতিতে আর্দ্র হইল। বিদায়-মুহূর্ত্তে চারু ব্যাকুলভাবে "তাহার হাত চাপিয়া হাত ধরিল, কহিল—আমাকে

সঙ্গে নিয়ে যাও! আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেওনা!" ভূপতি মুহূর্তের জন্য অভিমানে বিরূপ হইয়া গেল, সে বুঝিল, "অমলের বিচ্ছেদস্মৃতি যে বাড়িকে বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে চারু দাবানলগ্রস্ত হরিণীর ন্যায় সে বাড়ি পরিত্যাগ করিতে চায়। কিন্তু আমার কথা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না? আমি কোথায় পালাইব? যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিতে সময় পাইব না? নির্জ্জন বন্ধুহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গদান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব, তখন নিস্তব্ধ শোকপরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কি ভয়ানক হইয়া উঠিবে! যাহার অন্তরের মধ্যে মৃতভার তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখা সে আমি কতদিন পারিব! আরো কত বৎসর প্রত্যহ আমাকে এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে! যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেছে তাহার ভাঙ্গা ইটকাটগুলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?" ভূপতির বিমুখতায় চারু গুরুতর মানসিক আঘাত পাইল,—"চারু মুঠা করিয়া খাট চাপিয়া ধরিল।" ভূপতির স্বাভাবিক অনুকম্পা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল, সে বলিল,

"চল, চারু আমার সঙ্গেই চল!

চারু বলিল—না থাক্।"

ক্লাইমাক্‌সের মুখে এই উপসংহার চারু-ভূপতির ট্রাজেডিকে রসঘন করিয়াছে।

৯

স্বসম্পাদিত নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট-গল্পের মধ্যে প্রথম হইতেছে 'সৎপাত্র'।[১] চোখের-বালি সমাপ্ত হইবার পরে গল্পটি লেখা হইয়াছিল। কেন বলিতে পারি না, সৎপাত্র গল্পগুচ্ছে আদৌ সংগৃহীত হয় নাই।[২] বাড়ীর বাহিরে মৃদুবাক্ ভালমানুষ, বাড়ীর ভিতরে নিষ্ঠুরভাষী অত্যাচারী, সন্দিগ্ধচিত্ত পল্লীবাসী চাষী গৃহস্থ সাধুচরণের প্রথম দুই পত্নী সন্দেহজনকভাবে

[১] পৌষ ১৩০৯। [২] ইতিপূর্ব্বে কোন সমালোচকের চোখেও পড়ে নাই।

অকালে দেহত্যাগ করে। তৃতীয় পত্নী কিশোরী বিমলাও কি ভাবে সপত্নীদ্বয়কে অনুসরণ করিয়াছিল তাহাই এই গল্পের বিষয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন শোভন-ভাবে আবৃত ও সংযত অথচ ব্যঙ্গদিগ্ধ নিষ্ঠুর বাস্তব কাহিনী আর নাই। হয়ত এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ এটিকে গল্পগুচ্ছে স্থান দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বিমলার চরিত্র স্বাভাবিক ও শোভন। রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পে-উপন্যাসে সত্যকার villain বা পাষণ্ড-ভূমিকা নাই, কেবল এই গল্পটি ছাড়া। সাধুচরণ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট একমাত্র পাষণ্ড চরিত্র; কিন্তু সে স্বাভাবিক এবং লজিক্যাল। বনমালীর ভূমিকাও সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক ও সঙ্গত। অপর লেখকের হাতে পড়িলে এই চরিত্র নিশ্চয়ই অন্যভাবে চিত্রিত হইত।

অল্পস্বল্প ইংরেজী শিখিয়া এবং জাতীয়তার ভাণ করিয়া যে-শ্রেণীর কূটবুদ্ধি ব্যক্তি মকদ্দমার তদ্বির ও ঝগড়া-বিবাদে মাতব্বরি ফলাইয়া এবং সংবাদপত্রে কাজে অকাজে পত্রাঘাত করিয়া ও সংবাদদাতা সাজিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া থাকে তাহারি একটি নিখুঁত স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবি এই গল্পটির মূল্যবৃদ্ধি করিয়াছে। সাধুচরণের "পাড়ায় ভোলানাথ বলিয়া একটি এফে-ফেল্ যুবক বেকার বসিয়া আছে, সেই ভদ্রলোক নানা কৌশলে এই ভদ্রলোকটিকে বিচারের বজ্রমুষ্টি হইতে রক্ষা করিয়া পল্লীর সাধুবাদভাজন হইয়াছে।" বিমলার বেলাতেও ভোলানাথই সাধুচরণকে উদ্ধার করিল। "ভোলানাথের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি সংবাদপত্রের সংবাদদাতা। পুলিশের ঘুষ এবং অন্যায় অত্যাচার সম্বন্ধে তিনি অনেক লেখনী ক্ষয় করিয়াছেন।

"রাত্রি শেষ না হইতেই তাঁহার দ্বারে ঘা পড়িল। সাধুচরণের চাদর হইতে স্খলিত হইয়া তাঁহার বাক্সর মধ্যে কিছু টাকা ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

"পরদিন রাষ্ট্র হইল, সাধুচরণের যুবতী স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। বিমলার পিতা অবিশ্বাস প্রকাশপূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়া দোহাই দিয়া পড়িলেন। কিন্তু এবারেও এক ভদ্রলোক আর-এক ভদ্রলোককে রক্ষা করিল। ভোলানাথ পরোপকারী। সে নিজের জন্যও উপায় করিতে জানে।

"অনতিবিলম্বে অনেকগুলি বিবাহের প্রস্তাব আসিয়া উপস্থিত হইল। কন্যা-বৎসল পিতারা সৎকুলীনের মর্য্যাদা বোঝে।

"স্ত্রীর হিসাবে সাধুচরণের 'যত্র আয় তত্র ব্যয়'।"

গল্পটির বর্ণনাভঙ্গি দ্রুতগতি এবং crisp বা কাটাছাঁটা। এবিষয়েও রবীন্দ্র-সাহিত্যে গল্পটির বিশেষত্ব স্বীকার্য্য।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাহিত্যযশঃপ্রার্থিতা লইয়া প্রতিযোগিতার একটি বিশেষ সরস কাহিনী হইতেছে 'দর্পহরণ'[১] গল্পের বিষয়। পত্নীর নীরব ত্যাগস্বীকার পতিকে পরাজয়ের গ্লানি হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়ায় গল্পটির পরিণতি শোকাবহ হইতে পারে নাই।

'মাল্যদান'[২] একটি করুণ পেলব প্রেমকাহিনী। এক কিশোরী বালিকার অপরিণত মন যে কেমন করিয়া প্রেমের মৃদু-স্নিগ্ধ বর্ণচ্ছটায় বিকশিত হইয়াই চিরতিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া গেল তাহাই এই গল্পটিতে অনাড়ম্বরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

'কর্ম্মফল'[৩] গল্পের গঠনপদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আছে। গল্পটির আকার বড় এবং নাটকের মত কথোপকথনের দ্বারা বিবৃত, অনেকটা প্রজাপতির-নির্ব্বন্ধের ধরণের। এটিকে নাট্য-গল্প বলিতে হয়। নিঃসন্তানা ধনী মাতৃস্বসা কর্ত্তব্যপরায়ণ যথোচিতশাসনকারী পিতার পুত্রকে ভগিনীর সহায়তায় আদর দিয়া তাহার ইহকাল নষ্ট করিলেন; তাহার পর যখন তাঁহার সন্তান জন্মিল তখন ভগিনীপুত্রের উপর তাঁহার মনোভাব নিদারুণভাবে পরিবর্ত্তিত হইল,—এই মনোবৃত্তির সুষ্ঠু প্রকাশ এই গল্পে। বিদ্যাসাগরের ভুবনের মাসির কাহিনী রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়িলে যেরূপ হইতে পারিত এই গল্পে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

১০

কর্ম্মফল প্রকাশিত হইবার পর প্রায় সাড়ে তিন বৎসর কাল রবীন্দ্রনাথের কোন ছোট বা বড় গল্প প্রকাশিত হয় নাই। ১৩২১ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত

১ ফাল্গুন ১৩০৯। ২ চৈত্র ১৩০৯। ৩ কুন্তলীনপুরস্কার ১৩১০।

রবীন্দ্রনাথ (১৯০৭)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

[পৃ ৩০৭

রবীন্দ্রনাথের চারিটি মাত্র গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল,—'মাষ্টার মশায়,' 'গুপ্তধন,' 'রাসমণির ছেলে' এবং 'পণরক্ষা'। এই চারিটি গল্পের মধ্যে তিনটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পের অন্তর্ভুক্ত।

এক ধনী স্বেচ্ছাচারী বালকের স্নেহে বদ্ধ হইয়া অদৃষ্টবঞ্চিত স্নেহশীল মাতৃপরায়ণ সুদরিদ্র যুবকের ব্যর্থজীবনের পরম শোকাবহ অথচ মধুর কাহিনী 'মাষ্টার মশায়'[১] গল্পে শ্রেষ্ঠ রসসম্পদ লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে হরলালের মত ছেলে সর্ব্বত্রই দেখা যায়, এক হিসাবে তাহাকে পল্লীবাসী নিম্নমধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকের ছেলের টাইপ বলিয়া নেওয়া যায়। হরলালের "বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফঃস্বলের এন্‌ট্রেন্স স্কুলে কোনো মতে এন্‌ট্রেন্স পাশ করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। অনাহারে তাহার মুখের নিম্ন অংশ শুকাইয়া ভারতবর্ষের কন্যাকুমারীর মতো সরু হইয়া আসিয়াছে, কেবল মস্ত কপালটা হিমালয়ের মতো প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িতেছে। মরুভূমির বালু হইতে সূর্য্যের আলো যেমন ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি তাহার দুই চক্ষু হইতে দৈন্যের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে।"

মাষ্টার-মশায় গল্পটিকে মাতৃবাৎসল্যের গীতা বলিলে অন্যায় হয় না। যে-মায়ের স্নেহ ধ্রুবতারা হইয়া তাহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, যে-মায়ের বাৎসল্যে সে জীবনের চরম শ্রেয়ঃ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিল, এখন শেষ মুহূর্ত্তে অবাধ মুক্তির ক্ষণে সুবিপুল আনন্দে হরলালের মগ্ন চৈতন্য যেন সেই-মাতৃমূর্ত্তিতে বিশ্বরূপ দর্শন করিতে লাগিল। "হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারিদিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তা-ঘাট বাড়ি-ঘর দোকান-বাজার একটু একটু করিয়া তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে—বাতাস ভরিয়া গেল,

[১] প্রবাসী আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩১৪। কাহিনীটি প্রথম "ভূতের গল্প" বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছিল [মানসী ও মর্ম্মবাণী ফাল্গুন ১৩২৩ পৃ ১৬-১৭]।

আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গেল,· হরলালের শরীরমনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাহার মা অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল,—ঐ·গেল, তপ্ত বাষ্পের বুদ্বুদ একেবা ফাটিয়া গেল—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই; রহিল কেবল এ প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।" রবীন্দ্রনাথ শৈশবে মাতৃস্নেহসৌভাগ্য বিশেষ পান নাই, ত তাঁহার কাব্যে personal মাতৃমূর্ত্তি নাই, তাঁহার মাতৃস্নেহকল্পনা· বসুন্ধরা মূর্ত্তি ভাবান্বিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন, "মা যে কী জিনিষ জান কই আর। তাই তো তিনি আমার সাহিত্যে স্থান পেলেন না।"[১] এ যে সম্পূর্ণ সত্য নয় তাহার প্রমাণ এই গল্পটি এবং রাসমণির-ছেলে।

গল্পের অতিপ্রাকৃত উপোদ্ঘাতটুকু সাতিশয় শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায় যে সুতীব্র হৃদয়বেদনা নিদারুণ অপমান এবং অসামান্য মাতৃবাৎসল্য অনু করিতে করিতে হরলালের আত্মা দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিল তাঁহাই (ঠিকাগাড়ীর সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে সদ্য বিলাতফেরত বেণুগোপালের অবচে মনের কোণে সুপ্ত স্নেহের স্পর্শ পাইয়া মুহূর্ত্তের জন্য সজীব সত্তা লাভ করিয়াছি

'গুপ্তধন'[২] গল্পটিতে বিশুদ্ধ ধনলিপ্সার পরিণাম যে কিরূপ ভয়াবহ হইতে প তাহাই দেখান হইয়াছে। এড্গার অ্যালেন পো-র গল্পের ধরণে ইহা রচিত।

'রাসমণির ছেলে'[৩] আকারে ক্ষুদ্র উপন্যাসের মত। এত বড় মর্ম্মা ট্রাজিক গল্প বিশ্বসাহিত্যে অতি অল্পই আছে। এক কর্ম্মিষ্ঠা সংসারাভিজ্ঞা একদা ধনী অধুনা নিঃস্বপ্রায় বিরাট সংসারের এবং নিতান্ত অকর্ম্মণ্য নি স্বামীর ভার লইয়া এবং পরিশেষে জীবনের একমাত্র ভরসা পুত্রের বিয়োগবে বক্ষে চাপিয়া দিনের পর দিন কাটাইয়া গেল,—ইহাই গল্পটির বিষয়।

প্রধান ভূমিকা তিনটির মনোবৃত্তির বর্ণনায় ও বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ তাঁ স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতাকেও যেন ছাড়াইয়া গিয়াছেন। কালীপদর বালকসু সাধারণ মনোবৃত্তি তাহার মায়ের প্রভাবে ও উপদেশে সর্ব্ববিধ ত্যাগস্বী অনায়াসে বরণ করিতে উন্মুখ হইয়া উঠিল। এইখানে মাষ্টার-মশায়ের হরলা

১ 'ঘরোয়া' পৃ ।/· দ্রষ্টব্য। ২ ভারতী চৈত্র ১৩১৫। ৩ ভারতী আশ্বিন ১৩১৮।

সহিত তাহার পার্থক্য। হরলালের হৃদয়বৃত্তি আশৈশব নিপীড়িত হইয়াছিল, শুধু তাহার মায়ের নীরবস্নেহই তাহার মনের জোরের একমাত্র উৎস ছিল। কালীপদ বাপের ও মায়ের ভালবাসা তো পাইয়াই ছিল, উপরন্তু তাহার পিতা নিজের জীবনের যে নৈরাশ্যকরুণ দিকটা সর্ব্বদা গোপন করিয়া চলিতেন তাহাও তাহাকে সুগভীর বেদনা দিয়া অকালে সংসারাভিজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছিল। একদা একটা পাখা-করা মেম পুতুল দেখিয়া কালীপদ পাইবার জন্য জেদ করিয়াছিল। সেটি কিনিবার মত সামর্থ্য ভবানীচরণের ছিল না, এবং কালীপদকে তাহার প্রার্থিত বস্তু না দিবার মত মনের জোরও ছিল না। রাসমণি একদিন গোপনে কালীপদকে বুঝাইলেন, "কিন্তু মেমের দিক হইতে মন একমুহূর্ত্তে ফিরাইয়া আনা কত কঠিন তাহা বয়স্ক পাঠকদের বুঝিতে কষ্ট হইবে না।" মায়ের কথাতে কালীপদর মন বুঝিল না, তবুও সে বাবাকে বলিতে আসিল বাবা আমার সেই মেম আর চাই না। ভবানীচরণ তাহার কথা সব না শুনিয়াই কাজ আছে বলিয়া ব্যস্ত হইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। "কালীপদ তাহাদের বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পিতা যে কোনো কাজেই যাইতেছেন না, তাহা তাঁহার গতি দেখিয়াই বুঝা যায়—প্রতি পদক্ষেপেই তিনি যে একটা নৈরাশ্যের বোঝা টানিয়া টানিয়া চলিয়াছেন এবং তাহা কোথাও ফেলিবার স্থান নাই, তাহা তাঁহার পশ্চাৎ হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। কালীপদ অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মা, আমার সেই পাখা-করা মেম চাই না।" শৈশব হইতেই "কালীপদ মাতার মন্ত্রণার সঙ্গী হইয়া উঠিল," বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সে সংসারের ভাবনাচিন্তায় তাহার মায়ের বোঝার কতকটা নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইল,—ইহাই তাহার জীবনের ট্র্যাজেডি। পিতার প্রতি সমবেদনায় কালীপদ ভূমিকায় পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায় স্বর্ণমৃগ গল্পে বৈদ্যনাথের বড় ছেলের নিতান্ত সংক্ষিপ্ত চিত্রে।

রাসমণি কর্ম্মিষ্ঠা, স্নেহশীলা, কঠোর-কর্ত্তব্যপরায়ণা গৃহিণী। অকর্ম্মণ্য ও বালকতুল্য সরলহৃদয় স্বামীর অতীত ঐশ্বর্য্যের মোহ ও ভবিষ্যৎ সমারোহের মরীচিকা তাহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। রাসমণি "শানিয়াড়ির

চৌধুরীদের বংশগৌরব সম্বন্ধে কোনো দিন উদ্বেগ অনুভব করেন নাই। ভবানী তাহা জানিতেন এবং ইহা লইয়া মনে মনে তিনি হাসিতেন—ভাবিতেন, যেরূপ সামান্য দরিদ্র বৈষ্ণব বংশে স্ত্রীর জন্ম তাহাতে তাহার এ ত্রুটি ক্ষমা করাই উচিত—চৌধুরীদের মানমর্য্যাদা সম্বন্ধে ঠিক মতো ধারণা করাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।" "রাসমণি যে কেবল পাকশালায় অন্ন পাক করেন তাহা নহে অন্নের সংস্থানভাবও অনেকটা তাঁহার উপর," "কেবল ঘরের কাজ নহে—তালুক ব্রহ্মত্র অল্পস্বল্প যা কিছু এখনো বাকি আছে তাহার হিসাবপত্র দেখা, খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা সমস্ত রাসমণিকে করিতে হয়।" স্বামীর প্রতি রাসমণির আচরণ ছিল নিতান্ত স্নেহ-কোমল, বাৎসল্যবিজড়িত। "রাসমণির অনেক বয়স পর্য্যন্ত সন্তান হয় নাই,—এই তাঁহার অকর্ম্মণ্য সরলপ্রকৃতি পরমুখাপেক্ষী স্বামীটিকে লইয়া তাঁহার পত্নীপ্রেম এবং মাতৃস্নেহ দু-ই মিটিয়াছিল। ভবানীকে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বলিয়াই দেখিতেন।" পুত্র জন্মিলেও ভবানীচরণের প্রতি রাসমণির ব্যবহারের অন্যথা হইল না। ছেলেকে তিনি নিজের দলের মনে করিতেন, তাই তাহার ব্যবস্থা নিজেরই মত মোটামুটি,—"সে তো তাহারই গর্ভের সন্তান—তাহার আবার কিসের বাবুয়ানা! সে শক্ত-সমর্থ কাজের লোক—অনায়াসে দুঃখ সহিবে ও খাটিয়া খাইবে।" স্বামীকে তিনি দেখিতেন চৌধুরীবংশের সন্তান, তাই তাঁহার ব্যবস্থা ছিল বড়মানুষের মত। স্বামীর প্রতি বাৎসল্যবিজড়িত-স্নেহই রাসমণিকে তীব্রতম পুত্রশোক চাপিয়া রাখিয়া আবার পূর্ব্বের মতই শানিয়াড়ি চৌধুরীবাড়ির বৈভবহীন গুরুভার বহনের এবং তাহার শেষ প্রদীপটির স্নেহাসার জোগানোর দায়িত্ব নীরবে তুলিয়া লইতে হইয়াছিল। স্বামীর মুখ চাহিয়া তিনি এতটুকুও শোক করিবার অবসর পান নাই। "তাঁহার পুত্র আবার তাঁহার স্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল—স্বামীর মধ্যে আবার দুইজনেরই ভার তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের উপর তিনি তুলিয়া লইলেন। তাঁহার প্রাণ বলিল আর আমার সয় না। তবু তাঁহাকে সহিতেই হইল।"

ভবানীচরণের কাছে কালীপদ তো শুধু ছেলে নয়, তাঁহার হারানো বংশ-গৌরব ফিরাইবার জন্যই তো সে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাই "এতদিন পর্য্যন্ত

দারিদ্র্যকে তিনি নিতান্তই একটা খেলার মতো সকৌতুকে অতি অনায়াসেই বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলের সম্বন্ধে সে ভাবটি তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না।" লেখাপড়ায় কালীপদর কৃতিত্বে, তাহার কলিকাতা গমনে, ভবানীচরণ পিতৃগর্বে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলি, এমন কি তাঁহার মুখে "উইল-চুরির কথাটা এখন আর তেমন শোনা যায় না। এখন তাঁহাব একমাত্র আলোচনার বিষয় কালীপদ। তাহাবই কথা বলিবার জন্য তিনি এখন সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাহার চিঠি পাইলে ঘবে ঘরে তাহা পড়িয়া শুনাইবাব উপলক্ষ্যে নাক হইতে চশমা আর নামিতে চায় না। কোনোদিন এবং কোনোপুরুষে কলিকাতায় যান নাই বলিয়াই কলিকাতার গৌরববোধে তাঁহার কল্পনা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল।" ধীরে ধীবে কালীপদ যে তাঁহার অন্তর হইতে অপহৃত ঐশ্বর্য্যকে দূরীভূত করিয়া জুড়িয়া বসিয়াছিল তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই, তাই যখন তাঁহাব হাতে হারানো উইল পৌঁছিল তখন কালীপদ নাই বলিয়া তাহাব আব কোন মূল্য রহিল না। পুত্রবিয়োগে ভবানীচবণের অন্তর্দাহ রাসমণির মূক শোকের অপেক্ষা দুঃসহ। রাসমণির স্বামী রহিল, সে-স্বামীব মধ্যে তাহার বাৎসল্যের কিছু চরিতার্থতাও রহিল, ভবানীচবণের কিছুই রহিল না। এই কোমলহৃদয় সরলবিশ্বাসী ব্যক্তিটির শূন্য হৃদয়ের অশ্রুত হাহাকার চৌধুরীবাড়ির কক্ষে কক্ষে আকাশে বাতাসে অনবরত জাগিয়া রহিল।

'পণরক্ষা'[১] মাষ্টার-মশায় ও রাসমণির-ছেলের সমপর্য্যায়ের গল্প। মাষ্টার-মশায়ে মাতৃ-অনুরক্তি মাতৃশরণ্য ও ছাত্রবাৎসল্য, রাসমণিব ছেলেতে স্বামি-বাৎসল্য পুত্রবাৎসল্য ও মাতাপিতৃ-অনুরক্তি, আর পণরক্ষায় অনুজবাৎসল্য ও অগ্রজ-অনুরক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে। পণরক্ষায় রসিক বংশীর ছোট ভাই হইলেও তাহার প্রতি বংশীর স্নেহ মাতৃস্নেহেরই রূপান্তর। এক বছর বয়সে মাতৃহীন এবং তিন বছর বয়সে পিতৃহীন রসিককে বংশী একাই মানুষ করিয়াছিল, সে-কারণে "বংশীবদন তাহার ভাই রসিককে যেমন ভালোবাসিত এমন করিয়া সচরাচর মাও ছেলেকে ভালোবাসিতে পারে না।" পৈতৃক ব্যবসায় তাঁতের

[১] ভারতী পৌষ ১৩১৮।

কাজে রসিকের কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না, অথচ "সকল বিষয়েই রসিকের এমন নৈপুণ্য ছিল যে তাহার চেয়ে উচ্চবংশের ছেলেরাও তাহাকে খাতির না করিয়া থাকিতে পারিত না।" বিবাহের বয়স বংশীর গতপ্রায়। রসিকের অনুরক্ত ভক্ত-বৃন্দের অন্যতমা সৌরভীকে রসিকের বধূ করিয়া আনিবার জন্য সে প্রাণপণ করিয়া পণসঞ্চয় করিতে লাগিল। টাকা যখন জমিয়া উঠিয়াছে তখন রসিকের খেয়াল হইল বাইসিক্‌ল্ কিনিবে। অসুস্থশরীর বংশী একদিন রসিককে অকর্ম্মণ্যতার জন্য তিরস্কার করিল, তাহার পর অনুতপ্ত হইয়া বাইসিক্‌লের টাকা দিতে চাহিলে রসিক রাগ করিয়া গৃহত্যাগ করিল। গ্রাম ছাড়িবার পূর্ব্বে সে সারারাত জাগিয়া একটি কাঁথার নক্‌শা তোলা শেষ করিয়া সৌরভীকে সেইটি দান করিয়া গেল। নানাবিধ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেশত্যাগী রসিকের হৃদয় বাড়ি ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এমন সময় অদৃষ্টের ফেরে সে এক স্বজাতীয় বড়লোকের নজরে পড়িয়া গেল। রসিককে দেখিয়া ও তাহার কুলমর্য্যাদা শুনিয়া তাহাকে ঘরজামাই করিতে জানকীবাবু উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। জানকীবাবু তাহার দাদাকে খবর দিতে চাহিলে রসিক নিষেধ করিল। সে ভাবিল, "সমস্ত কাজ নিঃশেষে সারিয়া তাহার পরে সে দাদাকে চমৎকৃত করিয়া দিবে,. অকর্ম্মণ্য রসিকের যে সামর্থ্য কী রকম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনো ত্রুটি থাকিবে না।" শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। রসিক "অন্যান্য সকল প্রকার দানসামগ্রীর আগে একটা বাইসিক্‌ল্ দাবী করিল।"

যে বাইসিক্‌লের জন্য দাদার উপর রাগ করিয়া রসিক দেশত্যাগ করিয়াছিল সেই বাইসিক্‌ল্ পাইয়া রসিক এখন গ্রামে ফিরিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল একদা সন্ধ্যায় সে বাইসিক্‌ল্ চালাইয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। শহরবাসী ধনীর জামাতা রসিকের বেশভূষা সবই পাল্‌টাইয়া গিয়াছে। "রসিক কলার পরানো শার্টের উপর মালকোঁচা মারিয়া ঢাকাই ধুতি পরিয়াছে ; —শার্টের উপরে বোতামখোলা কালো বনাতের কোট, পায়ে রঙীন ফুলমোজা ও চক্‌চকে কালো চামড়ার সৌখীন বিলাতী জুতা।" বাড়ির সামনে আসিয়া বাইসিক্‌ল্ হইতে নামিয়া পড়িয়া রসিক দেখিল বাহির দরজায় তালা লাগানো। "জনহীন পরিত্যক্ত

বাড়ির যেন নীরব একটা কান্না উঠিতেছে—কেহ নাই—কেহ নাই। এক নিমিষেই রসিকের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিয়া চোখের সামনে সমস্ত অস্পষ্ট হইয়া আসিল।" সৌরভীর বাবা আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। তাহাদের বাড়িতে ঢুকিয়াই রসিক "মুহূর্ত্তকালের জন্য দেখিতে পাইল, সৌরভী তাহার সেই চিত্রিত কাঁথায় মোড়া কী একটা জিনিষ অতি যত্নে রোয়াকের দেয়ালে ঠেসান দিয়া রাখিতেছে। প্রাঙ্গণে লোক সমাগমের শব্দ পাইবামাত্রই সে ছুটিয়া ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। রসিক কাছে আসিয়াই বুঝিতে পারিল এই কাঁথায় মোড়া পদার্থটি একটি নূতন বাইসিক্‌ল্। তৎক্ষণাৎ তাহার অর্থ বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না।" রসিক শুনিল, তাহার চলিয়া যাইবার পর বংশী দিনরাত্রি অবিশ্রাম খাটিয়া সৌরভীর পণ এবং এই বাইসিক্‌ল্ কিনিবার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল। "ক্লান্ত ঘোড়া যেমন প্রাণপণে ছুটিয়া গম্যস্থানে পৌঁছিয়াই পড়িয়া মরিয়া যায়, তেমনিই যেদিন পণের টাকা পূর্ণ করিয়া বংশী বাইসিক্‌লটি ভি, পি, ডাকে পাইল সেই দিনই আর হাত চলিল না, তাহার তাঁত বন্ধ হইয়া গেল; —গোপালের পিতাকে ডাকিয়া তাহার হাতে ধরিয়া সে বলিল, 'আর একটি বছর রসিকের জন্য অপেক্ষা করিয়ো—এই তোমার হাতে পণের টাকা দিয়া গেলাম, আর যেদিন রসিক আসিবে তাহাকে এই চাকার গাড়িটি দিয়া বলিয়ো—দাদার কাছে চাহিয়াছিল, তখন হতভাগ্য দাদা দিতে পারে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে যেন সে রাগ না রাখে।"

দাদার টাকার উপহার লইবে না—তাহার এই শপথ আজ তাহার অন্তরকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়িত করিতে লাগিল; একটি তাহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, অপরটি লইবার আর উপায় নাই। "আজ যখন রসিক ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল দাদার উপহার তাহার জন্য এতদিন পথ চাহিয়া বসিয়া আছে—কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার দ্বার একেবারে রুদ্ধ।"

বংশীর ও রসিকের অন্তর্বেদনা মর্ম্মন্তুদ, সন্দেহ নাই। কিন্তু গল্পের উপেক্ষিতা সৌরভীর মনোবেদনার পরিমাপ কোথায়। ভ্রাতার ভাবিবধূর পণ এবং প্রার্থিত বাইসিক্‌লের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া বংশীর চিত্ত কিছু সান্ত্বনা পাইয়াছিল

নিশ্চয়ই। রসিক কলিকাতা শহরে "টাকায় হাড়কাটে চিরকালের মতো আপনার জীবন বলি দিয়া আসিয়াছে," সুতরাং এক হিসাবে সেও নিশ্চিন্ত। কিন্তু রসিকের একান্ত অনুরক্ত শান্ত নিরীহ সঙ্কোচশীলা সৌরভী, যে-সৌরভী পৃথিবী "কোনো দুর্লভ জিনিষ দাবী করিতে শেখে নাই," রসিকের সঙ্গে বিবাহ স্থির হইয়াছে জানিয়া যে-সৌরভীর কিশোরীহৃদয় শান্ত আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অন্তরের ভাণ্ডার তো ধূলিসাৎ হইয়া গেল—তাহার সম্বল রহিল কী ?

১১

১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে 'সবুজপত্র'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই উপলক্ষ্যে গল্পলেখায় রবীন্দ্রনাথ আবার যেন সাধনার যুগে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সবুজপত্রের প্রথম সাত সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের সাতটি গল্প প্রকাশিত হইল। এগুলি পরে 'গল্প-সপ্তক' নামে পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়াছে। এই গল্পগুলির রচনারীতিতে নূতনতর বৈশিষ্ট্য দেখা গেল।

গল্পগুলির বিষয়ে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে, তবে সবগুলির ভিতরে একটি মাত্র মূল সুর রহিয়াছে,—মূঢ়তার ফলে ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক ভক্তিভালবাসার অমর্যাদা অথবা প্রত্যাখ্যান। রচনাশৈলীতে কথ্যভাষাব রীতি বিশেষ করিয়া অনুসৃত হইল, এবং পূর্ব্বেকার গল্পের সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের স্থানে কচিৎ স্পষ্ট বিদ্রুপ বা sarcasm দেখা দিল, এবং বিরোধাভাসের প্রয়োগে বাগ্‌ভঙ্গিতে বুদ্ধিগ্রাহ্য ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিল।

'হালদার-গোষ্ঠী' গল্পে সনাতন পারিবারিক এবং সাংসারিক জ্ঞানের সহিত এক সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল উদার ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ প্রস্ফুট হইয়াছে। বনোয়ারিলালেব ব্যক্তিত্ব হালদার-গোষ্ঠীর কুলক্রমাগত পরিবেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হইল তাহার পরিণামে সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে একক দেখিয়া দূরে সরিয়া গেল। বনোয়ারিলালের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল তাহার স্ত্রীর ব্যবহার ; সংসারের প্রভাব যখন কিরণ্‌কে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিল তখনি সে বুঝিল যে হালদার-বাড়িতে সে একান্তই নিষ্প্রয়োজন। দেবরপুত্র হরিদাসকে কিরণ পুত্রের মত স্নেহ করিতেছে দেখিয়া এবং তাহার নিজের প্রতি হরিদাসের অবোধ অনুরক্তি অনুভব করিয়া বনোয়ারি ভাবিল, হরিদাসের মঙ্গলের জন্যই তাহাকে সরিয়া যাইতে

হইবে। তাই সে সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না। সংসারে বনোয়ারি যে দুইজনের কাছে অকৃত্রিম অনুরাগ পাইয়াছিল, সে দুইজনই অবোধ,—তাহার পোষা কুকুর আর ভাইপো হরিদাস।

সাংসারিক জ্ঞানের অশুচিতাবর্জ্জিত, সরল, তেজস্বিনী, শিক্ষিত এক তরুণী সঙ্কীর্ণচিত্ত অনুদার শ্বশুরগৃহের নিঃস্নেহ পরিবেশে অকথ্য মনোভঙ্গে পীড়িত হইয়া অকালে ঝরিয়া পড়িল,—ইহাই 'হৈমন্তী' গল্পের কাহিনী। দেনা-পাওনা গল্পের সঙ্গে এই গল্পের কিছু সাধর্ম্ম্য আছে। পুষ্পিত বর্ণনাশৈলী কাহিনীটির বাতাবরণকে ঘিরিয়া যেন বেদনাময় সজীব রূপ ধারণ করিয়াছে।

> বাড়িতে এখন সকলে বলিতে আরম্ভ করিল—এইবার অপুর মাথা খাওয়া হইল। বি, এ, ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কী?
>
> সে তো বটেই! দোষ সমস্ত হৈমর। তাহার দোষ যে তাহার বয়স সতেরো, তাহার দোষ যে আমি তাহাকে ভালবাসি, তাহার দোষ যে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমস্ত আকাশ আজ বাঁশি বাজাইতেছে।

হৈমন্তীর প্রকৃতি তাহার শ্বশুরবাড়ীর কাছে একেবারে অবোধ্য ও অগম্য ছিল, তাই এই সরল সত্যসন্ধ বালিকার দোষ তাহারা পদে পদে দেখিত। এই বিরুদ্ধতার বিষবাষ্পে হৈমন্তীর যেন শ্বাসরোধ হইতেছিল। হঠাৎ একদিন অপূর্ব্বর চোখে হৈমন্তীর মনের গভীর বেদনা ধরা পড়িয়া গেল।

> একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে বাহিরের ঘরে বসিয়া মার্টিনোর চরিত্রতত্ত্ব বইখানার বিশেষ বিশেষ লাইনের মধ্যপথগুলা ফাড়িয়া ফেলিয়া নীল পেন্সিলের লাঙল চালাইতেছিলাম এমন সময় বাহিরের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়িল।
>
> আমার ঘরের সমুখে আঙিনার উত্তর দিকে অন্তঃপুরে উঠিবার একটা সিঁড়ি। তাহারই গায়ে গায়ে মাঝে মাঝে গরাদে দেওয়া এক একটা

জানালা। দেখি তাহারই একটি জানালায় হৈম চুপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া। সেদিকে মল্লিকদের বাগানে কাঞ্চন গাছ গোলাপি ফুলে আচ্ছন্ন।

আমার বুকে ধক্‌ করিয়া একটা ধাক্কা দিল—মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপটি আমি এতদিন স্পষ্ট করিয়া দেখি নাই।

কিছু না, আমি কেবল তাহার বসিবার ভঙ্গীটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম। কোলের উপরে, একটি হাতের উপর আর একটি হাত স্থির পড়িয়া আছে, মাথাটি দেওয়ালের উপরে হেলানো, খোলা চুল বাম কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপব ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার বুকের ভিতরটা হুহু করিয়া উঠিল।

হৈমন্তীর পিতার চরিত্র 'চতুরঙ্গ'-এর জ্যাঠামশাইয়ে পরিণতি পাইয়াছে।

'বোষ্টমী' গল্পে প্রেমের এক অপূর্ব্ব মহনীয় রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রেম যখন সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিয়া কামনামাত্রশূন্য হয় তখনপ্রেমাস্পদের জন্য হয়ত তাহাকেই ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, এবং মানবপ্রেম তখন ভগবৎপ্রেমের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এই একান্ত বাস্তব গল্পটিতে পরম নৈপুণ্য ও অগাধ সহানুভূতির যোগে, অত্যন্ত সংযত ও সংক্ষিপ্ত রেখায়, বোষ্টমীর নিতান্ত সাধারণ অথচ অসাধারণ জীবনের চিত্র উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া চিরন্তন রসরূপ ধারণ করিয়াছে। গল্পটিতে বোষ্টমীকে উপলক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও সাধনার যে সুগভীর তাৎপর্য্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে তাহাতে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতিরও একটা গভীর ও অত্যদ্ভুত প্রকাশ দেখি। "কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ"—এই হইতেছে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের মূলকথা; বৈষ্ণব তত্ত্বে নরনারীর স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্য ভগবৎপ্রেমেরই প্রতিচ্ছায়া, এবং এই বৃত্তিগুলির চরম উৎকর্ষ ভগবদুপলব্ধিতে পৌছাইয়া দিতে পারে। বোষ্টমীর সাধনাও তাহাই। স্বামীর নীরব ভালবাসা, ছেলের ব্যাকুল অনুরক্তি,—ইহাই তাহার গুরু; এই ভালবাসাই তাহাকে সত্যের দিকে পরম ভালবাসার পথে বাহির করিয়া দিয়াছিল। "পৃথিবীতে

দুটি মানুষ আমাকে সবচেয়ে ভালবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।"

বোষ্টমীর স্বামীর চিত্রটুকু বড মধুর। "আমার স্বামী বড়ো সাদা মানুষ। কোনো কোনো লোকে মনে করিত তাঁহার বুঝিবার শক্তি কম। কিন্তু আমি জানি, যাহারা সাদা করিয়া বুঝিতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে।... আমার স্বামী মাথার উপরে একজন উপরওয়ালাকে না বসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন কি, বলিতে লজ্জা হয়, আমাকে যেন তিনি ভক্তি করিতেন। তবু আমার বিশ্বাস, তিনি আমার চেয়ে বুঝিতেন বেশি, আমি তাঁহার চেয়ে বলিতাম বেশি।" গভীর রাত্রে যখন সমস্ত নীরব এবং অন্ধকার "তখনি আমার স্বামীর মন যেন তারার মতো ফুটিয়া উঠে। সেই আঁধারে এক একদিন তাঁহার মুখে একটা আধটা কথা হঠাৎ শুনিয়া বুঝিতে পারি এই সাদা মানুষটি যাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে বুঝিতে পারেন।" গুরুদেবের চরিত্র চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য সংযম দেখাইয়াছেন। এই চরিত্রের সঙ্গে উদ্ধার গল্পের গুরুর চরিত্র তুলনীয়। চতুরঙ্গে লীলানন্দ স্বামীর ভূমিকা কতকটা অনুরূপ হইলেও এতটা পরিস্ফুট নয়।

রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পের মূলে অল্পস্বল্প বাস্তব চরিত্র বা ঘটনা আছে, কিন্তু সে বাস্তবিকতার সহিত কাহিনীর সম্পর্ক খুব গভীর নয়। বোষ্টমী গল্পটি সেরূপ নয়, রবীন্দ্রনাথের গল্পের মধ্যে ইহা সব চেয়ে জলন্ত বাস্তব। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই শিলাইদহে কিংবা সাজাদপুরে আনন্দী বোষ্টমীর মত কোন বোষ্টমীর পরিচয় পাইয়াছিলেন, এবং অনুমান করি তাঁহার নিকট হইতে হয়ত স্বীয় অতুলনীয় রসদৃষ্টিতে কিছু স্বচ্ছতাও লাভ করিয়াছিলেন। কবে যে এই বোষ্টমীর সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহা জানিতে পারি নাই। জানিলে বোঝা যাইত, গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্যে এবং সমসাময়িক গল্পরচনায় যে বাউল-গানের প্রভাব এবং বৈষ্ণব রসদৃষ্টির পরিচয় বিশেষ করিয়া পাওয়া যায় তাহার অন্যতম

উৎস ইহাই কিনা। পরবর্ত্তী কালে বিদেশে কবির মনে একাধিকবার আন্দী বোষ্টমীর কথা মনে পড়িয়াছিল।[১]

গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ অনেকখানিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এমন স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশ তাঁহার জীবনস্মৃতি ছাড়া অন্যত্র পাই না। রবীন্দ্র-জীবনীর তত্ত্বগত আলোচনায় বোষ্টমীর কথা বাদ দেওয়া চলে না। বিসদৃশ সমালোচনায় সকল লেখকই বিচলিত হয় বটে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বেশি বিচলিত হইবার আরো কারণ আছে। আমাদের দেশে সাহিত্যসমালোচনা প্রায়ই ব্যক্তিগত নিন্দায় পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর মন এইরূপ ব্যক্তিগত সমালোচনায় অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিত। তাই তিনি বোষ্টমীতে লিখিয়াছেন,

"আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম্ম নয়, এইজন্য লোকেও আমাকে সদাসর্ব্বদা যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালীর ভাগই বেশি।...

"কলিকাতা হইতে দূরে নিভৃতে আমার একটি অজ্ঞাতবাসের আয়োজন আছে; আমার নিন্দা-চর্চ্চার দৌরাত্ম্য হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি। সেখানকার লোকেরা এখনো আমার সম্বন্ধে কোনো একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছে নাই। তাহারা দেখিয়াছে আমি আমি ভোগী নই, পল্লীর রজনীকে কলিকাতার কলুষে আবিল করি না; আবার যোগীও নই, কারণ দূর হইতে আমার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ধনের লক্ষণ আছে। আমি পথিক নহি, পল্লীর রাস্তায় ঘুরি বটে কিন্তু কোথাও পৌছিবার দিকে আমার কোনো লক্ষ্যই নাই; আমি যে গৃহী এমন কথা বলাও শক্ত, কারণ ঘরের লোকের প্রমাণাভাব। এইজন্য পরিচিত জীবশ্রেণীর মধ্যে আমাকে কোনো একটা প্রচলিত কোঠায় না ফেলিতে পারিয়া গ্রামের লোক আমার সম্বন্ধে চিন্তা করা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছে— আমিও নিশ্চিন্ত আছি।...

"সেইদিন সন্ধ্যার সময় যখন ছাদে বসিয়াছি, বোষ্টমী আমার পায়ের কাছে

[১] 'বনবাণী' কাব্যের ভূমিকা এবং 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' (১১ই ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫) দ্রষ্টব্য।

আসিয়া বসিল। কহিল, 'আজ সকালে নাম শুনাইবার সময় তোমার প্রসাদী ফুলগুলি ঘরে ঘরে দিয়া আসিয়াছি। আমার ভক্তি দেখিয়া বেণী চক্রবর্ত্তী হাসিয়া বলিল, পাগলি, কা'কে ভক্তি করিস্ তুই? বিশ্বের লোকে যে তাকে মন্দ বলে। হাগো, সকলে নাকি তোমাকে গালি দেয়?'

"কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য মনটা সঙ্কুচিত হইয়া গেল। কালীর ছিটা এত দূরেও ছড়ায়!

"বোষ্টমী বলিল, 'বেণী ভাবিয়াছিল আমার ভক্তিটাকে এক ফুঁয়ে নিবাইয়া দিবে। কিন্তু এ তো তেলের বাতি নয়, এ যে আগুন। আমার গৌর, ওরা তোমাকে গালি দেয় কেন গো?'

"আমি বলিলাম, 'আমার পাওনা আছে বলিয়া। আমি হয় তো একদিন লুকাইয়া উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়াছিলাম।"

বোষ্টমী লেখাপড়ার শিক্ষা পায় নাই, দর্শন-উপনিষদ্ পড়ে নাই, যোগাভ্যাস করে নাই। তাহার হৃদয়ে-যে সত্যের আবির্ভাব, সে তো আপনিই হইয়াছে; তাহার ভালবাসাই তাহাকে যিনি "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করাইয়াছে। বাউল-কবি বলে, "মত্ত হস্তী টের পেলে না, চেঁউটি মরম জেনেছে।" রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "আমি গীতা পড়িয়া থাকি এবং বিদ্বান লোকদের দ্বারস্থ হইয়া তাহাদের কাছে ধর্ম্মতত্ত্বের অনেক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। কেবল শুনিয়া শুনিয়াই বয়স বহিয়া যাইবার যো হইল, কোথাও তো কিছু প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দৃষ্টির অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া এই শাস্ত্রহীনা স্ত্রীলোকের দুই চক্ষুর ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার একি আশ্চর্য্য প্রণালী।"

সন্তানহীনা, স্নেহশীলা, বৃহৎপরিবারের এক বধূ মাতাপিতৃহীনা অনাথা রূপহীনা লাঞ্ছিতা এক বালিকাকে ভালবাসিয়া এবং তাহার ভালবাসা পাইয়া ধন্য হইয়াছিল,—ইহাই 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের বিষয়। সংসারের নির্ম্মম অত্যাচারের মধ্যে বিন্দুকে আশ্রয় দিয়া এবং ভালবাসিয়া, তাহার সেই ভালবাসার দীপ্তিতে মেজ-বৌ সংসারের কৃত্রিম বন্ধনের বাহিরে নিজের মুক্ত স্বরূপ উপলব্ধি করিলেন। নিজের লাঞ্ছিত

জীবন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এবং তাহার ভালবাসার একমাত্র আস্পদ মেজ-বৌকে শাস্তি দিবার জন্য বিন্দু যেদিন আত্মঘাতিনী হইল সেদিনের আঘাত মেজ-বৌয়ের শিথিল গৃহবন্ধন ছিন্ন করিয়া দিল। "সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজ্‌ল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধ্‌ল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম্ জগতের মধ্যে যা-কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চারদিকে-প্রাচীর তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্বুদটা এমন ভয়ঙ্কর বাধা কেন?"

বোষ্টমীর সঙ্গে এই গল্পের মর্ম্মগত ঐক্য আছে। প্রকৃত অর্থাৎ স্বার্থহীন ভালবাসা বন্ধনের সৃষ্টি করে না, তাহা সংসারের ও সমাজের মিথ্যা জঞ্জাল হইতে মুক্ত করিয়া মানুষকে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া দেয়। ইহাতেই মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তি ও চরম আনন্দ। সবুজপত্রে স্ত্রীর-পত্র প্রকাশিত হইবার পর সাহিত্যরসিকসমাজে কিছু আলোড়ন হইয়াছিল। বাঙ্গালী ভদ্রঘরের অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ বাতাবরণের নিরানন্দ রূপের প্রকাশ এই গল্পটিতে অপূর্ব্বভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহার উপর স্ত্রীলোকের স্বাধীন আধ্যাত্মিক সত্তা ও সাধনার আবশ্যকতা স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা প্রাচীনপন্থীদের একেবারেই মনঃপূত হয় নাই। সাহিত্যে তথাকথিত নারীপ্রগতির উদ্দাম আবির্ভাব আশঙ্কা করিয়া ইঁহারা আতঙ্কিত হইলেন। কিন্তু বুঝিলেন না যে মেজ-বৌরা সংসারে খুব সুলভ নয়, এবং কোন সমাজবন্ধন বা সংসারশৃঙ্খল মেজ-বৌদের চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারে নাই।

গল্পের নায়ক সাধুতার কৃত্রিম আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া পরে আত্মাভিমানের বশে এবং অসাধু চাটুকারের প্ররোচনায় পরম স্নেহভালবাসার পাত্রীর বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করিতে বাধ্য হইয়াছিল,—ইহাই 'ভাইফোঁটা' গল্পের কাহিনী। গৌণত গল্পটি নীরব প্রেমের ও উপেক্ষিত অনাদৃত স্নেহের একটি করুণ কাহিনী।

নেহাৎ পাঠ্যপুস্তকের সাধুতার ভার লইয়া প্রাণবান্ মানুষের সর্ব্বদা চলে না। সে সাধুতায় প্রাণ নাই বলিয়া দায়ে পড়িলে তাহা প্রায়ই টিকিতে পারে না,

এবং তাহার প্রতিক্রিয়াও বড় সাংঘাতিক। "আমরা সাধুতার জেলখানায় সততাব লোহাব বেড়ি পরিয়া মানুষ। মানুষ বলিলে একটু বেশি বলা হয়—আমরা ছাড়া আর সকলেই মানুষ, কেবল আমরা মানুষের দৃষ্টান্তস্থল।" চিরকাল এইরূপ দৃষ্টান্তস্থল হইয়া থাকা বড় কঠিন, সেইজন্য মনে দৌর্ব্বল্য আসিলে লোকের চাটুবাক্যের দ্বারা মন চাঙ্গা করিয়া লইতে হয়। পর-প্রশংসালব্ধ আত্মম্ভরিতা ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্যতা গল্পটির নায়কের ট্রাজেডি।

'শেষের রাত্রি' গল্পের বিষয় নিতান্ত ক্ষীণ,—এক মুমূর্ষু যুবক তাহার তরুণী পত্নীকে পূজা করে, এদিকে লঘুচিত্ত তরুণীর মন রুগ্ণ স্বামীর উপব পড়িয়া নাই; মুমূর্ষুকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাহার মাসি মিথ্যাকথার মালা গাঁথিয়া চলিয়াছেন। শেষে যখন মাসির ফাঁকি ধরা পড়িল, তখন তরুণী অনুতপ্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া স্বামীব পায়ে লুটাইল, কিন্তু তাহার সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

মাসিব যে বাৎসল্য তাহা অসাধারণ এবং হৃদয়বিদারক। যতীন যখন শুনিল যে তাহার নিদারুণ ব্যাধি দেখিয়াও স্ত্রী বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে এবং সে-কথা মাসি তাহাব মনের আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্যই ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন, তখন সে যেমন একদিক হইতে দারুণ আঘাত পাইল তেমনি অপরদিকে এক পূর্ণতর আনন্দভাণ্ডারেব সন্ধান পাইল, তাহার মাসির বাৎসল্য যে কিরূপ মহনীয় তাহা বুঝিতে পারিল। মুমূর্ষু মরিবার পূর্ব্বে পূর্ণ শান্তি পাইল: "মাসি তোমাব কাছে যে স্নেহ পেয়েছি সে আমার জন্মজন্মান্তরের পাথেয় আমার সমস্ত জীবন ভ'রে নিয়ে চল্লুম। আর-জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার মেয়ে হয়ে জন্মাবে, আমি তোমাকে বুকে করে মানুষ করব।"

গল্পটির রচনারীতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে সবটাই কথোপকথন, এবং তাহার মধ্যে প্রায় আগাগোড়া মাসি আর যতীনের সংলাপ। এই গল্পের অনুকরণে বাঙ্গালায় কোন কোন তৎকালীন নবীন লেখক মুমূর্ষু পাত্রপাত্রী লইয়া morbid গল্পের ধারা প্রবর্ত্তন করেন।

'অপরিচিতা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রোমাণ্টিক-প্রেমের গল্প। অকৃতার্থ হইয়াও সার্থক এক প্রেমের কাহিনী এই তীব্র-ব্যঙ্গবিজড়িত হৃদয়াবেগ-অনুপ্রাণিত পুষ্পিত

ও অলঙ্কৃত ভাষায় অনবদ্য রূপ পাইয়াছে। বাঙ্গালী-সংসারে বিবাহব্যাপারে তুচ্ছ ঘটনা লইয়া যেরূপ নীচতা প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহা এই গল্পে মামার ভূমিকায় প্রকটিত হইয়াছে। পাত্রের মামার হৃদয়হীন বর্ব্বরতার জন্যই বিবাহসভা হইতে বর ও বরপক্ষ বিতাড়িত হইয়া চলিয়া আসিল। এই অপমান পাত্রের মনেও লাগিয়াছিল "কিন্তু এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রং একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল—এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল সাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব? আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল।—হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি—কেবল আর একটি মাত্র পা ফেলার অপেক্ষা—এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক-মুহূর্ত্তে অসীম হইয়া উঠিল!"

পরিশেষের 'বাঁশি' কবিতা এই সঙ্গে তুলনীয়।

১২

অপরিচিতার প্রায় তিন বৎসর পরে বাহির হইল 'তপস্বিনী'।[১] পর-পর তিনবার পরীক্ষায় ফেল করিয়া বরদাকান্ত নিরুদ্দেশ হইলে সকলে তাহার চিঠি পড়িয়া মনে করিল সে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে। বরদার বালিকা পত্নী ষোড়শী স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী হইবার জন্য পূজা-অর্চ্চনায়, যোগ-ধ্যানে ও সাধুসেবায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দিল। ষোড়শীর মনোবৃত্তি বড় স্বাভাবিক- ও নিপুণ-ভাবে ফুটিয়াছে।

গল্পটির উপসংহারে bathos অর্থাৎ ভাবাবতরণ চমৎকারজনক হইলেও যেন লঘু হইয়া গিয়াছে। "বরদা জাহাজে লস্কর হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বারো বৎসর পরে সে আজ কোন এক কাপড়-কাচা-কল-কোম্পানীর ভ্রমণকারী এজেন্ট হইয়া ফিরিয়াছে। বাবাকে বলিল, 'আপনার যদি কাপড়-কাচা কলের দরকার

[১] সবুজপত্র জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪।

থাকে খুব সস্তা ক'রে দিতে পারি।' বলিয়া ছবি আঁকা ক্যাটলগ পকেট হইতে বাহির করিল।"

গল্পটির রচনাভঙ্গি লঘুতর এবং অলঙ্কারবর্জ্জিত। বিবাহিত নারীর তপশ্চর্য্যা প্রসঙ্গে উদ্ধার গল্পের সঙ্গে এই গল্পের তুলনা করা যাইতে পারে।

'পয়লা নম্বর'[১] এক অধ্যয়নরত কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি এবং তাঁহার অনাদৃত পত্নীর কাহিনী। পত্নীর অনাদর সম্পূর্ণভাবে স্নেহাভিব্যক্তির দিক দিয়া। প্রতিবেশী এক ধনী ও গুণী যুবক ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং ইহার অন্তর এই আকর্ষণের প্রতি বিমুখ না থাকিলেও অবিবেচক স্বামী এবং গুণমুগ্ধ ভক্ত উভয়ের হস্ত হইতে তরুণী (পলাইয়া অথবা আত্মহত্যা করিয়া) আত্মরক্ষা করে। কাহিনী হিসাবেও বটে এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ শিল্পাদর্শের হিসাবেও বটে গল্পটির গঠন এবং পরিণতি খুব উচ্চাঙ্গের হয় নাই। অনুরূপ বিষয় উদ্ধার গল্পে অধিকতর নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শেষকালের অনেক উপন্যাসে ও গল্পে দাম্পত্য স্নেহ ও নরনারীর আত্মিক মিলন (spiritual affinity) ঘটিত প্রেমের মধ্যে পার্থক্য এবং বিরোধ দেখান হইয়াছে। প্রাত্যহিক জীবনের সংঘর্ষের মধ্যে আত্মিক মিলনের সুর ঠিকমত বাজে না, দৈহিক ও সামাজিক মিলনের পক্ষে স্থূলতা না হউক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কিছু খর্ব্বতা আবশ্যক হয়,—এই কথা, অর্থাৎ বৈষ্ণব রসতত্ত্বের স্বকীয়-পরকীয় প্রেমেরই নূতন ও আধুনিকতর ব্যাখ্যা, এই উপন্যাস-গল্পগুলির অধিকাংশের মূল কথা। চতুরঙ্গ উপন্যাসে এবং পয়লা-নম্বর গল্পে এই তত্ত্বের প্রথম আভাস পাওয়া গেল। পরে 'শেষের কবিতা'-য় ইহার পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা পাইতেছি

পিতার কর্তৃত্বে মাতৃকৃত বিবাহসম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল, তাহার পর নিজের কর্তৃত্বে পিতৃকৃত সম্বন্ধও বেশীদূর গড়াইল না, প্রৌঢ় বয়সে নিজকৃত সম্বন্ধও অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বিবাহবন্ধন অবধি পৌঁছিল না, শেষে পাত্রীকে তাহার প্রেমাস্পদের সহিত বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে এবং তাহাদের পুত্রকন্যাদের লইয়া স্নেহবৃত্তি চরিতার্থ করিতে হইল—ইহাই 'পাত্র ও পাত্রী'[২] গল্পের মূল কথা।

[১] সবুজপত্র আষাঢ় ১৩২৪।

[২] সবুজপত্র পৌষ ১৩২৪।

নারী যতই শিক্ষিত হউক এবং তজ্জনিত উদারতার যতই বড়াই করুক তাহাদের নৈসর্গিক ঈর্ষ্যাপ্রবৃত্তি এবং ক্ষুদ্রচিত্ততা কাটাইয়া ওঠা খুব সহজ ব্যাপার নয়,—ইহাই 'নামঞ্জুর গল্প'-এর[৩] মূল কথা। নন্-কো-অপারেশনের সমসকার রাজনৈতিক ও স্বাদেশিক উত্তেজনার একটি ব্যঙ্গগর্ভ চিত্র এই গল্পে বিশেষভাবে ফুটিয়াছে। রচনাভঙ্গিতে অনেকটা যেন সবুজপত্রের যুগের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিয়াছে। অমিয়ার চরিত্রে নারীর সনাতন দৌর্ব্বল্যের পরিচয় জাজ্বল্যমান, তবুও হরিমতির যবনিকান্তরালবর্ত্তী ভূমিকায় বাঙ্গালী মেয়ের স্বাভাবিক ভীরু স্নেহশীলতার সকরুণ ছবি মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে থাকে। গল্পটির ভূমিকা বাস্তবগর্ভ বলিয়া মনে হয়।

১৩

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের শেষ ধারা পাই 'তিন সঙ্গী'-তে (পৌষ ১৩৪৭)। তিন-সঙ্গীর গল্প তিনটি ১৩৪৬ ও ১৩৪৭ সালে রচিত ও প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গল্পগুলিতে ছোট-গল্পের রীতি একটু নূতনতর হইয়াছে।

'রবিবার' গল্পটি শেষের-কবিতাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। অভীকের সঙ্গে অমিতর কিছু সাদৃশ্য আছে। অতি-আধুনিক মেয়েরা অমিতর মন স্পর্শ করিতে পারে নাই; অভীকের মন স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল কিন্তু বাঁধিতে পারে নাই। বিভার প্রতি অভীকের ভালবাসা লাবণ্যর প্রতি অমিতর ভালবাসার মত রঙীন মুহূর্ত্তের আকস্মিক ব্যাপার না হইলেও গভীরতায় অগাধ। দুইজনের মিলনের প্রতিবন্ধক ছিল বিভার পিতৃভক্তি। বিভার পিতার ইচ্ছা ছিল না যে সে অভীককে বিবাহ করে যেহেতু সে নাস্তিক; তাঁহার ইচ্ছা ছিল কোন প্রতিভাবান্ যুবকের সঙ্গে, সম্ভবত অমরবাবুর সঙ্গে, বিভার বিবাহ হয়। বিভা অভীককে মন সমর্পণ করিয়াছে, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সে তাহার পিতার ইচ্ছাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিতেছে না। "সেই ইচ্ছা তো মত নয়, বিশ্বাস নয়, তর্কের বিষয় নয়। সে ওর স্বভাবের অঙ্গ। তার প্রতিবাদ চলে না।" চার-অধ্যায়ের

[৩] প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩২।

এলার মত বিভাও সম্পূর্ণভাবে তাহার "বাবারই মেয়ে"। মায়ের সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল না. তিনি মেয়ের পিতৃবাৎসল্য-সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যা অনুভব করিতেন। মায়ের মৃত্যুর পর বিভা বাপের হাতে মানুষ হয়। এলার পিতার অত শীঘ্র মৃত্যু না হইলে তাহার পরিণতি বিভার মতই হইতে পারিত। বিভার সঙ্গে গোরার সুচরিতা-চরিত্রেরও ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়।

অভীকের ক্ষোভ শুধু এই নয় যে বিভা বিবাহে রাজি হইতেছে না। সে যে অভীকের ছবির প্রশংসা করিতে পারিতেছে না এ দুঃখও কম নয়; "জানি তোমার সব চেয়ে বড়ো শাস্তি তুমি বুঝতে পারোনি আমার ছবি। এসেছে নতুন যুগ, সেই যুগের বরণসভায় আধুনিক বড়ো চৌকিটাতে আমার দেখা তোমার মিলল না।" অভীক চায় ইউরোপে যাইতে; সেখানে গেলে গুণী-সমাজ তাহার ছবির মূল্য বুঝিতে পারিবে, সে যশস্বী হইবে, তখন বিভার পিতার ইচ্ছার প্রতিকূল্য তাহাদের মিলন ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। অভীকের বিদেশ-গমনের বাঞ্ছা দেখিয়া বিভা তাহাকে অর্থ-সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে তাহার পুরুষত্বের মহিমা খাটো হইয়া যাইবে, তাই জাহাজের স্টোকার হইয়া অভীক ইউরোপ যাত্রা করিল।

অমরবাবুর সঙ্গে দুই-বোনের নীরদবাবুর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তবে অমরবাবুর চরিত্র উন্নততর। এইধরণের বিজ্ঞাতপস্বী-ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের শেষ তিনটি গল্পের বিশেষত্ব।

'শেষ কথা' গল্পের নায়ক নবীনমাধবের সঙ্গে রবিবার গল্পের অভীকের এবং চার-অধ্যায় গল্পের অতীন্দ্রর কিছু সাদৃশ্য আছে। নবীনমাধব ও অভীক বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রশিল্পী, অভীক ও অতীন্দ্র রূপশিল্পী ও কথাশিল্পী, অতীন্দ্র ও নবীনমাধব বিপ্লবী। নবীনমাধবের জীবনে কোন নারীর ছোঁয়াচ লাগে নাই। অভীকের মত সেও জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জাহাজের খালাসী হইয়া আমেরিকা পলাইয়াছিল; "জামশেদ টাটাকে সেলাম করেছি সমুদ্রের ওপার থেকে। ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁড়া নয়। সিঁধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাথরের প্রাচীরে। মায়ের আঁচলধরা বুড়ো খোকাদের দলে

মিশে মা মা ধ্বনিতে মন্তর পড়ব না, আর দেশের দরিদ্রকে অক্ষম অভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্র ব'লেই মানব, দরিদ্রনারায়ণ বুলি দিয়ে তার নামে মন্তব বানাব না।"

নবীনমাধব রুচিরাকে যখন প্রথম দেখে সেই দৃশ্য অধ্যাপক গল্প মনে করাইয়া দেয়। "পাঁচটি শাল গাছের ব্যূহ ছিল বনের পথে একটা টিপির উপরে। সেই বেষ্টনীর মধ্যে কেউ ব'সে থাকলে কেবল একটিমাত্র ফাঁকের মধ্যে দিয়ে তাকে দেখা যায়, হঠাৎ চোখ এড়িয়ে যাবারই কথা। সেদিন মেঘের মধ্যে আশ্চর্য্য একটা দীপ্তি ফেটে পড়েছিল। বনের সেই ফাঁকটাতে ছায়ার ভিতরে রাঙা আলো যেন দিগঙ্গনার গাঁঠ-ছেঁড়া সোনার মুঠোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক সেই আলোর পথে ব'সে আছে মেয়েটি, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে একমনে লিখছে একটি ডায়ারির খাতা নিয়ে।" অমিতর মত নবীনও এক দুর্লভ রঙীন মুহূর্তে নারীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। জিয়লজিষ্ট নবীনের মনের মধ্যে "বুদ্ধিশাসনের বহির্ভূত যে একটা মূঢ় লুকিয়ে ছিল, তাকে এই প্রথম দেখা গেল। ধরা প'ড়ে গেল আরণ্যক, যে যুক্তি মানে না, যে মোহ মানে। বনের একটা মায়া আছে, গাছপালার নিঃশব্দ চক্রান্ত, আদিম প্রাণের মন্ত্রধ্বনি।" এই মায়াই তাহার মনকে আবিষ্ট করিল।

অচিরার মনেও এই মায়া কাজ করিতেছিল। নবীনের দেহসৌন্দর্য্য, পাণ্ডিত্য এবং কর্ম্মনিষ্ঠতা তাহার মন আকর্ষণ করিয়া ভক্তি জন্মাইয়াছিল। তাহার মনে যে নৈর্ব্যক্তিক সতীত্বের আদর্শ জাজ্বল্যমান ছিল তাহার উজ্জ্বলতা কমিয়া আসিল। এমন সময় সে জানিতে পারিল তাহার দাদামশায়ের গোপন মনের অবস্থা। রুচিরা বুঝিল যে সে দূরে চলিয়া গেলে তাহার দাদুর দেহ-মন দুইই নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবে। এক ভালবাসার বঞ্চনা তাহাদের দুইজনকে বেদনা দিয়াছে, আর এক ভালবাসা বৃদ্ধকে নিরাশ্রয় করিবে। সে ইহাও বুঝিল. নবীনমাধবের মন পড়িয়া আছে কর্ম্মসাধনায় এবং তাহার সহিত বিবাহ হইলে এই কর্ম্মসাধনায় ব্যাঘাত পড়িবে। তাই সে নবীনের প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার জীবনের প্রথম ভালবাসার ইম্পার্সোনাল রূপকেই মনের

মধ্যে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া রহিল। নবীনের ভালবাসা তাহার আদর্শকে তাহার মনের মধ্যে দৃঢ়তর করিল।

রুচিরার প্রত্যাখানে নবীন ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির নিশ্চিন্ততাও অনুভব করিল। কাজের মধ্যে ডুবিয়া পড়িয়া সে অনতিবিলম্বে পূর্ব্বের মতই মাতিয়া উঠিল। কিন্তু মানুষের মন। "সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ ক'রে বারান্দায় এসে বোধ হোলো—খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেচে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে-চড়তে সেটা বাজে।"

রুচিরার দাদু অধ্যাপক সরকার চতুরঙ্গের জ্যাঠামশায়, হৈমন্তীর বাবা, ও গোরার পরেশবাবু—ইঁহাদেরই সগোত্র। ল্যাবরেটরি গল্পের চৌধুরী মহাশয়ও এই দলের। নাতনী-ঠাকুরদাদার গভীর স্নেহসম্পর্কের অন্য রকমের একটি চিত্র পাই ঠাকুর্দ্দায়।

'ল্যাবরেটরি' গল্পের মেরুদণ্ড সোহিনী-চরিত্র রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র সৃষ্টি। দেহের সতীত্ববোধ শিক্ষা-সংস্কার সাপেক্ষ। ইহার অভাবে, দৈহিক শুদ্ধি যে হারাইয়াছে সেও মনের জোর থাকিলে ভালবাসার পাত্রের উপর নিষ্ঠা রাখিয়া সতীত্বের উচ্চতর আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। ইহাই সোহিনী-চরিত্রের এবং ল্যাবরেটরি গল্পের মূল কথা।

সোহিনী পাঞ্জাবী মেয়ে। উপযাচিকা হইয়া সে নন্দকিশোরের কাছে আসিয়া জুটিয়াছিল। নন্দকিশোরকে সে প্রথম সাক্ষাতের সময় বলিয়াছিল, "অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু—তাহলে ঠকবে।" নন্দকিশোর সাত হাজার টাকা দিয়া সোহিনীর আইমার বাড়ীর দেনা শুধিয়া দিল এবং সোহিনীর সহিত আংটি বদল করিল। "নন্দকিশোর ওকে যে দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্ম্মল নয়, এবং নিভৃত নয়।" কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মানসমিলন হইতে বিলম্ব হয় নাই। নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর সোহিনী তাঁহার বিজ্ঞানসেবাব্রতকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিল; স্বামীর ইচ্ছার সঙ্গে নিজের কামনা মিলাইয়া দিল। সেই ব্রতসাধনের জন্য সে সর্ব্ববিধ

সংকোচ ও সংস্কার বিসর্জ্জন দিতেও উদ্যত ছিল। সম্পত্তি ঠকাইয়া লইবার জন্য আত্মীয়-অনাত্মীয় বহু মধুলোভী আসিয়া জুটিল। "সোহিনী স্বয়ং সমস্ত আইনের প্যাঁচ নিতে লাগল বুঝে। তার উপরে নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিত স্থান বুঝে উকিল-পাড়ায়। সেটাতে তার অসঙ্কোচ নৈপুণ্য ছিল, সংস্কার মানার কোনো বালাই ছিল না। মামলায় জিতে নিলে একে একে"।

নন্দকিশোর-সোহিনীর একমাত্র সন্তান নীলিমা মায়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা পায় নাই, কিন্তু মাতৃবংশগত দেহসৌন্দর্য্যের সঙ্গে রক্তচাঞ্চল্যের ভাগটা একটু বেশিই পাইয়াছিল; "আমার মেয়েটি মদের পাত্র, কানায় কানায় ভরা।" মায়ের সঙ্গে তাহার বিরোধ ছিল আদর্শগত। সোহিনী ভাবিল একটি ভাল বিজ্ঞানবিৎ ছেলের সঙ্গে নীলিমার বিবাহ দিয়া তাহার উপর নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরির ভার সঁপিয়া সে নিশ্চিন্ত হইবে। তেমন ছেলেও পাওয়া গেল। কিন্তু দুইজনেরই দৌর্ব্বল্য ধরা পড়িল। তখন বৃদ্ধ অধ্যাপক চৌধুরী ছাড়া তাহার গত্যন্তর রহিল না।

রেবতীর দুর্ব্বলতা হইতেছে দৃঢ়তার অভাব, বিশেষ করিয়া তাহার অভিভাবিকা পিসিমার সম্পর্কে। বাল্যকাল হইতে পিসিমার অনুগতি তাহার স্বভাবের অঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। তাই হোটেলে ভোজসভায় পিসিমা আসিয়া যখন বলিলেন, "রেবি, চলে আয়।" তখন গুড গুড করিয়া রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলিয়া গেল, নীলিমার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী নারীর বৈশিষ্ট্য সোহিনীর ও পিসিমার ব্যবহারের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একজন মানুষের মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা মানিয়া চলিয়া আনন্দ পায়, অপর জন মানুষকে শিশু করিয়া রাখিয়াই তৃপ্তিলাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে শেষপ্রকাশিত গল্প হইতেছে 'বদনাম' (প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮)।

১৪

যে-সকল ছোট-গল্পের আলোচনা করিলাম সেগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের এই-জাতীয় আরও কতকগুলি রচনা আছে; যাহাতে ছোট-গল্পের আংশিক লক্ষণ

থাকিলেও সম্পূর্ণতা নাই। কোন-কোনটিতে একটি বিশেষ ভাবরসের চিত্র ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, কোন-কোনটিতে ব্যঙ্গের বা রূপকের সাহায্যে একটি বিশেষ তত্ত্ব বা মত প্রতিপাদন করা হইয়াছে, এবং কোন কোনটিতে ছোট-গল্পের আদল মাত্র আছে। সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় ছোট-গল্প লেখার তৃতীয় যুগের অবসান হইয়া গেলে রবীন্দ্রনাথ এইধরণের গল্পের টুকরা বা "কথিকা" অনেকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি 'লিপিকা'-য় (১৯২৩) সংগৃহীত হইয়াছে। অনেককাল পরে রবীন্দ্রনাথ গদ্য-কবিতায় এইরূপ কথিকা রচনা করিয়াছেন। প্রথমজীবনেও যে তিনি এইধরণের গল্পাভাস ও parable অর্থাৎ রূপককাহিনী রচনা করেন নাই এমন নয়। রাজপথের-কথা এবং ঘাটের-কথা এই-শ্রেণীরই রচনা। সাধনায় প্রকাশিত 'একটা আষাঢ়ে গল্প' এবং 'একটি পুরাতন কথা' এই-পর্যায়েরই।

লিপিকার গল্পগুলি কাব্যের ভঙ্গিতে লেখা। ভাষা নিতান্ত লঘু এবং কথ্যভাষাশ্রিত। লিপিকা-র এই কয়টি গল্প রূপকচ্ছলে উপস্থাপিত হইলেও যথার্থ ছোট-গল্প,—'নামের খেলা,' 'রাজপুত্তুর,' 'অস্পষ্ট' ও 'নতুন পুতুল'। রাজপুত্তুরে বাঙ্গালী দরিদ্র ভদ্রঘরের ছেলে-মেয়ের ক্ষীণ রোমান্স ও তাহার করুণ পরিণতি বাস্তব-রসাশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। চিরকালের যে রাজপুত্র-রাজকন্যা চিরন্তন তরুণহৃদয়ে বাস করে তাহার সঙ্গে রূপ-ঐশ্বর্য্য-মানের কোন সম্পর্ক নাই, তাহারা যে দৈত্য-রাক্ষস-জিনের সঙ্গে লড়াই করে সে দৈত্য-রাক্ষস-জিন তাহাদেরই মধ্যে বাস করে।

"রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জ্জয়"—রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়াছে, বন্দিনীকে উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে।

> সাম্‌নে এল অসীম সমুদ্র, স্বপ্নের ঢেউ তোলা নীল ঘুমের মত। সেখানে রাজপুত্তুর ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ল।
>
> কিন্তু যেম্‌নি মাটিতে পা পড়া অম্‌নি এ কি হল? এ কোন্ জাদুকরের জাদু?
>
> এ যে সহর। ট্র্যাম চলেছে। আপিস-মুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম।...

আর রাজপুত্তুরের এ কি বেশ? এ কি চাল? গায়ে বোতাম-খোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহরে পড়ে, টিউশানি ক'রে বাসা খরচ চালায়।

রাজকন্যা কোথায়?

তার বাসার পাশের বাড়ীতেই।

চাঁপা ফুলের মত রঙ নয়, হাসিতে তার মাণিক খসে না। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নববর্ষায় ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারি সঙ্গে।

রাজকন্যা পড়িয়াছে দৈত্যের কবলে। মা-মরা মেয়ে গরীব বাপের স্নেহ ভোগ করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে খুড়োর বাড়িতে আসিয়াছে। খুড়ো তাহার সম্বন্ধ স্থির করিয়াছে এক ধনী বৃদ্ধের সঙ্গে। রাজপুত্র দৈত্যের গ্রাস হইতে রাজকন্যাকে লইয়া পলাইল। "খবর এল তারা লুকিয়ে বিবাহ করেচে। তাদের জাতের মিল ছিল না, ছিল কেবল মনের মিল। সকলেই নিন্দে করলে।" রূপকথায় দৈত্যের হাত এড়ানো সহজ; প্রতিদিনের সংসারে দৈত্যের হাত ও ক্ষমতা সুদীর্ঘতর।

লক্ষপতি তাঁর ইষ্টদেবতার কাছে সোণার সিংহাসন মানৎ করে বল্লেন, 'এ ছেলেকে কে বাঁচায়!'

ছেলেটিকে আদালতে দাঁড় করিয়ে বিচক্ষণ সব উকীল প্রধান সব সাক্ষী দেবতার কৃপায় দিনকে রাত করে তুললে। সে বড় আশ্চর্য্য!

সেই দিন ইষ্টদেবতার কাছে জোড়া পাটা কাটা পড়ল, ঢাক ঢোল বাজল, সকলেই খুসি হল। বললে, কলিকাল বটে, কিন্তু ধর্ম্ম এখনো জেগে আছেন।

তার পরে অনেক কথা। জেল থেকে ছেলেটি ফিরে এল। কিন্তু দীর্ঘপথ আর শেষ হয় না। তেপান্তর মাঠের চেয়েও সে দীর্ঘ এবং সঙ্গিহীন। কতবার অন্ধকারে তাকে শুনতে হল, হাউ মাউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ। মানুষকে খাবার জন্যে চারিদিকে এত লোভ।

রাস্তার শেষ নেই কিন্তু চলার শেষ আছে। একদিন সেই শমে এসে সে থামল।...

মুহূর্ত্তে আবার দেখা দিল সেই রাজপুত্তুর। তার কপালে অসীমকালের রাজটীকা।...

যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে ব'সে খবর পায়,—সেই ঘরছাড়া মানুষ তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চল্‌ল। তার সাম্‌নের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জ্জন করচে।

ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা; ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ,—সে রাজপুত্তুর।

লিপিকার লেখাগুলি সবই গদ্যের মত ছাপা। কিন্তু কয়েকটি লেখার রীদ্‌ম্ গদ্যের অপেক্ষা পদ্যের নিকটবর্ত্তী।[১] এইসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ'-র ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েচে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না রেখে ইংরেজীরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেচি, 'লিপিকা'-র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মত খণ্ডিত করা হয় নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।" পরে রবীন্দ্রনাথ এইধরণের লেখাগুলিকে পদ্যের আকারেই প্রকাশ করিয়াছেন। 'পুনশ্চ'-র অল্প কয়েকটি গদ্য-কবিতায় লিপিকার ধরণের গন্ধ পাইতেছি। তবে এগুলি রূপকথা বা তত্ত্বকথা নয়; নিজের স্মৃতিভাণ্ডার হইতেই এই লেখাগুলির ছায়াবস্তু সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'ছেলেটা,' 'সহযাত্রী,' 'শেষ চিঠি,' 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি,' 'ক্যামেলিয়া,' 'সাধারণ মেয়ে,' এবং 'প্রথম পূজা'। এইধরণের গল্প রবীন্দ্রনাথ পদ্যেও রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি পলাতকায় সংগৃহীত আছে।

১ এইধরণের প্রথম রচনা হইতেছে 'পুষ্পাঞ্জলি' [ভারতী বৈশাখ ১২৯২]। পুষ্পাঞ্জলির ক্ষীণ প্রভাব লিপিকা-র কোন কোন প্রস্তাবে দেখা যায়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উপন্যাসে প্রথম স্তর : হৃদয়সমস্যা

১

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ করিলে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর পাওয়া যায়। প্রথম স্তরে হৃদয়াবেগের প্রাবল্য ; নিষ্ঠুর ব্যক্তিত্বের চাপে অথবা সংসারের পীড়নে ভাবাতুর কোমল চিত্তের ব্যথাবেদনার প্রকাশই মুখ্য ; প্রধান রস সৌভ্রাত্র্য এবং বাৎসল্য। 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'মুকুট' এবং 'রাজর্ষি' এই স্তরের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা' নিতান্ত কাঁচা লেখা বলিয়া তাহার কোন আলোচনা এই প্রসঙ্গে করা চলে না। দ্বিতীয় স্তরে মানুষের আদিমতম হৃদয়বৃত্তি প্রেমেরই একান্ত প্রাধান্য, আর সব রস নিতান্ত আনুষঙ্গিক ; সামাজিক এবং পারিবারিক সম্পর্কে অবস্থিত বিশেষ অবস্থায় পতিত নর-নারীর পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণের জটিলতা প্রকাশ এবং তাহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই একমাত্র উদ্দেশ্য। 'চোখের বালি', 'নষ্টনীড়' ও 'নৌকাডুবি' এই স্তরের রচনা। তৃতীয় স্তরে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়বৃত্তি এবং মানসিক দ্বন্দ্ব মুখ্য প্রতিপাদ্য না হইয়া জীবনের, সমাজের, জাতির অথবা দেশের সমস্যার বৃহত্তর ভূমিকায় গৌণস্থান লাভ করিয়াছে ; এখানে উপন্যাসের পাত্রপাত্রী ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট হইয়াও যেন বিশেষ বিশেষ আইডিয়ার প্রতীকরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে ; প্রেমের প্রাবল্য থাকলেও প্রধান হইতেছে বুদ্ধি-রস। 'গোরা', 'ঘরে-বাহিরে', 'চতুরঙ্গ' এবং পরবর্তী সব উপন্যাস ও বড়-গল্প এই স্তরে অন্তর্ভুক্ত।

পাত্রপাত্রীর হৃদয়াবেগ ও হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের সংঘর্ষ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত করে, বাহিরের ঘটনাসংঘাত অথবা ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তির বিক্ষোভ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ পূর্ব্ববর্ত্তী ঔপন্যাসিকের লেখায় পাত্রপাত্রী বাহিরের শক্তির হাতের পুতুলমাত্র, বহির্জ্জগৎই যেন রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যাচার্য্য একাধারে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বহির্জ্জগৎ নাট্যাচার্য্য তো নয়ই,

এমন কি রঙ্গমঞ্চও নয়, রঙ্গমঞ্চের পটভূমিকামাত্র ; পাত্রপাত্রীর হৃদয়ই রঙ্গমঞ্চ, এবং রস জমিয়াছে সেই হৃদয়বৃত্তির আলোড়নে এবং সংঘাতে। আগেকার উপন্যাসে পাত্রপাত্রী যেন পুতুলনাচের পুতুল, তাহাদের সম্পূর্ণ সত্তা দর্শকের গোচরবাহিরে ; যিনি খেলাইতেছেন তাঁহার যতটুকু ইচ্ছা ততটুকুই যেন তাহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। যেখানে বাহিরের ঘটনাবলীর প্রাধান্য সেখানে এরূপ অর্দ্ধস্ফুট ভূমিকায় হয়ত হানি হয় না, কিন্তু যেখানে অন্তর্দ্বন্দ্বই সর্ব্বস্ব সেখানে উপন্যাসের রস ব্যাহত হয়। এরকম ক্ষেত্রে লেখক যদি ভূমিকার বৃহৎ অংশ ছাড়িয়া দিয়া পাত্রপাত্রীকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় না করাইয়া আত্মগত হইতে দেন তবেই রসসৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়। একটু উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্য বিশদ করি। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর পরস্পর প্রণয় জন্মিতে সময় লাগিয়াছিল নিশ্চয়ই, এবং নগেন্দ্রের তরফে সূর্য্যমুখীর উপর তাঁহার প্রবল ভালবাসার এবং কর্ত্তব্যবোধের সহিত মানসিক দ্বন্দ্বও কিছুকাল ধরিয়া অবশ্যই চলিয়াছিল ; এবং ইহাই উপন্যাসের সবচেয়ে প্রধান ব্যাপার, বিষবৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম। বঙ্কিমচন্দ্র এই ব্যাপার প্রথমে স্বগত রাখিয়া পরে অকস্মাৎ উপন্যস্ত করিয়াছেন ; পাঠককে এবিষয়ে অন্ধকারে রাখিয়া হঠাৎ সূর্য্যমুখীর চিঠিতে জানাইয়া দিলেন তাঁহার স্বামী কুন্দনন্দিনীর প্রতি অনুরক্ত, এবং কুন্দকে হীরার ঘরে কয়েক দিন আটক রাখিয়াই তাহাকে নগেন্দ্রের প্রণয়পিপাসু করিয়া তুলিলেন। অথচ রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্ত্তিনীতে অনুরূপ অবস্থায় নিবারণের মনোভাবের অথবা চোখের-বালিতে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর মনোভাবের বিকাশ ও পরিণতি সম্পূর্ণভাবে পাঠকের চোখের সামনে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। নগেন্দ্রের অনুতাপের কারণও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ; তাহার অনুরাগ যেমন আকস্মিক বিরাগ ও তেমনি আচম্বিত। অথচ নিবারণের ও মহেন্দ্রের অনুরাগে কেমন করিয়া ভাটা পড়িতে লাগিল তাহার স্বাভাবিক ও ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী রোমান্টিক উপন্যাসের ঘটনাবলীকে ঠিক বাস্তব বলা চলে না, তা সে ঘটনা যতই কেন ঘরোয়া অথবা ব্যক্তিনিষ্ঠ হউক। পাঠকের তাল-লাগা অর্থাৎ বিসদৃশ পরিণতিতে পাঠকের মন ক্ষুব্ধ না হওয়া রোমান্টিক

উপন্যাসের এক প্রধান উদ্দেশ্য। সেই কারণে বাহ্যঘটনার উপর অনেক নির্ভর করিতে হয়, এবং সংসারে সচরাচর ঘটনার যে-পরিণতি হয় না তাহা দেখাইতে হয়। সূর্য্যমুখীর অবস্থায় কোন্ বাঙ্গালী-ঘরের গৃহিণী ওরূপভাবে গৃহত্যাগ করিতেন না; সম্ভবত তিনি গৃহে থাকিয়া স্বামীর মন ফিরিয়া পাইতে সচেষ্ট হইতেন নতুবা ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া গৃহকাজে অথবা ধর্ম্মকর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিতেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্ত্তিনী গল্পে হরসুন্দরীর মনোবৃত্তি এই-হিসাবে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। কতকটা রোমান্টিসিজ্‌মের খাতিরেই পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসের ঘটনাপরিণতিতে অনেকখানি অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর পর নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর মিলন ঘটাইয়াই কাহিনী শেষ করিলেন। কিন্তু কাহিনী চুকিল না। বিষবৃক্ষের ফলভোগ যে দুইজনেরই বাকি রহিল। রোমান্সের অনুরাগ-বিরাগের শোধবোধ এককথায় শেষ করিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু সত্যকার জীবনে তাহার রেশ চলে বহুদিন ধরিয়া। মানুষের মন কাদার ঢেলা নয় যে ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়া গড়িয়া আবার যে ঢেলা সেই ঢেলা করা যায়; মানুষের মন গড়িতে সময় নেয়, ভাঙ্গিতে সময় নেয়, এবং ভাঙ্গিয়া গড়িতে—যদি গড়ে—আরও সময় নেয়। পুরাতন শয়নকক্ষে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর পুনরায় মিলন হইল; কিন্তু সে মিলনে পূর্ব্বেকার পূর্ণতা ও রস রহিল কি? রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্ত্তিনীতে এইরূপ মিলনের স্বাভাবিক পরিণতিই দেখান হইয়াছে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব- এবং মনোবৃত্তিবিকলন-মূলক বলিয়া রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কচিৎ রোমান্টিসিজ্‌মের আমেজ থাকিলেও বাহ্যঘটনার প্রাধান্য একেবারে নাই। বাহ্যঘটনা অনেক সময় যেন অন্তর্বিক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এই subjectivity বা স্বগতদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকেও কতকটা কাব্যাত্মক করিয়াছে। তবে ইহার জন্য তাঁহার অনায়াসসুন্দর কাব্যরসবাহী বাগ্‌ভঙ্গিও কম দায়ী নয়।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে-গল্পে চরিত্র-অঙ্কণে কোন অস্পষ্টতা দুর্ব্বলতা অসঙ্গতি বা অপূর্ণতা নাই। তাঁহার কবিচিত্তে চরিত্রটি যেমন সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হইয়া

উঠে তাঁহার চিত্রাঙ্কনী এবং বিশ্লেষণী রচনারীতিতে তাহা সঙ্গে সঙ্গে বাণীমূর্ত্তি পায়। পাত্রপাত্রীর মনের কথা পাঠককে অনুমান করিয়া লইতে হয় না, স্রষ্টা নিজে অথবা পাত্রপাত্রী স্বয়ং সেকথা বলিয়া দেন। এই জন্য কচিৎ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-গল্প একটু বেশি মুখর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই মুখরতাই তাঁহার রচনারীতির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং ইহার মধ্যে যে-পরিমাণে কবিত্ব-গভীর আত্মবিশ্লেষণ এবং তথ্যদৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অতুলনীয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক উপন্যাসে একটি করিয়া প্রশান্ত ও আত্মসমাহিত ভূমিকা আছে। ইহা যেন নায়ক-নায়িকার হৃদয়দ্বন্দ্বের ভারসাম্য রাখিয়া চলিয়াছে। সংস্কৃত নাটকে যেমন ঋষি বা তত্তুল্য চরিত্র কাহিনীকে রমণীয় পরিণতির দিকে আগাইয়া লইয়া যায় এও কতকটা তেমনি। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের বৈরাগী-চরিত্র ইহার অনুরূপ; বৌঠাকুরাণীর-হাটে বসন্তরায়, রাজর্ষিতে বিল্বন, চোখের-বালিতে অন্নপূর্ণা, নৌকাডুবিতে নলিনাক্ষ, গোরায় পরেশবাবু, চতুরঙ্গে জগমোহন, ঘরে-বাহিরেতে চন্দ্রনাথবাবু, যোগাযোগে বিপ্রদাস এবং শেষের-কবিতায় যোগমায়া। দুই-বোন, মালঞ্চ এবং চার-অধ্যায় ঠিক উপন্যাস নয়, বড়-গল্প; এগুলিতে অনুরূপ চরিত্র নাই। যোগাযোগ এবং শেষের-কবিতা গল্পের পর্য্যায়ে পড়ে; এই বই দুইটির আকার উপন্যাসের মত হইলেও প্লট গল্পের মত সরল।

গোরা অবধি এইরূপ মধ্যস্থ চরিত্রগুলি ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে এবং যোগাযোগ—এই তিনখানি উপন্যাসে এই চরিত্রগুলি হয়ত প্রচলিত মত অনুসারে ধর্ম্মপরায়ণ নয়, কিন্তু তাঁহারা লোকহিতপরায়ণ এবং অধ্যাত্ম-উপলব্ধিরসে ভরপুর। শেষের-কবিতার যোগমায়া মাঝামাঝি ভাবের, তিনি ধার্ম্মিক অথচ সর্ব্বাংশে প্রচলিত-আচারপরায়ণ নহেন।

প্রথম চারিটি উপন্যাসে এবং যোগাযোগ, শেষের-কবিতা, দুই-বোন এবং মালঞ্চ, এই চারিখানি বড়-গল্পে সমস্যা একান্তভাবে ব্যক্তিহৃদয়ের; শুধু নৌকা-ডুবিতে সামাজিক-সংস্কারের সমস্যা তাহার সহিত জড়িত আছে। গোরায় ব্যক্তির

সমস্যা তাহার সমাজমানসের সমস্যার সহিত জট পাকাইয়া গিয়াছে। চতুরঙ্গে ব্যক্তির সমস্যা তাহার আধ্যাত্মিক আকৃতির অঙ্গীভূত হইয়া দেখা দিয়াছে। ঘরে-বাহিরেতে এবং চার-অধ্যায়ে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সমস্যার পাকে ব্যক্তির সমস্যা ঘোরালো হইয়াছে।

এক-হিসাবে ঘরে-বাহিরে রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস, কেননা এই পর্যায়ই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ। পরবর্ত্তী উপন্যাসে ও বড়-গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ধরা দেন নাই; সেগুলি ইম্পার্সোনাল।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বাঙ্গালা উপন্যাসে শুধু রোমাণ্টিক প্রেমকাহিনী অথবা গার্হস্থ্য সুখদুঃখের চিত্র স্থান পাইত। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা উপন্যাসের এই সঙ্কীর্ণ পরিসর বাড়াইয়া দিলেন। বৌঠাকুরাণীর-হাট এবং রাজর্ষি ছাড়া তাঁহার আর সব উপন্যাসের আখ্যানবস্তু প্রেমমূলক হইলেও সেগুলি রোমান্স নয়; সেগুলিতে তিনি প্রেমরস ছাড়া আরও অনেক রস সঞ্চারিত করিয়াছেন। বাঙ্গালা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ এবং তথাকথিত বাস্তব-পদ্ধতির প্রবর্ত্তয়িতা রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে তিনি অপরাজিত।

২

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা' কখনো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা ভিখারিণী গল্পের অব্যবহিত পরে রচিত ও ভারতীতে এক বৎসর ধরিয়া (আশ্বিন-ভাদ্র ১২৮৪-৮৫) প্রকাশিত হয়। উপসংহার অসমাপ্ত বলিয়া মনে হয় যে কিশোর-ঔপন্যাসিক কাহিনীকে পূর্ণ পরিণতির দিকে আগাইয়া লইবার ধৈর্য্য হারাইয়াছিলেন। উপন্যাসখানি সাতাশ পরিচ্ছেদে গাঁথা। বিষয়বস্তু কিশোর-কবির কাব্যগুলির অনুরূপ,—নিষ্ঠুরের হস্তে প্রণয়ভীরু কিশোরীর নিপীড়ন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই অপরিণত লেখাটির মূল্য যে একেবারে নাই তাহা নয়। মোহিনী-মহেন্দ্রর গৌণ কাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণকান্তের উইলের ছায়া সত্ত্বেও চোখের-বালির পূর্ব্বাভাস পাই। করুণার মহেন্দ্র ও রজনী চোখের-বালির মহেন্দ্র ও আশাতে পরিণত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক উপন্যাস-গল্প তিনটির বিষয়পরিকল্পনা করা হইয়াছে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে। মোগল-রাজত্বকালেও বাঙ্গালার কোন কোন অঞ্চল সাময়িক অথবা স্থায়ী স্বাধীনতা ভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। এই স্বাধীন-বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষীণ কাহিনীসূত্র অবলম্বন করিয়া 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'মুকুট' এবং 'রাজর্ষি' রচিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের পাত্রপাত্রী সবই বাঙ্গালী; জাতিতে না হইলেও, সংস্কারে ও সমাজে। স্বজাতি নরনারীর সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার উপন্যাসগুলিতে মূর্তি লাভ করিয়াছে। তাই বাঙ্গালাদেশের স্বাধীন রাজ্যদ্বয়ের ইতিহাসের পটভূমিকায় তাঁহার প্রথম দুই সার্থক উপন্যাসের এবং প্রথম বড়-গল্পের পরিকল্পনা। স্বার্থান্ধ এবং বিচারমূঢ় নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সর্বজনীন প্রেমের—সৌহার্দ্য-সৌভ্রাত্র্য-বাৎসল্য-জীবপ্রীতির—বিরোধ এগুলির মর্মকথা।

কাঁচা লেখা করুণার কথা ছাড়িয়া দিলে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' [১] রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস। ইহার প্রধান ভূমিকাগুলির নাম এবং কোন কোন ঘটনার ছায়া ঐতিহাসিক হইলেও কাহিনী ঐতিহাসিক নয়। ইহাতে যে-হৃদয়বৃত্তির সংঘর্ষ দেখান হইয়াছে তাহার সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা রচয়িতার নিজস্ব কল্পনা। বসন্তরায়-উদয়াদিত্য-বিভার সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাই বস্তুভূত হইয়াছে। শৈশবে ভৃত্যলালিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ মাতৃবিয়োগের পর ঘনিষ্ঠ স্নেহসম্পর্কে আসেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগিনী সৌদামিনী দেবীর। বৌঠাকুরাণীর-হাটে এই সৌভ্রাত্র্যেরই স্নিগ্ধরস ফুটিয়াছে। বৌঠাকুরাণীর-হাট সৌদামিনী দেবীকে উপহৃত হইয়াছিল, ইহাও এই অনুমানের পোষকতা করে।

প্রতাপাদিত্যের আত্মম্ভরি ও নিষ্ঠুর স্বভাব জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্যের প্রতি বিদ্বেষের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া তাঁহাকে অমানুষিক কার্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। উদয়াদিত্যের ও বসন্তরায়ের মৃদু এবং প্রীতিপূর্ণ মনোবৃত্তি প্রতাপাদিত্যের মনো-

[১] প্রথমপ্রকাশ ভারতী ১২৮৮ অগ্রহায়ণ হইতে ১২৮৯ আশ্বিন; পুস্তকাকারে ১৮০৪ শকাব্দে (১৮৮২)।

ভাবের প্রতিকূল হইয়া তাহাতে ইন্ধন যোগাইল। শেষে একজন পলাইয়া এবং অপর জন আত্মোৎসর্গ করিয়া নিষ্কৃতি পাইল।

উদয়াদিত্যের পশ্চাতে কিশোর রবীন্দ্রনাথের ছায়া পড়িয়াছে। উদয়াদিত্য কোমলচিত্ত ও অদৃষ্টবাদী; তাঁহার চরিত্রে পুরুষোচিত গুণের ও মনস্বিতার অভাব নাই, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে উদ্যমের অভাব আছে। পিতৃবন্ধু সরলহৃদয় সঙ্গীতপ্রিয় রসস্নিগ্ধ বৃদ্ধ শ্রীকণ্ঠ সিংহের আদলে রবীন্দ্রনাথ বসন্তরায়ের স্নিগ্ধমধুর ভূমিকার অবতারণা করিয়াছিলেন। উদয়াদিত্যের মাতা রাণীর চরিত্রে বড়ঘরের গৃহিণীর গুণদোষ সমানভাবে ফুটিয়াছে। বধূবিদ্বেষ বাঙ্গালী শাশুড়ীর একটি প্রধান বিশেষত্ব। এই বিদ্বেষবহ্নি উদয়াদিত্যের স্ত্রী সুরমাকে গ্রাস করিয়া তবে নির্ব্বাপিত হইল। চোখের-বালিতে বধূবিদ্বেষের যে চিত্র পাই তাহা এত তীব্র নয়, তবে তাহার অনুপ্রেরণা আরও জটিল। সুরমার ও বিভার ভূমিকায় বাঙ্গালী মেয়ের নম্রমধুর সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত। রামচন্দ্র রায়ের ভূমিকায় অশিক্ষিত মূর্খ চাটুকারসেবিত জমিদারের অতিশয়িত বিদ্রূপচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। রামমোহনের চরিত্র মহৎ। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির মধ্যে পাষণ্ড চরিত্র পাই একটিমাত্র, তাহা হইতেছে বৌঠাকুরাণীর-হাটের মঙ্গলা। এই চরিত্রে, বিশেষ করিয়া সীতারামের সহিত তাহার সম্পর্কে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বৌঠাকুরাণীর-হাট কাহিনী অবলম্বনে অনেক কাল পরে রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৬) নাটক রচনা করেন। এই নাটকে মূল আখ্যানের অনেক ত্রুটি সংশোধিত হইয়াছে। একান্তভাবে বধূবিদ্বেষপ্রণোদিত নিষ্ঠুরতার পরিবর্ত্তে রাণীর নির্বুদ্ধিতাকেই সুরমার অপমৃত্যুর হেতু করা হইয়াছে, এবং উদয়াদিত্য-রুক্মিণী (মঙ্গলা)-সীতারাম কাহিনীটুকু বাদ দেওয়া হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যও প্রকৃতিস্থ মানুষ হইয়াছে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকা নূতন সৃষ্টি, কিন্তু এই ভূমিকার জন্য বোধ হয় নাটকটির ট্রাজিক রস কিছু লঘু হইয়া গিয়াছে।

৪

'মুকুট'[১] ছেলেদের জন্য লেখা গল্প। রচনা লঘু, বর্ণনা দ্রুতগতি। কাহিনী স্বাধীন-ত্রিপুরার ইতিহাস হইতে গৃহীত। সৌভ্রাত্র্য এবং ভ্রাতৃবিদ্বেষ গল্পটির উপজীব্য বিষয়। বড়-ভাইয়ের প্রতি ছোট-ভাইয়ের নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞতা রাজর্ষিতেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানে ভ্রাতৃস্নেহের মধ্যে বাৎসল্য লুক্কায়িত ছিল অনেকখানি।

'রাজর্ষি'[২] উপন্যাসের মুখ্য রস বাৎসল্য, গৌণ রস সর্বজনীন প্রীতি। ইহার আখ্যানবস্তুও স্বাধীন-ত্রিপুরার রাজবংশকাহিনী হইতে গৃহীত। রাজর্ষিতে ঐতিহাসিক প্রতিবেশ বৌঠাকুরাণীর-হাট অপেক্ষা স্ফুটতর এবং মুখ্য। দালিয়া গল্পে রাজর্ষিতে উল্লিখিত শাহ্ শুজার কন্যাদের পরবর্তী ইতিহাসের একটি কাল্পনিক চিত্র পাওয়া যায়।

রাজর্ষি কাহিনীর মূলসূত্র কিভাবে স্বপ্নে লাভ করিয়াছিলেন তাহা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে[৩] উল্লেখ করিয়াছেন; "এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে।"[৪]

বৌঠাকুরাণীর-হাটে এবং মুকুটে রবীন্দ্রনাথের সৌভ্রাত্র্যস্নেহের প্রতিচ্ছবি পাইয়াছি। তাঁহার জীবনে নূতনতর হৃদয়বৃত্তি শিশুস্নেহের পরিচয় পাওয়া গেল রাজর্ষিতে। রবীন্দ্রনাথের শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্কন্যা, সত্যেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যা, রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে এবং প্রথমযৌবনে তাঁহার হৃদয়ে যে কতটা স্থান অধিকার করিয়া তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির নবরূঢ় অঙ্কুরে বারিসেচন করিয়াছিল তাহা যাঁহারা

১ প্রথমপ্রকাশ বালক ১২৯২ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, হরিশ্চন্দ্র হালদারের লিথোচিত্র সংবলিত, পরে 'ছুটির পড়া'-র সঙ্কলিত (১৩১৬)।

২ প্রথমপ্রকাশ (ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ মাত্র) বালক ১২৯২ আষাঢ় হইতে মাঘ, হরিশ্চন্দ্র হালদারের লিথোচিত্র সংবলিত; পুস্তকাকারে ১২৯৩ সালে (১৮৮৭)।

৩ 'রচনাবলী' সংস্করণের ভূমিকায়ও রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ের পুনরুক্তি করিয়াছেন।

৪ 'সোনার তরী'-র অন্তর্গত গানভঙ্গ কবিতার মর্মও স্বপ্নলব্ধ।

রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও সাহিত্যের সহিত গভীরভাবে পরিচিত আছেন তাঁহাদের অজ্ঞাত নয়।

স্বপ্নলব্ধ অংশটুকু রাজর্ষির মূল কাহিনী ধরিলে গল্পটি শেষ হওয়া উচিত ছিল পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে,[১] কেননা সেইখানেই গল্পের আসর হইতে জয়সিংহের নিষ্ক্রমণ। এইটুকু লইয়াই পরে বিসর্জ্জন নাটক (১২৯৭) রচিত হয়। মূল উপন্যাসে কোন নারী-চরিত্র নাই, নাটকে দুইটি প্রধান নারী-ভূমিকার এবং অন্য কয়েকটি নূতন ভূমিকার অবতারণা হইয়াছে।

কর্ত্তব্যবোধের সহিত হৃদয়বৃত্তির ও সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানের সংঘর্ষ, এবং অহিংসার ও প্রেমের মহত্তর অধিষ্ঠানে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা,—ইহাই রাজর্ষির মূল কথা। গোবিন্দমাণিক্য যেন উদয়াদিত্যেরই পরিণামরমণীয় মূর্ত্তিভেদ। গোবিন্দমাণিক্যের স্নেহকোমল হৃদয়ের ট্রাজেডি কাহিনীকে আদ্যন্ত ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য কর্ত্তব্যবোধে রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়কে যে দণ্ড দিলেন তাহাতে প্রকারান্তরে নিজেকেই শাস্তি দেওয়া হইল। গোবিন্দমাণিক্য নিঃসন্তান, এবং উপন্যাসে তাঁহার পারিবারিক জীবনের বিশেষ কোন উল্লেখ না থাকায় মনে হয় সেখানেও তাঁহার সান্ত্বনার অবকাশ ছিল না। সেইজন্য তাঁহার হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ উপচিত হইয়াছিল ছোট-ভাই নক্ষত্ররায়ের উপর। রাজধর্ম্মের অনুরোধে যখন তিনি নক্ষত্ররায়কে নির্ব্বাসনের আদেশ দিতে বাধ্য হইলেন তখন ঠাকুরঘরের রুদ্ধদ্বারের আশ্রয় ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর রহিল না। "নক্ষত্ররায়ের প্রেম রাজার মনে দ্বিগুণ জাগিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ের ছেলেবেলাকার মুখ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে-সকল খেলা করিয়াছে, কথা কহিয়াছে তাহা একে একে তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। একেকটা দিন একেকটা রাত্রি, তাহার সূর্য্যালোকের মধ্যে তাহার তারাখচিত আকাশের মধ্যে শিশু নক্ষত্ররায়কে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উদয় হইল। রাজার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।"

নক্ষত্ররায়ের উপর গোবিন্দমাণিক্যের ভালবাসা বিশুদ্ধ বাৎসল্য নহে, তাহার

[১] 'রচনাবলী' সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

মধ্যে ভ্রাতৃস্নেহের প্রাধান্ত; এই স্নেহের মধ্য দিয়াই তাঁহার চিত্তের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইয়াছিল। বালিকা হাসির এবং শিশু তাতার উপর তাঁহার প্রীতি অহেতুক বাৎসল্যজনিত। এই প্রীতিই অবশেষে তাঁহার মনের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দিয়া তাঁহাকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছিল।

গোবিন্দমাণিক্যের তুলনায় রঘুপতির ভূমিকা বর্ণাঢ্য। রঘুপতির সবল নির্লিপ্ত ও অক্ষোভ্য ব্যক্তিত্ব সকলকেই আকৃষ্ট করিত; "রঘুপতির একপ্রকার তেজীয়ান দীপ্তশিখার মত আকৃতি ছিল, যাহা দেখিয়া সহস্র পতঙ্গেরা মুগ্ধ হইয়া যাইত।" রঘুপতি-যে রক্তমাংসের মানুষ সে-পরিচয় পাওয়া যায় শুধু জয়সিংহের সম্পর্কে। চাণক্যের মত কূটবুদ্ধি রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের নির্ব্বাসন ঘটাইয়া যখন বহুকাল পরে আবার মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন তখন জয়সিংহের স্মৃতি তাঁহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। উদ্দেশ্যহীন কর্ম্মহীন রঘুপতি জয়সিংহের স্মৃতির মধ্যে যেন নবজীবনের আভাস পাইলেন; "সোপানের বাম পার্শ্বে জয়সিংহের স্বহস্তে রোপিত শেফালিকা গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। এই ফুলগুলি দেখিয়া জয়সিংহের সুন্দর মুখ, সরল হৃদয়, সরল জীবন এবং অত্যন্ত সহজ বিশুদ্ধ উন্নত ভাব তাঁহার স্পষ্ট মনে পড়িতে লাগিল। সিংহের ন্যায় সবল তেজস্বী এবং হরিণশিশুর মত সুকুমার জয়সিংহ রঘুপতির হৃদয়ে সম্পূর্ণ আবির্ভূত হইল—তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি আপনাকে জয়সিংহের চেয়ে অনেক বড় জ্ঞান করিতেন, এখন জয়সিংহকে তাঁহার নিজের চেয়ে অনেক বড় মনে হইতে লাগিল।" ইহাই রঘুপতির নবজীবনের প্রত্যুষ। এইটুকু ধরিতে না পারিয়া কেহ কেহ রঘুপতি-চরিত্রের পরিণতিতে অসামঞ্জস্য দেখিয়াছেন।

নক্ষত্ররায় পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসের রামচন্দ্র রায়ের মত কতকটা দুর্ব্বলচিত্ত হইলেও একান্তভাবে মানুষ। চরিত্রদৌর্ব্বল্য এবং ছেলেমানুষি সত্ত্বেও সে পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করে।

জয়সিংহ-ভূমিকা মহনীয়। গুরু-আজ্ঞাপালনরূপ কর্ত্তব্যবোধের সঙ্গে রাজ-ভক্তির ও হৃদয়বৃত্তির বিরোধ তাহার তরুণ হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে,—

এই সমস্যা রাজার সমস্যার অপেক্ষা কঠোরতর। জয়সিংহের ভূমিকায় লেখকের প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে। জয়সিংহের জীবপ্রীতি-জীবনপ্রীতির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের মনের কথাই বলিয়াছেন; "আষাঢ়ের প্রভাতে এই জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।"

পীতাম্বরের মত সামান্য ভূমিকাও নক্ষত্ররায়ের প্রতি স্নেহশীলতার প্রকাশে তুচ্ছতার উর্দ্ধে উঠিয়াছে। হাস্যরসের তলে তলে কারুণ্যের স্রোত খুড়া-সাহেবের চরিত্রকে কমনীয় করিয়াছে।

নির্ব্বোধ গতানুগতিক জনগণের যে অব্যবস্থিত ও অযৌক্তিক মনোবৃত্তির ব্যঙ্গচিত্র রাজর্ষিতে পাই তাহা কঠোর হইলেও অবাস্তব নয়। গোবিন্দমাণিক্য যখন স্বেচ্ছায় রাজসিংহাসন ভাইকে দিয়া চলিয়া যাইতেছেন তখন "কেহই তাঁহাকে সমাদর করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না।"

রাজর্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ও রোমান্টিক উপন্যাসের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে কাটিয়া গিয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উপন্যাসে দ্বিতীয় স্তর: ব্যক্তি ও সমাজ সংঘর্ষ

১

বাউঠাকুরানীর হাট লিখিবার পনেরো-ষোল বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন পুনরায় উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন তখন তিনি ছোট-গল্পে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে উপন্যাসও যে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছেন তাহা প্রতিপন্ন হইল চোখের-বালিতে। সমাজের ও সংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিহৃদয়ের সংঘর্ষ চোখের-বালির ও পরবর্ত্তী উপন্যাসের বক্তব্য।

'চোখের বালি'-র[১] কেন্দ্রস্থানীয় ভূমিকা হইতেছে বিনোদিনীর। এই চরিত্রের অপূর্ব্বতা সমগ্র উপন্যাসখানিকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। চোখের-বালি লিখিবার অনেক কাল পূর্ব্ব হইতে রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনী-চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, এবং কাহিনীটিও মোটামুটি তাঁহার মনে একটি সমগ্র ও পরিণত রূপ লইয়াছিল। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত দুইটি পত্রে বিনোদিনীর অলিখিত কাহিনীর উল্লেখ আছে; "লেখা সম্বন্ধে নদীর উপমা খাটে না—যদি খাটত তা হলে আমার সেই বিনোদিনীর সুদীর্ঘ কাহিনীটি এতদিনে খাতার মধ্যে শেষ হয়ে থাকত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে না লিখলে লেখা অগ্রসর হয় না—জগতের এমনি কঠোর নিয়ম।"[২] "বিনোদিনী লিখতে আরম্ভ করেছি—কিন্তু তার উপরে ভারতী এবং বঙ্গদর্শন উভয়েই দৃষ্টি দিয়েছেন"।[৩] কাহিনীটি বাস্তব হউক বা না হউক, লেখকের মনে অখণ্ডভাবে মূর্ত্তি লাভ করিবার পর লিখিত হইয়াছিল বলিয়া চোখের-বালি রস এবং শিল্প উভয়তই সাহিত্য-সৃষ্টি-উৎকর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইয়াছে।

[১] প্রথমপ্রকাশ 'বঙ্গদর্শন' ১৩০৮-০৯, পুস্তকাকারে ১৩০৯ সালে।

[২] শিলাইদহ হইতে ২৬শে শ্রাবণ তারিখে লিখিত, বৎসরের উল্লেখ নাই [প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি পৃ ১০৩ দ্রষ্টব্য]।

[৩] শিলাইদহ অথবা সাজাদপুর হইতে লিখিত, তারিখের উল্লেখ নাই, তবে ঐ বৎসরেই পূজার ছুটির কিছুকাল পূর্ব্বে লেখা [ঐ পৃ ২৮৫ দ্রষ্টব্য]।

ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের অপেক্ষা মনের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার লীলার ও পরিণতি গুরুত্ব আধুনিক উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ। চোখের-বালিতে পাত্রপাত্রীর মনের দ্বন্দ্ব অবলম্বনে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও বিকাশ নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাই ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস। চোখের-বালির সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্য্য আর কোন বাঙ্গালা উপন্যাসে অতিক্রান্ত হয় নাই,—এমন কি রবীন্দ্রনাথের গোরায় ও ঘরে-বাইরেতেও নয়।

চোখের-বালির প্রধান ভূমিকা বিনোদিনীর। বিনোদিনী সুন্দরী শিক্ষিত শিল্প নিপুণ এবং সেবাদক্ষ। এই মেয়ে মনে মনে ভাবী স্বামীর ও শ্বশুরালয়ের যে কল্পনাচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল তাহা ভাগ্যের বঞ্চনায়—মহেন্দ্রর মূঢ়তায়—বাস্তবে পরিণত হইতে পারিল না। তাহার বিবাহ হইল পাড়াগাঁয়ে; এবং নূতন অবস্থায় নিজেকে পুনর্গঠিত করিবার সুযোগ পাইবার পূর্ব্বেই সে বিধবা হইল। তাহার মানসপটে কুমারীজীবনের উজ্জ্বল কল্পনাচিত্র লুপ্ত না হইয়া তাহার বুভুক্ষু মনে উত্তেজনার হেতু হইয়া রহিল। অকস্মাৎ একদা মহেন্দ্রর মা আসিয়া তাহার সেবাযত্নে মুগ্ধ হইলেন। বধূ আশার তুলনায় বিনোদিনীর শ্রেষ্ঠত্ব তাহার মন অভিভূত করিল; "রাজলক্ষ্মী কেবলি মনে করিতে লাগিলেন আহা, এই মেয়েই তো আমার বধূ হইতে পারিত। কেন হইল না।" এ ক্ষোভ শুধু যদি মনে পুষিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন তবে হয়ত ব্যাপার বেশি দূর গড়াইত না। কিন্তু প্রায়ই "রাজলক্ষ্মী মনের আবেগে বলিয়া ফেলিতেন, " তুই আমার ঘরের বউ হলিনে কেন, তা হইলে তোকে বুকে করিয়া রাখিতাম এই কথায় বিনোদিনীর নারীমনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল; সেবায় নৈপুণ্যে সৌন্দর্য্যে ও স্বাধীনতায় নিজের স্বকীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি, গৃহনীড় বাঁধা,—ইহা নারীর সনাতন আকাঙ্ক্ষা। তাহার পর বিহারীকে লিখিত মহেন্দ্রর চিঠি পড়িয়া বিনোদিনীর মনে বুভুক্ষার মধ্যে হিংসার জ্বালা উদ্দীপিত হইল; "চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কী রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তাহা কৌতুকরস নহে। বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।"

এক অশুভ মুহূর্তে বিনোদিনীকে সঙ্গে লইয়া রাজলক্ষ্মী কলিকাতায় ফিরিলেন। তাহার অনুপস্থিতিতে কলিকাতায় সংসার অব্যবস্থ ও বিশৃঙ্খল হইয়াছিল; আশা-মহেন্দ্রর অবিশ্রাম মিলনের মধ্যেও শ্রান্তি আসিয়াছিল। মহেন্দ্রর উচ্ছ্বসিত প্রেম তাহা লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু "উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারের স্রোতে ঘরকন্না ভাসাইয়া হাস্যমুখে ভাসিয়া চলা" বালিকা আশার কাছে বিভীষিকাজনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপ গ্লানির মধ্যে "বিনোদিনী যখন তাহার জোড়া ভুরু ও তীক্ষ্নদৃষ্টি, তাহার নিখুঁৎ মুখ ও নিটোল যৌবন লইয়া উপস্থিত হইল, তখন আশা অগ্রসর হইয়া তাহার পরিচয় লইতে সাহস করিল না।" বিনোদিনী যখন স্বেচ্ছায় সংসারের ভার তুলিয়া লইয়া দক্ষতার সহিত চালাইতে লাগিল তখন বিনোদিনীর শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইতে আশা দ্বিধা করিল না। অবশেষে বিনোদিনী অগ্রসর হইয়া আশার সহিত ভাব করিল। সহজেই আশা সর্ব্বগুণশালিনী বিনোদিনীর কাছে ধরা দিল, দুই বিরুদ্ধপ্রকৃতি তরুণীর মধ্যে "চোখের বালি" সম্পর্ক পাতানো হইল। অদৃষ্টের ব্যবস্থা অন্যরূপ হইলে যে সংসারে বিনোদিনী সর্ব্বময়ী হইতে পারিত আজ সেখানে সে অনুগৃহীতারূপে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে এবং তাহার স্থান আশা অধিকার করিয়াছে; বিনোদিনীর মত নারীর আত্মাভিমানের পক্ষে ইহা অসহ্য। "চোখের বালি" পাতানোয় বিনোদিনীর অবচেতন মনের এই দিকটা প্রথম সচেতন স্তরে প্রকাশ পাইল। মহেন্দ্রর সংসারের কর্তৃত্ব পাইয়া বিনোদিনীর নারীসুলভ আধিপত্য-স্পৃহা কতকটা চরিতার্থ হইল। সে যদি সাধারণ স্ত্রীলোক হইত তাহা হইলে এইখানেই ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারিত। কিন্তু বিনোদিনী তো সাধারণ মেয়ে নয়। তাহার ক্ষুধা দিনে দিনে আশা মহেন্দ্রর প্রেমলীলা কতকটা প্রত্যক্ষ ও কতকটা কল্পনা করিয়া উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল। ক্ষুধিতহৃদয় বিনোদিনী আশার কাছে খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের "নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।" শুধু শুনিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, আশাকে সাজাইয়া-গুছাইয়া শিখাইয়া-পড়াইয়া তাহার স্থানে নিজেকে কল্পনা করিয়া বিনোদিনী

গৌণভাবে আপনার প্রেমতৃষা মিটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার মনের কোণে কোথাও যদি কাহারো জন্য এতটুকুও স্নেহ থাকিত তবে সে বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু ভালবাসিবার তাহার কেহই ছিল না, এবং নৈর্ব্যক্তিক স্নেহশীলতাও তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। সুতরাং ঈর্ষ্যা জ্বলিয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না; বিশেষত আশা যখন-তখন বলিত যে আর একটু হইলেই তাহার স্বামীর সহিত বিনোদিনীর বিবাহ হইয়া যাইত। "তা তো হইতই। না হইল কেন। আশার এই বিছানা, এই খাট তো একদিন তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল। বিনোদিনী এই সুসজ্জিত শয়নঘরের দিকে চায়, আর সে কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। এঘরে আজ সে অতিথিমাত্র—আজ স্থান পাইয়াছে, কাল আবার উঠিয়া যাইতে হইবে।" এই ভাবিতে ভাবিতে "তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যে-দিকে চায়, তাহার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গবর্ষণ হইতে থাকে।"

যে-মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া বিনোদিনী আশা-মহেন্দ্র-রাজলক্ষ্মীর সংসারে আগুন জ্বালাইয়া দিল তাহা সাধাসিধা সহজবোধ্য ঈর্ষ্যামাত্র নয়; তাহার মূলে ছিল তিনটি পৃথক্ মনোভাব। প্রথমত আশার মুখে তাহাদের প্রণয়লীলা শুনিবার নারী-সুলভ স্বাভাবিক কৌতূহল। দ্বিতীয়ত তাহাতে তাহার অচরিতার্থ যৌনপ্রেমতৃষা কথঞ্চিৎ মিটাইবার প্রয়াস। প্রেমবুভুক্ষা বিনোদিনীর অবচেতন মনে যে বিশেষ-ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তাহার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে অথচ বিশেষ কৌশলের সহিত দিয়াছেন; "নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে মা যখন ঘুমাইতেছেন, দাসদাসীরা একতলার বিশ্রামশালায় অদৃশ্য, মহেন্দ্র বিহারীর তাড়নায় ক্ষণকালের জন্য কলেজে গেছে এবং রৌদ্রতপ্ত নীলিমার শেষ প্রান্ত হইতে চীলের তীব্রকণ্ঠ অতি ক্ষীণস্বরে কদাচিৎ শুনা যাইতেছে, তখন নির্জন শয়নগৃহে নীচের বিছানায় বালিশের উপর আশা তাহার খোলা চুল ছড়াইয়া শুইত এবং বিনোদিনী বুকের নীচে বালিশ টানিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া গুন্-গুন্-গুঞ্জরিত কাহিনীর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া রহিত,—তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিত, নিশ্বাস বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিত।" তৃতীয়ত তাহার নিজের যোগ্যতার ও দক্ষতার বোধ তাহাকে এই পীড়া দিত যে তাহার ন্যায্য সিংহাসনে আজ আশার মত অকর্ম্মণ্য অবোধ বালিকার দখলে।

বিনোদিনীর সম্বন্ধে বিহারী প্রথম হইতেই ঠিক ধারণা করিয়াছিল; তাহার মন বুঝিয়াছিল, এ-নারী খেলা করিবার নহে, ইহাকে উপেক্ষা করাও যায় না।" মহেন্দ্র তখন পর্য্যন্ত বিনোদিনীকে দেখে নাই, সুতরাং তাহার মন এই নারীর বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত তো ছিলই উপরন্তু বিনোদিনীর সখ্য আশাকে অনেক সময় স্বামী-সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য করিত বলিয়া তাহার উপর মহেন্দ্রর কতকটা বিদ্বেষই ছিল। এই বিদ্বেষ ঘুচিয়া মোহের রঙ লাগিল প্রধানত আশার ব্যবহারে। বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রর অহেতুক বিরূদ্ধভাব যাহাতে না থাকে সে-জন্য আশা নিজে উদ্‌যোগী হইয়া মহেন্দ্রর সহিত বিনোদিনীর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইল। এদিকে বিনোদিনী নিজেকে দুর্লভতর করিয়া মহেন্দ্রর আগ্রহ বাড়াইয়া চলিল। মহেন্দ্রর উপেক্ষা বিনোদিনীর আত্মসম্মানে ঘা দিয়াছে; তাই আশার নির্ব্বন্ধে মহেন্দ্র বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ করিতে রাজি হইলে বিনোদিনী বাঁকিয়া বসিল। ইতিমধ্যে মহেন্দ্রর নবপ্রেমলীলায় ভাটার টান দেখা দিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে বিনোদিনীর দুর্লভত্ব তাহার মনে আগ্রহের সঞ্চার করিতেছে। সময় বুঝিয়া বিনোদিনী যেন অজ্ঞাতসারেই ধরা দিল, কিন্তু নিজের দুর্লভত্ব নষ্ট করিল না। বিনোদিনীর মধ্যস্থতায় এখন মহেন্দ্র-আশার প্রণয়লীলায় নূতন আবেগ সঞ্চারিত হইল। ঘরের আকর্ষণ মহেন্দ্রর কাছে প্রবলতর হইয়া উঠিল; স্বামীর চিত্তরঞ্জন করিয়া সময় কাটাইবার দায় হইতে উদ্ধার পাইয়া আশাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল; আশাকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া বিনোদিনী মহেন্দ্রর উদ্দেশে তাহার চোখা চোখা অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এ অস্ত্র মোহিনীর সম্মোহন বাণ নয়, সেবাপরায়ণার সুনিপুণ দক্ষতা। "মহেন্দ্র এইরূপে আহারে ও আচ্ছাদনে, কর্ম্মে ও বিশ্রামে, সর্ব্বত্রই নানা আকারে বিনোদিনীর সেবাহস্ত অনুভব করিতে লাগিল। বিনোদিনীর রচিত পশমের জুতা তাহার পায়ে এবং বিনোদিনীর বোনা পশমের গলাবন্ধ তাহার কণ্ঠদেশে একটা যেন কোমল মানসিক সংস্পর্শের মতো বেষ্টন করিল।"

মহেন্দ্রর প্রধান দৌর্ব্বল্য এই ছিল যে তাহার মানসিক সত্তা অপর কোন ব্যক্তিত্বের আশ্রয় ব্যতিরেকে যেন জোর পাইত না। বিবাহের পর মাতার

প্রভাব সে কাটাইয়া উঠিয়াছিল; অর্থাৎ রাজলক্ষ্মীর অভিমান এবং মহেন্দ্রর প্রেমোন্মত্ততা মাতাপুত্রের স্নেহসম্পর্কে কতকটা বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল। অথচ বালিকা আশার এমন সাংসারিক জ্ঞান অথবা স্বাভাবিক বোধ ছিল না যাহাতে তাহার উপর মহেন্দ্রর দুর্ব্বল ব্যক্তিত্ব নির্ভর করিতে পারে। সুতরাং বিনোদিনীর কর্ম্মনিপুণ ও সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের আশ্রয় পাইয়া মহেন্দ্রর চিত্ত যেন কূল পাইল।

মহেন্দ্রর প্রতি বিনোদিনীর ব্যবহারের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিহারীর অগোচর রহিল না। এবং "বিনোদিনী বুঝিয়া লইল, এ লোকটিকে ভোলানো সহজ ব্যাপার নহে—কিছুই ইহার নজর এড়ায় না।" বিনোদিনীর মনে বিহারী দাগ বসাইয়া দিল; "বিহারী আশাকে শ্রদ্ধা করে এবং বিনোদিনীকে হাল্‌কা করিতে চায়, ইহা বিনোদিনীকে বিঁধিল।" সে ইহাও বুঝিল, "বিহারীর সম্মুখে সশস্ত্র থাকিতে হইবে।" বিহারীকে আঘাত করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া আশাকে উপলক্ষ্য করিয়া সে বক্রোক্তি ছাড়িতে লাগিল। ইহাতে একদিকে যেমন বিহারী ব্যথা পাইল অপরদিকে তেমনি আশার মন বিহারীর উপর বিরূপ হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রর মূঢ়তাও বিহারীকে দূরে ঠেলিয়া দিতে লাগিল।

দমদমের বাগানে চড়িভাতি বিনোদিনীর জীবনে একটি বৃহৎ ঘটনা। রন্ধনকার্য্যে সহযোগিতা করিয়া বিহারী বিনোদিনীর মনে প্রশংসার ভাব জাগাইল। তাহার পর আহারান্তে মহেন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িলে এবং আশা ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলে বটগাছের তলায় বসিয়া বিহারী গল্পচ্ছলে বিনোদিনীকে তাহার দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিল। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বিনোদিনী যেন তাহার হারানো বাল্যজীবনের সরল সুন্দর দিনগুলি ফিরাইয়া পাইল; তাহার নিজের—দেহের নয়, ব্যক্তিত্বের—উপর সে প্রথম আকর্ষণ বোধ করিল, এবং সেইজন্য নিজের প্রতি এবং সেই সঙ্গে বিহারীর প্রতি কিছু শ্রদ্ধা অনুভব করিল। বিনোদিনীর ব্যক্তিত্ব-উন্মেষের, দেহাত্মবোধ হইতে তাহার জাগরণের, এই ইঙ্গিতটুকু রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে দিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। বিনোদিনীর নিটোল কাঠিন্যের অন্তরালে যে কোমল হৃদয়টুকু চাপা পড়িয়াছিল তাহাই এই চিত্রে ক্ষণিকের জন্য বিদ্যুৎচকিতের মত উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাস তরুপল্লব মর্ম্মরিত

করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণে ক্ষণে দিঘির পাড়ে জামগাছের ঘনপত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপ-মায়ের কথা, তাহার বাল্যসাথীর কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল; বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্ব্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল।[1] বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্নদৃষ্টি বিহারীর মনে এ-পর্য্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বল-কৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্ত-সজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল, তখন বিহারী যেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনো সুধাধারায় সরস হইয়া আছে,—অপরিতৃপ্ত রঙ্গরস-কৌতুকবিলাসের দহনজ্বালায় এখনো নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই।" নিরলস কর্ম্মপরায়ণতা বিনোদিনীর স্বভাব। "কোনো কাজ যখন বিনোদিনীর উপর নির্ভর করে তখন সে আর কিছুই মনে রাখে না।" তাই সহজেই অতীতের বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া বিনোদিনী কর্ম্মপটু বিহারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিল; তাহার সুপ্ত কোমল নারীপ্রকৃতি বিহারীর কাছে মুহূর্ত্তের জন্য উন্মুক্ত হইল।

রাজলক্ষ্মীর রোগশয্যায় বিনোদিনীর ব্যস্ততা মহেন্দ্রর অসন্তোষ জাগাইল, বিশেষ করিয়া যখন সে নিজের পরিচর্য্যায় অল্পস্বল্প ত্রুটি দেখিতে পাইল। তাহার উপর, বিনোদিনী বিহারীকে চিঠি লিখিয়াছে জানিয়া তাহার অভিমান বাড়িয়া গেল; পড়িবার সুবিধার অছিলায় মহেন্দ্র স্বতন্ত্র বাসা করিয়া রহিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিনোদিনীর প্রতি অনুরাগ মহেন্দ্রর নিজের কাছে ধরা পড়ে নাই।

[1] তুলনীয়, "বিনোদা শয়নকক্ষের দ্বার রোধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল,—তাহার অশ্রুহীন চক্ষু মধ্যাহ্নের মরুভূমির মত জ্বলিতেছিল। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া বাহিরে বাগানে কাকের ডাক থামিয়া গেল, তখন নক্ষত্রখচিত শান্ত আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার বাপ-মায়ের কথা মনে পড়িল এবং তখন দুই গণ্ড দিয়া অশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।" ['পুত্রযজ্ঞ', ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫ পৃ ১০০]

পুত্রযজ্ঞের বিনোদা-চরিত্রে চোখের-বালির বিনোদিনীর অতি ক্ষীণচ্ছায় পূর্ব্বাভাস লক্ষণীয়। নামের সাদৃশ্যও উল্লেখযোগ্য।

বিনোদিনীর রচিত আশার পত্রে মহেন্দ্র বিনোদিনীর মনের কথা জানিতে পারিল এবং তন্মুহূর্ত্তে নিজের মনের কথাও স্পষ্টভাবে জাগিয়া উঠিল। মহেন্দ্র মানুষটির উপর বিনোদিনীর কিছুমাত্র অনুরাগ জাগে নাই, কেবলমাত্র তাহার উপর সমস্ত ছলাকলা বিস্তার করিয়া তাহাকে পদানত করিয়া নিজের একচ্ছত্রতা প্রতিষ্ঠা করিবার নেশা বিনোদিনীকে পাইয়া বসিয়াছিল। মহেন্দ্র বাড়ী হইতে চলিয়া গেলে বিনোদিনী তাহার অস্ত্রের লক্ষ্য হারাইয়া অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। মহেন্দ্রকে তাহার চাইই ; "দগ্ধ হইতেই হৌক বা দগ্ধ করিতেই হৌক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিষদগ্ধ অগ্নিবাণ জগতে কোথায় মোচন করিবে।" মহেন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আশার হইয়া বিনোদিনী মহেন্দ্রকে পর-পর তিনখানি পত্র বর্ষণ করিল। পত্রগুলির মধ্যে অনুরাগের যে তীব্র ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা বিনোদিনীরই বিরহিণীহৃদয়ের উচ্ছ্বাস। এই তীব্র উচ্ছ্বাসের মূল মহেন্দ্রর প্রতি ভালবাসা নয়, তাহার নিজেরই উপর ভালবাসা, তাহার অতৃপ্ত নিরুদ্ধ ভোগাকাঙ্ক্ষার বাঙ্ময় প্রকাশ। বেচারা মহেন্দ্র এই উচ্ছ্বাসের স্রোতে তাল সামলাইতে পারিল না। তবে বিনোদিনীর পক্ষে এইটুকু না বলিলে অন্যায় হয় যে তাহার নিজের মনোভাব যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল না, মহেন্দ্রকে যে সে ভালবাসে না একথা সে তখনো জানিতে পারে নাই।

মহেন্দ্র বাড়ী ফিরিয়া আসিলে জাত-মায়াবিনী বিনোদিনী অমনি নিজেকে মহেন্দ্রর নিকট হইতে দূরে দূরে রাখিয়া চলিতে লাগিল। মহেন্দ্রর মনে তখন নেশার ঘোর লাগিয়াছে। বিনোদিনীর ছলনায় সে ধরা দিতে দেরী করিল না। মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিল তখন বিনোদিনীর বিজয়গর্ব্ব— "ঠাকুরপো আমি হার মানিয়াছি, না তোমাকে হার মানাইয়াছি ?"—মহেন্দ্রকে স্তম্ভিত করিল, সে তাহার অপরাধ বুঝিতে পারিয়া মরমে মরিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে বিহারী আসিলে বিনোদিনী মহেন্দ্রর জন্য উদ্বেগের ছলনা করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীকে প্রতারিত করিল। বিহারী বিনোদিনীর প্রতি তাহার পূর্ব্বতন অহেতুক সন্দেহের জন্য অকুণ্ঠিতভাবে অনুতাপ প্রকাশ করিয়া তাহাকে আন্তরিক ভক্তি জানাইল বিহারী বলিল, "বৌঠা'ন আমি তোমাকে প্রথমে

চিনি নাই, সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করো।” বিহারীর এই শ্রদ্ধা-নিবেদন বিনোদিনীর কাছে অপূর্ব্ব ঠেকিল, বিনোদিনীর হৃদয়ের কঠিন আবরণের যেন আর এক স্তর খসিয়া গেল, “এমন জিনিস সে কখনো কাহারো কাছ হইতে পায় নাই।”

আশার কাশী-গমন উপলক্ষ্য করিয়া দুই বন্ধুর মনান্তর একটু নূতন রূপ ধারণ করিল। মহেন্দ্র একথা ভুলিতে পারে নাই যে সে বিহারীর নিকট হইতে আশাকে কাড়িয়া লইয়াছে। তাই সে বিহারীর সহজ কথায় গূঢ় হেতু ধরিয়া বিহারীকে নিদারুণ আঘাত দিয়া বলিল, “আমি তোমার মুখের সামনে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি আশাকে ভালবাসিয়াছ।” মহেন্দ্রর এই মর্ম্মান্তিক অভিযোগে বিহারীর মনোবেদনা বিনোদিনীকে ক্ষুব্ধ করিল, “বিহারীর সেই মৃত্যুবাণাহত রক্তহীন পাংশুমুখ বিনোদিনীকে সকল কর্ম্মের মধ্যে যেন অনুসরণ করিয়া ফিরিল। বিনোদিনীর অন্তরে যে সেবাপরায়ণা নারীপ্রকৃতি ছিল, সে সেই আর্দ্রমুখ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। রুগ্ন শিশুকে যেমন মাতা বুকের কাছে দোলাইয়া বেড়ায়, তেমনি সেই আতুর মূর্ত্তিকে বিনোদিনী আপন হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া দোলাইতে লাগিল।” বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর শ্রদ্ধাতে এইরূপে কারুণ্যের স্পর্শ লাগিয়া অনুরাগের বীজ উপ্ত হইল।

বিহারীকে সান্ত্বনা দিয়া বিনোদিনী একটি ছোট চিঠি লিখিয়া পাঠাইল; তাহা বিহারীর হাতে না পড়িয়া মহেন্দ্রর হাতে পড়িল। মহেন্দ্র চিঠি পড়িয়া বিনোদিনীকে ভুল বুঝিল এবং তাহাকেও ভুল বুঝাইল, যেন বিহারী অবজ্ঞা করিয়া উত্তর না দিয়া চিঠি ফেরৎ পাঠাইয়াছে। এই চিঠি লইয়াই উপন্যাসের ঘটনায় ক্লাইমাক্স্ আসিল। এই কল্পিত অপমানে অভিমানিনী বিনোদিনী যেন মরীয়া হইল। “ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই দংশন করে, ক্রুদ্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।” মহেন্দ্র আশাকে অন্নপূর্ণার নিকট কাশীতে পাঠাইয়া দিল; অদৃষ্টের পরিহাসে আশা যাইবার সময় মাথার দিব্য দিয়া বিনোদিনীকে স্বামীর ভার লইতে অনুরোধ করিয়া গেল।

চতুর ও সতর্ক বিনোদিনী মহেন্দ্রর কাছে ধরা দিল না। মহেন্দ্রব বিমর্ষভাব দেখিয়া রাজলক্ষ্মী মনে করিলেন যে বধূর অভাবে ছেলে উপযুক্ত পরিচর্যা হইতেছে না। তিনি বিনোদিনীকে এই ভার লইতে বলিলেন। বিনোদিনীও প্রথমে ঔদাসীন্য দেখাইয়া পরে যেন রাজলক্ষ্মীর অসুস্থ শরীরের দিকেই চাহিয়া একান্ত অনিচ্ছুকভাবে রাজি হইল। রাজলক্ষ্মীর পুত্রসর্ব্বস্ব অন্ধস্নেহপরায়ণ চিত্তে লোকের নিন্দা বা সমাজে কলঙ্ক ভীতি স্থান পাইল না। পুত্রের এবং সংসারের যে কত বড় সর্ব্বনাশ তিনি করিতে যাইতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রবীণা নারী যে এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন তাহাও নয়। তাঁহার অনুরোধ ঠেলিয়া পরে কাকীর কথায় মহেন্দ্র যাহাকে বিবাহ করিয়াছে তাহার অপবাধ তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই; তাঁহার অবচেতন মনে হয়ত এমন কামনা ছিল যে বিনোদিনীর সেবায় মহেন্দ্র যেন বুঝিতে পারে যে মায়ের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সে ঠকিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর মনোগহনের এই ভাব বিনোদিনীও আভাসে বুঝিয়াছিল; তাই সে অকুণ্ঠিতভাবে মহেন্দ্রর সংসারে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে পারিয়াছিল, এবং যখন মহেন্দ্রর সহিত তাহার সম্পর্ক রাজলক্ষ্মীর অন্ধদৃষ্টির সম্মুখেও অপ্রকাশিত রহিল না, রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে মায়াবিনী বলিয়া গালি দিলেন, তখন বিনোদিনী অবিচলিতভাবে বলিয়াছিল, "পিসিমা, আমরা মায়াবিনীর জাত্, আমার মধ্যে কী মায়া ছিল, তাহা আমি ঠিক জানি নাই, তুমি জানিয়াছ,—তোমার মধ্যেও কী মায়া ছিল, তাহা তুমি ঠিক জানো নাই, আমি জানিয়াছি। কিন্তু মায়া ছিল, নহিলে এমন ঘটনা ঘটিত না। ফাঁদ আমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছি। ফাঁদ তুমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছ। আমাদের জাতের ধর্ম্ম এইরূপ—আমরা মায়াবিনী।"

বিহারীকে উপলক্ষ্য করিয়া মহেন্দ্র-বিনোদিনীর মধ্যে ঝগড়ার মত হইয়াছিল; তাহার অবসানে মহেন্দ্র গমনোদ্যতা বিনোদিনীর পা ধরিয়া আটকাইবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময় বিহারী আসিয়া পড়িয়া সমস্ত দৃশ্যের কুৎসিত-অর্থ কল্পনা করিয়া ব্যথা বোধ করিল। বিনোদিনী দেখিল বিহারী তাহাকে ভুল বুঝিয়া চলিয়া যাইতেছে, সে সামনে আসিয়া দুই হাতে বিহারীর ডান হাত চাপিয়া ধরিল;

বিহারী ঘৃণার সহিত তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বিনোদিনী পড়িয়া গিয়া বাম হাতের কনুইয়ে আঘাত পাইল—কনুই কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এই শারীরিক আঘাতকে বিনোদিনীর ব্যথিত অনুতপ্ত ও সানুকম্প চিত্ত যেন দণ্ড-আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিল। তবুও বিহারীর উপর তাহার অভিমান হইল। সেই অভিমানের বশে বিনোদিনী মহেন্দ্রর প্রেমপ্রার্থনা সরাসরি অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, অথচ মহেন্দ্রর বাহুবন্ধনে ধরা দিতেও বাধিল। মহেন্দ্র যেদিন আত্মবিস্মৃত হইয়া "বিনোদিনীর হাত বলপূর্ব্বক লইয়া নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল" তখন বিনোদিনী বিহারীর নিকট হইতে যে আঘাত পাইয়াছিল সেখানে আবার লাগিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল; মহেন্দ্র-বিনোদিনীর মধ্যে অদৃশ্য বিহারীর ব্যবধান স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

আশা কাশী হইতে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বিনোদিনীর ছায়া গভীরতর হইয়া দম্পতীর মধ্যে বিচ্ছেদ আনিয়া দিয়াছে। মহেন্দ্র অন্যাসক্ত এবং অপরাধী, আশা অবোধ ও অসহায়। একদা রাত্রিবেলায় "মহেন্দ্রের রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না।" সে বিনোদিনীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। এতদিনে রাজলক্ষ্মীও ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। মহেন্দ্রর চিত্তদৌর্ব্বল্য ও ভীরুতা দেখিয়া নিদারুণ অবজ্ঞায় তাহাকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া "বিনোদিনী তাহার ঘনকৃষ্ণ ভ্রূযুগের নীচে হইতে মহেন্দ্রের প্রতি বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করিল। মহেন্দ্র কোন উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।" পরদিন সকালে মহেন্দ্রর চিঠির উত্তরে বিনোদিনী নিজের যথার্থ মনোভাব এবং মহেন্দ্রর দৌর্ব্বল্য স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিল। বিনোদিনী-চরিত্রের অনেকখানিই এই পত্রে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বিনোদিনী লিখিয়াছিল, "জগতে আমার ভালবাসিবার এবং ভালবাসা পাইবার কোন স্থান নাই। তাই আমি খেলা খেলিয়া ভালবাসার খেদ মিটাইয়া থাকি।...তুমি লিখিয়াছ, আমাকে ভালবাসো,...ও-কথা বিশ্বাস করি না। এক সময় মনে করিতে তুমি আশাকে ভালবাসিতেছ সে-ও মিথ্যা—এখন মনে করিতেছ তুমি আমাকে ভালবাসিতেছ, এ-ও মিথ্যা। তুমি কেবল নিজেকে ভালবাসো।"

এই চিঠি আশাও দেখিল; তাহার মন গেল ভাঙিয়া। ওদিকে রাজলক্ষ্মীর মনও বিরূপ হইয়া গিয়াছে। এই দুই নারীর বিরুদ্ধতায় বিনোদিনীর "দুই চক্ষে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।" রাজলক্ষ্মীকে আঘাত দিবার জন্য বিনোদিনী মহেন্দ্রর সহিত গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে স্বীকার করিল। দুর্ব্বলচিত্ত মহেন্দ্রর প্রতি অবজ্ঞা এবং সবলচিত্ত বিহারীর উপর অনুরাগ বিনোদিনীকে আর একবার মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিল। বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় বিনোদিনী বিহারীর বাসায় গিয়া তাহার আশ্রয় ভিক্ষা করিল মনের আগল খুলিয়া দিয়া। বিহারী শুনিয়া কঠিনভাব ধারণ করিয়া তাহাকে ইচ্ছা করিয়া আঘাত দিয়া বলিল, "তুমি আজ যে কাণ্ডটা করিলে, এবং যে কথাগুলা বলিতেছ, ইহার অধিকাংশই, তুমি যে-সাহিত্য পড়িয়াছ—তাহা হইতে চুরি। ইহার বারো-আনাই নাটক এবং নভেল।" বিহারীর এই কঠিন সত্য কথায় বিনোদিনীর আবেগ-উচ্ছ্বাস নিবিয়া গেল। "মর্ম্মাহত ফণিনীর মতো সে স্তব্ধ হইয়া—নত হইয়া রহিল।" বিনোদিনীর আকুল প্রেমপ্রার্থনায় বিহারী মনে মনে বিচলিত হইয়াও নিজেকে সংবরণ করিতেছে এমন সময় তাহার পোষ্য বালক বসন্ত আসিয়া তাহাদের সঙ্কট মুহূর্ত্ত নিরাপদে কাটাইয়া দিল এবং বিনোদিনীর মনে বাৎসল্য জাগাইয়া তাহার হৃদয়ের নবজাগরণ সম্পূর্ণ করিল। "বিনোদিনী দুই হাত বাড়াইয়া দিল। বসন্ত প্রথমে একটু দ্বিধা করিয়া ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে গেল। বিনোদিনী তাহাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।" বিনোদিনীর এই কাতর মূর্ত্তি বিহারীর মন আঁকড়াইয়া রহিল।

মহেন্দ্রর হৃদয়ে যে ক্ষুধা জাগিয়াছে তাহা সহজে শান্ত হইবার নয়। এদিকে বিহারী কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। বিনোদিনী যখন উত্তরের প্রত্যাশায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে তখন হঠাৎ মহেন্দ্র আসিয়া পড়িয়া তাহার ক্ষুব্ধ পল্লীলোকে ক্ষুব্ধতর করিয়া তুলিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহেন্দ্রর অনুগামিনী হওয়া ছাড়া তাহার গত্যন্তর রহিল না। মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কলিকাতায় এক বাসায় আনিয়া তুলিল। কিন্তু বিনোদিনীর মনের নাগাল পাইল না; তাহার চিত্ত বিহারীকে অনুধ্যান করিতেছে। বিহারীর বাসায় একদিন রাত কাটাইয়া

প্রভাতে মহেন্দ্র বারাসত হইতে বিহারীকে লেখা বিনোদিনীর চিঠিখানি দেখিতে পাইল, এবং ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া খাম খুলিয়া পড়িয়া ফেলিল। "চিঠির প্রত্যেক অক্ষর মহেন্দ্রকে দংশন করিতে লাগিল।" ঈর্ষ্যাকুল মহেন্দ্র বিনোদিনীকে মিথ্যা করিয়া জানাইল যেন বিহারী কলিকাতাতেই ছিল এবং সেইদিনই পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছে। এই কথায় বিশ্বাস করিয়া বিনোদিনীর আত্মাভিমানে আঘাত পাইল। এদিকে বিহারীর চিন্তা তাহার দেহে মনে তপস্যার আগুন জ্বালাইয়াছে; "তাহার শরীর কৃশ হইয়া গেছে—এবং সেই কৃশতা ভেদ করিয়া তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখে একটি দীপ্তি বাহির হইতেছে।" বিনোদিনী নিজের ফাঁদে পড়িয়া ছটফট করিতেছিল। "যে মূঢ় মহেন্দ্র বিনোদিনীর সমস্ত মুক্তির পথ চারিদিক হইতে রুদ্ধ করিয়া তাহার জীবনকে এমন সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রতি বিনোদিনীর ঘৃণা ও বিদ্বেষের সীমা ছিল না।" অথচ পলাইবার পথ নাই। তখন দুইজনে কলিকাতা পরিত্যাগ করিল। এদিকে "বিহারীর মধ্যে যে যৌবন নিশ্চলভাবে সুপ্ত হইয়াছিল, যাহার কথা সে কখনো চিন্তাও করে নাই, বিনোদিনীর সোনার কাঠিতে আজ সে জাগিয়া উঠিয়াছে।" বিনোদিনীর মনও বিহারী-ময়; তাহার সম্মুখে ব্যর্থতার মরুভূমি ধূধূ করিতেছে, দিন তাহার আর কাটে না। বিনোদিনী ভাবে, "তবু কাল সূর্য্য উঠিবে এবং সংসার তাহার ক্ষুদ্রতম কাজটুকু পর্য্যন্ত ভুলিবে না—এবং অবিচলিত বিহারী যেমন দূরে ছিল, তেমনি দূরে থাকিয়া ব্রাহ্মণবালককে তাহার বোধোদয়ের নূতন পাঠ অভ্যাস করাইবে।"

মহেন্দ্র যতই ব্যাকুল হইয়া উঠে তাহার ও বিনোদিনীর মধ্যে ব্যবধান যেন ততই কঠিন হইতে থাকে। যে-দিন সে জানিল বিহারী বিনোদিনীর মনপ্রাণ অধিকার করিয়া আছে সেইদিন হইতে তাহার মন মোহমুক্তির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সংসারত্যাগের গ্লানি এবং ধর্ম্মত্যাগের গভীর পরিতাপ মহেন্দ্রের চিত্তের অন্তস্তলে যে প্রতিক্রিয়ার সূচনা করিতেছিল তাহা পরদিন প্রভাতে তাহার মনে আলোড়ন আনিয়া দিল। মহেন্দ্রের মোহ ছুটিয়া গেল, বিনোদিনী তাহার কাছে আজ তাহার সমস্ত অসামান্যত্ব ঘুচাইয়া সামান্য স্ত্রীলোকরূপে প্রতিভাত হইল।

বিহারী সেইদিনই আসিয়া পড়িল। তাহার নিকট বিনোদিনী সরলভাবে মনের কথা প্রকাশ করিল। বিহারী বুঝিল বিনোদিনী নিজেকে এবং মহেন্দ্রকে বাঁচাইয়াছে। বিহারী বিনোদিনীকে ভালবাসে বলিয়াই বিবাহ করিতে সঙ্কল্প করিল। বিনোদিনী প্রেমের তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। একদা যে-প্রেমের জন্য সে সর্ব্বস্ব দিতে পারিত, আজ সে-প্রেমের জন্যই সে বিহারীকে প্রত্যাখ্যান করিতে ইতস্তত করিল না; বিনোদিনী বুঝিয়াছিল সব প্রেম বিবাহকল্যাণে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না। বিহারীকে সে "হাতজোড় করিয়া কহিল, ভুল করিয়ো না,—আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে,—আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব।"

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সংস্করণে বিনোদিনীর কথা এইখানেই শেষ। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কাহিনীতে গল্পটি আরো একটু আগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর পর বিনোদিনী অন্নপূর্ণার সহিত কাশী যাইতে প্রস্তুত হইল। যাইবার সময় সে আশার কাছে ক্ষমা চাহিতে গেল। "মহেন্দ্রকে ভালবাসা যে কিরূপ অনিবার্য্য আশা তাহা নিজের হৃদয়ের ভিতর হইতেই জানে। নিজের ভালবাসার সেই বেদনায় বিনোদিনীর প্রতি আজ তাহার বড় দয়া হইল। ···এককালে সে বিনোদিনীকে ভালবাসিয়াছিল, সেই ভালবাসা তাহাকে স্পর্শ করিল।" মহেন্দ্রও বিনোদিনীকে প্রণাম করিয়া ক্ষমা চাহিল।

রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে যে দুই হাজার টাকার নোট দিয়া গিয়াছিলেন তাহা সে বিহারীর প্রতিষ্ঠিত আতুরাশ্রমে দান করিয়া দিল। "খানিক বাদে বিহারী কহিল—আমি কি তোমাকে কিছু দিতে পারিব না? বিনোদিনী কহিল, তোমার চিহ্ন আমার কাছে আছে, তাহা আমার অঙ্গের ভূষণ—তাহা কেহ কাড়িতে পারিবে না। আমার আর কিছু দরকার নাই।—বলিয়া সে নিজের হাতের সেই কাটা দাগ দেখাইল।"

আশা বিনোদিনীর প্রতিরূপ। বিনোদিনী খরযৌবনা রূপসী, শিক্ষিতা কর্ম্মদক্ষা মনস্বিনী; আশা অনতিক্রান্তযৌবনা শ্রীমতী, অপটু ভীরু লজ্জাশীলা। বিবাহের পূর্ব্বে বিনোদিনী পিতামাতার স্নেহলালনসৌভাগ্য যথেষ্ট লাভ

করিয়াছিল। কিন্তু আশা দরিদ্রকন্যা, মাতাপিতৃহীন হইয়া ধনী জ্যেঠতাতের গৃহে অনুগ্রহলালিত। বিনোদিনীকে দেখিলে মোহ হইত, আশাকে দেখিলে মায়া হইত। বিনোদিনী তাহার যোগ্যতার গুণে রাজলক্ষ্মীর সংসার স্থান লাভ করিয়াছিল, অনুকম্পার উদ্রেক করিয়াই আশা মহেন্দ্রর বধূ হইয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্ব হইতে বিনোদিনীর দুর্ভাগ্যের আরম্ভ, বিবাহের পর হইতে আশার ভাগ্যোদয়। বিনোদিনীর দুর্ভাগ্যই যে আশার সৌভাগ্য এই কথা বিনোদিনী ভুলিতে পারে নাই, এবং ইহাই তাহার মনকে বিষাক্ত করিয়াছিল। আশার ব্যক্তিত্ব ছিল নিরুদ্ধপ্রকাশ; তাই সে রাজলক্ষ্মীর সংসারে নিজের যথার্থ স্থানটি জোর করিয়া দখল করিতে পারে নাই, এবং বিনোদিনীর সম্মুখে নিজের স্নিগ্ধ মহিমা পূর্ণভাবে বিস্তার করিতে পারে নাই। "আত্মীয় গৃহে বাল্যকাল হইতে পরের মতো লালিত হইয়াছিল বলিয়া, লোক-সাধারণের নিকট আশার একপ্রকার আন্তরিক কুণ্ঠিতভাব ছিল। ভয় হইত পাছে কেহ প্রত্যাখ্যান করে।" বিনোদিনী সম্মুখে আশা নিজেকে খাটো না করিলে রাজলক্ষ্মীর সংসারে বিনোদিনীর প্রতিষ্ঠা অতটা সহজে হইত না। আশা নিজেই বিনোদিনীর গুণমুগ্ধ ক্রীড়নক হইয়া বিজয়িনীর জয়যাত্রার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল।

প্রথমে বিহারীর সহিত যে তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছিল এবং মহেন্দ্র মাঝখান হইতে আসিয়া না পড়িলে বিহারীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়া যাইত, একথা আশা জানিত বলিয়া বিহারীর উপর তাহার একটু অহেতুক বিরূপভাব ছিল। বিহারীর সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে ঠাট্টা করিয়া বিনোদিনী এই বিরুদ্ধভাবকে পুষ্ট করিয়াছিল। অবশেষে মহেন্দ্রর ঈর্ষা আশাকে বিহারীর প্রতি বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিল। ফলে বিহারী মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রেমলীলায় কিছুমাত্র বাধা দিবার সুযোগ পাইল না। মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্ক যখন আশার কাছে স্বচ্ছ হইয়া উঠিল তখন হইতে তাহার মনোভাবে পরিবর্ত্তন দেখা দিল; পতি-পরিত্যক্ত বালিকা রাতারাতি বর্ষীয়সীর ভূয়োদর্শিতা লাভ করিল। আবশ্যক হইলে আশাও যে কতটা কর্ম্মদক্ষ হইতে পারে তাহা রাজলক্ষ্মীর পীড়ায় তাহার

অক্লান্ত ব্যাকুল সেবা হইতে ধরা পড়িল। পুত্রবিরহিণী মাতার ও পতিপরিত্যক্তা বধূর মনের মিল হইতে বিলম্ব হইল না। গুরুতর পীড়ার আশঙ্কাপূর্ণ পরিমণ্ডলে অতি সহজেই আশা-বিহারীর বিরুদ্ধভাব ও সঙ্কোচ ঘুচিয়া গেল। অনুরূপ অবস্থায় আশা-মহেন্দ্রর বাহ্য মিলনও ঘটিল, এবং বোধ হয় রাজলক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে উভয়ের মনের মিলনও বিলম্বিত হয় নাই। কিন্তু বিনোদিনীর উপন্যাসের পক্ষে তাহা অবান্তর বলিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহা কাহিনীর অন্তরালে রাখিয়া বই শেষ করিয়াছেন।

রাজলক্ষ্মী-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে অবুঝ পুত্রপরায়ণতা। আশার প্রতি তাঁহার বিরূপতার প্রধান কারণ তিনটি। প্রথমত পুত্র তাঁহার জা অন্নপূর্ণার বোনঝি আশাকে বিবাহ করিয়াছে; শুধু তাঁহার মত অবহেলিত হইয়াছে বলিয়া নয়, আশা অন্নপূর্ণার সম্পর্কিত বলিয়াই রাজলক্ষ্মীর অসন্তোষ। দ্বিতীয়ত পুত্রবৎসল মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক ঈর্ষা; এতদিন মহেন্দ্র তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া ছিল, এখন সে পত্নীর অনুগত হইবে,—শুধু রাজলক্ষ্মীর নয় বাঙ্গালী বধূর শাশুড়ীরই এই সাধারণ মনোভাব। তৃতীয়ত গৃহকর্ম্মে আশার অপটুতা। বারাসতে গিয়া রাজলক্ষ্মী যখন বিনোদিনীর সেবানৈপুণ্যের পরিচয় পাইলেন তখন আশার সহিত তুলনা করিয়া বিনোদিনীর শ্রেষ্ঠতা তাঁহার বধূবিদ্বেষে ইন্ধন যোগাইল। বিনোদিনীকে বিবাহ না করিয়া মহেন্দ্র ঠকিয়াছে, ইহা জানাইবার জন্য যেন রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীর উপর সংসারের কর্ত্তৃত্ব এবং আশার অনুপস্থিতিতে মহেন্দ্রর পরিচর্য্যার ভার দিয়াছিলেন। এবিষয়ে যে কথা উঠিতে পারে তাহা রাজলক্ষ্মী গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই; "স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে সংসারে এবং সমাজে তিনি মহেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না। মহেন্দ্র সম্বন্ধে বিনোদিনী সমাজনিন্দার আভাস দেওয়াতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন।" রাজলক্ষ্মী নিজের মন জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার মনের কথা বিনোদিনীর সজাগ দৃষ্টির অগোচর ছিল না। রাজলক্ষ্মী যখন মহেন্দ্রকে ভুলাইবার অভিযোগ করিয়া বলিলেন, "আমার ছেলের দোষগুণ আমি জানি—কিন্তু তুমি যে কেমন মায়াবিনী তাহা জানিতাম না," তখন উত্তরে বিনোদিনী

বলিয়াছিল, "সে-কথা ঠিক পিসিমা,—কেহ কাহাকেও জানে না। নিজের মনও কি সবাই জানে। তুমি কি কখনো তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই। একবার ঠাওর করিয়া দেখ দেখি।" রাজলক্ষ্মী পুত্রের অপরাধ না দেখিয়া বিনোদিনীর ঘাড়েই সমস্ত দোষ চাপাইলেন। বিনোদিনীর উপর তাঁহার মন ভাঙিয়া গেলে পর তিনি আশার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। পুত্রকে গৃহবাসী করিতে না পারায় আশার উপর তাঁহার বিরক্তি জন্মিতেছিল, কিন্তু তাঁহার পীড়ায় আশার উদ্বেগ ও ব্যাকুল পরিচর্য্যা দেখিয়া তিনি অবশেষে পুত্রবধূর যথার্থ মূল্য বুঝিলেন। মহেন্দ্রর বিরহ উভয়ের হৃদয় নিকটতর করিল। রাজলক্ষ্মীর ব্যথাতুর মন অন্নপূর্ণাকে কাছে পাইয়া সান্ত্বনা বোধ করিল। বিহারীর প্রচেষ্টায় অনুতপ্ত পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়া রাজলক্ষ্মী নিশ্চিন্তমনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অন্নপূর্ণার ভূমিকা মূল-কাহিনীর পক্ষে অবান্তর। তবুও স্বল্প আয়োজনে চরিত্রটি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল উপন্যাসে একটি নির্লিপ্ত আত্মসমাহিত সদানন্দ ধৈর্য্যশীল শান্তরসাস্পদ চরিত্র থাকে যাহা কোন কোন প্রধান ভূমিকার ভক্তির আলম্বন হইয়া তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। চোখের-বালিতে অন্নপূর্ণা এইশ্রেণীর ভূমিকা। অন্নপূর্ণা সংসারে যতই দুঃখ পাইয়াছেন ততই ভগবানের কৃপা অন্তরে অনুভব করিয়াছেন। কাশীবাস তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল না, তিনি আসিয়াছিলেন শুধু রাজলক্ষ্মীর অহেতুক ঈর্ষ্যা হইতে সংসারের শান্তি রক্ষা করিবার জন্য। বিহারীর শিক্ষা অন্নপূর্ণার কাছে। আশাও কাশীতে গিয়া তাঁহার কাছে থাকিয়া সংসারের সেবাধর্ম্মের মর্ম্ম জানিয়া ধন্য হইল। আশাকে উপদেশ দিবার ছলে অন্নপূর্ণার মুখে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলাইয়াছেন তাহাতে অতি সহজভাবে গৃহীর নিষ্কামকর্ম্মের মূল কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

চুনি, দুঃখে-কষ্টে যে-শিক্ষালাভ হয় শুধু কানে শুনিয়া তাহা পাইবি না। তোর এই মাসিও একদিন তোর বয়সে তোরই মতো সংসারের সঙ্গে মস্ত করিয়া দেনাপাওনার সম্পর্ক পাতিয়া বসিয়াছিল। তখন আমিও তোরই

মতো মনে করিতাম, যাহার সেবা করিব তাহার সন্তোষ না জন্মিবে কেন। যাহার পূজা করিব, তাহার প্রসাদ না পাইব কেন। যাহার ভালো চেষ্টা করিব, সে আমার চেষ্টাকে ভালো বলিয়া না বুঝিবে কেন। পদে পদে দেখিলাম সেরূপ হয় না। অবশেষে একদিন অসহ্য হইয়া মনে হইল, পৃথিবীতে আমার সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে—সেইদিনই সংসার ত্যাগ করিয়া আসিলাম। আজ দেখিতেছি, আমার কিছুই নিষ্ফল হয় নাই। ওরে বাছা, যাঁর সঙ্গে আসল দেনাপাওনার সম্পর্ক যিনি এই সংসার-হাটের মূল মহাজন, তিনিই আমার সমস্তই লইতেছিলেন, হৃদয়ে বসিয়া আজ সে-কথা স্বীকার করিয়াছেন। তখন যদি জানিতাম। যদি তাঁর কর্ম বলিয়া সংসারের কর্ম করিতাম, তাঁকে দিলাম বলিয়াই সংসারকে হৃদয় দিতাম, তা হইলে কে আমাকে দুঃখ দিতে পারিত।

চোখের-বালির নায়ক বলিতে যদি কোন ভূমিকা থাকে তো বিহারী। উপন্যাসের প্রথম দিকে বিহারীর প্রকাশ ঘটিয়াছে মহেন্দ্রর পশ্চাতে ছায়ামণ্ডলে। বিহারীর স্বভাব মহেন্দ্রর মত আত্মপ্রকাশশীল নয়। এই কারণে রাজলক্ষ্মীর মত সকলেই তাহাকে "ষ্টীম্‌বোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মতো মহেন্দ্রের একটি আবশ্যক ভারবহ আস্‌বাবের স্বরূপ দেখিতেন ও সেই হিসাবে মমতাও করিতেন।" মহেন্দ্রর উপর বিহারীর প্রীতি ছিল স্নেহবিজড়িত, তবুও মহেন্দ্রর খাম্‌খেয়ালির ঝোঁক সহিয়া সহিয়া তাহার মনে যে ক্বচিৎ ক্ষোভের সঞ্চার হইত না এমন কথা বলা চলে না। এইকারণেই সে মহেন্দ্রর অস্বীকারের পর বিনোদিনীকে বিবাহ করিতে রাজি হয় নাই। আশাকে বিবাহ করিতে বিহারী স্বতই ইচ্ছুক হইয়াছিল; তাহাকে মহেন্দ্র ঝোঁক করিয়া বিবাহ করায় তাহার অন্তর ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। নবপ্রেমের উচ্ছ্বাসে মত্ত মহেন্দ্র-আশার প্রতি মৃদু তিরস্কারের ঝাঁজেই শুধু এই ক্ষোভ কিছু প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং এইজন্যই আশাকে লইয়া বিনোদিনী ঠাট্টা করিলে অথবা মহেন্দ্র কটাক্ষ করিলে তাহা বিহারীর হৃদয় কঠিনভাবে বিদ্ধ করিত।

মহেন্দ্রর আওতার বাহিরে বিহারীর যে একটা স্বতন্ত্র ও মূল্যবান্ সত্তা

আছে তাহা ধরা পড়িল যখন সে মহেন্দ্রর সঙ্গচ্যুত হইয়া রাজলক্ষ্মীকে লইয়া বারাসতে গিয়া উঠিল। "বৃদ্ধদের তাস-পাশার বৈঠক হইতে বাগদীদের তাড়িপান-সভা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সে তাহার সকৌতুক কৌতূহল এবং স্বাভাবিক হৃদ্যতা লইয়া যাতায়াত করিত—কেহ তাহাকে দূর মনে করিত না, অথচ সকলেই তাহাকে সম্মান করিত।" মহেন্দ্রর পরিবেশমুক্ত বিহারীকে পূর্ণভাবে বিকশিত দেখিয়া বিনোদিনী প্রথম হইতে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং বিহারীরও অন্তরালবর্ত্তিনী বিনোদিনীর প্রথম পরিচর্য্যা লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। বারাসতে বিহারী বিনোদিনীকে দেখে নাই, দেখিলে হয়ত তখন হইতেই আকৃষ্ট হইত। বিনোদিনীকে সে প্রথম দেখিল রাজলক্ষ্মীর সংসারে, কিন্তু তাহার দ্বারা আশা-মহেন্দ্রর অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া বিহারী তাহাকে ভাল চোখে দেখিতে পারে নাই। তবুও বিনোদিনীর স্বভাব সম্বন্ধে বিহারী গোড়া হইতে মোটামুটি সত্য ধারণাই পোষণ করিয়াছিল; বিহারী বুঝিয়াছিল, "এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিবার নহে। কিন্তু শিখা একভাবে ঘরের প্রদীপরূপে জ্বলে, আর একভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়— সে আশঙ্কাও বিহারীর মনে ছিল।" বিনোদিনীও বুঝিয়াছিল, "এ লোকটিকে ভোলানো সহজ ব্যাপার নহে—কিছুই ইহার নজর এড়ায় না।" দমদমের বাগানে দুপুরবেলায় বিনোদিনীর ছেলেবেলাকার গল্প শুনিয়া অজ্ঞানিতে বিনোদিনীর প্রতি বিহারীর সজ্ঞান শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল।

বিহারী যতই বিচক্ষণ হউক না কেন বিনোদিনীর মত নারীর ছলনা সবটুকু ধরিয়া ফেলা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিনোদিনীর যখন চলিয়া যাওয়ার কথা হইতেছে তখন সে আশার প্রতি কৃত্রিম স্নেহ জানাইয়া বিহারীর সম্মুখে যে অভিনয়টা করিল তাহাতে বিহারী অবিচলিত থাকিতে পারে নাই। সমস্ত সংশয় পরিত্যাগ করিয়া তাহার মন বিনোদিনীর উপর প্রসন্ন ও শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিল। ছলনালব্ধ হইলেও বিহারীর এই শ্রদ্ধা বিনোদিনী পুলকিতচিত্তে গ্রহণ করিল। এই হইতে বিনোদিনীর উপর বিহারীর মন ফিরিতে শুরু করিল।

তাহার প্রতি মনে মনে কি ভাব পোষণ করিয়া বিনোদিনী অধীর হইয়া উঠিয়াছে তাহা বিহারীর নিকট প্রকাশ পাইল বিনোদিনীর মুখ হইতেই। মহেন্দ্রর

নেশার পাশ হইতে মুক্তির আশা করিয়া ছুটিয়া আসিয়া যেদিন বিনোদিনীর মন উচ্ছ্বসিত হইয়া নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করিল তখন বিহারী বুঝিল এই ভাগ্য-বঞ্চিত নারীচিত্তের দুঃসহ বেদনা। বিনোদিনীকে বারাসতে রাখিয়া আসিবার পর তবে বিহারী আত্মজিজ্ঞাসার অবসর পাইল। যে-বিহারী কোনকালেই "নিজের কাছে নিজেকে আলোচ্য বিষয় করে নাই," সে "আজ নিজের সেই অন্তরবাসীকে কোন মতেই ঠেলিয়া রাখিতে পারিল না"; "একটি অসম্পূর্ণ ব্যাকুল চুম্বন তাহার মুখের কাছে আসন্ন হইয়া রহিল"।

বিহারীর ঔদাসীন্য ও বিদ্বেষ যেন বিনোদিনীকে বেশি করিয়া তাহার দিকে ঠেলিয়া দিল। মহেন্দ্রর বিপরীত স্বভাব—বিনোদিনীর প্রেমভিক্ষায় কাতরতা—তাহাকে মহেন্দ্রর প্রতি বিরাগ এবং বিহারীর উপর অনুরাগ বাড়াইয়া দিতে লাগিল। "বিহারী যে মানুষ, তাই সে পোষ মানিতে পারে না", —ইহাই বিনোদিনীর কাছে বিহারীর তীব্রতম আকর্ষণ।

অবশেষে এলাহাবাদে আত্মগ্লানিকাতর বিরহিণীর মন বিহারীর সম্মুখে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় ফুটিয়া উঠিলে ভালবাসিয়া শ্রদ্ধা করিয়া বিহারী অশ্রুবিধৌতকলুষ বিনোদিনীর প্রেম স্বীকার করিয়া লইল।

বিনোদিনীর রুদ্ধ প্রেমতৃষার, অনুপলব্ধ আত্মরতির বলি, হইল মহেন্দ্র। মহেন্দ্রর বয়স হইয়াছে, তবুও তাহার মন সম্পূর্ণভাবে শৈশবের আওতা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই; "কাঙারু-শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।" "বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে সর্ব্বপ্রকারে প্রশ্রয় পাইয়াছে, এইজন্য তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃঙ্খল।" পরের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না। বিহারীর নীরব অথচ সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব মহেন্দ্র মনে মনে স্বীকার করিত; "বিহারীকে মহেন্দ্র ভয় করে।" সেইজন্য বিনোদিনীর পা টানাটানি করিবার সময় বিহারীর কাছে ধরা পড়িয়া গিয়া মহেন্দ্র যেন একটা মুক্তি-আনন্দ পাইল; "বিহারী হঠাৎ আসিয়া আজ যেন মহেন্দ্রের ছিপি-আঁটা মসীপাত্র উল্টাইয়া ভাঙিয়া ফেলিল—বিনোদিনীর কালো চোখ এবং কালো চুলের

কালি দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়া পূর্ব্বেকার সমস্ত লেখা লেপিয়া একাকার করিয়া দিল।"

"হৃদয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে মহেন্দ্রের উচিত-অনুচিতের আদর্শ সাধারণের অপেক্ষা কিছু কড়া।" তাই আকর্ষণের তীব্রতা এবং প্রলোভনের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও মহেন্দ্র শেষ অবধি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। বিনোদিনীর বিরাগ অবশ্য এবিষয়ে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল। বিনোদিনী ঠিকই বুঝিয়াছিল, তাহার প্রতি মহেন্দ্রর যে ভালবাসা তাহা আত্মপ্রীতিরই রূপান্তর; তাহাতে ক্ষমা নাই, ধৈর্য্য নাই, বেদনাসহিষ্ণুতা নাই। বিনোদিনীকে ত্যাগ করিতে, বিশেষ করিয়া বিহারীর হাতে তাহাকে তুলিয়া দিতে মহেন্দ্রর অহঙ্কারে বাধে, তাই সে সকল লাঞ্ছনা সহিয়াও বিনোদিনীর আশা ত্যাগ করিতে পারে নাই। কিন্তু অপরের প্রতি অসীম প্রেম পোষণ করিয়া যে নারী নির্বাক্ ধৈর্য্যে দুঃসহ দুঃখের ভারে ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে তাহার আশায় কতদিন থাকা যায়। অপ্রাপ্যকে সাধনা দ্বারা লাভ করিবার মত প্রেম মহেন্দ্র কখনো জানে নাই। মহেন্দ্রর চিত্তও মাতা ও পত্নী পরিত্যাগের অনুতাপগ্লানিতে এবং মনোভঙ্গক্লান্তিজনিত অবসাদে অকস্মাৎ একদিন বিনোদিনীর মোহনির্মোক হইতে বিমুক্ত হইয়া গেল। তখন আর চির-পরিচিত পুরাতন সংসারে ফিরিয়া আসিতে বাধিল না। তাহার আহত আত্মাভিমান সহজেই তাহাকে মাতৃবাৎসল্যের ও পত্নীপ্রেমের প্রতি আগ্রহ-উন্মুখ করিল।

চোখের-বালির সূক্ষ্ম কৌশল ও জটিল কারুকার্য্য বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের প্রতিযোগী। অবচেতন ও সচেতন মনের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ারূপ লূতাতন্তুর ইন্দ্রজাল মানুষের ব্যক্তিত্বকে যেভাবে গঠিত এবং পরিচালিত করে তাহার এমন শল্যচতুর সহৃদয় বিশ্লেষণ বিদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেও সহজলভ্য নয়।

'নষ্টনীড়' চোখের-বালির সমসাময়িক এবং সমপর্য্যায়ের রচনা। ছোট-গল্পের প্রসঙ্গে ইহার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২

'নৌকাডুবি'[১] চোখের-বালির অব্যবহিত পরে লেখা। রবীন্দ্রনাথের আর কোন দুইটি বড় উপন্যাস এত অল্পকাল ব্যবধানে রচিত হয় নাই। তবুও নৌকাডুবিতে চোখের-বালির প্রভাব বা অনুবৃত্তি নাই। বরং দুই-তিন বৎসর পরে লেখা 'গোরা'-র সঙ্গে কিছু মিল দেখা যায়। নৌকাডুবির কাহিনীর পটভূমিকা চোখের-বালির অপেক্ষা বিস্তৃততর, পাত্রপাত্রীর সংখ্যাও বেশি। প্রধানত এই জন্য নৌকাডুবি চোখের-বালির মত অতটা সংহত ও অখণ্ড রূপ লয় নাই। আরও একটি কারণ আছে। চোখের-বালির কাহিনী যেমন উপন্যাসরচনার পূর্ব্বেই লেখকের মনে সমগ্রতা পাইয়াছিল, নৌকাডুবির কাহিনী তেমন একেবারে অখণ্ড রূপ পায় নাই, লিখিতে লিখিতে কাহিনীটি পরিণামের দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এইকারণেই প্রধান ভূমিকা দুইটি—রমেশ ও হেমনলিনী—কিয়ৎপরিমাণে অপরিণত ও উপেক্ষিত রহিয়া গিয়াছে।

চোখের-বালিতে ব্যক্তি-জীবনের সমস্যার সহিত সংসার-জীবনের সমস্যা ঘনীভূত; নৌকাডুবিতে ব্যক্তি-জীবনের সমস্যার সহিত সমাজ-জীবনের সমস্যা বিজড়িত। চোখের-বালির কাহিনী-আবর্ত্তে মানুষের মন যতটা দায়ী সাংসারিক অবস্থা বা দৈব-ব্যবস্থা এতটা নয়; নৌকাডুবিতে দৈব-ব্যবস্থা এবং সামাজিক সংস্কার যতটা দায়ী মানুষের মন ততটা নয়। সামাজিক-পরিমণ্ডলে মানুষ দৈবগতিকে কত অসহায় হইতে পারে নৌকাডুবিতে তাহার একটি পরিপূর্ণ আলেখ্য পাইতেছি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুই উপন্যাসে, বৌঠাকুরাণীর-হাটে এবং রাজর্ষিতে, ব্যক্তিবিশেষের susceptibility ও sensibility-র সংঘর্ষে ট্রাজেডি ও গভীরতর পরিণতি দেখান হইয়াছে। তৃতীয় উপন্যাস চোখের-বালিতে গার্হস্থ্য-পরিবেশে ব্যক্তিবিশেষের ব্যাহত আত্মপ্রকাশের দ্বন্দ্ব ফুটিয়াছে। চতুর্থ উপন্যাস নৌকাডুবিতে গার্হস্থ্য-পরিবেশে ও সামাজিক-পরিমণ্ডলে দৈবহত ব্যক্তিবিশেষের আত্মপ্রকাশ ব্যাহত হইয়াছে। পঞ্চম উপন্যাস গোরায় সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর সমস্যার পটভূমিকায় ব্যক্তিগত সমস্যা বিলীন হইয়াছে। এইরূপে

[১] প্রথমপ্রকাশ বঙ্গদর্শন ১৩১০-১২); গ্রন্থাকারে ১৩১৩ সালে।

দেখিতেছি যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়া ব্যক্তির প্রকাশ সমষ্টি-পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমবর্দ্ধমান প্রসারণের অভিমুখে চলিয়াছে। এই পরিণতি রবীন্দ্রনাথের জীবনেও লক্ষ্য করা যায়। বাল্যে কবি ছিলেন গৃহকোণে আবদ্ধ; কৈশোরে ভ্রাতৃসন্তানদের লইয়া সখ্যবাৎসল্যমিশ্র প্রীতি তাঁহার হৃদয়ে উচ্ছ্বাস আনিয়াছিল; যৌবনে তাঁহার মন যেন বিহারীরই মত আত্মগত নির্লিপ্ত সুদূর ও প্রসন্ন ছিল। প্রৌঢ় বয়সে বৃহত্তর জাতির, ভারতবর্ষের, সমস্যা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল।

উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া জাতি-ধর্ম্ম-রাষ্ট্রসমস্যার আলোচনা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ 'গোরা'-য় প্রথম ও প্রকৃষ্টভাবে দেখা দিল। ইহার একটু আভাস নৌকাডুবিতে পাই। ব্রাহ্মসমাজের অনুদার সঙ্কীর্ণতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কটাক্ষ নৌকাডুবিতেই প্রথম দেখি। গোরার কয়েকটি ভূমিকায় নৌকাডুবির কয়েকটি চরিত্রের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনি। নৌকাডুবির অন্নদাবাবু এবং নলিনাক্ষ মিলিয়া গোরায় পরেশবাবুতে পরিণত হইয়াছে; হেমনলিনী সুচরিতায়, অক্ষয় পানুবাবুতে, এবং ক্ষেমঙ্করী হরিভাবিনীতে রূপান্তর লইয়াছে।

নৌকাডুবির নায়ক আসলে রমেশ। দৈববিঘটিত বিবাহের ফাঁদে পড়িবার পূর্ব্বে রমেশ হেমনলিনীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল; কিন্তু সে অনুরাগ তখন তাহার অন্তরে শিকড় গাড়িতে পারে নাই। সেইজন্য নৌকা-ডুবির পর পাশে মূর্চ্ছিত কমলাকে নিজের বধূ মনে করিয়া রমেশ যে ঠিক অনুকম্পার বশীভূত হইয়াছিল এমন কথা বলা চলে না; "তাহার উচ্চ শিক্ষিত মন ভিতরে-ভিতরে একটি অপূর্ব্বরূপ রসে পরিপূর্ণ হইয়া এই ছোট মেয়েটির দিকে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল।" হেমনলিনীর প্রতি অনুরাগ তখনো এতটা প্রবল হয় নাই যে তাহা তাহার মনের বহুযুগের সংস্কারকে ঠেকাইয়া রাখিবে। রমেশের মন যখন বালিকা বধূর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে তখন অকস্মাৎ কঠিন আঘাত আসিল; রমেশ জানিতে পারিল, যাহাকে সে তাহার স্ত্রী সুশীলা মনে করিয়া গৃহে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে সে কমলা, অপরের পরিণীতা বধূ, তাহারই মত নৌকা-ডুবির বলি। একথা জানিয়া রমেশ নিজের ক্ষতি গ্রাহ্য করিল না,

অপাপবিদ্ধ সুন্দরী বালিকার ভবিষ্যতের ভয়াবহ পরিণতিই তাহাকে ব্যথা দিতে লাগিল। রমেশ সাধারণ ভদ্রঘরের ছেলে, তাহার উপর সে উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছে, সুতরাং জানিয়া শুনিয়া অপরের পত্নীকে সে নিজের অঙ্কলক্ষ্মী করে কি করিয়া। অথচ কমলা যে তাহার পত্নী নয় তাহা প্রকাশ করিলে কমলার সর্ব্বনাশ হইবে। রমেশ ভাবিল, "এখন এই মেয়েটিকে যেখানেই ফেলা হইবে, সেইখানেই সে অতল সমুদ্রের মধ্যে পড়িবে।" কমলাকে রমেশ ফেলিতে পারিল না। তাহার উচ্চহৃদয় ও স্বার্থশূন্যতা এইভাবে তাহার ভাগ্যগ্রন্থিতে প্রথম জট পাকাইয়া দিল।

কমলাকে বোর্ডিংএ দিবার পর সে দৈবক্রমে পুনরায় হেমনলিনীদের গৃহে প্রবেশাধিকার লাভ করিল। তাহার বিবাহের কথা ও কমলার ট্রাজেডি চাপিয়া গিয়া হেমনলিনীর প্রণয়চ্ছটায় আত্মবিস্মৃত হইয়া রমেশ আপন সমস্যা জটিলতর করিয়া তুলিল। কমলার সম্পর্কে আহত ও সংশয়াকুল হইয়া রমেশের হৃদয় যেন হেমনলিনীর প্রেমের স্নিগ্ধ আলোকে রাতারাতি বিকশিত হইয়া উঠিল। তাহাদের বিবাহ স্থির; কিন্তু অদৃষ্টের গ্রন্থি খুলিবার পূর্ব্বেই আর এক পাক লাগিয়া গেল। হেমনলিনীকে যদি রমেশ সকল কথা খুলিয়া বলিত তাহা হইলে তখনি সমস্যা মিটিয়া যাইত। কিন্তু স্বাভাবিক সঙ্কোচের জন্য এবং কমলাকে অকারণ ব্যথা হইতে বাঁচাইতে গিয়া রমেশ নিদারুণ ভুল করিয়া বসিল। অক্ষয়ের ঈর্ষ্যা উদ্‌যোগী হইয়া কমলাকে যবনিকার অন্তরাল হইতে বাহির করিতে চেষ্টিত হইলে রমেশের পক্ষে বিবাহ স্থগিত রাখা ছাড়া উপায় রহিল না। ইহাতে তাহার ও অন্নদাবাবুর সংসারের মধ্যে একটু ব্যবধান সৃজিত হইলেও হেমনলিনী-রমেশের প্রেম পরস্পরের হৃদয়ে নিগূঢ় ঐক্যলাভ করিল। আসন্ন বিরহের বেদনা এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কা বিজড়িত হইয়া রমেশের চিত্তে হেমনলিনীর মূর্ত্তি ব্যথাতুর ব্যাকুলতার সঞ্চার করিল; "শরতের অপরাহ্ণ-আলোকে বাতায়নবর্ত্তিনী" হেমনলিনীর "স্তব্ধমূর্ত্তিটি রমেশের মনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া দিল। ঐ সুকুমার কপোলের একটি অংশ, ঐ সযত্ন-রচিত কবরীর ভঙ্গি, ঐ গ্রীবার উপরে কোমলবিরল কেশগুলি, তাহারি নীচে

সোনার হারের একটুখানি আভাস, বামস্কন্ধ হইতে লম্বিত অঞ্চলের বঙ্কিম প্রান্ত, সমস্তই রেখায়-রেখায় তাহার পীড়িত চিত্তের মধ্যে যেন কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গেল।"

কমলার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয়ে রমেশ তাহাকে লইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইল। রমেশের চিত্তে যথোচিত সরলতা থাকিলে সে হয়ত ইহা করিত না। একে হেমনলিনীর প্রেম তাহাকে কমলার সমস্যা সমাধানে ভীরু করিয়াছিল, তাহার উপর তাহার হৃদয়ে দৃঢ়তারও কিছু অভাব ছিল। সর্ব্বোপরি কমলার যৌবনোন্মেষের সৌন্দর্য্য তাহার মনে চমক লাগাইয়া দিয়া কমলার উপর তাহার পূর্ব্বতন স্নেহ জাগাইয়া তুলিল। এই তিন কারণে রমেশ অক্ষয়-যোগেন্দ্রর বিরুদ্ধতার সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিল না। ষ্টীমারে কমলার গৃহিণীপনা তাহার ক্ষুধিত উপবাসী চিত্তকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু কমলার সেবা ও প্রীতি তো তাহার ন্যায্য পাওনা নয়; "এত-বড় জিনিষটা কেবল ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত—এই চিন্তার নিষ্ঠুর আঘাতও সে এড়াইতে পারিল না।" রমেশ ইহাও বুঝিল, "হেমনলিনী কিংবা কমলা, উভয়ের মধ্যে একজনকে বিসর্জ্জন দিতেই হইবে। উভয়কেই রক্ষা করিয়া চলিবার কোন মধ্যপথ নাই।" হেমনলিনীর আশ্রয় আছে, কমলা নিরাশ্রয়,—এই মনে করিয়া রমেশ হেমনলিনীকে ছাড়িতে চাহিল। কিন্তু চাহিলেই কি ছাড়া যায়। হেমনলিনীর জন্য "তাহার আগ্রহের অধীরতা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।" অথচ হেমনলিনী ও তাহার মিলনের পক্ষে যে প্রকাণ্ড বাধা বাড়িয়া উঠিতেছে, কমলাকে বাঁচাইয়া তাহা দূরীভূত করিবার অসম্ভাব্যতা তাহার নিকট দিন দিন পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে রমেশ যে তাহার সঙ্গে একটা দূরত্ব রাখিয়া চলিতেছে তাহা কমলার সজাগ বোধের বিষয়ীভূত হইয়া তাহাকে অভিমানক্ষুব্ধ ও পীড়িত করিতে লাগিল, এবং চক্রবর্ত্তীর আবির্ভাবে ব্যাপারটা কঠিনতর সমস্যার আকার ধারণ করিল। চক্রবর্ত্তীর কন্যা শৈলর মধ্যস্থতায় সহজ মিলনের সুযোগ আসিল বটে, কিন্তু যে-দূরত্বটুকু রক্ষা করিয়া চলা রমেশের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহা

সে নিঃসঙ্কোচে ডিঙাইয়া যাইতে পারিল না। "কমলা, তুমি আমাকে ডাকিয়াছ?" তাহার এই অতর্কিত প্রশ্নই কমলাকে যেন দূরে ঠেলিয়া দিল।

কমলার কাছ হইতে সরিয়া গিয়া রমেশের মোহ কতকটা কাটিয়া গেল। কলিকাতায় আসিলে হেমনলিনীর কথা তাহার মনে অধিকতর জাগরূক হইয়া উঠিল। হেমনলিনীকে সকল কথা জানাইয়া সে চিঠি লিখিল। হেমনলিনীরা তখন পশ্চিমে হাওয়া খাইতে গিয়াছে, তাই সে চিঠি তাহার পকেটেই রহিয়া গেল এবং গাজিপুরে ফিরিলে দৈবচক্রে তাহা কমলার হাতে পড়িল। রমেশ তখন এলাহাবাদে চলিয়া গিয়াছে। কমলা তাহার অদৃষ্টের চক্রান্ত জানিতে পারিয়া মর্ম্মাহত হইল। অনুরূপ উপায়ে চোখের-বালিতে আশা তাহার স্বামী ও বিনোদিনীর ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিল। কমলার সম্বন্ধে চিত্তস্থির করিয়া রমেশ আশাপূর্ণ হৃদয়ে গাজিপুরে আসিয়া দেখিল যে কমলা নাই। কমলা আত্মহত্যা করিয়াছে মনে করিয়া "রমেশের বুকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া গেল।" সংসারের উপর পরিপূর্ণ বৈরাগ্যের ভাব লইয়া রমেশ গাজিপুর ত্যাগ করিল এবং এইসঙ্গে উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চ হইতেও বিদায় গ্রহণ করিল। অতঃপর তাহার কাহিনী উপন্যাসের পক্ষে অবান্তর। তাহার ভূমিকায় আবির্ভূত হইল নলিনাক্ষ। রমেশের চিত্ত শান্ত হইলে সে হেমনলিনীর সহিত দেখা করিয়া সকল কথা বলিতে গিয়াছিল। হেমনলিনী তাহাকে অকস্মাৎ দেখিয়া বিমূঢ়চিত্তে কথা না কহিয়া ঘরে চলিয়া যায়। রমেশ ভুল বুঝিয়া মনে করিল হেমনলিনী তাহাকে ঘৃণা করে। শেষ আশাটুকু ত্যাগ করিয়া হেমনলিনীকে সব কথা চিঠি লিখিয়া জানাইয়া রমেশের হৃদয় এক অপূর্ব্ব বেদনাবিজড়িত মুক্তিসুখ অনুভব করিল। যে দুই নারী তাহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল তাহাদের স্মৃতির মধ্যে সে আর বিরোধ দেখিতে পাইল না। হেমনলিনীকে সে লিখিয়াছিল, "সংসারে যে দুটি রমণীকে আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইবার সাধ্য আমার নাই এবং তাঁহাদিগকে চিরজীবন স্মরণ করাই আমার পরম লাভ।" কমলা বাঁচিয়া আছে জানিয়া রমেশ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল, কেননা তাহার কাছে সকল কথা বলিয়া ক্ষমা চাওয়া বাকি

আছে। কমলার সহিত দেখা হইলে রমেশ জানিল যে সে এখন সম্পূর্ণই অনাবশ্যক। অতীতের জের নিঃশেষে চুকাইয়া দিয়া রমেশ বৃহৎ পৃথিবীর জনসমুদ্রের মধ্যে তলাইয়া গেল।

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর খেলা রমেশের জীবনের ট্রাজেডিকে নিষ্করুণ করিয়াছে। ইহার তুলনা গ্রীক ট্রাজেডির সঙ্গে করা চলে। হেমনলিনীর হৃদয়ের তবু একটা অবলম্বন ছিল—তাহার পিতৃবাৎসল্য; রমেশের কিছুই ছিল না। তাই ভাগ্যহত রমেশের বেদনা এত পীড়াদায়ক।

কমলার জীবন হইতে রমেশ অন্তরিত হইলে পর কাহিনীর রঙ্গমঞ্চে নলিনাক্ষ ডাক্তারের আবির্ভাব ঘটিল। এই আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য পাঠকের মন যেন প্রস্তুত ছিল না। তথাপি কাহিনীর পরিণতির পক্ষে ইহা অসঙ্গত হয় নাই। নলিনাক্ষর মাতৃসেবার মধ্যে পিতৃপরায়ণা হেমনলিনী কিছু সাত্মাতা অনুভব করিয়াছিল। ইহার উপর তাহার আধ্যাত্মিক নিরাসক্তি ও নির্লিপ্ততার ভাব তাহার মনে নলিনাক্ষর প্রতি ভক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু এই ভক্তি তাহার চিত্তে বিশেষ স্থিরতা আনিয়া দিতে পারে নাই; সেই জন্য নলিনাক্ষর অনুপস্থিতে হেমনলিনীর চিত্ত আবার অশান্ত হইয়া উঠিত। নলিনাক্ষও ভিতরে ভিতরে হেমনলিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। এ ব্যাপার শুধু তাহার মা ক্ষেমঙ্করীই বুঝিয়াছিলেন; "তুমি ভাবিলে, আমার নলিন সন্ন্যাসিমানুষ, দিন রাত্রি কি-সব যোগযাগ লইয়া আছে, উহাকে আবার বিবাহ করা কেন? হোক্ আমার ছেলে, তবু কথাটা উড়াইয়া দিবার নয়।" নলিনাক্ষর কর্তব্যবোধ ছিল সুতীক্ষ্ণ; তাহার মনে তখনো সংশয় ছিল তাহার পরিণীতা বধূ হয়ত বাঁচিয়া আছে। সেইজন্য হেমনলিনীর সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইলে তাহার মন সম্পূর্ণ সায় দিতে পারে নাই। সুন্দরী কমলার গোপন পূজা যে তাহাকে টানে নাই এমন কথাও জোর করিয়া বলা চলে না। তাহার কর্তব্যবোধই অত সহজে কমলাকে হৃদয়ে এবং সংসারে অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিতে তাহাকে প্রেরণা দিয়াছিল।

নৌকাডুবির গৌণ পুরুষ-ভূমিকাগুলি ব্যক্তিগত বিশেষত্ব লইয়া বিকশিত

হইয়াছে। অন্নদাবাবুর শরীর ও মন দুইই দুর্ব্বল, অথচ কন্যাস্নেহে আঘাত লাগিলে এই নরম মানুষটি কত অনায়াসে কঠিন হইয়া গিয়াছেন। যোগেন্দ্রর প্রকৃতি অধীর, মন সাদাসিধা, ব্যবহার রাফ্‌সাফ্‌, কথাবার্ত্তা চোখাচোখা। সে মনে কিছু পুষিয়া রাখিতে পারে না, যাহা বলিবার তাহা মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়া চুকাইয়া দেয়। অক্ষয়-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে সে কাজের লোক। স্বতই হউক বা পরতই হউক "অক্ষয় যে ভার গ্রহণ করে তাহা রক্ষা করিতে কখনো শৈথিল্য করে না।" অক্ষয় মনে মনে হেমনলিনীকে পূজা করিত; এবং তাহার এই ভালবাসা একান্তভাবে স্বার্থপর ছিল না। রমেশের প্রতি তাহার ঈর্ষ্যা অনেকটা বিদ্বেষের ভাব লইয়াছিল। তাহার ক্ষীণ আশা ছিল, রমেশকে তাড়াইতে পারিলে বুঝি হেমনলিনীকে লাভ করা সহজ হইবে। এ বিষয়ে যোগেন্দ্রর সাহায্যেও যখন কিছু করিতে পারা গেল না তখন হেমনলিনীর মুখ চাহিয়াই অক্ষয় আপনার স্বার্থ বলি দিয়া নলিনাক্ষকে আনিয়া দিল। ষ্টীমারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে রমেশ ও কমলা বড় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের, বিশেষ করিয়া কমলার দিক দিয়া, এই ব্যবধান বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই উমেশের অবতারণা। শুধু তাই নয়। উমেশকে পাইয়াই কমলার নারীজীবনের স্নেহবৃত্তির উন্মেষ হইল। উমেশ না থাকিলে আমরা স্নেহসরস পতিপূজারিণী কমলাকে পাইতাম না; সে রমেশের চিঠি পড়িয়া নিশ্চয়ই গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিত। উমেশের ভূমিকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। চক্রবর্তী খুড়া ও তাঁহার স্ত্রী "সেজ বৌ"-এর চরিত্রও স্বাভাবিক।

নৌকাডুবির নায়িকা কমলা কি হেমনলিনী তাহা বলা সহজ নয়। এক হিসাবে কমলা নায়িকা, যেহেতু তাহার চরিত্রের সম্পূর্ণ ক্রমবিকাশ দেখান হইয়াছে এবং তাহারি মিলনে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। আর হিসাবে হেমনলিনীকে নায়িকা বলিতে হয়, যেহেতু তাহার চিত্তের দ্বন্দ্ব কঠিনতর এবং তাহার আঘাত আরও দুঃসহ। কমলার মিলনে বই শেষ হইয়া গেলেও হেমনলিনীর বেদনা পাঠকচিত্তে বাজিতে থাকে, এবং কাহিনীর আদি হইতে শেষ অবধি হেমনলিনী পাঠকের মনে বিরাজ করিতে থাকে। নৌকা-ডুবির আসল casualty হেমনলিনী

আমাদের প্রবৃত্তি কতটা পরিমাণে সংস্কারের উপর করে নির্ভর তাহা কমলার ভূমিকায় দেখান হইয়াছে। যতক্ষণ কমলা জানিত যে রমেশ তাহার স্বামী ততক্ষণ তাহার উপর স্বাভাবিক প্রীতির অভাব হয় নাই। অবশ্য রমেশের ব্যবহারে এই প্রীতি প্রেমে পরিণত হইবার সুযোগ নাই, অধিকন্তু আঘাতের পর আঘাত পাইয়া সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তবুও তাহার নবজাগ্রত যৌবনের সমস্ত ব্যাকুলতা রমেশের কাছ হইতে এতটুকু আগ্রহের জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। ফুল যেমন ফুটিবার জন্য আলোকের অপেক্ষা রাখে, তরুণী-হৃদয়কে তেমনি উন্মীলিত হইবার জন্য প্রীতি-প্রেমের উপর নির্ভর করিতে হয়। অবস্থা স্বাভাবিক হইলে রমেশের প্রেমই কমলার প্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিত। তাহা না হওয়ায় উমেশের অনুরক্তি, চক্রবর্ত্তীর স্নেহ, এবং সর্কোপরি চক্রবর্ত্তীর কন্যা শৈলজার সখ্য কমলার চিত্তকে স্নিগ্ধসরস করিয়া রাখিয়াছিল। চিঠি পড়িয়া কমলা যখন জানিতে পারিল যে রমেশ তাহার স্বামী নয় সেই মুহূর্তেই তাহার মন রমেশের উপর সম্পূর্ণভাবে বিমুখ হইয়া গেল, এবং নিজের আচরণের লজ্জা তাহাকে যেন ধূলায় মিশাইয়া দিল। যেখানে হৃদয়ের সহিত যোগ স্থাপিত হয় নাই সেখানে সংস্কারের বিরুদ্ধতা সে সম্পর্ককে যে নিঃশেষে চুকাইয়া দিবে তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু কমলার নারীহৃদয় জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার হৃদয়নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছে। সুতরাং নদীস্রোত যেমন একদিকে বাধা পাইলে অপর দিকে দ্বিগুণ বেগে ছুটিয়া যায় তেমনি কমলার মন তাহার অজ্ঞাত স্বামীর জ্ঞাত নামটুকু আঁকড়াইয়া ধরিল প্রাণপণে। ভাগ্যের প্রসন্নতায় সে অচিরকালে স্বামীর সান্নিধ্য পাইল। সৌম্যদর্শন শান্তস্বভাব প্রসন্নমুখ নলিনাক্ষ অনায়াসে কমলার মনপ্রাণ অধিকার করিয়া বসিল।

হেমনলিনী কমলার কতকটা প্রতিরূপ চরিত্র। কমলার সৌন্দর্য্যই তাহার প্রধান আকর্ষণ; নবযৌবনের অসামান্য লাবণ্য লইয়া সে রমেশকে এবং নলিনাক্ষকে আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার মন তখনো অপরিণত। সুন্দরী বলিতে যাহা বোঝায় সে-হিসাবে হেমনলিনী সুন্দরী ছিল কিনা সন্দেহ। তাহার আকর্ষণ ব্যক্তিত্বের সৌকুমার্য্যে, তাহার বুদ্ধিদীপ্ত মুখের শান্তরশ্মিতে।

"হেমনলিনীর সেই স্নিগ্ধগম্ভীর মুখ, তাহার বিশেষ ধরণের সেই শাড়ীপরা তাহার চুল বাঁধিবার পরিচিত-ভঙ্গী, তাহার হাতে······প্লেন-বালা এবং তারকাটা দুইগাছি করিয়া সোনার চুড়ি···রমেশের বুকের মধ্যে একটা ঢেউ যেন একেবারে কণ্ঠ পর্য্যন্ত······ঠেলিয়া উঠিল।" হেমনলিনী ছেলেবেলায় মা হারাইয়াছে, ভগিনীও ছিল না, তাই তাহার মন অন্তর্মুখ হইয়া গিয়াছিল। সে কমলাকে বলিয়াছিল, "ছেলেবেলা হইতে সব কথা কেবল মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে, শেষকালে এমন অভ্যাস হইয়া গেছে যে, আজ মন খুলিয়া কোনো কথা বলিতে পারি না। লোকে মনে করে, আমার ভারি দেমাক।" হেমনলিনী-রমেশের প্রেম পরস্পরের উপর পরমবিশ্বস্ত ছিল। কমলাকে লইয়া রমেশের পলায়ন তাহার অপরাধের লক্ষণ বলিয়া সকলে গ্রহণ করিল। হেমনলিনীর বিশ্বাস টলিল না বটে, মনে সন্দেহ উঁকি দিতে লাগিল; তাহার সরল হৃদয় "রমেশের প্রতি বিশ্বাসকে···সমস্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে জোর করিয়া আঁকড়িয়া রহিল।" কিন্তু রমেশ দূরেই রহিয়া গেল। পিতার সেবায় হেমনলিনী অন্তরের বেদনা ভুলিতে চেষ্টা করিল। বৃদ্ধ অন্নদাবাবুর কাছেও মাতৃহীনা কন্যার বিধুরহৃদয়ের ব্যথা অজ্ঞাত রহিল না। মায়ের কথা তুলিয়া কন্যা পিতাকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। "চারিদিকে কলিকাতার কর্ম্ম ও কোলাহল তাহারি মাঝখানে একটি গলির বাড়ির ছাদের কোণে এই বৃদ্ধ ও নবীনা, দুটিতে মিলিয়া, পিতা ও কন্যার চিরন্তন সম্বন্ধটিকে সন্ধ্যাকাশের ম্রিয়মাণচ্ছায়ায় অশ্রুসিক্ত মাধুরীতে ফুটাইয়া তুলিল।"

হেমনলিনীর ক্লান্ত মন নলিনাক্ষর বক্তৃতায় নিজের প্রতিধ্বনি পাইয়া তাহার উপর শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিল। তাহার মাতৃ-অনুরক্তির পরিচয় পাইয়া এই শ্রদ্ধা গাঢ়তর হইল; "মাতার উল্লেখমাত্রে সেই মুহূর্ত্তেই নলিনাক্ষের মুখে যে একটি সরসভক্তির গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইল, তাহা দেখিয়া হেমনলিনীর মন আর্দ্র হইয়া গেল।" নলিনাক্ষর আধ্যাত্মিকতায় ও মাতৃভক্তিতে পিতৃনিষ্ঠ হেমনলিনীর বিরহিহৃদয় যেন একটা আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়া গেল। নলিনাক্ষর সাধনপ্রণালী ও শুচি আচার এবং নিরামিষ-আহার গ্রহণ করিয়া তাহার মন তৃপ্তি পাইল।

মনে যে-টুকু জোর আসিল সেটুকু নলিনাক্ষর প্রত্যক্ষ প্রভাবে; "নলিনাক্ষের উপস্থিতিমাত্রই হেমনলিনীর সমস্ত আহ্নিকক্রিয়াকে যেন দৃঢ় অবলম্বন দিত।"

নলিনাক্ষর উপর হেমনলিনীর শ্রদ্ধায় কখনো প্রেমের রং ধরে নাই। পিতার মুখ চাহিয়া এবং নলিনাক্ষর শান্তহৃদয়ের সান্ত্বনার আশা লইয়া হেমনলিনী বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হইল। নলিনাক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া এবং তাহার মাতার সেবায় তাহাকে সাহায্য করিবার অবসর পাইবে বলিয়া হেমনলিনী আত্মবিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছিল। "নলিনাক্ষের প্রতি হেমনলিনীর একান্ত নির্ভরপর ভক্তি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে ভালবাসার বিদ্যুৎসঞ্চারময়ী বেদনা নাই—তা না-ই থাকিল! ঐ আত্মপ্রতিষ্ঠ নলিনাক্ষ যে কোনো স্ত্রীলোকের ভালবাসার অপেক্ষা রাখে তাহা ত মনেই হয় না। তবু সেবার প্রয়োজন ত সকলেরই আছে। নলিনাক্ষের মাতা পীড়িত এবং প্রাচীন—নলিনাক্ষকে কে দেখিবে! এ-সংসারে নলিনাক্ষের জীবন ত অনাদরের সামগ্রী নহে—এমন লোকের সেবা ভক্তির সেবাই হওয়া চাই।" প্রেমাস্পদ এবং ভক্তিভাজন এই দুই লইয়া যে অন্তর্দ্বন্দ্ব হেমনলিনীর মনে জাগিয়া ছিল তাহা রূপান্তরিতভাবে অনেককাল পরে 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি গল্পে প্রকট হইয়াছে। পুরাতন বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে মনে করিয়া হেমনলিনী যে "একটা বৃহৎ বৈরাগ্যের আনন্দ অনুভব করিল", সে যে "নিজের জীবনের একাংশের নিঃশেষ-অবসান-জনিত শান্তি লাভ করিল" তাহা সর্ব্বাংশে বাস্তব নয়, অনেকটাই তাহার মনগড়া। তাই রমেশকে দেখিবামাত্র তাহার মনের বাঁধ ভাঙিয়া গেল, তাহার হৃদয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হওয়ায় দ্রুতপদে ঘরে পলাইয়া আসিয়া বাঁচিল। কিন্তু নিজের উপর তাহার বিশ্বাসও গেল টলিয়া। সে উৎসাহ করিয়া ক্ষেমঙ্করীর আশীর্ব্বাদী মকরমুখো মোটা সোনার বালাজোড়া পরিয়া আসিল, কিন্তু "সমস্ত শিষ্টালাপের মধ্যে নিজের প্রতি অবিশ্বাস হেমনলিনীর মনকে আজ ভিতরে ভিতরে ব্যথিত করিতে লাগিল।"

মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিতে রাখিতে হেমনলিনীর মন বোবা হইয়া গিয়াছিল। কমলার সঙ্গ পাইয়া তাহা আর্দ্র হইল। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া

রমেশের চিঠি পাইয়া তাহার চিত্তে আবার বিপর্য্যয় আলোড়ন উপস্থিত হইল। এই অসহায় নারীর নিদারুণ দুঃখ কল্পনা করিয়া নলিনাক্ষর হৃদয় ব্যথিত হইল,—"ঐ যে নারী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া, উহার স্থিরশান্ত মূর্ত্তিটি উহার অন্তঃকরণকে কেমন করিয়া বহন করিতেছে?...ইহাকে কোনো সান্ত্বনা দেওয়া যায় কি না? কিন্তু মানুষে মানুষে কি দুর্ভেদ্য ব্যবধান! মন জিনিষটা কি ভয়ঙ্কর একাকী।"

এই বৈরাগ্যবিধুর মূর্ত্তি লইয়াই হেমনলিনী পাঠকের মনশ্চক্ষে শেষবারের মত দাঁড়াইল। কলিকাতা-যাত্রার পূর্ব্বে হেমনলিনী ক্ষেমঙ্করীদের বাড়ীতে গেল বিদায় লইতে। কমলা নিজের বেদনার কথা ভুলিয়া গেল, হেমনলিনীর অব্যক্ত ব্যথা যেন তাহার মনে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। "হেমনলিনীর প্রশান্তমুখে কি-একটা ভাব ছিল, যাহা দেখিয়া কমলার চোখে জল আসিতে চাহিতেছিল কিন্তু হেমনলিনীর কেমন একটা দূরত্ব আছে—তাহাকে কোনো কথা বলা যেন চলে না, তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যেন বাধে। আজ কমলার সকল কথাই হেমনলিনীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু সে আপনার সুগভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া চলিয়া গেল, কেবল একটা-কি রাখিয়া গেল, যাহা বিলীয়মান গোধূলির মত অপরিমেয় বিষাদের বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ। গৃহকর্ম্মের অবকাশকালে আজ সমস্তদিন কেবলি হেমনলিনীর কথাগুলি এবং তাহার শান্ত-সকরুণ চোখের দৃষ্টি কমলার মনকে আঘাত" দিয়া ফিরিতে লাগিল।

নৌকাডুবির গৌণ নারী-ভূমিকার মধ্যে প্রধান হইতেছে ক্ষেমঙ্করী। সংসারে নানা আঘাত পাইয়া ক্ষেমঙ্করীর মন পুত্রপরায়ণ ও স্পর্শকাতর হইয়া উঠিয়াছিল তিনি আচারে নিষ্ঠাবতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ছিল না তিনি যে ছুঁই-ছুঁই করিতেন তাহা "মনের ঘৃণা নয়—ও কেবল একটা অভ্যাস।" "সুন্দর ছেলে, সুন্দর মুখ তিনি বড় ভালবাসিতেন", এবং "ছোটোখাটো কোনো একটি সুন্দর জিনিষ দেখিলেই তিনি না কিনিয়া থাকিতে পারিতেন না।" এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার জন্যই কমলা অত সহজে তাঁহার সংসারে স্থানলাভ করিয়াছিল। ছেলের বিষয়ে তাঁহার স্পর্শকাতরতা ছিল অত্যধিক। তাঁহার

নলিনাক্ষের সহিত বিবাহে কোন মেয়ের অমত থাকিতে পারে—ইহা তাঁহার পুত্রস্নেহগর্ব্বে আঘাত করিয়াছিল। এইজন্য অনেকটা অজ্ঞাতসারেই তাঁহার চিত্ত হেমনলিনীর প্রতি বিমুখ এবং কমলার উপর প্রসন্ন হইয়াছিল এবং তিনি সকলদিকেই "হেমনলিনীর গর্ব্ব খাটো করিতে উদ্যত" হইয়াছিলেন।

স্বার্থপর সাধারণ নারীর বাস্তবচিত্র হইতেছে নবীনকালীর ভূমিকা। কমলাকে আশ্রয় দিয়া যে নবীনকালী নিজেই বর্ত্তাইয়া গেল তাহা কমলাকে সে কিছুতে ভুলিতে দেয় নাই, উপবস্তু কৃতজ্ঞতার দাবী করিয়া খাটাইয়া খাটাইয়া তাহার অন্তর ভরাইয়া রাখিত। "নবীনকালী যে কমলাকে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যে রস ছিল না।"

শৈলজার চরিত্রে, বিশেষ করিয়া শৈলজা-কমলার সখিত্বে, বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরার কথা মনে পড়ে। আড়াল হইতে কমলার পতিপূজাও যেন পাচিকাবেশিনী ইন্দিরাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। "শৈলজা শ্যামবর্ণ, তাহার মুখখানি ছোটখাটো,—মুষ্টিমেয়, চোখ-দুটি উজ্জ্বল, ললাট প্রশস্ত—মুখ দেখিলেই স্থিরবুদ্ধি এবং শান্ত পরিতৃপ্তির ভার চোখে পড়ে।" "শৈলজার সবসুদ্ধ ছোটখাটো সংক্ষিপ্ত রকমের ভাব—কমলার ঠিক তাহার উল্টা—আয়তনে ও ভাব-ভঙ্গীতে সে আপনার বয়সকে অনেকটা ছড়াইয়া গেছে।" আকৃতিতে এই বৈপরীত্যের জন্যই দুই সখীর অন্তরঙ্গতা অত শীঘ্র ও অনায়াসে জমিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

উপন্যাসে তৃতীয় স্তর : জীবন সমস্যা

১

'গোরা'[১] বাঙ্গালা তথা ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের এক নূতনতর দান। এতদিন পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের মধ্য দিয়া শুধু নরনারীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র লীলা অঙ্কন ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। গোরার চিত্রপট বিস্তীর্ণতর। আধুনিক ভারতবর্ষের প্রবলতম সমস্যা, হিন্দুসমাজের এবং ভারতবর্ষীয় সভ্যতার মরণবাঁচনের সমস্যা, এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত ওতপ্রোত। অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাস নৌকাডুবিতে সামাজিক-সংস্কারের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির সংঘর্ষের একটা পরিণাম দেখান হইয়াছে। গোরায় ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে ধর্ম্মের, এবং ধর্ম্মের সঙ্গে সত্যের বিরোধ ও সমন্বয়ের বিরাট চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির উদার মহত্ত্ব, নিঃসঙ্গ ব্রাহ্মণ্যমহিমা, সার্ব্বভৌম কারুণ্য, সর্ব্বোপরি শান্ত সত্যনিষ্ঠা—এসকল সত্ত্বেও সামাজিক বৈষম্য, আচার-বিচারের নিগড়, জাতিভেদের তুচ্ছতা এবং জনসাধারণের অপরিসীম দারিদ্র্য ও মূঢ়তা যে দেশকে তিলে তিলে মহতী বিনষ্টির দিকে লইয়া যাইতেছে—ইহা কবিমনীষায় গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে তাহার সমাধানের যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা সত্যসত্যই ভবিষ্যার্থকথা। হিন্দুসমাজের অনুদারতা, এবং আচারকে ধর্ম্মের স্থানে প্রতিষ্ঠা করার মূঢ়তা যে অহরহ সমাজবেষ্টনীকে ক্ষুদ্রতর করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে তাহা রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে কেহ এমনভাবে উপলব্ধি করেন নাই; "হিন্দু-সমাজে প্রবেশের কোনো পথ নেই। অন্ততঃ সদর রাস্তা নেই, খিড়কীর দরজা থাকতেও পারে। এসমাজ সমস্ত মানুষের সমাজ নয়—দৈববশে যারা হিন্দু হয়ে জন্মাবে এ সমাজ কেবলমাত্র তাদের।" ধর্ম্ম হইতেছে ব্যক্তিগত, সমাজ সমষ্টিগত। যে সমাজ বাঁচিয়া

[১] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ভাদ্র ১৩১৪ হইতে ফাল্গুন ১৩১৬, পুস্তকাকারে ১৩১৬ সালে।

আছে এবং বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহাকে সকল ধর্ম্মমতের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। হিন্দুসমাজকে সঙ্কীর্ণ অর্থে হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীর সঙ্গে একীভূত না রাখিয়া বিস্তৃততর না করিলে আর বাঁচিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শের অনুগত হইয়া যে কেহ ভারতবর্ষে বাস করিবে সেই-ই বৃহত্তর হিন্দু-সমাজের গণ্ডীর মধ্যে পড়িবে, যেমন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়াও যে-কেহ ইংলাণ্ডে বাস করিয়া সেখানকার আদর্শ অনুযায়ী চলিলে ইংরেজ-সমাজভুক্ত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না তেমনি।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও সনাতন আদর্শের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং সেকালের সরল, অনাড়ম্বর, ত্যাগপরায়ণ, আত্মসমাহিত আনন্দঘন ব্রাহ্মণ্যজীবনের প্রতি সুগভীর অনুরাগ রবীন্দ্রনাথের রচনায়—কবিতায় এবং প্রবন্ধে—অজস্রভাবে প্রকাশিত হইলেও গোরায় যেমন উজ্জ্বল ও সংহত রূপ ধরিয়াছে এমন আর কোথাও নয়। সমসাময়িক 'তপোবন' প্রবন্ধ[১] এই হিসাবে গোরার আংশিক ভাষ্য। এই দুইটি ক্ষুদ্র বৃহৎ রচনার মর্ম্মকথা একই,—"ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করচে, দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘট্‌বে ততদিন নানাদিক্ থেকে আমাদের বারম্বার ব্যর্থ হতে হবে।"

গোরার ভূমিকায় মহাত্মা গান্ধীর আগমনী আছে। দুঃস্থ-দরিদ্র-নিপীড়িতের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের দুঃখনির্য্যাতন স্বীকার করিয়া গোরা তাহার প্রতিরোধে শুধু আত্মিক বল লইয়া একাকী দাঁড়াইয়াছিল, এবং সেইজন্য আদালতে সে স্বেচ্ছায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে নাই, সে বলিয়াছিল, "এরাজ্যে সম্পূর্ণ নিরুপায়ের যে গতি আমারো সেই গতি।" ভারতবর্ষে নন্-কোঅপারেশন আন্দোলন শুরু হইবার প্রায় বারো বৎসর পূর্ব্বে গোরা লেখা হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ নেতাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম-মনোবৃত্তিতে যে প্রতিক্রিয়াশীল পরিবর্ত্তন আসিতেছিল তাহার অনুদারতায় এবং পাশ্চাত্য-

১ প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী পৌষ ১৩১৬।

বিমুখতায় রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ক্লিষ্ট হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথ জন্মাবধি অপৌত্তলিক ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, সুতরাং পৌত্তলিক হিন্দুসমাজের প্রতি তাঁহার অহেতুক অনুরাগ থাকার কথা নয়। কিন্তু তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব্বতন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন নাই; তিনি মনে প্রাণে চিন্তায় কর্ম্মে খাঁটি দেশী ছিলেন। শুধু উপনিষদের উপর পৈতৃক ভক্তি লইয়া নয়, নিজের প্রগাঢ় কবিমনীষাদৃষ্টি লইয়া রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ধর্ম্ম ও আদর্শকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণ মনোভাবের প্রতিনিধি পানুবাবুর মত রামায়ণ-মহাভারত-ভগবদ্গীতাকে হিন্দুদের সামগ্রী বলিয়া অবহেলা করিতে পারেন নাই। প্রতীক-উপাসনার মর্ম্মকথাও তাহার কাছে অশ্রদ্ধেয় নয়। তাই গোরাকে দিয়া বলাইয়াছেন, "আমি ঠাকুরকে ভক্তি করি কি না ঠিক বল্‌তে পারিনে, কিন্তু আমি আমার দেশের ভক্তিকে ভক্তি করি।...তুমি যখন তোমার মাসীর ঘরে ঠাকুরকে দেখ তুমি কেবল পাথরকেই দেখ, আমি তোমার মাসীর ভক্তিপূর্ণ করুণ হৃদয়কেই দেখি।" তপোবন প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ এই কথাই আর একভাবে বলিয়াছেন, "কোনো একটি বিশেষ নদীর জলে স্নান করলে নিজের অথবা ত্রিকোটিসংখ্যক পূর্ব্বপুরুষের পারলৌকিক সদ্গতিঘটার সম্ভাবনা আছে এ বিশ্বাসকে আমি সমূলক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এবিশ্বাসকে আমি বড় জিনিস বলে শ্রদ্ধা করিনে। কিন্তু অবগাহন স্নানের সময় নদীর জলকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে পারে আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি।"

'গোরা' নব্য ব্রাহ্মসমাজের critique; ব্রাহ্মধর্ম্মের গুণ এবং ব্রাহ্মসমাজের দোষ দুইই ইহাতে আশ্চর্য্য উদারতা ও অন্তর্দৃষ্টির সহিত উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের লোক, অন্তত তখন পর্য্যন্ত ছিলেন; এইজন্য বিক্ষোভ হয় নাই। হিন্দুসমাজের হইলে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা যে অযথার্থ নয় তাহা শীঘ্রই প্রমাণিত হইল; ব্রাহ্মরা বৃহত্তর হিন্দুসমাজের বাহিরে নহেন এই মনোভাব প্রকটতর হইতে বিলম্ব হয় নাই, এবং বিনয়-ললিতার মত হিন্দু-ব্রাহ্ম বিবাহও পরে অপ্রত্যাশিত ঘটনা হয় নাই।

বৃহৎ সামাজিক-সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধান গোরার সব কথা নয়, এবং ইহা আধুনিক ভারতের মহাভারত মাত্রও নয়। সাধারণ অর্থে উপন্যাস বলিতে যাহা বোঝায় সে-হিসাবেও গোরা বিরাট রচনা। এতদিন পর্যন্ত বাঙ্গালা উপন্যাসে একমাত্র রস ছিল মধুর বা প্রেমরস। বাৎসল্য বা অন্য রসের ছিটাফোঁটা কচিৎ করুণরসের উপকরণ হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। চোখের-বালিতে বাৎসল্যরস নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, এবং নৌকাডুবিতে অকিঞ্চিৎকর না হইলেও গৌণ। গোরায় প্রেমরসের সঙ্গে সঙ্গে সখ্য-বাৎসল্য-শান্তরসের সমান যোগান হইয়াছে। বর্ষীয়ানের সখ্য রস লইয়া এমন রোমান্স সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন।

চোখের বালিতে ঘটনাস্রোত আবর্তিত হইয়াছে অতৃপ্ত মনে সুপ্ত বাসনার জাগরণে এবং অবচেতন মনে ঈর্ষ্যাবৃত্তির প্রণোদনে; নৌকাডুবিতে অদৃষ্টের পাকচক্রের সঙ্গে সচেতন মনের স্বার্থকাঙ্ক্ষা যোগ দিয়া কাহিনীকে জটিলতর করিয়াছে। গোরায় অদৃষ্টের চক্রান্ত নেপথ্যেই চুকিয়া গিয়াছে, এবং তাহারি ফল এক মহৎ হৃদয়ের পিছনে থাকিয়া সংস্কারের ও সমাজের ছোট-বড় সহস্র বাধা ঠেলিতে ঠেলিতে কাহিনীকে সুমহৎ পরিণতিতে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।[১]

গোরা এক আইরিশ সৈনিকের ছেলে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তাহার মা কৃষ্ণদয়ালের গৃহে আশ্রয় লয় এবং সেইখানে পুত্রপ্রসব করিয়াই মারা যায়। নিঃসন্তান আনন্দময়ী গোরাকে পাইয়া স্তনন্ধয়প্রীতিরসে মাতৃহৃদয় ভরাইয়া তোলেন। আনন্দময়ীর মুখ চাহিয়া কৃষ্ণদয়াল গোরার জন্মকথা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। গোরা বড় হইলেও পারিয়া উঠিলেন না দুই কারণে, প্রথমত আনন্দময়ী বেদনা পাইবেন, দ্বিতীয়ত ইউরোপীয় শিশুকে লুকাইয়া রাখার জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অপরাধী করিবে। গোরার জন্মরহস্য রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর মধ্যে পরম সুকৌশলে ঢাকিয়া রাখিয়া একেবারে গল্পের শেষে অনাবৃত করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে অনেকবার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করিতে ভোলেন নাই যে

১ গোরার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের নিজের ছায়া পড়িয়াছে। শুধু আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতেও গোরা রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ। কোন কোন ঘটনাও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষীকৃত। চরঘোষপুরের ব্যাপার এইরূপ একটি বাস্তব ঘটনা। পাবনা প্রাদেশিক-সম্মিলনীর উপলক্ষে অভিভাষণে (১৩১৪) তাহার উল্লেখ আছে [সমূহ পৃ ১০২-১০৩]।

গোরা আনন্দময়ীর গর্ভজাত নহেন এবং তাহাকে লইয়াই আনন্দময়ীকে সমাজ-প্রচলিত আচারবিচারের খুঁটিনাটি ত্যাগ করিতে হইয়াছে। গোঁড়া বামুন-পণ্ডিতের পৌত্রী আনন্দময়ী আচারবিচার মানেন না কেন এই অনুযোগ করিলে আনন্দময়ী গোরাকে বলিয়াছিলেন, "তোকে কোলে নিয়েই আমি আচার ভাসিয়ে দিয়েছি তা জানিস্? ছোট ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বুঝতে পারা যায় যে জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না। সে কথা যেদিন বুঝেচি সেদিন থেকে এ কথা নিশ্চয় জেনেচি যে আমি যদি খৃষ্টান বলে ছোট জাত বলে কাউকে ঘৃণা করি তবে ঈশ্বরও আমার কাছে থেকে কেড়ে নিবেন।" আনন্দময়ীর কথায় বিনয়ের মনেও অস্পষ্ট সংশয় জাগিয়াছিল। গোরা খ্রীষ্টান সাহেবের ছেলে, সুতরাং হিন্দুসমাজের আচার-বিচারে এবং হিন্দুধর্মের পূজা-অনুষ্ঠানে তাহার কোন অধিকার নাই,—এই বোধ যদি কৃষ্ণদয়ালকে কুণ্ঠিত না করিত এবং আনন্দময়ীকে কচিৎ পীড়া না দিত তাহা হইলে কাহিনীর উৎপত্তিই হইত না। সংস্কারের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির সংঘর্ষ হইতেছে কাহিনীর বীজ।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে গোরাকে আইরিশ সন্তান করা কাহিনীর পক্ষে একান্তই আবশ্যক ছিল কি না। গোরাকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে গড়িয়াছেন—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার যে মনোভাব এবং ভারতবর্ষের পক্ষে তাহার সেবার যে প্রয়োজন—তাহাতে গোরাকে এমন স্থান লইতে হইয়াছে যেখানে সে ভারতবর্ষের সহিত একান্ত সম্পৃক্ত হইয়াও সম্পূর্ণ নিরাসক্ত; ভারতবর্ষের উপর তাহার দাবী কোন কৃত্রিম অথবা স্বতঃসিদ্ধ দাবী নয়, সে দাবী অহেতুক অনুরাগের, তাহা ভক্তির, তাহা সত্য-উপলব্ধির। এইজন্য গোরাকে হইতে হইয়াছে হিন্দুসমাজের সমস্ত সঙ্কীর্ণতার, সমস্ত ক্ষুদ্রতার, সমস্ত ভেদাভেদের, সমস্ত সমাজ-সংস্কারের বাহিরে। দেহমনের তেজ অসামান্য না হইলে গোরার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না, তাই গোরাকে বিদ্যুদ্‌গর্ভস্তনিতবচন দেব বজ্রপাণির মত করিয়া গড়িতে হইয়াছে। তাহা না হইলে বহু শতাব্দীর আবর্জনাকে ভস্মসাৎ করিবে কে। এই তেজস্বিতার জন্য এবং সংস্কারমুক্তচিত্ততার জন্য গোরাকে আইরিশ দম্পতীর সন্তানরূপে আনন্দময়ীর ক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ হইতে হইয়াছে।

গোরা-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে অসামান্য প্রাবল্য—দেহের, বাক্যের এবং মনের। তাহার দেহ এমন যে কাহারও চোখ এড়াইয়া যাইবার যো নাই। গোরার অসাধারণ মূর্ত্তিতে, তাহার চরিত্রের দৃঢ়তায়, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, বিশ্বাসের কঠোরতায়, ইচ্ছার প্রচণ্ডতায়, মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরের মর্ম্মভেদী প্রবলতায় তাহার ব্যক্তিত্বের দুর্দ্দম প্রকাশ। বিনয় ঠিকই বলিয়াছিল, "তুমি মনে কর যত কিছু শক্তি ঈশ্বর কেবল একলা তোমাকেই দিয়েছেন, আর আমরা সবাই দুর্ব্বল প্রাণী।" একথা গোরাও স্বীকার করিয়া লইয়াছিল ; "সব বিষয়েই যতটা দরকার আমি তার চেয়ে অনেক বেশি জোর দিয়ে ফেলি, সেটা যে অন্যের পক্ষে কতটা অসহ্য তা আমার ঠিক মনে থাকে না।"

পূজা-অনুষ্ঠান এবং ঠাকুর-ঘর হইতে গোরাকে তফাৎ রাখিতে গিয়া কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ী গোরার অবচেতন মনে বিরুদ্ধতা জাগাইয়া হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তাহার আগ্রহ অস্বাভাবিকভাবে বাড়াইয়া তুলিলেন। গোরার প্রবল বিশ্বাস এবং প্রচণ্ড ইচ্ছার মধ্যে একটা জবরদস্তির ভাব ছিল, তাই বুদ্ধির দ্বারা তলাইয়া না দেখিয়া আচার-অনুষ্ঠানের উগ্রতার মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া গোরার দেশপ্রীতি সাময়িক তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল। আনন্দময়ীর উদার স্নেহ গোরার হৃদয়ে পরিপক্ক হইয়া উচ্ছ্বসিত দেশপ্রেমে পরিণত হইয়াছিল। অবিনাশের মূঢ় ভক্তির কবল হইতে বাহির হইবার জন্য গোরা যখন ছটফট করিতেছিল তখন "বেহারা আসিয়া খবর দিল, মা গোরাকে ডাকিতেছেন।" মা ডাকিতেছেন—এই আহ্বানে যেন মোহ দূর হইয়া তাহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল, "এই মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের আলোকে ভারতবর্ষ যেন তাহার বাহু উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।"

গোরার হিন্দুয়ানির মধ্যে একটা উগ্র বিদ্রোহের ভাব ছিল। ইহার হেতু ছিল দেশের দুর্গতির প্রতি শিক্ষিত লোকের নির্ম্মম উদাসীনতা কিংবা উপর-পড়া হইয়া মিশনারি-মনোভাবজনিত কৃত্রিম সংস্কারপ্রচেষ্টা। গোরা জানিত দেশের দুর্গতদের উন্নত করিতে হইলে, সমাজকে সংস্কার করিতে হইলে, তাহা ভিতর হইতে স্বাভাবিকভাবে এবং শ্রদ্ধার সহিত করিতে হইবে। যাহার ভালবাসা নাই তাহার তিরস্কার অথবা সংস্কার করিবার অধিকারও নাই। ব্রাহ্মসমাজ তখন ছিল

শিক্ষিত ও সংস্কারক দলের প্রতীক। সেইজন্য পরেশবাবুদের বাড়ী যাইবার সময় "শিক্ষিত লোকদের সমস্ত বই-পড়া ও নকল-করা সংস্কারকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া গোরা কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, পরনে মোটা ধুতির উপর ফিতা বাঁধা এক জামা ও মোটা চাদর, পায়ে শুঁড়তোলা কট্‌কি জুতা" পরিয়া "যেন বর্ত্তমান কালের বিরুদ্ধে এক মূর্ত্তিমান বিদ্রোহের মত আসিয়া উপস্থিত হইল।"

গোরার প্রকৃতির মধ্যে একটা নিঃসঙ্গতার ভাব ছিল যাহাতে সে খুব অল্প লোকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারিত।[১] এই কারণেই যৌবনের স্বাভাবিক বৃত্তিসত্ত্বেও কোন নারীর প্রতি সে এতদিন কিছুমাত্র আকর্ষণ অনুভব করে নাই। আনন্দময়ীর বাৎসল্য এবং বিনয়ের সৌহৃদ্য ইহাই গোরার হৃদয়বৃত্তির একমাত্র অবলম্বন ছিল। গোরার বিবিক্ততায় বিনয়ও সময় সময় দূরে পড়িয়া যাইত, এবং আনন্দময়ীও তাহাকে একটু ভয় করিয়া চলিতেন। পরেশবাবুর বাড়ীতে সুচরিতাকে দেখিয়া, তাহার সহিত তর্ক করিয়া, এবং তাহার কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধালাভ করিয়াও গোরা সুচরিতার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই; তাহার কারণ বিনয়কে ভাঙ্গাইয়া লইতেছে বলিয়া তাহাদের উপর গোরার রাগ ছিল। শুধু পরেশবাবুর প্রতি শ্রদ্ধাই তাহাকে কিছু নরম করিয়াছিল। নারীর কল্যাণস্পর্শ পুরুষের জীবনকে কি অপূর্ব্বভাবে ভরিয়া তুলিতে পারে একথা যখন বিনয় নিশীথ রাত্রিতে ছাদে বসিয়া বলিতেছিল তখনি গোরার মনে একটা অজানিত ক্ষুধার চমক লাগিল। মানবহৃদয়ের এই রোমান্টিক উদ্দীপনা একটা সত্য পদার্থ, তাহা গোরার কাছে এতদিন এমনভাবে কখনো প্রকাশিত হয় নাই। "এই সমস্ত ব্যাপারকে সে এতদিন কবিত্বের আবর্জ্জনা বলিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া

[১] এখানে গোরার সঙ্গে গোরার স্রষ্টার স্বভাবগত সুগভীর ঐক্য আছে। পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারীর একস্থানে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জ্জন নিঃসঙ্গ ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হ'য়েচে। তীরে দেখতে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো, জনতার কোলাহল ক্ষণে ক্ষণে ঘাটেও নামতে হ'চ্চে, কিন্তু কোনোখানে জমিয়ে ব'সতে পারিনি। বন্ধুরা ভাবে তাদের এড়িয়ে গেলুম, শত্রুরা ভাবে অহঙ্কারেই দূরে দূরে থাকি। যে-ভাগ্যদেবতা বরাবর আমাকে সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেলো, পাল গোটাতে সময় দিলে না, রসি যতবার ডাঙায় খোঁটায় বেঁধেছি টান মেরে ছিঁড়ে দিয়েচে, সে কোনো কৈফিয়ৎ দিলে না।"

আসিয়াছে—আজ সে ইহাকে এত কাছে দেখিল যে ইহাকে আর অস্বীকার করিতে পারিল না।…তাহার যৌবনের একটা অগোচর অংশের পর্দা মুহূর্তের জন্য হাওয়ায় উড়িয়া গেল এবং সেই এতদিনকার রুদ্ধ কক্ষে এই শরৎ নিশীথের জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়া একটা মায়া বিস্তার করিয়া দিল।" কিন্তু এ মায়া কতক্ষণের। দেশের মায়া তাহাকে মুগ্ধ করিয়া মহাশক্তির বন্ধনে দিবারাত্রি টানিতেছে। বিনয়ের রোমান্টিক প্রেম গোরার অপ্রত্যক্ষ স্বদেশপ্রেমকে প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য অতিমাত্র আগ্রহশীল করিল। গোরা বলিল, "তুমি এতদিন বই-পড়া প্রেমের পরিচয়েই পরিতৃপ্ত ছিলে—আমিও বই-পড়া স্বদেশপ্রেমকেই জানি—প্রেম আজ তোমার কাছে যখনি প্রত্যক্ষ হ'ল তখনি বুঝতে পেরেছ বইয়ের জিনিসের চেয়ে এ কত সত্য…স্বদেশপ্রেম যেদিন আমার সম্মুখে এমনি সর্বাঙ্গীনভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে সেদিন আমারও রক্ষা নাই…তোমার জীবনের এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনকে আজ আঘাত করেছে—তুমি যা পেয়েছ তা আমি কোনোদিন বুঝতে পারব কি না জানি না—কিন্তু আমি যা পেতে চাই তার আস্বাদ যেন তোমার ভিতর দিয়েই আমি অনুভব করচি।" বলিতে বলিতে গোরার ভাবঘনচিত্তে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে যেন ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর আনন্দ অনুভব করিল; "ক্ষণকালের জন্য তাহার মনে হইল তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া একটি জ্যোতির্লেখা সূক্ষ্ম মৃণালের ন্যায় উঠিয়া একটি জ্যোতির্ময় শতদলে সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিকশিত হইল—তাহার সমস্ত চেতনা সমস্ত শক্তি যেন ইহাতে একেবারে পরম আনন্দে নিঃশেষিত হইয়া গেল।"

গোরার মতে কালের দিন আর রাত্রি এই দুই ভাগের মত সমাজেরও দুই ভাগ, পুরুষ আর নারী। "সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীলোক রাত্রির মতই প্রচ্ছন্ন—তার সমস্ত কাজ নিগূঢ় এবং নিভৃত। আমাদের কর্মের হিসাব থেকে আমরা রাতকে বাদ দিই। কিন্তু বাদ দিই বলে তার যে গভীর কর্ম তার কিছুই বাদ পড়ে না! সে গোপনবিশ্রামের অন্তরালে আমাদের ক্ষতি পূরণ করে আমাদের পোষণের সহায়তা করে।" এই একদেশদর্শিতা গোরার আদর্শের একটা বড় ত্রুটি

ছিল। সুচরিতাকে ভালবাসিয়া এবং তাহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পাইয়া এই ত্রুটির সংশোধন হইল।

গোরার স্বদেশপ্রেম একাধারে বুদ্ধিদীপ্ত এবং আনন্দঘন। তবে বুদ্ধির দিকটা ছিল প্রবলতর। এইজন্য তাহার আদর্শের খুঁতগুলি সে মানিতই না, সর্ব্বদা সেগুলির অনুকূলে চোখা চোখা যুক্তি খাড়া করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া দৃঢ় করিয়া রাখিত। গোরার স্বদেশপ্রেমের আনন্দময়তার পিছনে ছিল তাহার প্রবল ব্যক্তিত্বের উচ্ছ্বসিত সহানুভূতি এবং sense of justice বা ন্যায়পরতা। এইজন্য গোরার ইমোশনে ঘরে-বাইরের সন্দীপনের ক্লেদসিক্ত ভাবালুতা কখনই ছিল না। সত্যকে, আদর্শকে গোরা বুদ্ধির সাহায্যেই খুঁজিত, কিন্তু বুদ্ধির নাগালের তো একটা সীমা আছে। সত্য অনুভবের বস্তু, বিশ্লেষণের নয়। গোরার মধ্যেও অনুভব ছিল, কিন্তু সে অনুভবের মধ্যে ছিল ঐক্য-উপলব্ধির আনন্দ; "ভারতবর্ষের নানাপ্রকার প্রকাশে, এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল। সেই ঐক্যের আনন্দেই আমি আমার এই ভারতবর্ষের জন্যে প্রাণ দেব বলে ঠিক করেছি।" কিন্তু আত্মোপলব্ধির দ্বারা এই আনন্দ-অনুভবকে স্থায়ী করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরেশবাবুও গোরার মত নিরাসক্ত, তবে তাঁহার নিরাসক্তির মূলে ঔদ্ধত্য বা ঔদাসীন্য ছিল না, তাহা ছিল উপলব্ধিজাত ভক্তি ও শান্তরসে ভরপুর। মতে না মিলিলে গোরার মন মানুষকে হয় জোর করিয়া ধরিয়া রাখিত নয় একেবারে ত্যাগ করিত, কিন্তু পরেশবাবু সকলেই ছাড়িয়া দিতেন স্বস্ব সীমার মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করিয়া তুলিতে। পরেশবাবুর সম্পর্কে আসিয়া গোরা বুঝিতে পারিল যে তাহার আদর্শে, তাহার সত্যে ধর্ম্মের স্থান নাই বলিয়া তাহাকে সে সর্ব্বান্তঃকরণে অবিরোধে গ্রহণ করিতে পারে নাই। পরেশবাবুর আত্মসমাহিত শান্তিরস গোরাকে দেখাইয়া দিল যে ধর্ম্মের অতিভূমিতে উঠিলে সর্ব্ববন্ধ দূর হইয়া যায় এবং ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ অনুযায়ী তিতিক্ষা-ধৈর্য্য-সেবার সৌভাগ্য লাভ করা যায়। গোরার জন্মরহস্য ভেদ হইলে সে জানিল যে সে এমন এক স্থান পাইয়াছে যেখান হইতে জাতি-

ভেদাভেদের অতীত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে তাহার কোন বাধা নাই। তখন তাহার কাছে মাতৃস্নেহ এবং দেশপ্রেম এক হইয়া উঠিল। ইহার সহিত সুচরিতার প্রেম ও পরেশবাবুর প্রশান্তি মিলিত হইয়া তাহার চিত্তকে কোমল এবং সেবা-ভক্তির যোগ্যপাত্র করিয়া দিল; গোরার সাধনা সম্পূর্ণতা লাভ করিল।

বিনয় দেহে-মনে গোরার প্রতিরূপ, ছায়া নয়। বাঙ্গালী ভদ্রঘরের শিক্ষিত ছেলের টাইপ বিনয়ের মধ্যে অপূর্ব্বভাবে মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। "বিনয় সাধারণ বাঙ্গালী শিক্ষিত ভদ্রলোকের মত নম্র, অথচ উজ্জ্বল; স্বভাবের সৌকুমার্য্য ও বুদ্ধির প্রখরতা মিলিয়া তাহার মুখশ্রীতে একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে। কালেজে সে বরাবরই উচ্চ নম্বর ও বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে; গোরা কোনোমতেই তাহার সঙ্গে সমান চলিতে পারে না।" গোরার মত বিনয়ের চিত্তে জবরদস্তি ছিল না, তাহার হৃদয়বৃত্তি ছিল অত্যন্ত প্রবল। গোরার প্রচারিত অধিকাংশ মত বিনয় বন্ধুর ভালবাসার খাতিরেই গ্রহণ করিয়াছিল, "তাই তর্কের সময় সে একটা মতকে খুব উচ্চস্বরে মানিয়া থাকে কিন্তু ব্যবহারের বেলা মানুষকে তাহার চেয়ে বেশী না মানিয়া থাকিতে পারে না।" বিনয়ের মন বড় কোমল; যাহাকে সে ভালবাসে বা শ্রদ্ধা করে তাহাকে সে ত্যাগ করিতে পারে না। তাহার বুদ্ধি পরিষ্কার, জেদের বসে সে একদিক দেখিয়া অপর দিকের প্রতি চোখ বুজিয়া রহিত না; "বিনয়ের দোষ এই যে সে একটা জিনিষের দুই দিক না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে না।" সেইজন্য তর্কে বিনয়ের বুদ্ধি শাণিত কৃপাণের মত ঝলক দিয়া খেলিত। গোরার uncompromising মনোভাবের কাছে নিজের প্রকৃতিকে খর্ব্ব করিয়া বিনয় তাহাদের বন্ধুত্বকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। "গোরা নিজের সমস্ত মত, উৎসাহ, সঙ্কল্প লইয়া বিনয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। বিনয় সেইজন্য কেবল মত প্রকাশ এবং তাহা লইয়া তর্ক করিতে পটু ছিল। প্রবন্ধ লেখা, সভাস্থলে বক্তৃতা করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু লোকজনদের সঙ্গে সাধারণভাবে আলাপ করা কিংবা একটা সাদা চিঠি লেখা তাহার দ্বারা সহজে হইতে পারিত না।" পরেশবাবুর সংসারে অনাত্মীয় নারীর নিঃসঙ্কোচ

সাহচর্য্যে আসিয়া বিনয়ের প্রকৃতি যেন সাড়া দিয়া উঠিল এবং গোরার বিরুদ্ধতার সম্মুখেও নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতে ভীত হইল না। গোরার প্রবল ব্যক্তিত্বের চাপে ক্ষুণ্ণ বন্ধুত্ব স্বাধীনপ্রকৃতির খোলা হাওয়ায় নূতন জাগরণ লাভ করিল। "এতদিন পরে সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, সে লোককে খুসি করিতে পারে এমন কি শিক্ষা দিতেও পারে।"

পরেশবাবুর বাড়ীর আতিথ্য গ্রহণের মধ্যে বিনয় স্বভাবতই কোন বিরোধ দেখিতে পায় নাই, বরং তাহার হৃদয়বৃত্তির এই নূতন অভিজ্ঞতা তাহার পুরাতন আকর্ষণগুলিকে মধুরতর করিয়াছিল। কিন্তু গোরার চিত্ত স্বার্থপর—কেননা তখনও তাহার মন নারীসঙ্গমাধুর্য্যের সন্ধান পায় নাই। তাই পরেশবাবুর বাড়ীতে বিনয়ের যাওয়া-আসা গোরাকে বেদনা দিতে লাগিল যে "বিনয়ের চিত্তের একটা প্রধান ধারা এমন একটা পথে চলিয়াছে, যে পথের সঙ্গে গোরার জীবনের কোনো সম্পর্ক নাই।" বিনয়ের বন্ধুত্ব ও সাহচর্য্য গোরার জীবনের একটা বড় জিনিষ ছিল, একথা গোরা বরাবরই জানিত। তাই বিনয়ের নিন্দা করাতে সে বিরক্ত হইয়া অবিনাশকে বলিয়াছিল, "তুমি কি মনে কর বুদ্ধিতে ক্ষমতাতে বিনয় আমার চেয়ে কোন অংশে ছোট! তুমি জান তার সাহায্য না পেলে আমার নিজের মত ও বিশ্বাস আমার নিজের কাছে আজ এত স্পষ্ট ও দৃঢ় হয়ে উঠত না।"

অনাত্মীয় নারীর সঙ্গে পরিচয়ের কুণ্ঠা বিনয়ের ভূমিকাকে প্রথমেই বেশ জীবন্ত ও উজ্জ্বল করিয়াছে। সুচরিতার প্রতি তাহার অনুরাগ সাধারণ রোমান্টিক মনোভাব ছাড়া আর কিছু ছিল না, এবং এই মনোভাব বিনয়ের মনে শিকড় গাড়িয়া বসিবার পূর্ব্বেই গোরার প্রতি সুচরিতার অনুরাগ তাহাকে বিনয়ের নিকট হইতে সুদূর করিয়া ফেলিয়াছে। ললিতা-বিনয়ের অনুরাগ একটা বেশ বিরোধভাবের উপর আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এই অসামান্য মেয়েটির সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বে বিনয় প্রথম হইতেই একটু আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পর তাহার সুস্পষ্ট সতেজ ইংরেজী উচ্চারণ ও আবৃত্তি তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সর্ব্বোপরি গোরার অপমানে বিনয়ের পাশে আসিয়া দাঁড়ানোয় এবং

তাহার উপর নির্ভর করিয়া স্টীমারে চলিয়া আসা বিনয়ের চিত্তে প্রেমের বীজ বপন করিয়াছিল—"ললিতার কমনীয় স্ত্রীমূর্ত্তি আপন অন্তরের তেজে বিনয়ের চক্ষে আজ এমন একটি মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেখা দিল যে, নারীর এই অপূর্ব্ব পরিচয়ে বিনয় নিজের জীবনকে সার্থক বোধ করিল।" এই প্রেমের সফলতার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড বাধা দাঁড়াইল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণতা এবং বিনয়-ললিতার আত্মসম্মানবোধ। পানুবাবু ব্রাহ্মসমাজের নামে পরেশবাবুকে আঘাত দিতে লাগিল বলিয়া ললিতার মনে বিরুদ্ধভাব উঠিল এবং তাহাই তাহাদের বিবাহ সম্ভাবনা জাগাইয়া তুলিল এবং অচিরে বিবাহও ঘটাইয়া দিল। আনন্দময়ীর মাতৃহৃদয়ের স্নেহচ্ছায়া এবং পরেশবাবুর উদারদৃষ্টির আশীর্ব্বাদ দম্পতীর সংসারারম্ভ সামাজিক এবং পারিবারিক প্রতিকূল্যের মধ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে উৎরাইয়া দিল।

পরেশবাবুর ভূমিকা গোরা উপন্যাসের কেন্দ্রস্থানীয়। ইঁহারই চরিত্রপ্রভাব প্রধান পাত্রপাত্রীগুলিকে সুমহৎ লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। প্রাচীন-কালের ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহপতির আদর্শ আধুনিককালের উপযোগী পরিবর্ত্তন লাভ করিলে যাহা দাঁড়ায় তাহাই রবীন্দ্রনাথ পরেশবাবুর মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পরেশবাবু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে থাকিয়াও অন্য সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করিতেন না। তিনি সত্যের উপাসক; ঈশ্বরের কাছে তিনি এই প্রার্থনা করিতেন, "ব্রাহ্মের সভাতেই হোক আর হিন্দুর চণ্ডীমণ্ডপেই হোক আমি যেন সত্যকে সর্ব্বত্রই নতশিরে অতি সহজেই বিনা বিদ্রোহে প্রণাম করতে পারি—বাইরের কোনো বাধা আমাকে যেন আটক করে না রাখ্‌তে পারে।" যৌবনে ধর্ম্মমতের স্বাধীনতার জন্য হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, তাই স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা তিনি সর্ব্বদাই পোষণ করিতেন। সকলকেই, এমন কি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকেও তিনি "তার জায়গাটুকু" ছাড়িয়া দিতেন। গোরার সঙ্গে তাঁহার এই এক বড় বৈপরীত্য। পরেশবাবু একমাত্র নিজের বুদ্ধির উপরেই নির্ভর করিতেন না, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরও বিশ্বাস রাখিয়া চলিতেন। তাই তাঁহার নিজের ইচ্ছার ও মতের বিরোধে কোন কাজ হইলে তিনি দুঃখ পাইতেন না। পরেশবাবুর মনের জোর বুদ্ধিনিষ্ঠ নয়, তাহা সত্যের উপর আত্যন্তিক

নির্ভরের জোর, এইজন্য এই জোরের কোন বাহ্য প্রকাশ ছিল না। "নিজের জোর তিনি কোথাও কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই কিন্তু তাঁহার মধ্যে কত বড় একটা জোর অনায়াসেই আত্মগোপন করিয়া আছে।" গোরার কিন্তু ঠিক উল্টা। "গোরার কাছে তাহার নিজের ইচ্ছা কি প্রচণ্ড! এবং সেই ইচ্ছাকে সবেগে প্রয়োগ করিয়া সে অন্যকে কেমন করিয়া অভিভূত করিয়া ফেলে!"

মানবহৃদয়ের মহত্ত্বের একটা দিক যেমন পরেশবাবু, আর একটা দিক তেমনি আনন্দময়ী। আনন্দময়ী যেন যশোদা; যাহাকে সত্য করিয়া ধরিয়া রাখিবার মত দাবী নাই এমন পরের ছেলের উপর স্নেহ যেন আত্মজ প্রীতিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। চিন্তাশীলতায় ও উপলব্ধিতে পরেশবাবু যে স্থানে পৌঁছিয়াছেন, শুধু মাতৃহৃদয়ের সকরুণ বাৎসল্য লইয়া আনন্দময়ীও সেই অতিভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আনন্দময়ীর বাৎসল্যের সাধনা, এবং তাহাতে তিনি আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গোরা এবং বিনয় এই দুই ক্রোড়-দেবতাকেই "তাঁহার মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছেন, সংসারে ইহাদের চেয়ে বড় তাঁহার আর কেহ ছিল না।" যে-গোরাকে কোলে পাইয়া তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পৌত্রী হইয়াও আচারবিচারে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। অদৃষ্টের এমনই নিষ্করুণ পরিহাস যে সেই-গোরাই আবার অতিরিক্ত আচারবিচারপরায়ণ হইয়া তাঁহার হাতের রান্না খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু কোনরকম দুঃখ-কষ্ট তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। "সমস্ত উদ্বেগ নিস্তব্ধভাবে পরিপাক করাই তাঁহার চিরদিনের অভ্যাস। সুখ ও দুঃখ উভয়কেই তিনি শান্তভাবেই গ্রহণ করিতেন, তাঁহার হৃদয়ের আক্ষেপ কেবল অন্তর্যামীরই গোচর ছিল।" তাই গোরা হাজতে গিয়াছে শুনিয়াও তিনি অযথা ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন নাই; "তিনি চোখের দৃষ্টিতে নিঃশব্দ বেদনার ছায়া লইয়া ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।" আনন্দময়ীর চারিদিকে একটি কারুণ্যের ও শান্তির হাওয়া বহিত, এবং তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে অন্তরের অশান্তি-বিদ্রোহের তাপ যেন জুড়াইয়া আসিত, "চারিদিকের সকলের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ সহজ হইয়া আসিত।" তাই বিনয় বলিয়াছিল, "মা,

ইচ্ছা করে আমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি বিধাতাকে ফিরিয়ে দিয়ে শিশু হয়ে তোমার ঐ কোলে আশ্রয় গ্রহণ করি। কেবল তুমি, সংসারে তুমি ছাড়া আমার আর কিছুই না থাকে।" গোরার দেশপ্রেমের মূলে আনন্দময়ী; তাঁহারি স্নেহঘন মাতৃমূর্তির ছায়া সমগ্র দেশকে ব্যাপিয়া যেন গোরার হৃদয়কে টানিয়া ধরিয়া ছিল। গোরার পরম উপলব্ধির শেষেও আনন্দময়ী; তাঁহারি মধ্যে গোরা দেশমাতৃকার কল্যাণময়ী প্রতিমা দেখিয়া ধন্য হইয়া গেল। "গোরা কহিল, মা, তুমিই আমার মা! যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা! তুমিই আমার ভারতবর্ষ!"

পরেশবাবুর শিক্ষা-দীক্ষা সার্থকতা লাভ করিয়াছিল সুচরিতার মধ্যে। পরেশবাবু-সুচরিতার সম্বন্ধ স্নেহমধুর ও সুগভীর। ঘরের বাহিরের মূঢ় অবিচার ও হৃদয়হীনতা হইতে পরেশবাবুর একটিমাত্র আশ্রয়ভূমি ছিল সুচরিতার সঙ্গ। সুচরিতাও তাঁহার কাছে আসিয়া চিত্তের বেদনাভার লঘু করিয়া দিত। বয়স তাহার বেশি নয়, কিন্তু সংসারের আঘাতে এবং পরেশবাবুর শিক্ষায় তাঁহার মনের বাড় অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল; তাহার মুখে বড় বড় তর্ক একেবারেই অশোভন হয় নাই। গোরার উগ্র বেশ, উদ্ধত তর্ক এবং প্রবল কণ্ঠস্বর সুচরিতার মনে প্রথমে বিরোধ জাগাইয়া তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, কেননা প্রবলের প্রতি নারীর আকর্ষণ তাহার আদিম প্রবৃত্তি। গোরার সহিত হারাণের অশিষ্ট ব্যবহার এবং মূঢ় তর্ক তাহার মনকে হারাণবাবুর উপর বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাহারি প্রতিক্রিয়ায় গোরার প্রতি অজ্ঞাতসারে প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। হারাণের ক্ষুদ্রতা তাহাকে গোরার পক্ষাবলম্বন করিতে বাধ্য করিল, অথচ গোরার উগ্র হিন্দুয়ানি তাহার অন্তরে প্রতিকূলতার ভাব জাগাইয়া রাখিল; এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে পড়িয়া সুচরিতার অবচেতন মানসে গোরার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ শিকড় গাড়িয়া বসিল; গোরা একটি প্রচণ্ড সমস্যা হইয়া তাহার মনকে চাপিয়া ধরিল। তর্কের মাঝে সুচরিতা একবার উত্তেজিত হইয়া পড়ায় গোরা তাহার দিকে চাহিয়াছিল; "সে চাহনিতে

সঙ্কোচের লেশমাত্র ছিল না,” তবুও এই দৃষ্টি সুচরিতাকে লজ্জা দিতে লাগিল, তাহার নারীচিত্ত এই মনে করিয়া কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল—গৌরমোহন বাবু কি মনে করিলেন! এই লজ্জায় শিক্ষিত ব্রাহ্মতরুণীর মহিমা নষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া সে নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে করিতে লাগিল। এই হীনতাবোধ তাহার মনের অনুরাগের পক্ষে বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিল। যাইবার সময় গোরা তাহাকে কোন সম্ভাষণ করে নাই, এই উপেক্ষা সুচরিতার মনকে পীড়া দিয়া তাহাকে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিল যে গোরার উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য সে আজ অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেছে না। বিনয়ের মুখে গোরার কথা, গোরার মত, সুচরিতা আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিল। গোরার সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাতে সুচরিতার অনুরাগ স্পষ্টতর হইল। প্রথম পরিচয়ে এবং বিনয়ের মুখে গোরার মনের এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব সে অনুভব করিয়াছিল, এবার গোরার দেহ তাহার দৃষ্টিগোচরে পড়িয়া তাহাকে বিস্ময়হত করিয়া তাহার মনে অনুরাগের বান ডাকাইয়া দিল। গোরাও যেন সুচরিতাকে এই প্রথম দেখিল, দেখিয়া যেন একটা অপূর্ব্ব অনুভূতির নিবিড়তা তাহার চিত্তকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। “গোরা শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে প্রগল্‌ভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সুচরিতার মুখশ্রীতে তাহার আভাসমাত্র কোথায়? তাহার মুখে বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহ প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু নম্রতা ও লজ্জার দ্বারা তাহা কি সুন্দর কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে!…দেখিতে দেখিতে ক্রমশই সুচরিতার কপালের ভ্রষ্ট কেশ হইতে তাহার পায়ের কাছে শাড়ির পাড়টুকু পর্য্যন্ত অত্যন্ত সত্য এবং অত্যন্ত বিশেষ হইয়া উঠিল। একই কালে সমগ্রভাগে সুচরিতা এবং সুচরিতার প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্রভাবে গোরার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল।”

পানুবাবুর সঙ্গে সুচরিতার হৃদয়ের সম্পর্ক হয় নাই। বিবাহের সম্ভাবনা উভয়পক্ষ মানিয়া লইয়াছিল মৌনভাবে। পানুবাবু সেই ভাবিয়া সুচরিতার শিক্ষা ও সংশোধনের ভার লইয়াছিলেন, এবং সুচরিতাও বাধ্য ছাত্রীর মত নিজেকে গুরুর উপযুক্ত শিষ্যা করিয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত।

কিন্তু তাহার আসল গুরু পরেশবাবুর উদার সত্যনিষ্ঠার আস্বাদ সে পাইয়াছে। তাই "হারাণবাবুর সাম্প্রদায়িক উৎসাহের অত্যাচারে এবং সঙ্কীর্ণ নীরসতায়" সুচরিতা ভিতরে ভিতরে বিমুখ হইয়া উঠিতেছিল। পানুবাবুর সহিত সুচরিতার মনের মিল হইয়াছে কিনা এবিষয়ে পরেশবাবুও নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই; এইজন্যই তাহাদের বিবাহ অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ছিল। সুচরিতার কর্ত্তব্যবোধ তাহার হৃদয়বৃত্তির অপেক্ষা প্রবলতর ছিল, তাই মনের বিমুখতাসত্ত্বেও সে কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে পানুবাবুকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু গোরার প্রতি পানুবাবুর হীন মনোভাব এবং পরেশবাবুর ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি নীচ কপটতা সুচরিতাকে একেবারে দূরে ঠেলিয়া দিল।

বরদাসুন্দরীর সংসার তথা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণ বেষ্টনী হইতে বাহিরে আসিয়া সুচরিতার চিত্ত যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। পরেশবাবুর শিক্ষা তাহার ধ্রুবতারা। চিত্তের বেদনায়, সংসারের সঙ্কটের সময়, সে পরেশবাবুর কাছেই ছুটিয়া যাইত এবং তাঁহার সান্নিধ্যের প্রগাঢ় শান্তি তাহাকে নীরবে অভিষিক্ত করিয়া দিত। "এই তাহার সঙ্কটের সময় তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল পরেশবাবু। তাঁহার কাছে সে পরামর্শ চাহে নাই, উপদেশ চাহে নাই, অনেক কথা ছিল যাহা পরেশবাবুর সম্মুখে সে উপস্থিত করিতে পারিত না এবং এমন অনেক কথা ছিল যাহা লজ্জাকর হীনতাবশতই পরেশবাবুর কাছে প্রকাশের অযোগ্য। কেবল পরেশবাবুর জীবন, পরেশবাবুর সঙ্গমাত্র তাহাকে যেন নিঃশব্দে কোন্ পিতৃক্রোড়ে কোন্ মাতৃবক্ষে আকর্ষণ করিয়া লইত।" পিতা-কন্যার নিবিড় স্নেহসম্পর্ক এবং আধ্যাত্মিক সহানুভূতির পরিপূর্ণ চিত্র উপন্যাসটির সমগ্র পরিবেশ জুড়িয়া আছে।

অনুরাগের সঙ্গে কারুণ্যের যোগ না হইলে প্রেম পরিপূর্ণ হয় না। সুচরিতার মনে গোরার উপর কারুণ্যের সঞ্চার হইল জেল-ফেরত গোরাকে দেখিয়া। "গোরার দেহের এই শীর্ণতাই সুচরিতার মনে বিশেষ করিয়া একটি বেদনাপূর্ণ সম্ভ্রম জাগাইয়া দিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল প্রণাম করিয়া গোরার পায়ের ধূলা গ্রহণ করে। যে উদ্দীপ্ত আগুনের ধোঁয়া এবং কাঠ আর দেখা যায় না গোরা

সেই বিশুদ্ধ অগ্নিশিখাটির মত তাহার কাছে প্রকাশ পাইল। একটি করুণামিশ্রিত ভক্তির আবেগে সুচরিতার বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল।" জেলের মধ্যে একান্ত পাইয়া গোরার মনও সুচরিতার ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া ছিল। "এমন একদিন ছিল, যখন ভারতবর্ষে যে স্ত্রীলোক আছে সে কথা গোরার মনে উদয়ই হয় নাই।" আজ তাহার নবজাগ্রত প্রেমের আলোকে দৃষ্টি খুলিয়া গেল। "জেলের মধ্যে বাহিরের সূর্য্যালোক এবং মুক্ত বাতাসের জগৎ যখন তাহার মনের মধ্যে বেদনা সঞ্চার করিত তখন সেই জগৎটিকে কেবল সে নিজের কর্ম্মক্ষেত্র এবং কেবল সেটাকে পুরুষসমাজ বলিয়া সে দেখিত না,—যেমন করিয়াই সে ধ্যান করিত বাহিরের এই সুন্দর জগৎসংসারে সে কেবল দুইটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মুখ দেখিতে পাইত, সূর্য্যচন্দ্রতারার আলোক বিশেষ করিয়া তাহাদেরই মুখের উপর পড়িত, স্নিগ্ধ নীলিমামণ্ডিত আকাশ তাহাদেরই মুখকে বেষ্টন করিয়া থাকিত—একটি মুখ তাহার আজন্ম পরিচিত মাতার, বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত আর একটি নম্র সুন্দর মুখের সঙ্গে তাহার নূতন পরিচয়।" গোরা-সুচরিতা পরস্পরের মধ্যে মিল খুঁজিয়া পাইল, তাই তাহাদের প্রেমের সম্মুখে কোন বাধাই টিকিতে পারিল না—হরিমোহিনীর স্বার্থপরতা নয়, গোরার অভিমানাহত আত্মসম্মানবোধও নয়। জন্মরহস্য-উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে গোরার মনের কাল্পনিক সংস্কারের সকল শৃঙ্খল কাটিয়া গেলে সে একদিকে আনন্দময়ী অপরদিকে সুচরিতা এই দুই নারীর স্নেহে ও প্রেমে চরিতার্থতা লাভ করিল। সুচরিতাও একদিকে পরেশবাবু অপরদিকে গোরা এই দুই পুরুষের প্রশান্তিতে ও তেজস্বিতায়, ভক্তিতে এবং সেবায়, আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইল।

ললিতার ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নারীচরিত্রের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বাধিক ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এমন জীবন্ত নারীচরিত্র সাহিত্যে খুব কমই আছে। প্রচলিত ধারণা অনুসারে ললিতাকে সুন্দরী বলা চলে না, তবুও পরেশ-বাবুর কন্যাদের মধ্যে সেই বেশি করিয়া চোখে পড়ে। তেজস্বিতাই হইতেছে ললিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অপরের অন্যায় বা জুলুম সে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না, জবরদস্তি দেখিলে বা অনুমান করিলেই তাহার অন্তর বিমুখ

হইয়া উঠে ; "আমার স্বভাবই ঐ—যদি আমি দেখি কেউ কথায় বা ব্যবহারে জোর প্রকাশ করচে সে আমি একেবারেই সইতে পারিনে।" ললিতার মনে যে স্বাতন্ত্র্যের তেজ এবং শক্তির দৃঢ়তা ছিল তাহাই তাহার মুখশ্রীতে একটি বিশেষ সৌন্দর্য্যের আভা বিকীর্ণ করিত, কিন্তু এই সৌন্দর্য্য সকলের চোখে পড়িবার মত নয়। প্রথমে পরেশবাবু ও সুচরিতা এবং পরে বিনয় ললিতার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সত্যকার পরিচয় পাইয়াছিল। ললিতার মা বরদাসুন্দরী তাহাকে বুঝিতে পারিতেন না, কিন্তু তাহার সত্যপরতাকে ও তাহার তেজস্বিতাকে ভয় করিয়া চলিতেন। "পরেশবাবু এই খামখেয়ালি দুর্জ্জয় মেয়েটিকে তাঁহার অন্যান্য সকল সন্তানের চেয়ে একটু বিশেষ স্নেহই করিতেন। ইহার ব্যবহার অন্যের কাছে নিন্দনীয় ছিল বলিয়াই ললিতার আচরণের মধ্যে যে একটি সত্যপরতা আছে সেইটুকে তিনি বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন।......সংসারে ললিতা প্রিয় হইবে না কিন্তু খাঁটি হইবে ইহাই জানিয়া পরেশবাবু কেমন একটু বেদনার সহিত কাছে টানিয়া লইতেন—তাহাকে আর কেহ ক্ষমা করিতেছে না জানিয়াই তাহাকে করুণার সহিত বিচার করিতেন।"

ললিতার মনের তলে তলে একটা বিপরীত ধারা বহিত ; যখনি তাহার জেদে পড়িয়া কেহ অনুকূল হইয়া পড়িত অমনি তাহার অথবা নিজের উপর সে অপ্রসন্ন হইয়া উঠিত। "কেহ-যে তাহার নির্ব্বন্ধের জোর মানিয়া লইবে এটুকুও তাহার স্বাধীনচিত্ত অকুণ্ঠিতভাবে মানিয়া লইতে চাহিত না। জেদ এবং অভিমান তাহার জটিল চরিত্রের একটা প্রধান প্রকাশ ছিল। "ভুলিয়া গেছি বলিলে ললিতার কাছে অপরাধ ক্ষালন হয় না—কারণ ভুলিতে পারাটাই সকলের চেয়ে গুরুতর অপরাধ।"

বিনয়ের উপর ললিতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল তাহার অন্যের জুলুম সহ্য না করিবার প্রবৃত্তি হইতে। একই দিনে সে বিনয় এবং গোরার সম্পর্কে প্রথম আসিয়াছিল। গোরার উগ্র বেশ, ভাব এবং তর্কনিষ্ঠা ললিতার ভাল লাগে নাই, এবং বিনয়ের মত লোক যে গোরার মন্ত্রে বশীভূত হইয়া তাহারি কথা আবৃত্তি করিতে থাকিবে ইহাও সে পছন্দ করে নাই। সুচরিতার সঙ্গে প্রথম আলাপ বলিয়া

সুচরিতার প্রতি বিনয়ের মন প্রথমে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে ললিতার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল বুঝি বা সুচরিতা বিনয়কে ভালবাসিয়াছে। এই সন্দেহের জন্যই ললিতার মন প্রথমে বিনয়ের বিরুদ্ধে "যেন অস্ত্রধারণ করিয়া উঠিয়াছিল।" কেননা বাড়ীর লোকের মধ্যে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ছিল সুচরিতা। পিতৃ-স্নেহসৌভাগ্য এই দুই তরুণী ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছিল এবং সেই কারণে পরস্পরের মন অতি কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল। যখন সে জানিল যে সুচরিতা বিনয়ের প্রতি কোন বিশেষ পক্ষপাতের ভাব পোষণ করে না তখনি তাহার মন বিনয়ের উপর প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাহার পর ললিতার মন চাহিল বিনয়কে গোরার পরিবেশ হইতে মুক্ত করিয়া আনিতে; "আমার ইচ্ছা করে ওঁর বন্ধুর বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওঁকে স্বাধীন করে দিতে।" অনুরাগের প্রথম সূচনা এই অস্পষ্ট অধিকারবোধ হইতে বোঝা যাইতেছে। ললিতার খোঁচায় উত্তেজিত হইয়া বিনয় তর্ক করিতে লাগিল, ললিতার তাহা ভালই লাগিল। কিন্তু বিনয় যখনি তর্ক ছাড়িয়া দিয়া ললিতার ইচ্ছার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল তখনি তাহার মন বিরূপ হইয়া গেল। তাহার সচেতন মন চাহিতেছে বিনয় তাহাকে স্বীকার করিয়া লউক, কিন্তু তাহার অবচেতন মন যেন লজ্জাবোধ করিয়া বিনয়ের প্রতি তাহার এই অনুরাগকে এবং বিনয়ের নতিস্বীকারকে তিরস্কার করিতে ছাড়িতেছে না। ললিতার মন বলিতে লাগিল, "কেবল আমার অনুরোধ রাখিবার জন্য বিনয়বাবুর এমন করিয়া রাজি হওয়া উচিত হয় নাই। অনুরোধ! কেন অনুরোধ রাখিবেন। তিনি মনে করেন, অনুরোধ রাখিয়া তিনি আমার সঙ্গে ভদ্রতা করিতেছেন। তাঁহার এই ভদ্রতাটুকু পাইবার জন্য আমার যেন অত্যন্ত মাথাব্যথা।" তাহার ব্যবহারে বিনয় ব্যথা বোধ করিতেছে জানিয়া ললিতার মনে কষ্ট হইল; "ললিতা সহজে কাঁদিতে জানে না কিন্তু আজ তাহার চোখ দিয়া জল যেন ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিল। কি হইয়াছে কেন সে বিনয়বাবুকে বার বার এমন করিয়া খোঁচা দিতেছে এবং নিজে ব্যথা পাইতেছে?" আবৃত্তি-অভিনয়ের মহড়া উপলক্ষ্যে বিনয়-ললিতার মন পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইল। পরেশ-বাবুর কথায় ললিতা যেদিন রিহার্শালে যোগ দিল সেদিন তাহার নারীকণ্ঠের সুস্পষ্ট

সতেজ ইংরেজী-উচ্চারণ তাহার মুখশ্রীর তাহার চরিত্রের সঙ্গে জড়িত হইয়া বিনয়ের মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিল। নিজের এই কৃতিত্ব এবং বিনয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ললিতার মনেও পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। "ললিতা যখনি নিজে অনুভব করিল তাঁহার আবৃত্তি ও অভিনয় অনিন্দনীয় হইয়াছে; সুগঠিত নৌকা ঢেউয়ের উপর দিয়া যেমন করিয়া চলিয়া যায় সেও যখন তেমনি সুন্দর করিয়া তাহার কর্ত্তব্যের দুরূহতার উপর দিয়া চলিয়া গেল তখন হইতে বিনয়ের সম্বন্ধে তাহার তীব্রতাও দূর হইল। বিনয়কে বিমুখ করিবার জন্য তাহার চেষ্টামাত্র রহিল না।" সুচরিতার নির্লিপ্ততায় বিনয় এবং ললিতা দুইজনেই—অবশ্য বিভিন্ন কারণে—বেদনা বোধ করিল, এবং উভয়ের মধ্যে সাধারণ এই বেদনাবোধ উভয়কে ঘনিষ্ঠতর করিল। গোরার পরিবেশের বাহিরে এবং ললিতার সান্নিধ্যে আসিয়া বিনয় নিজের স্বতন্ত্র শক্তিকে অনুভব করিয়া একটা নূতন উৎসাহস্ফূর্ত্তি বোধ করিল। গোরার উপর স্নেহ ও শ্রদ্ধা উভয়ের একটি সাধারণ গ্রন্থি হইয়া দাঁড়াইল, এবং গোরার অপমান দুইজনেই আঘাত করিয়া দুইজনের ভাগ্য এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দিল। কাহাকেও না বলিয়া ললিতা ষ্টীমারে বিনয়ের সঙ্গে পিতার কাছে ফিরিয়া গেল। ললিতা যে সকলকে ছাড়িয়া আজ তাহাকেই আশ্রয় করিয়াছে এই ভাবিয়া বিনয়ের চিত্ত ভরিয়া উঠিল। তাহার সম্ভ্রমপূর্ণ ও আন্তরিক ভদ্র ব্যবহারে ললিতা স্বস্তি বোধ করিল এবং সামাজিকতার দিক হইতে সে যে অন্যায় আচরণ করিয়াছে এই সঙ্কোচ এবং বিনয়ের আশ্রয়ে আসিয়াছে এই স্বস্তি তাহার মনে নবানুরাগের হর্ষ জাগাইল।

ষ্টীমার হইতে নামিয়াই ললিতার মন আবার বাঁকিতে শুরু করিল। আসল কথা, উত্তেজনার মুখে চলিয়া আসিয়া যে সে ভাল করে নাই নিজের উপর এই রাগই তাহার অভিমানী চিত্তকে বিনয়ের বিরুদ্ধে খাড়া করিল। "আজ সকাল হইতেই ললিতা বিনয়ের উপর রাগ করিয়া আছে। রাগটা যে অসঙ্গত তাহা সে সম্পূর্ণ জানে—কিন্তু অসঙ্গত বলিয়াই রাগটা কমে না বরং বাড়ে। ঘটনাবশতঃ বিনয় যে তাহার উপরে একটা কর্ত্তৃত্বের অধিকার লাভ করিয়াছে ইহা তাহার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল।" আবার পূর্ব্বেকার মত বিনয়ের উপর

বিরোধের ভাব জাগিয়া উঠিল,—কিন্তু এ বিরোধ বিরাগের নয়, অনুরাগের। বিনয়কে ব্যথা দিয়া সেও ব্যথা পাইতে লাগিল, তবুও আগেকার সেই মিলনের সুরটি মনে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। যখনি জানিল যে তাহার সহিত বিবাহ সম্ভবপর নয় বলিয়া বিনয় তাহাদের বাড়ী আসা ছাড়িয়া দিয়াছে তখনি ললিতার বিরহী হৃদয়ে প্রেমের সুর আর চাপা রহিল না। অশান্ত হৃদয় লইয়া সে আনন্দময়ীর কাছে গেল, এবং তাঁহার স্নেহচ্ছায়ায় তাহার মনের বিকার কাটিয়া গেল। কিন্তু সে এখন করে কি। তাহার দিন কাটিবে কি করিয়া। "ললিতার জীবন যে ললিতার পক্ষে অত্যন্ত সত্য পদার্থ; সে ত আধাআধি কিছুই জানে না; সুখ দুঃখ তাহার পক্ষে কিছু-সত্য-কিছু-ফাঁকি নহে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে লড়াই করিবে, মরিবে তবু হারিবে না, এই তাহার পণ ছিল।"

বিনয়ের সহিত বিবাহ তাহার কাম্য, কিন্তু সেজন্য বিনয় যে নিজেকে খাটো করিবে এ চিন্তা ললিতার অসহ্য। তাই সে বিনয়কে ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা লইতে বাধা দিল। তাহার আত্মসম্মানবোধ, তাহার সুবৃহৎ প্রেম, পরেশবাবুর উদার দৃষ্টি এবং আনন্দময়ীর সুনিবিড় স্নেহ সব মিলিয়া ললিতাকে অসাধারণ মনস্বিতায় উদ্দীপ্ত করিল। অবশেষে সামাজিক প্রভেদকে স্বীকার করিয়াও বিনয়-ললিতার প্রেম জয়যুক্ত হইল। "তাহারা হিন্দু কি ব্রাহ্ম একথা তাহারা ভুলিল, তাহারা যে দুই মানবাত্মা এই কথাই তাহাদের মনের মধ্যে নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মত জ্বলিতে লাগিল!"

পানুবাবু, বরদাসুন্দরী, হরিমোহিনী, কৃষ্ণদয়াল, মহিম, অবিনাশ, কৈলাস ও সতীশ প্রভৃতি ভূমিকা ফোটোগ্রাফের মত নিখুঁত। প্রথম দুই ভূমিকায় ব্রাহ্ম-সমাজের এবং শেষের দুই ভূমিকায় হিন্দুসমাজের বিশেষ বিশেষ মনোভাব মূর্ত্তি ধরিয়াছে।

পানুবাবুর চরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ যে পরিমাণে ironical হইয়াছেন তাহা তাঁহার অপর কোন উপন্যাসে দেখা যায় না। তাঁহার ছোট-গল্পে অবশ্য নিতান্ত অবান্তর কোন কোন ভূমিকায় এমন দেখা যায়। পানুবাবুর চরিত্রের ক্ষুদ্রতা ছিল তাঁহার মনের সঙ্কীর্ণতায় এবং তাঁহার মূঢ় আত্মম্ভরিতায়। তাঁহার

বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, কিন্তু তিনি নিজে এবং তাঁহার সমাজের লোকে সেই বিদ্যাবুদ্ধির উপর যোগ্যতার অনেক বেশি মূল্য দিয়াছিল। দূরে হইতে ব্রাহ্ম সমাজের সকলেই তাঁহাকে "ইংরেজি বিদ্যার ভাণ্ডার, তত্ত্বজ্ঞানের আধার ও ব্রাহ্ম-সমাজের মঙ্গলের অবতাররূপে" দেখিত। পরেশবাবুর বাড়ীতে তাঁহার সে পরিমাণ খাতির ছিল না, কেননা সুচরিতা তাঁহাকে পরেশবাবুর তুলনায় নিতান্ত খাটো করিয়া না দেখিয়া পারে নাই। ললিতা তো তাঁহাকে মোটেই দেখিতে পারিত না, এবং বরদাসুন্দরীও তাঁহাকে মনে মনে অবজ্ঞা করিতেন যেহেতু তিনি সামান্য ইস্কুলমাষ্টার মাত্র। গোরার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া পানুবাবু, তর্কে এবং প্রভাবে, সুচরিতার মন এবং পরেশবাবুর সংসার হইতে স্বাধিকারচ্যুত মনে করিয়া নিজেকে আরও খেলো করিয়া তুলিলেন। কিন্তু শেষ অবধি তাঁহার এই ধারণা রহিয়া গেল যে তিনিই ব্রাহ্মসমাজের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার "ন্যায়াগ্নিদীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে ভীরুতা কম্পিত হয়, কপটতা ভস্মীভূত হইয়া যায়—তাঁহার এই তেজোময় আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ব্রাহ্মসমাজের একটি মূল্যবান্ সম্পত্তি।"

বরদাসুন্দরীর ভূমিকা অতি অল্প কথায় পরিষ্কারভাবে আঁকা হইয়াছে। শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবেশের বাহিরে বড় হইয়া পরে শিক্ষিত এবং উন্নত সমাজের সঙ্গে তাল রাখিতে গেলে চিত্তের উদারতা এবং ব্যাপক সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন। বরদাসুন্দরীর তাহার একান্ত অভাব ছিল। "বড় বয়স পর্য্যন্ত পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত কাটাইয়া হঠাৎ এক সময় হইতে আধুনিক কালের সঙ্গে সমান বেগে চলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; সেই জন্যই তাঁহার সিল্কের সাড়ি বেশী খস্‌খস্ এবং উঁচু গোড়ালির জুতা বেশী খট্‌খট্ শব্দ করে। পৃথিবীতে কোন্ জিনিসটা ব্রাহ্ম এবং কোন্‌টা অব্রাহ্ম তাহারই ভেদ লইয়া তিনি সর্ব্বদাই অত্যন্ত সতর্ক হইয়া থাকেন। সেইজন্যই রাধারাণীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি সুচরিতা রাখিয়াছেন। …মেয়েদের পায়ে মোজা দেওয়াকে এবং টুপি পরিয়া বাহিরে যাওয়াকে তিনি এমনভাবে দেখেন যেন তাহাও ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মমতের একটা অঙ্গ।" পরেশ-বাবুর উদার জীবনের শিক্ষা বরদাসুন্দরীকে এড়াইয়া গিয়াছে। পাড়াগেঁয়ে মেয়ের অনুদারতা তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। যতদিন সুচরিতা কৃপা-

পাত্রী ছিল ততদিন তাহার উপর বরদাসুন্দরী প্রসন্ন ছিলেন, কিন্তু যখন হইতে সে বিদ্যাবুদ্ধিচরিত্রে সকলের শ্রদ্ধা ও স্নেহ আকর্ষণ করিতে লাগিল তখন হইতে বরদাসুন্দরীর মনে ঈর্ষ্যা জাগিল। শেষে সুচরিতা যখন নিজের বাড়ীতে চলিয়া গেল তখন স্বস্তিবোধ না হইয়া তাঁহার অহঙ্কারে যেন ঘা লাগিল; "সুচরিতা যে তাঁহাদের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আজ নিজের সম্বলের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে এ যেন তাহার একটা অপরাধ।"

পানুবাবু এবং বরদাসুন্দরী যেমন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণতার অতুলনীয় প্রতিনিধি, কৃষ্ণদয়াল এবং হরিমোহিনী তেমনি হিন্দু-ধর্ম্মের মূঢ় অনুষ্ঠানের এবং হিন্দু-ঘরের সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার চরম দৃষ্টান্ত। মানুষ হিসাবে হরিমোহিনী বরদাসুন্দরীর অপেক্ষা কিছু শ্রেষ্ঠ, কেননা তাঁহার স্বার্থপরতা বরদাসুন্দরীর স্বার্থপরতার মত অতটা সঙ্কীর্ণ এবং হৃদয়হীন নয়। তাহা ছাড়া সংসারে ঘা খাইয়া খাইয়া হরিমোহিনীর অন্তরে একটা সাময়িক বৈরাগ্যের এবং একটা বাহ্য ভক্তির ভাব আসিয়াছিল। "তিনি অন্তরে যে অসহ্য দুঃখ পাইয়াছেন বাহিরেও যেন তাহার সহিত ছন্দরক্ষা করিবার জন্য কঠোর আচারের দ্বারা অহরহঃ কষ্ট সৃজন করিয়া চলিতেছিলেন। এইরূপে দুঃখকে নিজের ইচ্ছার দ্বারা বরণ করিয়া তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইয়া তাহাকে বশ করিবার এই সাধনা।" বৈষ্ণবী গল্পের বৈষ্ণবীর সঙ্গে হরিমোহিনীর এইখানে কিছু সাদৃশ্য আছে।

হরিমোহিনীর স্নেহাতুর চিত্ত অবলম্বন হারাইয়া বৈরাগ্যপরায়ণতা এবং ভগবদ্‌ভক্তির কিছু প্রশান্তি লাভ করিয়াছিল। সুচরিতা-সতীশের কাছে আসিয়া তাঁহার স্নেহবুভুক্ষু হৃদয় কতকটা তৃপ্তিলাভ করিল। যতক্ষণ সুচরিতা তাঁহার প্রভাবের বাহিরে ছিল ততক্ষণ তাঁহার স্নেহশীল হৃদয়ের স্বার্থপরতা ঢাকা পড়িয়াছিল। কিন্তু সুচরিতার গৃহে আসিয়া সাংসারিক স্থিরতা লাভ করিয়া তাহাকে আয়ত্তে পাইয়া অন্তরের সুপ্ত স্বার্থপরতা এবং সংস্কারজনিত সঙ্কীর্ণতা প্রকট হইয়া উঠিল। "হরিমোহিনী এখন সুচরিতাকে তাহার পূর্ব্বের সমস্ত পরিবেষ্টন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্ত করিতে চান।" পানুবাবুর সহিত তর্ক ও ঝগড়া করিয়া সুচরিতা যেদিন বলিল যে সে হিন্দু, সে আর তাঁহার সম্মুখে বাহির হইবে না, তখন

হরিমোহিনী লুকাইয়া লুকাইয়া শুনিয়া আশাতীত আনন্দ পাইলেন। সুচরিতা যে এত শীঘ্র হিন্দু-আচারবিচার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে ইহা তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই। এখন এইকথা শুনিয়া তাঁহার স্বার্থপরচিত্ত আরও লোভাতুর হইল। "হরিমোহিনী তৎক্ষণাৎ তাঁহার পূজাগৃহে গিয়া মেঝের উপরে সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া তাঁহার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং আজ হইতে ভোগ আরও বাড়াইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এতদিন তাঁহার পূজা শোকের সান্ত্বনারূপে শান্তভাবে ছিল, আজ তাহা স্বার্থের সাধন রূপ ধরিতেই উগ্র, উত্তপ্ত, ক্ষুধাতুর হইয়া উঠিল।" গোরা অথবা অন্য কাহারো সহিত বিবাহ হইলে সুচরিতা তাঁহার একেবারে হাতছাড়া হইয়া যাইবে এই ভয়ে তিনি পূর্ব্বেকার সকল অপমান-অত্যাচার ভুলিয়া গিয়া তাঁহার বয়স্থ দ্বিতীয়পক্ষ দেবরের সঙ্গে বিবাহ দেওয়াইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। "পরেশবাবুর বাড়ীতে সর্ব্বদাই অপরাধভীরুর মত যে হরিমোহিনী ছিলেন, যিনি কোন মানুষকে ঈষৎমাত্র অনুকূল বোধ করিলেই একান্ত আগ্রহের সহিত অবলম্বন করিয়া ধরিতেন সে হরিমোহিনী কোথায়?... পূর্ব্বে সমস্ত সংসারকে শূন্য দেখিয়া যে দেবতাকে ব্যাকুলচিত্তে আশ্রয় করিয়াছিলেন সেই দেবপূজাতেও তাঁহার চিত্ত স্থির হইতেছে না। একদিন তিনি ঘোরতর সংসারী ছিলেন—নিদারুণ শোকে যখন তাঁহার বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল তখন মনেও করিতে পারেন নাই যে আবার কোনোদিন তাঁহার টাকাকড়ি ঘরবাড়ি আত্মীয়-পরিজনের প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি ফিরিয়া আসিবে—কিন্তু আজ হৃদয়-ক্ষতের একটু আরোগ্য হইতেই সংসার পুনরায় তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার মনকে টানাটানি করিতে আরম্ভ করিয়াছে—আবার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা তাহার অনেকদিনের ক্ষুধা লইয়া পূর্ব্বের মতই জাগিয়া উঠিতেছে—যাহা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন সেইদিকে পুনর্ব্বার ফিরিবার বেগ এমনি উগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, সংসারে যখন ছিলেন তখনো তাঁহাকে এত চঞ্চল করিতে পারে নাই!"

রবীন্দ্রনাথের মনের কোণে হিন্দুসমাজের প্রতি যে একটু বিশেষ টান ছিল তাহা বোঝা যায় কৃষ্ণদয়ালের ও মহিমের ভূমিকা হইতে। এই দুইটি নিতান্ত অবান্তর

ভূমিকা শুধু সহৃদয়তা স্পর্শেই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এই হিউমার পানুবাবুর ও বরদাসুন্দরীর চরিত্রচিত্রণে দেখি না।

প্রথম জীবনে পশ্চিমে থাকিতে কৃষ্ণদয়াল "পল্টনের গোরাদের সঙ্গে মিশিয়া মদ-মাংস খাইয়া একাকার করিয়া দিয়াছেন। তখন দেশের পূজারি পুরোহিত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শ্রেণীর লোকদিগকে গায়ে পড়িয়া অপমান করাকে পৌরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন; এখন না মানেন এমন জিনিস নাই। নূতন সন্ন্যাসী দেখিলেই তাহার কাছে নূতন সাধনার পন্থা শিখিতে বসিয়া যান। মুক্তির নিগূঢ় পথ এবং যোগের নিগূঢ় প্রণালীর জন্য ইহার লুব্ধতার অবধি নাই।"

স্ত্রীর অঞ্চলছায়াশ্রয়ী দশটা-পাঁচটা-আপিস-পরায়ণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের টাইপ হইতেছে মহিম। বাহিরে আপিসের এবং ঘরের স্ত্রীর তাড়া খাইতে খাইতে তাঁতের মাকুর মত তাহার দিনগুলি জীবনের সুতা বয়ন করিয়া চলিয়াছে। মহিমের স্বভাব কোমল। আনন্দময়ীর প্রতি মহিমের মনোভাব যেমনই হউক "গোরার প্রতি তাহার একপ্রকার স্নেহ ছিল।" গোরা হাজতে গেলে মহিম তাহাকে খালাস করিবার জন্য উকীল-খরচা দিয়া লোক পাঠাইয়া "আপিসে গিয়া সাহেবের কাছে ছুটি যদি পান এবং বৌ যদি সম্মতি দেন তবে নিজেও সেখানে যাইবেন" স্থির করিয়াছিল।

মহিমের বড় দুঃখ যে কৃষ্ণদয়াল সংসার সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হইলেও টাকার বেলা সজাগ। সাধুসন্ন্যাসীর জন্য তাঁহার খরচে আটকায় না, কিন্তু ছেলের প্রতি কৃপণ; "যারা গৃহস্থ, যাদের টাকা দরকার সব চেয়ে বেশী, বাবার টাকা তাদের ভোগে আসবে না এটা তুমি নিশ্চয় জেনো! আমার মুস্কিল হয়েছে এই যে, অন্যের বাবা কষে টাকা তলব করে, আর নিজের বাবা টাকা দেবার কথা শুনলেই প্রাণায়াম করতে বসে যায়।" তবুও সন্ন্যাসীদের প্রসন্নতা লাভ করিলে যদি পিতা-তহবিলের গ্রন্থি কথঞ্চিৎ শিথিল হয় এই আশায় তত্ত্বালোচনায় যোগ দিতে সে সাধ্যমত ত্রুটি করে নাই।

২

রবীন্দ্রনাথের বড়-গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে মিল দেখা যায় জোড়া জোড়া, পরস্পর দুইটিতে। যেমন, 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'; 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালি'; 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'। 'চতুরঙ্গ'-ও[১] তেমনি অব্যবহিত পরবর্ত্তী উপন্যাস ঘরে-বাইরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সবুজপত্রে প্রকাশিত চতুরঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী গল্পগুলির সঙ্গেও সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

চতুরঙ্গের গঠনরীতি সাধারণ উপন্যাসের মত নয়। বইটির চারিটি "অঙ্গ" বা ভাগ—'জ্যাঠামশায়,' 'শচীশ,' 'দামিনী,' ও 'শ্রীবিলাস'—যেন চারিটি স্বতন্ত্র কাহিনী। এগুলি স্বতন্ত্র গল্পরূপেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চারিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পের মধ্য দিয়া একই কাহিনী পরিণতির দিকে আগাইয়া গিয়াছে। চতুরঙ্গ আকারে বড় নয়, অবান্তর আখ্যানের অথবা পাত্রপাত্রীর ভিড়ও নাই, সুতরাং প্রকারে ইহা বড়-গল্পই। কিন্তু বর্ণনার চাল বড়-গল্পের অপেক্ষা ধীরতর। সে হিসাবে ইহাকে উপন্যাস বলিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাধারণ পাঠকের পক্ষে কঠিন এবং দুর্বোধ্য, কেননা যে-পরিমাণ রসবোধ এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং আত্মবিশ্লেষণ থাকিলে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির প্রকৃত আস্বাদন লওয়া যাইতে পারে তাহা শিক্ষিত পাঠকের মধ্যেও সুলভ নয়। এই-হিসাবে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে চতুরঙ্গ সবচেয়ে কঠিন। ইহাতে তিনি অধ্যাত্মসাধনার উচ্চস্তরের কথা যতটা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন তেমনভাবে ভারতীয় সাহিত্যে আর কোথাও বলা হয় নাই। আমাদের দেশে "সহজ"-সাধনা বা রসসাধনার সাহায্যে বাউল-বৈষ্ণব সাধকগণ উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সাধনার মধ্যে একটা বড় গলদ ছিল যাহা সিদ্ধ বা উচ্চতর সাধকদের হয়ত কোন ক্ষতি করিত না কিন্তু প্রবর্ত্ত বা নিম্নতর সাধকেরা তাহাতে আটক পড়িয়া গিয়া দিশা হারাইত। রসসাধনার এই রসাল দিকটার বিপদ যে কত গভীর তাহা রবীন্দ্রনাথ চতুরঙ্গে দেখাইয়াছেন। সমসাময়িক গল্প বোষ্টমীতে রসসাধনার স্বাত্মানন্দ বা উচ্চতর

[১] প্রথমপ্রকাশ সবুজপত্র অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩২১, পুস্তকাকারে ১৩২৩ সালে।

দিকের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। চতুরঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে আমাদের দেশের লোক-দেখানো স্বার্থপর হৃদয়হীন জনসেবার হীনতা চিত্রিত হইয়াছে।

"সব প্রেম প্রেম নয়", অর্থাৎ সব প্রেম জীবনে চরিতার্থতা আনিয়া দিতে পারে না। এক প্রেম হইতেছে তাহার ধ্যানের ধন, অন্তরের গুরু—"গুরু যে তার মনের ব্যথা ঝরায় দুনয়ন;" আর-এক প্রেম হইতেছে তাহার সাধনার দেবতা, দেহের প্রাণ। এই দুই প্রেমের দুর্নিবার দোটানায় পড়িয়া নারীহৃদয়ের বেদনাপূর্ণ দ্বন্দ্ব 'শেষের কবিতা' হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল পরবর্ত্তী উপন্যাস-গল্পেরই মুখ্য অথবা গৌণ সমস্যা। এই সমস্যা সর্ব্বপ্রথম চতুরঙ্গে উপস্থাপিত হইয়াছে। চতুরঙ্গে সমস্যাটি যতটা সূক্ষ্ম এবং নিপুণ পরবর্ত্তী গল্প-উপন্যাসে ততটা নয়, সেখানে ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বত্র নিজেকে ঢাকিয়া রাখিতে পারেন নাই। এইজন্য চতুরঙ্গের শিল্পসৌন্দর্য্য যাঁহাদের চোখ এড়াইয়া গিয়াছে তাঁহারা শেষের-কবিতার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকে যেন বাসরঘরের চৌকাঠ অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া পাঠকের কাছে বিদায় গ্রহণ করেন, পূর্ব্বরাগেই যেন তাঁহার নায়ক-নায়িকার প্রেমের পরিসমাপ্তি। শুধু চতুরঙ্গে—'শ্রীবিলাস' অংশে—বিবাহের পরবর্ত্তী দাম্পত্য প্রেমের আভাস-চিত্র পাই। কিন্তু শ্রীবিলাস-দামিনীর সংসার দুই বৎসরও টিকে নাই, পূর্ব্বরাগ-অনুরাগের ঘোর কাটিয়া যাইবার পূর্ব্বেই ইহলোকের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

চতুরঙ্গের প্রথম অঙ্গ 'জ্যাঠামশায়' সর্ব্বাধিক স্বয়ংসম্পূর্ণ। শচীশের জ্যাঠামশায় জগমোহনের ভূমিকা এইখানেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কেবল শচীশের মধ্যে তাঁহার শিক্ষা এবং প্রভাব শেষ অবধি কাজ করিতে থাকে। জগমোহন রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি; সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী কোন কোন গল্পে এই-ধরণের ভূমিকা দেখা গেলেও কোনটি এমন সুস্পষ্ট নয়। "জগমোহন শচীশের জ্যাঠা। তিনি তখনকার কালের নামজাদা নাস্তিক। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়—তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন।" "কারো কাছে তিনি লেশমাত্র সুবিধা প্রত্যাশা করেন এমন সন্দেহমাত্র পাছে কারো মনে আসে এই

ভয়ে ক্ষমতাশালী লোকদিগকে তিনি দূরে রাখিয়া চলিতেন। তিনি যে দেবতা মানিতেন না তা'র মধ্যেও তাঁর ঐ ভাবটা ছিল। লৌকিক অলৌকিক কোনো শক্তির কাছে তিনি হাত জোড় করিতে নারাজ।" "জগমোহনের নাস্তিক ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা", তাহার মধ্যে নিজেব লোকসান ছাড়া আর কিছুই লাভ দেখা যাইত না। জগমোহন "শচীশকে বলিতেন, দেখ্ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল হইতে হইবে। আমবা কিছুকে মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশ।" "পৃথিবীতে পুণ্যের উপরে জ্যাঠামশায়ের রাগ ছিল; তিনি বৈষয়িকতার চেয়ে এটাকে অনেক বেশী নোংরা বলিয়া ভাবিতেন।" ছোট ভাই হবিমোহন যখন আদালতে বড় ভাইকে বিধর্ম্মী ও আচারভ্রষ্ট প্রমাণ করিয়া পৈতৃক দেবত্র-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিল তখন আইনজ্ঞদের ভরসা সত্ত্বেও জগমোহন হাইকোর্টে আপিল করিতে রাজি হইলেন না। বলিলেন, "যে ঠাকুরকে আমি মানি না তাহাকেও আমি ফাঁকি দিতে পারিব না। দেবতা মানিবার মত বুদ্ধি যাহাদের, দেবতাকে বঞ্চনা কবিবাব মত ধর্ম্মবুদ্ধিও তাহাদেরই।" মনের জোর জগমোহনের ছিল অসাধারণ। বাড়ী ভাগ হইবার পর শচীশ স্বভাবতই তাহার ভাগে পড়িয়াছিল, কিন্তু যখন তাঁহার কানে গেল যে হরিমোহন বলিয়া বেড়াইতেছে যে শচীশকে হাতে রাখিয়া প্রকারান্তরে জগমোহন হরিমোহনের কাছে আর্থিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টায় আছেন তখন তিনি চমকাইয়া উঠিলেন, "শচীশকে বলিলেন, গুড্‌বাই শচীশ! শচীশ বুঝিল, যে বেদনা হইতে জগমোহন এই বিদায়বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাঁ'র উপরে আর কথা চলিবে না।" ঠাকুরদেবতায় ও ধ্যানধারণায় জগমোহনের যতই নাস্তিক্যবুদ্ধি থাক জীবন্ত নরদেবতায় ও তাহার সেবায় পরিপূর্ণ আস্তিক্যবুদ্ধি লইয়াই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শচীশের স্নেহ তাঁহার হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইয়াছিল। মানবদেবতার সেবা যে তিনি শুধু কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে করিতেন তাহা নয়, তাঁহার হৃদয়রস এই সেবার মধ্য দিয়াই উপচিত হইত। জগমোহনের শুষ্ক পাণ্ডিত্য এবং দুর্দ্ধর্ষ একগুঁয়েমির অন্তরালে যে-মানুষটি বাস করিত তাহার করুণকোমল হৃদয় সমবেদনার সুধাধারায় পূর্ণ হইয়াছিল।

মানুষের লাঞ্ছনা বেদনা দেখিলেই তাহা উৎসরিত হইয়া উঠিত। "জগমোহনের চোখে সহজে জল আসে না—তাঁর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি শচীশকে বলিলেন, শচীশ, এই মেয়েটি আজ যে লজ্জা বহন করিতেছে, সে যে আমার লজ্জা, তোমার লজ্জা। আহা, ওর উপরে এত বড় লজ্জা কে চাপাইল ?" জগমোহন আজ ননীবালাকে যতখানি স্নেহমর্য্যাদা দিলেন ততখানি সে আর কাহারো কাছে পায় নাই, এমন কি তাঁহার মা থাকিতে তাঁহার কাছেও নয়। "কেননা মা ত তা'কে মেয়ে বলিয়া দেখিত না, বিধবা মেয়ে বলিয়া দেখিত—সেই সম্বন্ধের পথে যে আশঙ্কার ছোট ছোট কাঁটায় ভরা ছিল।"

হরিমোহন জগমোহনের সম্পূর্ণ বিপরীত। হালদার-গোষ্ঠী গল্পের নীলমণির সঙ্গে হরিমোহনের সাধর্ম্ম্য আছে। জগমোহন-হরিমোহনের বৈপরীত্যের পূর্ব্বাভাস যেন বনোয়ারি-নীলমণির সম্পর্কের মধ্যে দেখা যায়। ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদাসের প্রতি বনোয়ারির স্নেহই যেন শচীশের প্রতি জগমোহনের স্নেহে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

জগমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শচীশ চতুরঙ্গের কেন্দ্রীয় ভূমিকা। দেহে মনে আচরণে সে অসাধারণ মানুষ; শচীশের অসাধারণত্ব গোরাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। শচীশ-ভূমিকার পরিকল্পনায় বাস্তব ব্যক্তির ছায়া আছে বলিয়া মনে হয়। "শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তা'র চোখ জ্বলিতেছে, তা'র সরু সরু লম্বা আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রং যেন রং নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তা'র অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম"। শচীশের হৃদয় গভীর, আচরণ উচ্ছ্বাসবিহীন, দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। —"তা'র চোখ যারা দেখে নাই তা'রা বুঝিবে না এই দৃষ্টি যে কি।" সংসারের নিন্দা গ্লানি কলুষতা তাহার শিশু-চিত্তকে অমলিন রাখিয়াছিল। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়তায় কেহ তাহাকে হটাইতে পারিত না। "জ্যাঠামশায়কে শচীশ যে কতখানি ভালবাসিত আমরা তা কল্পনা করিতে পারি না। তিনি শচীশের বাপ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন, আবার ছেলেও ছিলেন বলিতে পারা যায়; কেননা নিজের সম্বন্ধে তিনি এমন ভোলা এবং সংসার সম্বন্ধে এমন অবুঝ ছিলেন

যে তাকে সকল মুস্কিল হইতে বাঁচাইয়া চলা শচীশের এক প্রধান কাজ ছিল। এমনি করিয়া জ্যাঠামশায়ের ভিতর দিয়াই শচীশ আপনার যাহা কিছু পাইয়াছে এবং তার মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা কিছু দিয়াছে।" জগমোহনের মৃত্যুতে শচীশের কাছে জগৎ নিরর্থক হইয়া গেল ; নিজের লেখাপড়া, মানবের সেবা, কোন কাজেই তাহার মন বসিল না। "এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিলে তা'র আলো যেমন হঠাৎ চলিয়া যায় জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ তেমনি করিয়া কোথায় যে গেল জানিতেই পারিলাম না।"

জগমোহনের কাছে শচীশের যে মন্ত্রশিক্ষা হইয়াছিল তাহা শূন্য নাস্তিকতা নয়। তাহা একটা স্নেহপ্রীতির সুদৃঢ় আস্তিক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই জগমোহনের মৃত্যুতে সেই বুদ্ধির ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িলে তাহার অন্তরে যে নিঃসীম গহ্বর হাহা করিয়া উঠিল তাহা সে বৈষ্ণবসাধনার রসতত্ত্বের নেশা দিয়া ভরাইতে চেষ্টা করিল। মুক্ত আকাশের বিহঙ্গ লীলানন্দ-স্বামীর দলের ছেলেখেলার খাঁচায় ধরা দিল। যে-শচীশ কখনো জ্যাঠামশায়কেও প্রণাম করে নাই সেই শচীশকে গুরুর পা টিপিতে এবং তামাক সাজিতে দেখিয়া অবাক হইয়া শ্রীবিলাস যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "শচীশ, জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কি বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে? জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু কি এত বড় মৃত্যু?" তখন শচীশ উত্তর করিয়াছিল, "বিশ্রী, জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায় ; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে মুক্তি ত ভোগ করিয়াছি। এখন রাতের বেলাকার এ মুক্তিই বা ছাড়ি কেন? এ দুটো ব্যাপারই সেই আমার এক জ্যাঠামশায়েরই কাণ্ড এ তুমি নিশ্চয় জানিয়ো।"

কিন্তু রসসাধনায় একটা বড় মাদকতা আছে। শুধু আইডিয়ার নেশায় ভোর হইয়া সর্ব্বক্ষণ থাকা চলে না, যখনি মাটিতে পা পড়ে তখনি সেই নেশার ঘোর দুর্দ্দমনীয় বেগে দেহের দিকে টানে—রূপকের ধ্যান হইতে নামিয়া সে বাস্তবতার

মধ্যে চরিতার্থতা খুঁজিতে চায়। কলিকাতায় আসিয়া দামিনীর সংস্পর্শ শচীশের রসধ্যান ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত করিয়া তুলিল। দামিনী বিধবা হইলেও তরুণী, প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরপুর, সে জীবনরসের রসিক। ননীবালাও ছিল বিধবা এবং তরুণী, কিন্তু সে মরণরসের রসিক ; জীবনে তাহার আশা করিবার কিছুই ছিল না, তাই সে "মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর" করিয়া দিয়া গেল। ননীবালার প্রেম ত্যাগ করিতে জানে, দামিনীর প্রেম আদায় করিতে তৎপর। দামিনীর দুর্দ্দমনীয় প্রেম যখন শচীশকে লক্ষ্য করিয়া উচ্ছ্বসিত তখনো তাহা শচীশকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার সেবামাধুর্য্যে সে মুগ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বেশি নয়। "এমনি করিয়া দামিনী যখন স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিয়াছে শচীশ তা'র শোভা দেখিতে লাগিল। কিন্তু আমি বলিতেছি শচীশ কেবল শোভাই দেখিল দামিনীকে দেখিল না।" শচীশ-দামিনীর এই বিষম-সম্বন্ধে, প্রথম সঙ্কট আসিল পশ্চিমসমুদ্র উপকূল-গুহায় নিশীথের গভীর অন্ধকারে। তন্দ্রাচ্ছন্ন শচীশ লাথি মারিয়া সেই নরম বীভৎস "ক্ষুধার পুঞ্জ" যাহা তাহার "পায়ের উপর একরাশি কেশর" ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাকে দূর করিয়া দিল।

দামিনীর যে ক্ষুধাকে শচীশ লাথি মারিয়া দূর করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, সেই ক্ষুধাই এখন তাহাকে পাইয়া বসিল। অভিমানিনী দামিনী আর গুরুসেবার উপলক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বের মত ধরাছোঁয়া দিল না। সে শ্রীবিলাসকে আড়াল করিয়া শচীশকে লইয়া যেন খেলাইতে লাগিল। শচীশ সম্পূর্ণ আত্মস্থ না হইলেও ধাতস্থ আছে, তথাপি মন হয় চঞ্চল। শচীশ জানে এসব প্রকৃতির মায়ার খেলা, তাই মায়ার ফাঁদ এড়াইবার জন্য সে দ্বিগুণ-উৎসাহে গুরুর পা-টিপিতে শুরু করিয়া দিল। কিন্তু গুরু কি করিবেন। তিনি শচীশ-দামিনীকে "যে রসের স্বর্গলোকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন আজ মাটির পৃথিবী তাহাকে ভাঙিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিল। এতদিন তিনি রূপকের পাত্রে ভাবের মদ কেবলি তাহাদিগকে ভরিয়া ভরিয়া পান করাইয়াছেন, এখন রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকি হইয়া পাত্রটা মাটির উপরে কাৎ হইয়া পড়িবার জো হইয়াছে।" আসন্ন বিপদের লক্ষণ গুরুর অগোচর রহিল না। তিনি দামিনীকে ছাড়িতে পারেন কিন্তু শচীশকে

পারেন না ; শচীশ এবং শ্রীবিলাস ছিল "গুরুজির দলের দুই প্রধান বাহন, ঐরাবত এবং উচ্চৈঃশ্রবা বলিলেই হয়"। কিন্তু শচীশ চাহিলে এবং গুরু বলিলেই বা দামিনী ছাড়িবে কেন। তাহার স্বামী-যে বিষয়সম্পত্তি সমেত স্ত্রীর ভার গুরুকে দান করিয়া গিয়াছে এ অপমান সে ভুলিতে পারে নাই। শচীশের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহার শরীর-মন যেন চষিয়া ফেলিল ; সে বুঝিল দামিনীর কাছ হইতে পলাইয়া গেলে বা দামিনী দূরে দূরে রহিলেও তাহার স্বস্তি নাই। দামিনীর কাছে কাছে থাকিয়াই সে মনের সঙ্গে লড়াই করিতে প্রস্তুত হইল। শচীশ ভাবিয়াছিল বিদ্রোহিণী দামিনীর আকর্ষণ বুঝি বা সেবানম্র গুরুশুশ্রূষু দামিনী কাটাইয়া দিবে। কিন্তু সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা কিছুই হইল না। "আর একবার দামিনী যখন এমনি করিয়াই নত হইয়াছিল তখন শচীশ তা'র মধ্যে কেবল মাধুর্য্যকেই দেখিয়াছিল, মধুরকে দেখে নাই। এবার স্বয়ং দামিনী তা'র কাছে, এমনি সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে গানের পদ, তত্ত্বের উপদেশ সমস্তকে ঠেলিয়া সে দেখা দেয়। কিছুতেই তা'কে চাপা দেওয়া চলে না।"

বৃহত্তর জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া লীলানন্দ-স্বামীর আওতায় যখন শচীশ "কল্পনার খোলা ভাঁটিতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের, অতীতের ও বর্ত্তমানের সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একত্র চোলাইয়া একটা অপূর্ব্ব আরক বানাইতেছিল," তখন একদিন সত্যকার জীবনের নিষ্ঠুর আঘাতে রসের পাত্র ভাঙিয়া গিয়া উলঙ্গ কামনার তলানি বাহির হইয়া পড়িল,—লীলানন্দ-স্বামীর কীর্ত্তনদলের গায়ক নবীনের স্ত্রী স্বামীর দুশ্চরিত্রতায় নিজের কর্ত্তব্য সমাধান করিয়া দিয়া আত্মহত্যা করিল। এই ঘটনায় দামিনীর সত্যদৃষ্টিলাভ হইল এবং তাহাতে আসন্ন দ্বিতীয় ক্রাইসিসের আর সম্ভাবনা রহিল না। রসের উল্টা পিঠ কাম, সেই কামলালসার ইন্ধনে আত্মত্যাগ শচীশ দেখিয়াছে—ননীবালায়। এখন দামিনী তাহারি আর একপিঠ দেখিল—নবীনের স্ত্রীতে। দামিনীর বিপদ শচীশের কাছ হইতে যতটা নিজের কাছ হইতে আরো বেশি। তাহার পতনের চেয়ে শচীশের পতন হইবে অধিকতর ক্ষোভের। তাই সে শচীশকে হাত-জোড় করিয়া বলিল, "আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে ত সে তুমি।...তুমিই আমার

গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিষ—যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইও না।" দামিনীর কথায় শচীশের রসের ঘোর কাটিয়া গেল। লীলানন্দ-স্বামীর দলও ভাঙ্গিয়া গেল, অন্তত শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের সম্পর্কে।

"আবার একদিন কানাকানি এবং কাগজে কাগজে গালাগালি চলিল যে, ফের শচীশের মতের বদল হইয়াছে। একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত, না মানিত ধর্ম্ম; তা'র পরে আর একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁওয়া স্নান-তর্পণ যোগযাগ দেবদেবী কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না; তা'র পরে আর একদিন এই সমস্তই মানিয়া-লওয়ার ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল—কি মানিল আর কি না মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল আগেকার মত আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়া বিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই।"

শ্রীবিলাস ও দামিনী শচীশকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিতে গেল। শচীশ তখন আত্মার সত্য-আশ্রয়ের জন্য নিজের অন্তরের মধ্যেই যেন হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে; সে তখন কলিকাতায় ফিরিতে রাজি হইল না, বলিল "একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম, সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর-একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম, সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজে দাঁড়ানো চলে না। একটা আশ্রয় না পাইলে আমি সহরে ফিরিতে সাহস করি না।"

দামিনীর নারীপ্রকৃতি ও প্রেম শচীশের দেহের দুর্দ্দশা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল; সে তাহাকে ফেলিয়া যাইতে চাহিল না। অগত্যা শ্রীবিলাস একটা পোড়ো ভুতুড়ে বাড়ীতে শচীশ-দামিনীকে লইয়া উঠিল। শচীশের আত্মার ব্যাকুলতা যেন তাহার দেহ ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার "শরীরটা প্রতিদিনই যেন অতি-শান-দেওয়া ছুরির মত সূক্ষ্ম হইয়া আসিতে লাগিল।" "আর ভাব-

সম্ভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।" দামিনীর সেবা সে লইতে পারে না, এবং ফিরাইয়া দিলেও দামিনী ব্যথা পায়,—ইহাতে শচীশের মন উচ্চাটিত হইতে লাগিল। প্রেমের বন্ধন এখন সেবার বন্ধনে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া শচীশ এই বন্ধনও কাটাইতে চায়, তাহা না হইলে সে চরম সত্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। শচীশ ভাবে, "যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উল্টা মুখে চলিলে তবেই ত মিলন হইবে?··· তিনি রূপ ভালবাসেন তাই কেবলি রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা ত শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বদ্ধ সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। একথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।"

একদিন রাত্রিতে বৃষ্টির ঝাঁট আসিতেছে বলিয়া জানালা বন্ধ করিতে দামিনী শচীশের ঘরে ঢুকিয়াছিল; "শচীশ মুহূর্ত্তকালের জন্য যেন দ্বিধা করিয়া তা'র পরে বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।" দামিনীর প্রেমভক্তির সেবা শচীশকে মাটির দিকে টানিতেছে; তাই যখন ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া দামিনী তাহার লাগ পাইল তখন তাহার ব্যগ্রতায় সে ঘরে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু "ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল—যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড় দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া কর, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।"

বোষ্টমীও ঠিক এই কথাই বলিয়াছিল একটু অন্যভাবে,—"পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে ভালোবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্য খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।"

"দামিনী যেন শ্রাবণ-মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্-মিক্ করিয়া উঠিতেছে।" বিবাহের পর

হইতেই তাহার স্বামী শিবতোষ লীলানন্দ-স্বামীর কাছে মন্ত্র লইয়া জীবন্মুক্তির প্রত্যাশায় "কাঞ্চন এবং অন্যান্য রমণীয় পদার্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে বসিল।" তাই স্বামীর সহিত দামিনীর কিছুমাত্র অন্তরঙ্গতা ঘটে নাই। উপরন্তু তাহার গহনাগুলি গুরুসেবায় দান করায় এবং তাহার কাছ হইতে জোর করিয়া গুরুভক্তি আদানের চেষ্টা করায় দামিনীর মন স্বামীর প্রতি একান্ত বিমুখ হইয়াছিল। "যে সময় দামিনীর বাপ এবং তা'র ছোট ছোট ভাইরা উপবাসে মরিতেছে সেই সময়ে বাড়িতে ষাট-সত্তরজন ভক্তের সেবার অন্ন তা'কে নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া তরকারিতে সে নুন দেয় নাই, ইচ্ছা করিয়া দুধ ধরাইয়া দিয়াছে তবু তা'র তপস্যা এম্‌নি করিয়া চলিতে লাগিল। এমন সময় তা'র স্বামী মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল। সমস্ত সম্পত্তি-সমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করিল।"

গুরু যতই তাহাকে স্নেহ-অনুগ্রহ করিতে থাকে দামিনীর বিদ্রোহ ততই উগ্রতর হয়। গুরুর ক্ষমা তাহার কাছে শাসনের অপেক্ষাও অসহ্য। তাহার পর শচীশের আগমন হইতে কখন-যে অজ্ঞাতসারে দামিনীর ভাব-পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল তাহা কেহই লক্ষ্য করিল না। শচীশের উপস্থিতিতে গুরুর সান্নিধ্য তাহার একান্ত কাম্য হইয়া উঠিল। "দামিনীর সেবা এখন এমন সহজে এমন সুন্দর হইয়া উঠিল যে, তা'র মাধুর্য্যে ভক্তদের সাধনার উপরে ভক্তবৎসলের যেন বিশেষ একটি বর আসিয়া পৌঁছিল।" তবে দামিনীর মনোভাব বেশিদিন শচীশের অজ্ঞাত রহিল না।

গুহায় তন্দ্রাচ্ছন্ন শচীশের নিষ্ঠুর পদাঘাত দামিনীর বুকে বড়ই বাজিল। শচীশের উপর দারুণ অভিমান করিয়া সে গুরুসেবা এবং ভক্তসঙ্গ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া পূর্ব্বের ভাবে ফিরিয়া গেল। নূতনের মধ্যে এই, শ্রীবিলাসকে সে টানিয়া লইল অন্তরঙ্গ করিয়া। "দামিনী গুরুজির কাছে ঘেঁসে না তার প্রতি তাঁর একটা অনুরাগ আছে বলিয়া, দামিনী শচীশকে কেবলি এড়াইয়া চলে তাঁর প্রতি তা'র মনের ভাব ঠিক উল্টা রকমের বলিয়া। কাছাকাছি আমিই একমাত্র মানুষ যাকে লইয়া রাগ বা অনুরাগের কোনো বালাই নাই।" এদিকে লাথি মারিবার পর হইতে শচীশের মনে আগুন ধরিয়াছে। এ আগুন শান্ত করিল দামিনীই, তাহাকে গুরু

বলিয়া স্বীকার করিয়া। নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যা তাহাকে দেখাইয়া দিয়াছে আগুন লইয়া খেলার বিপদ। দামিনীর কথা স্বীকার করিয়া শচীশ মনে মনে তাহাকে ত্যাগ করিল। কিন্তু শচীশের প্রতি প্রেম দামিনীর তো শুধু মনের আগুন নয়, ইহা তাহার সমস্ত নারীপ্রকৃতিকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। শচীশের শরীরের অনাদর বাৎসল্যপূর্ণ নারীহৃদয় সহিবে কি করিয়া। তাই সে শচীশের পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল আগলাইবার জন্য। প্রেমের বন্ধন একতরফা নয়, পরস্পর পরস্পরকে বাঁধে। শচীশ তাহার দিকের বন্ধন কাটিয়া দিয়াছে দামিনীর প্রার্থনায়, এখন শচীশের প্রার্থনায় দামিনী নিজের দিকের বাঁধন ছাড়িয়া দিল। এতক্ষণে শচীশ যথার্থ মুক্তি পাইল।

শচীশের প্রতি দামিনীর প্রেমের মধ্যে কতকটা ছিল ভক্তি বাকিটা মোহ। শচীশের মানবত্বটুকু তাহার কাছে একবারেই প্রকাশ পায় নাই। শচীশ ছিল তাহার কাছে একটা বৃহৎ আইডিয়ার বা ধ্যানধারণার মত, উপাস্যদেবতার মত। এমন প্রেমে নারীর চরিতার্থতা নাই। শচীশের জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডলে দামিনীর চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছিল, তাই শ্রীবিলাস সহজে তাহার চোখে পড়ে নাই। কিন্তু শ্রীবিলাসের সাহচর্য্য, তাহার মুগ্ধ হৃদয়ের গোপন পূজা দামিনীর নারীপ্রকৃতির উপরে যে কাঠিন্যের আস্তরণ পড়িয়াছিল তাহা ঘুচাইতে সাহায্য করিল। চোখের-বালিতে যেমন বিহারীর কথায় ও সহানুভূতিতে বিনোদিনী বাল্যজীবনে ফিরিয়া গিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিল এখানেও তেমনি দামিনী শ্রীবিলাসের সাহচর্য্যে তাহার ছেলেবেলাকার কথা, পাড়াপড়শির কথা, এলোমেলো নানা কথা সহজভাবে কহিয়া গিয়া মনের বোঝা হালকা করিয়া দিত। শ্রীবিলাসের প্রেম দামিনীর সজাগ অনুভূতির গোচরে আসে নাই বটে কিন্তু তাহার অবচেতন নারীচিত্তের কাছে এটুকু অজানা ছিল না যে তাহার কাজ করিয়া দিতে পারিলে শ্রীবিলাস কৃতার্থ হইয়া যায়। "সে একরকম করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল যে দাবী করাই আমার প্রতি সবচেয়ে অনুগ্রহ করা। কোনো কোনো গাছ আছে যাদের ডালপালা ছাঁটিয়া দিলেই থাকে ভালো—দামিনীর সম্বন্ধে আমি সেই জাতের মানুষ।" শ্রীবিলাসের প্রতি দামিনীর চিত্ত তাহার অজ্ঞাতসারেই আকৃষ্ট হইয়াছিল।

শচীশের মোহ কাটাইয়া দামিনী দেখিল সে একেবারে নিরাশ্রয়—তাহার কোথাও স্থান নাই। লীলানন্দ-স্বামীর কাছে ফিরিয়া যাওয়া তাহার মরণের অধিক হইবে। এই সঙ্কটে শ্রীবিলাসের ভীরু প্রেম তাঁহাকে আশ্রয় দিল।

আমার মনের ভাব সম্বন্ধে দামিনী কোনো রকম তারে-খবর পায় নাই সে কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু এতদিন সে খবরটা তা'র কাছে দরকারি খবর ছিল না—অন্ততঃ তা'র কোনো রকম জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ছিল। এতদিন পরে একটা জবাবের দাবী উঠিল। দামিনী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আমি যে একটা কিছু, দামিনী এতদিন সেকথা লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই, বোধ করি আর কোনোদিক হইতে তা'র চোখে বেশি একটা আলো পড়িয়াছিল। এবার তা'র সমস্ত জগৎ সঙ্কীর্ণ হইয়া সেইটুকুতে আসিয়া ঠেকিল যেখানে আমিই কেবল্ একা। কাজেই আমাকে সম্পূর্ণ চোখ মেলিয়া দেখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমার ভাগ্য ভালো, তাই ঠিক এই সময়টাতেই দামিনী আমাকে যেন প্রথম দেখিল।

অনেক নদী পর্ব্বতে সমুদ্রতীরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালের ঝড়ে রসের তানে বাতাসে আগুন লাগিয়াছে। "তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি", এই পদের শিখা নূতন নূতন আখরে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে। তবু পর্দ্দা পুড়িয়া যায় নাই।

কিন্তু কলিকাতার এই গলিতে এ কি হইল?

যখন আড়াল থাকে তখন অনন্তকালের ব্যবধান, যখন আড়াল ভাঙে তখন সে এক-নিমেষের পাল্লা। আর দেরী হইল না। দামিনী বলিল, আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম কেবল এই একটা ধাক্কার অপেক্ষা ছিল। আমার সেই-তুমি আর এই-তুমির মাঝখানে ওটা কেবল একটা ঘোর আসিয়াছিল। আমার গুরুকে আমি বারবার প্রণাম করি, তিনি আমার এই ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।

কালকাতার এই সহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশীর তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্ব-শক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।

চতুরঙ্গের চরিত্র চারিটি—জগমোহন, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস; তাহার মধ্যে প্রথমটি যেন শচীশেরই পূর্ব্ব-ভূমিকা। চতুরঙ্গ নামের আরো একটি অর্থ আছে দামিনী এবং শচীশের দিক দিয়া। তাহার স্বামী ভবতোষ, ভবতোষের গুরু লীলানন্দ, এবং লীলানন্দের শিষ্য শচীশ এই তিনজনের কাছে দামিনী দশপঁচিশের খুঁটির মত টানাপোড়েন করিয়া অবশেষে শ্রীবিলাসের কাছে আশ্রয় পাইল। শচীশের চিত্তও রস ও রূপ এবং রূপ ও অরূপের মধ্যে দোদুল্যমান হইয়া অবশেষে মুক্তির নির্দ্দেশ পাইয়াছে।

৩

'ঘরে-বাইরে'[১] রবীন্দ্রনাথের গল্পভঙ্গিতে নূতন ধারা এবং উপন্যাসশৈলীতে নূতন টেকনিকের পত্তন করিল।

'গোরা'-র সঙ্গে ঘরে-বাইরের কিছু সংযোগ আছে। গোরার প্রধান সমস্যা হইতেছে সমাজের এবং সংস্কারের স্থূল বন্ধনের মধ্যে পড়িয়া পীড়িত উদার চিত্তের মুক্তিকামনা—অর্থাৎ এমন এক বৃহত্তর সমাজক্ষেত্রের পরিকল্পনা যেখানে ভারতবর্ষীয় মানব বহুবিচিত্র ধর্ম্মমত ও সংস্কার লইয়া পরস্পর মিলিত হইয়া ভারতীয় আদর্শ উপলব্ধি করিতে পারে। গোরার এই সমস্যা ঘরে-বাইরের সমস্যার তুলনায় কতকটা theoretical বা কাল্পনিক। আমাদের বাঙ্গালাদেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে "জাতীয়" উন্মাদনার মত্ততা স্থিরতর দৃষ্টি এবং ধ্রুবতর কল্যাণবুদ্ধিকে উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহারি শান্তগভীর বিশ্লেষণ ঘরে-বাইরের একটি প্রধান উপপাদ্য। বাঙ্গালাদেশের এই বিক্ষোভ অনেককাল পরে—ঘরে-বাইরে লিখিবার পাঁচ

১ প্রথমপ্রকাশ সবুজপত্র ১৩২২, পুস্তকাকারে ১৯১৬।

ছয় বৎসর পরে—একটু পরিবর্ত্তিতভাবে, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রবলতম রাষ্ট্রীয় বা "জাতীয়" আন্দোলনে পুনরাবির্ভূত হইয়াছিল। গোরায় যাহার অস্পষ্ট আভাস, ঘরে-বাইরের সেই আসন্ন নন্-কোঅপারেশন আন্দোলনেরই ভবিষ্যৎ-কথা ও ফলশ্রুতি। ঘরে-বাইরে বাঙ্গালার অনতি-অতীত স্বদেশী-বিপ্লব প্রচেষ্টার ভাষ্য এবং ভারতবর্ষের অচিরাগামী নন্-কোঅপারেশন আন্দোলনের উপোদ্ঘাত।

ঘরে-বাইরের কেন্দ্রীয় ভূমিকা হইতেছে বিমলার। বিমলা রূপসী নয়, শুধু অদৃষ্টের জোরে এবং সুলক্ষণের গুণে সে গরীবের ঘরে মেয়ে হইয়াও ধনিগৃহের সর্ব্বসমাদৃত কনিষ্ঠ বধূ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। বিমলার প্রতি নিখিলেশের আকর্ষণের মধ্যে তাই রূপজ মোহ ছিল না। নিখিলেশও রূপকথার রাজপুত্র নয়—সেইজন্য বিমলার প্রেমের মধ্যেও হীনতাবোধ ছিল না। "ছেলেবেলায় রূপকথায় রাজপুত্রের কথা শুনেছি,—তখন থেকে মনে একটা ছবি আঁকা ছিল। ···স্বামীকে দেখ্‌লুম, তার সঙ্গে ঠিক মেলে না; এমন কি, তাঁর রঙ দেখলুম আমারি মতো। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সঙ্কোচ ছিল সেটা কিছু ঘুচল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও পড়ল।" নিখিলেশের ভালবাসা সহজে পাওয়ায় এবং আত্মহীনতাবোধ না থাকায় বিমলার গৃহাবদ্ধ মনে দায়িত্ববোধের এবং কুণ্ঠার কিছু অভাব ছিল। তবে স্বামীর প্রতি একটা সহজ ভক্তির অনুভূতি বিমলার মনে গোড়া থেকেই ছিল। এই অনুভূতি তাহার মায়ের কাছে পাওয়া। "ভক্তির আপন সৌন্দর্য্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে সে আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। মা যখন বাবার জন্যে বিশেষ ক'রে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জল খাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ ক'রে কেওড়া জলের ছিটে-দেওয়া কাপড়ের টুকরোয় আলাদা জড়িয়ে রাখতেন, তিনি খেতে বসলে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন; তাঁর সেই লক্ষ্মীর হাতের আদর, তাঁর হৃদয়ের সুধারসের ধারা কোন্ অপরূপ রূপের সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত সে যে আমার ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতুম। সেই ভক্তির সুরটি কি

আমার মনের মধ্যে ছিল না? ছিল।" এই ভক্তির সুরই নিখিলেশের উদার চিত্তের অবকাশে তীব্রতর হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত বিমলাকে বাঁচাইয়া গিয়াছে।

বিমলার বিধবা দুই জা অপূর্ব্ব সুন্দরী। এইখানেই ছিল বিমলার অবচেতন মনের আসল হীনতাবোধ। ইহাদের অহিত আচরণে বিমলা যে ঝাঁজ প্রকাশ করিয়া ফেলিত তাহাতে এই হীনতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া মেজো-জার সঙ্গে নিখিলেশের সহৃদয় সখ্য বিমলা ভালমনে দেখিতে পারে নাই; "আমার রাগের সত্যিকার ঝাঁজটুকু সমাজের উপরেও না, আর কারও উপরেও না সে কেবল—সে আর বলব না।" নিখিলেশ যখন বিমলাকে লইয়া কলিকাতায় গিয়া থাকিতে চাহিল তখন দুইটি কারণে বিমলা রাজি হয় নাই। প্রথম হইতেছে তাহার দিদিশাশুড়ীর স্মৃতি এবং শ্বশুরবাড়ীর tradition-এর উপর আসক্তি; "এ যে আমার শ্বশুরের ঘর, দিদিশাশুড়ি কত দুঃখ কত বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে কত যত্নে এ'কে এতকাল আগ্‌লে এসেছেন, আমি সমস্ত দায় একেবারে ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কলকাতায় চ'লে যাই তবে যে আমাকে অভিশাপ লাগ্‌বে এই কথাই বারবার আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল। দিদিশাশুড়ির শূন্য আসন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।" দ্বিতীয় কারণ হইতেছে জায়েদের উপর স্বাভাবিক ঈর্ষ্যা; "যাঁরা চিরদিন এমন শত্রুতা ক'রে এসেছেন তাঁদের হাতে সমস্ত দিয়ে-থুয়ে চলে যাওয়া যে পরাভব। আমার স্বামী যদি বা তা মান্‌তে চান আমি তো মান্‌তে দিতে পার্‌ব না! আমি মনে মনে জান্‌লুম, এ আমার সতীত্বের তেজ।" সংসারে প্রভুত্ব করা নারীর প্রধান কামনা, বিমলাও সাধারণ নারীর অতিরিক্ত নয়।

সন্দীপ আসিয়া বিমলাকে যে অত শীঘ্র মাতাইয়া তুলিল তাহার জন্য বিমলার মন যেন কতকটা প্রস্তুত ছিল। প্রথমত, নিখিলেশের ব্যক্তিত্বে কোন glamour বা চটক না থাকায় অবচেতন মনের ক্ষোভ; দ্বিতীয়ত এবং প্রধানত, নিখিলেশের প্রেম তাহাকে কেবল প্রাচুর্য্যে ভরিয়া দিয়াছে, তাহার নিকট কিছুই দাবী করে নাই। পরস্পরের প্রেমে আদান-প্রদানের সমতা না থাকায়

উভয়ের মিলন সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। বিমলার "পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার সুযোগের দরকার অনেক বেশি ছিল।" চাহিবার পূর্ব্বেই পাওয়ার মত হৃদয়বৃত্তির ট্রাজেডি আর নাই। বিমলারও তাহাই ঘটিয়াছিল, নিখিলেশের অজস্র দানের মর্য্যাদা না বুঝিয়া বিমলার মনে অযথা শক্তির গর্ব্ব আসিয়াছিল। নারীর পক্ষে এ বড় অকল্যাণের মূল; "পুরুষকে বশ করবার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ? ভক্তির মধ্যে সেই গর্ব্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা।"

নিখিলেশের উদার প্রেম বিমলার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে গৃহবেষ্টনীর মধ্যে পীড়িত কল্পনা করিয়া কুণ্ঠা বোধ করিত। কলিকাতায় লইয়া গিয়া বিমলাকে বৃহত্তর সংসারের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া পরস্পরের প্রেমকে যাচাই করিয়া লইয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের পথে বাধা অপসরণ করাই ছিল নিখিলেশের চিত্তের কামনা। বিমলার গৃহাসক্ত মন তাহাতে সায় দেয় নাই। বিমলা ঘরের অজুহাতে বাইরেকে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু একদা যখন বাহির হুড়মুড় করিয়া তাহার গৃহে বন্যার মত আসিয়া পড়িল তখন সে তাহার জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। স্বদেশী-যুগের উন্মত্ততার ঢেউ জমিদার-পরিবারের প্রাচীন পরিবেশের ও কঠিন অবরোধের বাধা ভেদ করিয়া বিমলার চিত্তে আঘাত হানিল।

নিখিলেশের ধ্যানী এবং আত্মনিষ্ঠ চিত্তে উন্মত্ততা-আবেগের ক্ষোভ একেবারেই স্থান পাইত না। স্বদেশী-আন্দোলনের যেটুকু সত্য অর্থাৎ গঠনমূলক, তাহার সহিত তাহার যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ; কিন্তু যেটুকু মিথ্যা, যাহা ভাঙ্গনমূলক, তাহার উপর সে ছিল নিতান্ত বিরূপ। বিলাতী বলিয়াই কাপড় পোড়ানো এবং বিদেশী বলিয়াই বিমলার শিক্ষয়িত্রী মিস্ গিল্‌বিকে ছাড়ানো এবং অপমান করা—এই দুই ব্যাপার লইয়া বিমলার সহিত নিখিলেশের সম্পর্কে প্রথম বিরোধ সম্ভাবনা জাগিল। এবিষয়ে নিখিলেশের মনোভাবে বিমলা যেন লজ্জাবোধ করিল। যে-নিখিলেশকে বিমলা মাটির মানুষ মনে করিত, তাহার এই দৃঢ়তায় বিমলা বিস্মিত ও শঙ্কিত হইল, তাহার আত্মাভিমান আহত হইল।

এমন অবস্থায় প্রোজ্জ্বল উল্কার উদ্দীপনা লইয়া সন্দীপের আবির্ভাব। নিখিলেশের বাল্যবন্ধু সন্দীপের ফোটোগ্রাফ বিমলার আগেই দেখা ছিল। সন্দীপের চেহারা ভালো, কিন্তু সে নিখিলেশকে ঠকাইয়া টাকা আদায় করে এবং সে নিখিলেশের অপেক্ষা সুশ্রী, এই ধারণা তাহার অবচেতন মনে রহিয়া যাওয়ায় সন্দীপের উপর বিমলার অবজ্ঞার ভাবই ছিল। কিন্তু সন্দীপকে বক্তৃতা দিতে দেখিয়া বিমলা সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল। বিমলার মুগ্ধ মুখশ্রী দেখিয়া সন্দীপের মুখে ও মনে দ্বিগুণ উদ্দীপনা জাগিয়া উঠিল,—এটুকুও বিমলার অজ্ঞাত রহিল না, এবং ইহা তাহার নারীত্বগর্ব্ব জাগাইয়া তুলিল।

বিমলার সহিত পরিচয়ের পর সন্দীপের সহজ ও সরল ব্যবহার বিমলার মনে এতটুকু সঙ্কোচের অবসর দিল না। তাহার বক্তৃতালব্ধ জয় সন্দীপ অসঙ্কোচ ব্যবহারের দ্বারা কায়েম করিয়া লইল। "যেমন জোর তাঁর বক্তৃতায় তেমনি একটুও দ্বিধা নেই, সব জায়গাতেই আপন আসনটি অবিলম্বে জিতে নেওয়াই যেন তাঁর অভ্যাস। কেউ কিছু মনে করতে পারে এসব তর্ক তাঁর নয়।" বিমলার মনে মোহজাল দৃঢ়তর করিবার জন্য সন্দীপ নিখিলেশের সহিত বন্দেমাতরং মন্ত্রের ভাব লইয়া তর্ক তুলিল। বিমলার মন সন্দীপের কথায় মাতিয়া উঠিল,—নিখিলেশের সহিত তাহার আন্তরিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিদারণরেখা পড়িল। মোহমুগ্ধ বিমলার নারীচিত্ত সমস্ত সংস্কার ভুলিয়া আদিম নারীত্বে ফিরিয়া গিয়া যখন সন্দীপের অনুবৃত্তি করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্যে লোভ ক'রব—আমি কিছু চাই যা আমি কাড়ব কুড়ব; আমার রাগ আছে আমি দেশের জন্যে রাগ ক'রব, আমি কাউকে চাই যাকে কাটব কুটব, যার উপরে আমি আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুলব; আমার মোহ আছে আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব, আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব; যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব। আমি মানুষ, আমি দেবতা নই!"—তখন নিখিলেশ প্রথম বুঝিতে পারিল যে যাহাকে সহধর্ম্মিণী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহার সহিত নিজের অন্তরের পার্থক্য কত সুগভীর।

সন্দীপের সহিত যেদিন বিমলার পরিচয় হইল সেইদিন নিখিলেশের মাষ্টার-মশায় চন্দ্রবাবুর সহিতও বিমলার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিল। ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশ হইতে সে সে শেষ অবধি বাঁচিয়া যাইবে ইহার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তাহারি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

বিমলা সাধারণ নারী, নারীর মতই "পুরুষের মধ্যে সে দুর্দ্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন কি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।...উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালবাসা"। একই বিষয়ে নিখিলেশকে কখনই সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই; নিখিলেশের ধৈর্য্য-শীলতা সে দুর্ব্বলতার চিহ্ন বলিয়া মনে করিত। সন্দীপের প্রবল ব্যক্তিত্ব এই কারণেই বিমলাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। শুধু অভিভূত করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, সন্দীপের ক্ষুধিত মুগ্ধ নেত্রের উত্তাপে উত্তেজনায় বিমলার মনপ্রাণ যেন শতদলের মত বিকশিত হইল। বিমলার কাছে সন্দীপ তো একটি ব্যক্তি-মাত্র নয়, সে সমগ্র দেশের প্রতীক, তাই তাহার স্তবগানের মাদকতা ছিল অত্যন্ত কড়াগোছের। "সন্দীপবাবু তো কেবল একটিমাত্র মানুষ নন—তিনি যে একলাই দেশের লক্ষ লক্ষ চিত্তধারার মোহানার মতো। তাই, তিনি যখন আমাকে ব'ললেন, মৌচাকের মক্ষিরাণী, তখন সেদিনকার সমস্ত দেশসেবকদের স্তবগুঞ্জনধ্বনিতে আমার অভিষেক হয়ে গেল।" মানভঞ্জন গল্পের গিরিবালার psychosis বা মনোভাব এই সঙ্গে তুলনীয়। যে-নারী শুধু গৃহকোণের প্রভুত্ব পাইলেই কৃতার্থ হয় সে যদি বহিঃসংসারের রঙ্গমঞ্চে রাণী সাজিয়া দাঁড়ায় তখন তাহার মত্ততার তুলনা কোথায়। বিমলার গূঢ়গর্ব্ববোধ তাহাকে যেখানে তুলিয়া দিল সেখানে ক্ষুদ্র সংসারের ব্যঙ্গ-উপহাস তাহাকে স্পর্শ করিতে, তাহার মনকে বাস্তবতার মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। "এর পরে আমাদের ঘরের কোণে আমার বড় জায়ের নিঃশব্দ অবজ্ঞা, আর আমার মেজোজায়ের সশব্দ পরিহাস আমাকে স্পর্শ ক'রতেই পারলে না। সমস্ত জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে।" সামান্য ব্যাপারে বিমলার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এবং বিমলার সিদ্ধান্তে অসামান্য বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সন্দীপ বিমলার গর্ব্ববোধের ইন্ধন যোগাইয়া চলিল।

ব্যাপার যে কতদূর গড়াইতে চলিয়াছে সে বিষয়ে বিমলার মন সজাগ হইল যখন সে সন্দীপের মনের স্থূল দিকটার পরিচয় পাইল,—সন্দীপ যখন তাহারি পড়িবার জন্য তাহাদের বৈঠকখানায় একখানি আধুনিক ইংরেজি বই ফেলে এসেছিল যে বইয়ে "স্ত্রীপুরুষের মিলনরীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট-স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে।" সেদিন নিখিলেশের আকস্মিক উচ্ছ্বাসও কতকটা নাড়া দিয়াছিল, "নিখিল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দেখ সন্দীপ, মানুষ মর্মান্তিক দুঃখ পাবে কিন্তু তবু মরবে না, এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় আছে, তাই আমি সব সইতে প্রস্তুত হয়েছি—জেনে শুনে, বুঝে সুঝে।" সন্দীপের বুঝিতে দেরী হইল না যে বিমলার ঘোর আজ অকস্মাৎ ভাঙিয়া গিয়াছে—"ও যে কোন্ স্রোতে ভেসেছে হঠাৎ আজ সেটা বুঝতে পেরেছে। এখন ওকে জেনে-শুনে হয় ফিরতে হবে না এগোতে হবে।" নিখিলেশ তাহাকে ধ্যানের পীঠে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সন্দীপ তাহাকে ভাবের রঙে রঙাইয়াছে. নিখিলেশের প্রেম তাহার পদতলের ভূমি; সন্দীপের আকর্ষণ ভৃগুপাতের মত তীব্রমধুর অথচ ভয়ঙ্কর, তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা বিমলাকে বিকর্ষণও করে। হয়ত আবেগের অস্পষ্ট কুহেলিকার মধ্য দিয়া এই দ্বন্দ্ব, এই নেশা একদিন আপনিই কাটিয়া যাইত, "কিন্তু সন্দীপবাবু যে থাকতে পারলেন না, তিনি যে নিজেকে স্পষ্ট করে তুললেন। তাঁর কথার সুর যেন স্পর্শ হয়ে আমাকে ছুঁয়ে যায়, চোখের চাহনি যেন ভিক্ষা হয়ে আমার পায়ে ধরে। অথচ তার মধ্যে এমন একটা ভয়ঙ্কর ইচ্ছার জোর, যেন সে নিষ্ঠুর ডাকাতের মতো আমায় চুলের মুঠি ধরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়।" সন্দীপের বাসনার এই তীব্র আবেগ বিমলাকে যেন স্বপ্নাভিভূত করিয়া দুর্দ্দমনীয়ভাবে টানিতেছিল। সন্দীপের উপর বিমলার শ্রদ্ধা আর রহিল না; বিমলা একথাও বুঝিল, "সন্দীপের এই অভিমান যে আমার প্রতি অপমান," তবুও সে রাগ করিতে পারে না, তবুও তাহার মোহ কাটিতে চায় না, "তবু আমার এই রক্তে-মাংসে এই ভাবে-ভাবনায় গড়া বীণাটা ওরই হাতে বাজতে লাগল।" চন্দ্রনাথবাবুর প্রশান্ত ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে বিমলার মন উচ্চতর ভূমিতে আশ্রয় পাইয়া কিছু শান্তি লাভ করে, কিন্তু সে ভাব

তো স্থায়ী হয় না; সন্দীপ দেশের দোহাই পাড়িয়া বিমলার নেশাকে অচিরে জমাট করিয়া দেয় এবং বিমলাকে আত্মগ্লানি হইতে বাঁচাইয়া যায়। "এমনি ক'রে সন্দীপবাবুর কথায় দেশের স্তবের সঙ্গে যখন আমার স্তব মিশিয়ে যায়, —তখন সঙ্কোচের বাঁধন আর টেকে না, তখন রক্তের মধ্যে নাচন ধরে। যত দিন আর্ট আর বৈষ্ণব কবিতা, আর স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নির্ণয়, আর বাস্তব অবাস্তবের বিচার চলছিল ততদিন আমার মন গ্লানিতে কালো হয়ে উঠেছিল। আজ সেই অঙ্গারের কালিমায় আবার আগুন ধ'রে উঠল—সেই দীপ্তিই আমার লজ্জা নিবারণ ক'রলে। মনে হ'তে লাগল আমি যে রমণী সেটা যেন আমার একটা অপরূপ দৈবী মহিমা।" তাহার উপর সন্দীপ সর্ব্বদাই বিমলার মনে বাসনার অগ্নিশিখা জ্বালাইয়া তুলিবার জন্য তাহার বাগ্মিতার নিরলস প্রয়োগ করিত। সন্দীপ বলিত, "আমি চাই, এই বাণীই হচ্চে সৃষ্টির মূল বাণী—সেই বাণীই কোন শাস্ত্র বিচার না ক'রে আগুন হ'য়ে সূর্য্যে তারায় জ্ব'লে উঠেছে।" "বিমলাও তাই বুঝিয়াছিল—'আমি চাই' এই কথাটাকেই নিঃসঙ্কোচে অবাধে অন্তরে বাহিরে সমস্ত শক্তি দিয়ে বলতে পারাই হ'চ্চে আপনার পূর্ণ প্রকাশ—না বলতে পারাই হ'চ্চে ব্যর্থতা।"

কিন্তু এই উদ্দীপিত কামনার মোহকরী শক্তির বিরুদ্ধে বিমলার মনের গোপন কোণে তাহার মায়ের স্বামী-ভক্তির স্মৃতি, তাহার দিদিশাশুড়ীর সংসার-মমতা, নিখিলেশের প্রতি তাহার অলক্ষিত প্রেম, তাহার নিজের সর্ব্ববিধ সংস্কার —পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীল ছিল তাই সে নিখিলেশের ফোটোগ্রাফ এবং সাধের অর্কিড গাছকে অনাদরের ধূলায় মলিন রাখিল বটে কিন্তু একেবারে ফেলিয়া দিতে পারিল না। বিমলার জীবনের বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বে এইখানেই তাহার মনের গতি ফিরিতে শুরু হইল; "ইচ্ছে হ'ল, পরগাছাটাকে জানালার বাইরে ফেলে দিই—ছবিটাকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে আনি—প্রলয়শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতা প্রকাশ হোক। হাত উঠেছিল কিন্তু বুকের মধ্যে বিঁধল, চোখে জল এল—মেজের উপর উপুড় হ'য়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম। কী হবে, আমার কী হবে! আমার কপালে কি আছে!"

কিন্তু তবুও বিমলার সমস্ত সংস্কার কিছুই বাধা দিতে পারিত না যদি তাহার ইতস্তত-ভাবের প্রতিক্রিয়ায় সন্দীপের মনে ইমোশনের "দুর্ব্বলতা," অর্থাৎ তাহার সকল সংস্কার, জাগিয়া না উঠিত। "আমার খুসী আছে কিন্তু ব্যথাও আছে। সেইজন্যে কেবলি দেরি হ'য়ে যাচ্চে—তেমন জোরে ফাঁস কষতে পারছিনে।" এমন অনেক মুহূর্ত্ত আসিয়াছিল যখন সন্দীপ ইচ্ছা করিলেই বিমলাকে দখল করিতে পারিত—এমন কি বিমলার মনও যেন তাহার জন্য উৎসুক-শঙ্কিত ছিল—কিন্তু সন্দীপের সুপ্ত সংস্কার জাগিয়া উঠিয়া তাহার মনকে দুর্ব্বল করিয়া দিয়া পিছু পানে টানিত। মানুষের মন কোমল হইয়া পড়িলে তাহার আইডিয়ার জোর কমিয়া যায়। "এতদিন যে-সব বাধা আমার প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে ছিল তারা আজ আমার রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছে।" মানুষের জীবনের ট্রাজেডিও এইখানে—"মানুষ আপনাকে যা ব'লে জানে মানুষ তা নয়, সেইজন্যেই এত অঘটনী ঘটে।"

নিখিলেশ সত্যসত্যই ব্যথা পাইল সেদিন, যেদিন তাহার কাছে কাজ আদায় করিবার জন্য বিমলা বিশেষ করিয়া সাজ করিয়া গিয়াছিল। ইহাতে নিখিলেশের একটা বড় ভুল ভাঙ্গিল। এতদিন সে মনে করিয়াছিল যে সন্দীপের ডাকে বিমলার হৃদয় বুঝি যথার্থই সাড়া দিয়াছে, সন্দীপের সহিতই বুঝি বিমলার অন্তরের যথার্থ মিল, আজ বুঝিল যে বিমলা সন্দীপের প্রতিধ্বনিমাত্র—প্রতিনিধি নয়। "আজ ওর বিলিতি খোপার চূড়াকে কেবলমাত্র চুলের কুণ্ডলী ব'লেই দেখলুম—শুধু তাই নয়, একদিন এই খোঁপা আমার কাছে অমূল্য ছিল, আজ দেখি এ সস্তা দামে বিকোবার জন্যে প্রস্তুত।" পুরুষ নিজের কামনার মোহরসে নারীকে রঙাইয়া লইয়া তাহাকে মোহিনী করিয়া তোলে; সেই মোহিনীকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে পারিলেই তবে তাহার মোহবন্ধন টুটিয়া যায়। আজ নিখিলেশের সেই বন্ধনমুক্তি ঘটিল এবং তাহার মন সেই সঙ্গে বিমলাকেও মুক্তি দিল। অন্তরের বেদনার অভিষেকে নিখিলেশের চিত্ত নিষ্ঠুর সত্যকে বরণ করিয়া লইল।

ব্যর্থসজ্জার "অশ্রুভরা অভিমানের রক্তিমায় যখন বিমলা সূর্য্যাস্তের দিগন্ত-

রেখায় একখানি জলভরা আগুনভরা রাঙা মেঘের মতো নিঃশব্দে” সন্দীপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন জানিল না সে কতটা অরক্ষিত, তাহার সঙ্কট মূহূর্ত্ত কতটা আসন্ন। সন্দীপের আক্রমণের জন্য তাহার অবচেতন মন কতকটা তৈয়ারী ছিল। সন্দীপও এই সুযোগ ছাড়িতে চাহে না। কিন্তু অনুরাগের আগুনে তাহার চিরকালের সঙ্কোচও সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিল, বিমলার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে একটা চৌকিতে বসাইয়া দিয়াই সন্দীপের উত্তেজনা গেল থামিয়া। বিমলা বুঝিল, কি বিপদ তাহার কান ঘেঁষিয়া গিয়াছে। বিমলা চলিয়া গেলে সন্দীপের মনে আফশোশ জাগিল, “মনে হ’তে লাগ্‌ল ঠিক সময়টাকে বয়ে যেতে দিয়েছি। এ কী কাপুরুষতা। আমার এই অদ্ভুত দ্বিধায় বিমল বোধ হয় আমার পরে অবজ্ঞা ক’রেই চলে গেল! ক’রতেও পারে।” বিমলার মনের ঘোর যাহাতে কোন কিছু করিতে না পাইয়া কাটিয়া না যায় এবং তাহার পৌরুষের উপর যাহাতে অবজ্ঞা না আসে তাই সন্দীপ তাহার কাছ হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাহিয়া বসিল। সন্দীপ বুঝিয়াছিল যে বিমলার অন্তরাত্মা সন্দীপের জন্য যে-কোন দুঃখ বরণ করিতে চায়; “বিমলার অন্তরাত্মা চাইছে যে আমি সন্দীপ তার কাছে খুব বড় দাবী ক’রব তাকে মরতে ডাক দেব। এ না হ’লে সে খুসি হবে কেন? এতদিন সে ভালো ক’রে কাঁদতে পায় নি ব’লেইতো আমার পথ চেয়ে ব’সেছিল। এতদিন সে কেবলমাত্র সুখে ছিল ব’লেইতো আমাকে দেখবামাত্র তার হৃদয়ের দিগন্তে দুঃখের নববর্ষা একেবারে নীল হ’য়ে ঘনিয়ে এল।”

প্রথম সঙ্কট কাটিয়া গেলে সন্দীপ বিমলাকে কিছুকালের জন্য রেহাই দিল, কেন না “রসের পেয়ালার...তলানি পর্য্যন্ত গেলে” তাহার সম্বন্ধে বিমলার মোহ একেবারে টুটিয়া যাইবে, এবং বিমলার মোহের প্রয়োজন এখনো মিটিয়া যায় নাই। সন্দীপ বুঝিয়াছিল, “সেদিন আমি বিমলার হাত চেপে ধ’রেছিলুম, তার রেস্‌ ওর মনে বাজছে আমারও মনে তার ঝঙ্কার থামেনি। এই রেস্‌-টুকুকে তাজা রেখে দিতে হবে।” বিমলার মধ্যে সন্দীপ সমগ্র দেশকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে,—তাহার এই কথা বিমলাকে দ্বিগুণ অভিভূত করিল। বিমলার স্বপ্নাবিষ্ট

মন সন্দীপের দিকে আর এক পা আগাইয়া গেল—বিমলা তাহাকে এই প্রথম "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিল, এবং তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া অবসাদের, পরাজয়ের কান্না কাঁদিতে লাগিল। সন্দীপের সম্মোহন শক্তির জয়শীলতার ইহাই পরাকাষ্ঠা। টাকা কোন ছার কথা, বিমলা তাহার গহনার বাক্স উজাড় করিয়া দিতে উন্মুখ হইল। সন্দীপ দাবী কমাইয়া পাঁচ হাজারে নামিয়া মস্ত বড় ভুল করিল। . .

বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্ব নিখিলেশের অগোচর রহিল না। সেও ব্যথা পাইতে লাগিল, তবে নিজের হৃদয়বেদনার কাছে সে ব্যথা বড় নয়। কিন্তু যেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগানের কোণে বিমলার বুকফাটা কান্না শুনিল সেদিন নিখিলেশের কাছে বিমলার দুর্বিষহ দুঃখ মূর্তিমান্ হইয়া দেখা দিল। নিজের সমস্ত ক্ষোভ চাপাইয়া এই পাশবদ্ধ হরিণীর আর্তি নিখিলেশকে বিচলিত করিল। নিখিলেশ মনে মনে বিমলার উপর সমস্ত দাবী পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে ছুটি দিল। নিখিলেশ বুঝিল, "যাকে আমার হৃদয়ের হার ক'রব তাকে চিরদিন আমার হৃদয়ের বোঝা ক'রে রেখে দিতে পারব না।" বিমলাকে মুক্তি দিয়া নিখিলেশ নিজেও মুক্তিলাভ করিল; "সত্যি যেদিন পাখীকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি সেদিন বুঝতে পারি পাখীই আমাকে ছেড়ে দিলে।" সন্দীপের সম্মোহন-পাশ হইতে বিমলার মুক্তি কিছুতেই হইত না যদি-না বালক অমূল্যর সরল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তাহার অন্তরে মাতৃস্নেহের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিত। সন্দীপ অমূল্যকে যে-পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে সে সর্ব্বনাশের পথ, সে-পথে চলিবার যোগ্যতা তাহার এখনো হয় নাই। "ও যে নিতান্ত কাঁচা, ভালোকে ভালো ব'লে বিশ্বাস করবার যে ওর সময়। আহা ওর যে বাঁচবার বয়েস, বাড়বার বয়েস। আমার ভিতরে মা জেগে উঠল যে।" অমূল্যর উপস্থিতি এবং তাহার প্রতি বিমলার স্নেহই পরে বিমলাকে চরম সঙ্কটমুহূর্ত্তে রক্ষা করিয়াছিল।

সন্দীপের মোহের বশে বিমলা স্বামীর সিন্দুক হইতে মোহর চুরি করিল। চুরি করিয়াই কিন্তু তাহার মনে প্রতিক্রিয়া জাগিল। "আজ আমি এই যে চুরি ক'রে আনলুম, এও তো টাকা চুরি নয়, এ যে আকাশের চিরকালের

আলো চুরিরই মতো—এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি,—বিশ্বাস চুরি, ধর্ম্ম চুরি!"

বিমলার স্নেহ লইয়া অমূল্যর প্রতি অহেতুক ঈর্ষ্যা এবং সোনার উপর অচেতন লোভ, সন্দীপ-চরিত্রের এই দুই দুর্ব্বলতা বিমলার মোহের মূলে নাড়া দিতে লাগিল। মোহর চুরির পর হইতেই বিমলা-সন্দীপের সম্পর্কে রোমান্টিক সুরটুকু চলিয়া গিয়াছিল। এখন মিথ্যা-মোহের আবরণ খসিয়া পড়ায় সন্দীপের কামনা নিরাবরণ তীব্রতায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অথচ বিমলার মনে এখনো জোর আসে নাই। তৃতীয় সঙ্কটমুহূর্ত্তের মুখে বিমলা তিষ্ঠিতে পারিল না, পলাইবার জন্য দরজার দিকে ছুটিল, সন্দীপের উগ্র লোভ এখন নিঃসঙ্কোচ। নিখিলেশের আগমনী জুতার শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া বিমলাকে চরম অপমান হইতে বাঁচাইয়া দিল। অমূল্যর মঙ্গলচিন্তা বিমলার মনকে নিজের বিষয় হইতে সরাইয়া উচ্চতর স্তরে লইয়া গেল। "অমূল্য, নিজের জন্য ভাবব না, যেন তোমাদের জন্যে ভাবতে পারি"—এই কয়টি কথার মধ্যে তাহার নবজন্ম সূচিত হইয়াছে। সন্দীপের কথার আকর্ষণ বিমলাকে আর অভিভূত করে না, কেন না সে আর নৈর্ব্যক্তিক শক্তি নয় যে-শক্তি দেশকে জাগ্রত করিতে অভ্যুদিত হইয়াছে, সে লোভী সাধারণ মানুষ ছাড়া কিছু নয়। তাই বিমলা সহজেই সন্দীপের মর্ম্মে আঘাত দিতে পারিল,—"সন্দীপবাবু, আপনি গলগল ক'রে এত কথা ব'লে যান কেমন ক'রে? আগে থাকতে বুঝি তৈরী হ'য়ে আসেন?" মর্ম্মের দুর্ব্বল স্থানে ঘা পড়ায় অপরিসীম ক্রুদ্ধ হইয়া সন্দীপ নিজের মহিমা হারাইল। যতই সে বিমলাকে রূঢ় কর্কশ কথা বলিতে লাগিল ততই বিমলা সন্দীপের যথার্থ পরিচয় পাইয়া নিজের অন্তরে মোহমুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিল। কিন্তু কোন মানুষেরই সব কিছু মিথ্যা নয়, সন্দীপেরও নয়। প্রত্যক্ষের প্রতি সন্দীপের নিষ্ঠা, তাহার অন্তরের প্রচণ্ড শক্তি যাহা সমস্ত বাধা বিঘ্নকে উড়াইয়া দিয়া মরণকে তুচ্ছ করিয়া তাণ্ডবে মত্ত হইয়া উঠে--তাহা তো মিথ্যা নয়। সন্দীপের ব্যক্তিত্বের এইদিকের ভীমকান্ত আকর্ষণ বিমলার মনের অপরদিক—তাহার অপর ego—অস্বীকার করিতে পারিল না; "আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারছে

সন্দীপের এই প্রলয়ঙ্কর রূপ—আর এক বুদ্ধি ব'লছে এই তো মধুর।" সন্দীপের মধ্যে যে দৈবী শক্তির প্রকাশ হইয়াছে তাহারি চরণে স্বামীর সাক্ষাতে বিমলা তাহার গহনার বাক্স নিবেদন করিয়া দিল।

বিমলা যখন টাকা চুরি স্বীকার করিয়া লইল তখন নিখিলেশের ব্যথিত মুখের দিকে চাহিয়া বিমলা যাঁহাকে বিদ্বেষ করিত সেই মেজোরাণীই তাহার অপরাধকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া তাহাকে নিজের স্নেহপুটে টানিয়া লইলেন, এবং তাঁহারি মধ্যস্থতায় দম্পতী স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ফিরিয়া আসিবার পক্ষে আনুকূল্য লাভ করিল। বিমলা তাহার অনুতপ্ত হৃদয়ের সমস্ত ক্রন্দন ঢালিয়া দিয়া নিখিলেশের পায়ে যেন পূজার অর্ঘ্য প্রদান করিল। বিমলার অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে,—"যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন ক'রে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।"

কিন্তু বিমলার বেদনা এইখানেই শেষ হইয়া গেল না। যে-দুইজনের স্পর্শে তাহার হৃদয়ের গভীরতম উৎস খুলিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে মৃত ও মরণাপন্ন করিয়া গল্পের বিধাতা বিমলার প্রায়শ্চিত্তকে নিষ্ঠুরতর করিয়া বিমলার কাহিনী শেষ করিয়া দিয়াছেন। নিখিলেশের বাঁচিবার সম্ভাবনা এবং বিমলার মনোবেদনা, এই দ্বিধার মধ্যে পাঠকের চিত্তবৃত্তি দোলাচল হইয়া রহিল।

নিখিলেশের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার উদার সহানুভূতি, অসীম ধৈর্য্য, অটুট সত্যনিষ্ঠা। এই সত্য মনগড়া বা কল্পনার সত্য নয়, কোন ইমোশন-বিজড়িত আইডিয়ার সত্য নয়, এই সত্য কল্যাণের সত্য, ক্ষমার সত্য, ত্যাগের সত্য। নিখিলেশের অনুভূতি গভীর; বাহিরের চাঞ্চল্য, মনের মত্ততা তাহার ধাতে সয় না। এইখানেই বিমলার সনাতন নারীচিত্তের সহিত নিখিলেশের সনাতন মুক্ত পুরুষচিত্তের প্রবল বৈপরীত্য এবং সন্দীপের আদিম-মানবচিত্তের সহিত আনুগত্য। এইজন্যই বিমলার প্রতি নিখিলেশের আকর্ষণ এতটুকুও কমে নাই এবং এইজন্যই সে বিমলাকে সন্দীপের সম্বন্ধে স্বাধীনতায় কুণ্ঠা বোধ করিত।

নিখিলের তত্ত্বদর্শী মন সাময়িক উত্তেজনা-উদ্দীপনার মধ্যে অবিচল থাকিয়া,

তাহার শেষ কতদূর গড়াইতে পারে ইহা ভাবিয়া নিজের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিত। সেইজন্য স্বদেশী-আন্দোলন লইয়া জনসাধারণ যখন উল্লসিত হইয়া উঠিত নিখিলেশ অনেক সময় তাহাতে আনন্দ অনুভব করিতে পারিত না। "আমার স্বামী যে অবিচলিত ছিলেন তা নয়। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনার মধ্যে তাঁকে যেন একটা বিষাদ এসে আঘাত ক'রত। যেটা সাম্‌নে দেখা যাচ্চে তার উপর দিয়েও তিনি যেন আর একটা কিছুকে দেখতে পেতেন।" তাই সন্দীপও বুঝিয়াছিল, "চাঁদ সদাগরের মতো ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েছে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও ম'রেও মানতে চায় না। মুস্কিল এই, এদের কাছে মরাটা শেষ প্রমাণ নয়, ওরা চক্ষু বুজে ঠিক ক'রে রেখেছে তার উপরেও কিছু আছে।"

নিখিলেশের আত্মগত ও শান্ত হৃদয়ের পক্ষে নারীর ভালবাসা একটা অলৌকিক মাহাত্ম্যমণ্ডিত হইয়া অনুভূত হয়। প্রতিদান না পাইলেও তাহার হৃদয় অজস্রভাবে ভালবাসিয়াই তৃপ্তিলাভ করে। বিমলার ভালবাসা নিখিলেশের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত হইলেও তাহার সূক্ষ্ম অনুভূতির কাছে নিরপেক্ষভাবে যাচাই হওয়া আবশ্যক ছিল। তাই একসময় সে বিমলাকে কলিকাতায় "বাহিরে" আনিয়া তাহার প্রেমের একটা পরীক্ষা লইতে ইচ্ছুক হইয়াছিল; "আমি প্রেমিক সেই জন্যই আমি তালা-দেওয়া লোহার সিন্দুকের জিনিষ চাইনি—আমি তাকেই চেয়েছিলুম আপনি ধরা না দিলে যাকে কোন মতেই ধরা যায় না।"

আদর্শের আতশি-কাচের মধ্যদিয়া সে বিমলাকে খুব বড় করিয়া দেখিয়াছিল বলিয়া স্পর্শ করিতে পারে নাই। রক্তমাংসের স্থূলতা-বর্জ্জিত প্রেমও জ্ঞানের ও তপস্যার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে ধোঁয়াটে, অবাস্তব হইয়া পড়ে। বিমলার জ্ঞান ও তপস্যা দুইয়ের অভাব ছিল। সেইজন্য সন্দীপের ইমোশন, তাহার লালসার স্থূলতা, স্বভাবের ডাক হইয়া বিমলার বাসনাকে, তাহার রক্তমাংসকে অনায়াসে সাড়া দিতে বাধ্য করিয়াছিল। নিখিলেশের বিশ্বাসবান্ প্রেম এবং ধৈর্য্য ক্ষমা ও প্রবল সহানুভূতিই বিমলাকে শেষ অবধি বাঁচাইয়া গিয়াছে।

সন্দীপ নিখিলেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধপ্রকৃতির মানুষ হইলেও তাহাদের দুইজনের মধ্যে মিল ছিল এক বিষয়ে,—উভয়েই নিজ স্বভাবের কাছে নিষ্কপট;

"এই কপটতা জিনিষটা আমার সয় না, এটা নিখিলেরও সয় না—এইখানে ওর সঙ্গে আমার মিল আছে।" উভয়েই নির্ভীক, কিন্তু সেই নির্ভীকতায় প্রভেদ আছে। সন্দীপের নির্ভীকতা ততক্ষণই টিকিয়া থাকে যতক্ষণ তাহার মনে কোন আইডিয়ার ইমোশন জাগ্রত থাকে। নিখিলেশের নির্ভীকতার মধ্যে ইমোশনের স্পর্শ নাই, তাহা ধ্রুব, অমোঘ। কাহিনীর উপসংহারে সন্দীপ তাই প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পলাইল, আর নিখিলেশ না পলাইবার জন্য প্রাণ দিল।

নিখিলেশের স্বাধীন চিত্ত কাহারো উপর কোন রকম বন্ধন—স্নেহের হউক অথবা সমাজের হউক—আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হইত। তাহার ব্যক্তিত্ব কাহাকে কাছে না টানিয়া যেন দূরত্ব রাখিয়া চলিত। "নিজের চারিদিককে যারা সহজেই সৃষ্টি ক'রতে পারে তারা এক জাতের মানুষ, আমি সে জাতের না। আমি মন্ত্র নিয়েছি, কাউকে মন্ত্র দিতে পারি নি।" সন্দীপের প্রকৃতি ঠিক বিপরীত—নিজের ইমোশনে সে নিজে যত সহজে ভুলিতে পারিত অপরকে আরো সহজে ভোলাইতে পারিত। নিখিলেশের কাছে সত্য ছিল ধ্রুব, absolute, পারমার্থিক ও নৈর্ব্যক্তিক। সন্দীপের কাছে সত্য relative, ব্যবহারিক। "কিন্তু নিখিলকে এসব কথা বোঝানো ভারি শক্ত। সত্য জিনিষটা ওর মনে একটা নিছক প্রেজুডিসের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। যেন সত্য ব'লে কোন একটা বিশেষ পদার্থ আছে। আমি ওকে কতবার বলেছি, যেখানে মিথ্যাটা সত্য সেখানে মিথ্যাই সত্য। আমাদের দেশ এই কথাটা বুঝত ব'লেই অসঙ্কোচে ব'লতে পেরেছে অজ্ঞানীর পক্ষে মিথ্যাই সত্য। সেই মিথ্যা থেকে ভ্রষ্ট হ'লেই সত্য থেকে সে ভ্রষ্ট হবে।" নিখিলেশের স্থির বুদ্ধিতে কোন রকম ইমোশন প্রশ্রয় পাইত না; সন্দীপ ইমোশনের রসেই মাতাল হইয়া থাকিত। "ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি সন্দীপ হ'চ্ছে আইডিয়ার যাদুকর,—সত্যকে আবিষ্কার করায় ওর কোন প্রয়োজন নেই, সত্যের ভেল্‌কি বানিয়ে তোলাতেই ওর আনন্দ। মধ্য আফ্রিকায় যদি ওর জন্ম হ'ত তাহ'লে, নরবলি দিয়ে নরমাংস ভোজন করাই যে মানুষকে মানুষের অন্তরঙ্গ করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধনা এই কথা নূতন যুক্তিতে প্রমাণ ক'রে ও পুলকিত হ'য়ে উঠত। ভোলানোই যার কাজ নিজেকেও না ভুলিয়ে সে

থাকতে পারে না।" সন্দীপের কর্ম্মনীতি ছিল,—"সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ফললাভ।" নিখিলেশের ধর্ম্মনীতি ছিল—সত্যই লক্ষ্য এবং তাহার উপলব্ধিতেই ফললাভ। দুই জনেই সাধক, এবং দুইজনেই নিষ্কপট—এইজন্য সম্পূর্ণ বিপরীতপ্রকৃতির হইলেও দুইজনের মধ্যে ছন্দের মিল ছিল। তাই মাষ্টার-মশায় বলিয়াছিলেন, "জানো নিখিল, সন্দীপ অধার্ম্মিক নয় ও বিধার্ম্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ, চাঁদই বটে কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার উল্টো দিকে গিয়ে পড়েছে।"

সন্দীপের শক্তি খাঁটি, যখন সে একটা আইডিয়ার ভাবরসের তুঙ্গশিখরে থাকে তখনো সে খাঁটি। কিন্তু এই ইমোশনের স্থিরভূমি নাই, ধৈর্য্য নাই। ইমোশনের প্রতিক্রিয়া আছে; তাই সে সর্ব্বদাই অশান্ত। নিখিলেশের স্থিরবুদ্ধির প্রশান্তি সে পাইবে কোথায়। রসের ভিয়ানে শক্তির সাধনায় সন্দীপ তান্ত্রিক সাধক, মন্ত্রব্যবসায়ী; সে তান্ত্রিক, কেন না তাহার সাধনা শক্তির সাধনা, তাহা অপরকে পীড়া দিবে, ধ্বংস করিবে। কিন্তু সে শুধুই তান্ত্রিক নয়, বৈষ্ণব-রসসাধনার মত্ততার আকর্ষণও তাহার কাছে কম তীব্র নয়। সন্দীপের philosophy of life বা জীবন-দর্শন এবং বিমলার মনে তাহার প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য বাউল-গানের রীতিতে প্রকাশ করিয়াছেন তাহারি মুখে:

আমার নিকড়িয়া-রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে
নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহন সুরে।
আমার ঘর বলে তুই কোথায় যাবি
বাইরে গিয়ে সব খোয়াবি,—
আমার প্রাণ বলে, তোর যা আছে সব যাক না উড়ে পুড়ে।
ওগো, যায় যদি তো যাক না চুকে,
সব হারাব হাসিমুখে,
আমি এই চলেছি মরণসুধা নিতে পরাণ পুরে।
ওগো, আপন যারা কাছে টানে
এ রস তারা কেই বা জানে,
আমার বাঁকা পথের বাঁকা সে যে ডাক দিয়েছে দূরে!
এবার বাঁকার টানে সোজার বোঝা পড়ুক ভেঙ্গে-চুরে।

সন্দীপের সাধনার রসও নিকড়িয়া; তবে তাহাতে দুঃখের, ত্যাগের কঠিন তপস্যা নাই। কিন্তু ত্যাগের মর্য্যাদা সন্দীপ শেষ অবধি বুঝিতে পারিয়াছিল। বিমলার প্রতি তাহার অনুরাগ স্থূল বাস্তবতা পার হইয়া একটা অনির্ব্বচনীয় অনুভূতিতে আসিয়া ঠেকিয়াছিল—একটা "কিন্তু"-তে। "সেই আমার সর্ব্বনাশী কিন্তুর হাতে দিয়ে গেলুম আমার পূজা।" সন্দীপ লোভী, কিন্তু সে লোভের বস্তুর মর্য্যাদা জানে, সে জানে, "পৃথিবীতে যা সকলের চেয়ে বড় তাতে লোভ পড়ে সস্তা করতে গেলেই সর্ব্বনাশ ঘটে—মুহূর্ত্তের অন্তরে যা অনন্ত তাকে কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলেই সীমাবদ্ধ করা হয়।" তাই পরাজয়ের ক্ষণে সে কিছুমাত্র পিছুটান না রাখিয়া বিদায় লইতে বিলম্ব করিল না।

গোরা-চরিত্রের ছায়া সন্দীপ-চরিত্রে সামান্য কিছু পড়িয়াছে। গোরার মত সন্দীপেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে মনের মতের এবং কণ্ঠের জোর। দুইজনেরই বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য যেমন চমকপ্রদ কর্ম্মক্ষমতাও তেমনি প্রচণ্ড। তবে গোরার বুদ্ধি বিশুদ্ধ, তাহার মন কোনও বিশিষ্ট মতবাদকে ধরিয়া ভাবরসে প্লাবিত হইয়া উঠে নাই, এবং তাহার যে সত্য তাহার মধ্যে আপেক্ষিকতা বা সাময়িকতা কিছু ছিল না। সন্দীপের বুদ্ধিতে ইমোশনের রঙ পাকা হইয়াছিল, এবং তাহার মনে যে লালসার স্থূলতা ছিল তাহাতে গোরার নিঃসঙ্গতার ও ত্যাগশীলতার সম্ভাবনামাত্র ছিল না।

ঘরে-বাইরের মুখ্য পাত্র হইতেছে তিনজন—বিমলা, নিখিলেশ, সন্দীপ। বিমলা-নিখিলেশের আত্মকথায় আর যে-কয়টি অবান্তর চরিত্রের পরিচয় মিলিতেছে তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে মেজোরাণী এবং মাষ্টার-মশায়। মাষ্টার-মশায়ের মধ্যে নিখিলেশের জীবন-আদর্শ মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ চন্দ্রনাথবাবুর মুখের জ্যোতি অস্তোন্মুখ সন্ধ্যাসূর্য্যের নম্রতায় পরিপূর্ণ, এই জ্যোতির স্নিগ্ধতায় নিখিলের ক্ষতবিক্ষত অশান্তচিত্ত ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিয়াছে। "আশ্চর্য্য ঐ মানুষটি। আমি ওঁকে আশ্চর্য্য বলছি এই জন্যে যে আজকের আমার এই দেশের সঙ্গে কালের সঙ্গে ওঁর এমন একটা প্রবল পার্থক্য আছে। উনি আপনার অন্তর্যামীকে দেখতে পেয়েছেন সেইজন্য আর কিছুতে ওঁকে ভোলাতে পারে না।"

গল্পের নেপথ্য হইতে মেজোরাণীর অসজ্জিত ভূমিকাটুকু বড় উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বিমলার দুই জা রূপসী ছিলেন, তাঁহারা স্বামিসৌভাগ্য বলিতে বিশেষ কিছু পান নাই, এবং যাহা পাইয়াছিলেন সে-টুকুও তাঁহাদের ভাগ্যে বেশিদিন টিকে নাই। "মদের ফেনা আর নটীর নূপুরনিক্কণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড় ঘরের ঘরণীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধ'রে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রেখেছিলেন," কিন্তু "সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই তাঁদের ভোগের উৎসব মিটে গেল—কেবল রূপযৌবনের বাতিগুলো শূন্য সভায় সমস্ত রাত ধ'রে মিছে জ্বলতে লাগল। কোথাও সঙ্গীত নেই, কেবলমাত্রই জ্বলা।" ইহাদের ব্যর্থ জীবনের জন্য নিখিলেশের করুণার অন্ত ছিল না। বিমলার অভিমান ছিল, "স্বামী এঁদের দুঃখটাই দেখতেন দোষ দেখতে পেতেন না।" এই অভিমান নিতান্ত অকারণ নয়, বিমলা নিজে সুন্দরী ছিল না।

বড়রাণী ছিলেন "জপে তপে ব্রতে উপবাসে ভয়ঙ্কর সাত্ত্বিক, বৈরাগ্য তাঁর মুখে এত বেশি খরচ হ'ত যে মনের জন্যে শিকি পয়সার বাকি থাকত না।" মেজোরাণী ছিলেন অন্য ধরণের। "তাঁর বয়স অল্প—তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং ক'রতেন না, বরঞ্চ তাঁর কথাবার্তা হাসিঠাট্টায় কিছু রসের বিকার ছিল। যে সব যুবতী দাসী তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাদের রকম সকম একেবারেই ভালো নয়। তা নিয়ে কেউ আপত্তি করবার লোক ছিল না—কেন না এ বাড়ীর ঐ রকমই দস্তুর। আমি বুঝতুম আমার স্বামী যে অকলঙ্ক আমার এই বিশেষ সৌভাগ্য তাঁর কাছে অসহ্য।" আসল কথা হইতেছে, নিখিলেশ যে রূপহীনা বিমলাকে লইয়া বাড়াবাড়ি করিতেছে তাহা এই বাড়ীর দস্তুরের বিরুদ্ধে, এবং নিখিলেশের প্রতি তাঁহার যে আবাল্য সখ্যস্নেহ ছিল তাহার পক্ষে ইহা ছিল দৃষ্টিকটু। বিমলার সৌভাগ্যের ঈর্ষ্যাও ইহার সহিত বিজড়িত ছিল। নিখিলেশ যখন স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার শুরু করিল তখন কাহারো কাছে কোন উৎসাহ পায় নাই, এমন কি বিমলার কাছেও না, কেবল মেজোরাণী না বুঝিয়াও নিখিলেশের মুখ চাহিয়া তাহাতে প্রশ্রয় দিতেন। বিমলা ভাবিত, "আমি যে স্বামীর খেয়ালে

যোগ দিইনে সেইটের কেবল জবাব দেবার জন্যেই উনি এই কাণ্ডটি করতেন।"
একদিন মেজোরাণী যখন সেলাই করিতেছেন তখন বিমলা স্পষ্ট করিয়াই বলিল, "এ তোমার কী কাণ্ড! এদিকে তোমার ঠাকুরপোর সামনে দিশি কাঁচির নাম করতেই তোমার জিব দিয়ে জল পড়ে, ওদিকে সেলাই করবার বেলা বিলিতি কাঁচি ছাড়া যে তোমার এক দণ্ড চলে না!" ইহার উত্তরে মেজোরাণী যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে নিখিলেশের সহিত তাঁহার আবাল্যস্নেহমধুর সম্পর্কটি পরিস্ফুট হইয়াছে; "তাতে দোষ হয়েছে কী, কত খুসী হয় বল দেখি? ছোটবেলা থেকে ওর সঙ্গে যে একসঙ্গে বেড়েছি, তোদের মতো ওকে আমি হাসিমুখে কষ্ট দিতে পারিনে। পুরুষ মানুষ, ওর আর তো কোন নেশা নেই—এক, এই দিশি দোকান নিয়ে খেলা, আর ওর এক সর্ব্বনেশে নেশা তুই—এইখানেই ও মজবে!"

বিমলার ভালবাসার পূজায় আত্মবিস্মৃত নিখিলেশ মেজোরাণীর স্নেহের আবশ্যকতা অনুভব করে নাই। কিন্তু বিমলার মনোবৃত্তিতে যখন সে নিদারুণ ব্যথা পাইল তখন মেজোরাণীর সতর্ক সজাগ স্নেহধারা উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে শান্তির আশ্বাস বহন করিয়া আনিল; "ঠাকুরপো, তুমি করছ কী? লক্ষ্মী ভাই, শুতে যাও—তুমি নিজেকে এমন ক'রে দুঃখ দিয়ো না। তোমার চেহারা যা হয়ে গেছে সে আমি চোখে দেখতে পারিনে! এই ব'লতে ব'লতে তাঁর চোখ দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ ক'রে জল পড়তে লাগল। আমি একটি কথাও না ব'লে তাঁকে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে শুতে গেলুম।"

বিমলাকে মুক্তি দিয়া নিখিলেশের চিত্ত হইয়া গেল নিঃস্ব। বিমলাকে লইয়া সে কলিকাতায় যাইবে বটে কিন্তু শান্তি পাইবে কি করিয়া। এই সঙ্কটেও মেজোরাণীর স্নেহের পরিচয় তাহার চিত্ত ভরিয়া তুলিল। নিখিলেশ দেখিল তিনি বাড়ীর সমস্ত মায়া কাটাইয়া তাহার সঙ্গে কলিকাতা যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন; "এতক্ষণ পরে আমার এই বাড়ি যেন কথা ক'য়ে উঠ্‌ল। আমার বয়স যখন ছয় তখন ন' বছর বয়সে মেজোরাণী আমাদের এই বাড়িতে এসেছেন।... এমনি ক'রে শিশুকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত একটি সত্য সম্বন্ধ দিনে দিনে অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে জেগে উঠেছে; সেই সম্বন্ধের শাখা-প্রশাখা এই বৃহৎ বাড়ির সমস্ত ঘরে

আঙিনায় বারান্দায় ছাদে বাগানে তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে সমস্তকে অধিকার ক'রে দাঁড়িয়েছে। যখন দেখলুম মেজোরাণী তাঁর সমস্ত ছোট-খাট জিনিষপত্র গুছিয়ে বাক্স বোঝাই ক'রে আমাদের বাড়ির থেকে যাবার মুখ ক'রে দাঁড়িয়েছেন তখন এই চিরসম্বন্ধটির সমস্ত শিকড়গুলি পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন শিউরে উঠ্‌ল। আমি বেশ বুঝতে পারলুম কেন মেজোরাণী, যিনি ন' বছর বয়স থেকে আর এ-পর্য্যন্ত কখনও একদিনের জন্যও এ-বাড়ি ছেড়ে বাইরে কাটান নি, তিনি তাঁর সমস্ত অভ্যাসের বাঁধন কেটে ফেলে অপরিচিতের মধ্যে ভেসে চললেন। অথচ সেই আসল কারণটির কথা মুখ ফুটে বলতেই চান না—অন্য কত রকমের তুচ্ছ ছুতো তোলেন। এই ভাগ্যকর্তৃক বঞ্চিতা পতিপুত্রহীনা নারী সংসারের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র সম্বন্ধকে নিজের হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত অমৃত দিয়ে পালন করেছেন, তার বেদনা যে কত গভীর সে আজ তাঁর এই ঘরময় ছড়াছড়ি বাক্স পুঁটুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে যত স্পষ্ট ক'রে বুঝলুম এমন আর কোনও দিন বুঝি নি।" মেজোরাণীর হৃদয়ের গভীর উৎস হইতে উৎসারিত বেদনাবিজড়িত স্নেহের পরিচয় নিখিলেশের হৃদয়ে আঘাত করিল। একটা তোরঙ্গের উপর বসিয়া পড়িয়া নিখিলেশ বলিল, "মেজোরাণীদিদি আমরা দুজনেই এই বাড়িতে যেদিন নতুন দেখা দিয়েছি সেই দিনের মধ্যে আর-একবার ফিরে যেতে বড় ইচ্ছে করে।" ইহার উত্তরে তিনি যে কথা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার ব্যর্থ নারীজীবনের রিক্ততার গভীর হতাশ্বাস ধ্বনিত হইয়াছে,—"না ভাই, মেয়ে জন্ম নিয়ে আর নয়—যা সয়েছি তা একটা জন্মের উপর দিয়েই যাক, ফের আর কি সয়?"

সংসারে যে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন আছে একথা নিখিলেশ ভুলিয়াই গিয়াছিল। মেজোরাণীর ব্যবহারে তাহার সে ভুল ভাঙ্গিল; নিখিলেশ বুঝিল বিমলার প্রেম যদি সে নাও পায় তবুও তাহার জীবন ব্যর্থ হয় নাই।

নারীর পক্ষে বড় শক্ত প্রতিপক্ষ নারীর অপরাধ ক্ষমা করা,—মেজোরাণী নিখিলেশের মুখ চাহিয়া তাহাও করিলেন; বিমলা তাঁহারি টাকা চুরি করিয়াছে জানিয়াও তাহার সকল দোষ নির্বিবাদে ঢাকিয়া লইলেন।

রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরের সঙ্গে ষ্টিভেন্‌সনের *Prince Otto* উপন্যাসের বিশেষ ভাবসাদৃশ্য আছে। ষ্টিভেন্‌সের বই বহুকাল পূর্ব্বে রচিত বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে 'প্রিন্‌স্ অটো' পড়িয়া 'ঘরে বাইরে' লিখিয়াছিলেন এমন কথা বলা চলে না, কেন না উপন্যাস দুইটির ঘটনাসংস্থান সম্পূর্ণভাবে পৃথক। প্রথমশ্রেণীর কাব্য-শিল্পীর মনের ঐক্য যে স্থানকালপাত্রের ব্যবধান ছাড়াইয়া যায় তাহার এক প্রমাণ এইখানে পাইতেছি। ষ্টিভেন্‌সনের সেরাফিনা, অটো ও গোনড্রেমার্ক যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপ। গট্‌হোল্‌ড্‌-এর ঠিক অনুরূপ না হইলেও কাছাকাছি ভূমিকা হইতেছে চন্দ্রনাথবাবুর। কাউণ্টেসের ভূমিকার অনুরূপও ঘরে-বাইরেয় নাই, তবে অটোর উপর কাউণ্টেসের প্রভাব কতকটা নিখিলেশের উপর মেজোরাণীর প্রভাবের সঙ্গে তুলনা করা চলে, যদিও মনোবৃত্তি অনেকটা ভিন্নধরণের। প্রিন্স-অটোতে কাউণ্টেসকে দিয়া অটো নিজের ধনাগার হইতে মোহর চুরি করাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন আর ঘরে-বাহিরেয় সন্দীপ বিমলাকে তাহার স্বামীর অর্থ চুরি করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল। ষ্টিভেন্‌সনের উপন্যাসকাহিনীর মধ্য দিয়া একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুর বহিয়া গিয়াছে। ইহার উপসংহারও ironical ও পুরাপুরি মিলনান্ত। ঘরে-বাহিরেয় সুর কারুণ্যাত্মক ও serious, উপসংহার ট্রাজিক এবং অধিকতর শিল্পসঙ্গত।

৪

'যোগাযোগ'[১] যখন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে শুরু হয় তখন ইহার নাম ছিল 'তিন-পুরুষ'। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল কাহিনীটি তৃতীয় পুরুষ অবধি টানিবার। কিন্তু গল্প ফাঁদিবার পর তাঁহার কল্পনা পরিবর্ত্তিত হইল; যে-অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ বছরের জন্মদিনের কথা লইয়া উপন্যাসের পত্তন হইয়াছিল তাহার জন্মের সম্ভাবনার ইসারা করিয়াই তিনি কাহিনী শেষ করিয়া দিলেন। সম্ভবত এই কারণে[২] রবীন্দ্রনাথ বইটির নাম পাল্‌টাইয়াছিলেন; যোগাযোগের

[১] আশ্বিন ১৩৩৪ হইতে চৈত্র ১৩৩৫, পুস্তকাকারে আষাঢ় ১৩৩৬। [২] ইতিমধ্যে জলধর সেনের 'তিন পুরুষ' নামে উপন্যাস বাহির হইয়াছিল।

ভূমিকায় নামপরিবর্ত্তন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ কিছু মূল্যবান্ কথা বলিয়াছেন, "গল্প জিনিষটাও রূপ; ইংরাজিতে যাকে বলে ক্রিয়েশন্। আমি তাই বলি গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দ্দিষ্ট। 'বিষবৃক্ষ' নামটাতে আমি আপত্তি করি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—নামে দোষ নাই। কেন না ও-নামে গল্পের কোন ব্যাখ্যাই করা হয় নি।"

আমাদের দেশে যে বিবাহপ্রথা বর্ত্তমান আছে তাহাতে স্বামী-স্ত্রীর affinity বা আন্তরিক মিল নিতান্ত দৈবাধীন ব্যাপার। তবু-ও যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে সচরাচর কোন দুর্ঘটনা দেখা যায় না তাহার একমাত্র কারণ এই যে উভয় পক্ষে, অন্ততঃ স্ত্রীর পক্ষে, কোনরূপ পূর্ব্বসংস্কার বাধা হইয়া দাঁড়ায় না। আগেকার দিনে মেয়েদের অতি অল্পবয়সেই বিবাহ হইত, সুতরাং তাহাদের বৈবাহিক সংস্কার বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ীর আওতায় স্বামীর সম্পর্কে গঠিত হইত। অতএব সেখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে মসৃণতাহানির সম্ভাবনা ছিল কম। কিন্তু বেশি বয়সে বিবাহ হইলে মেয়েদের মনে পিতৃগৃহের স্নেহছায়ায় অভিজ্ঞতাহীন গাঢ় সংস্কারের শিকড় গাড়িবার সম্ভাবনা থাকে বেশি, সুতরাং এই-ধরণের কোন কোন মেয়ের পক্ষে স্বামীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা খুবই সম্ভব, এবং তাহা না হইলে, অর্থাৎ তাহার সংস্কারের সঙ্গে স্বামীর সংস্কারের বিরোধ ঘটিলে, সংসারে ট্রাজেডি ঘনায়। এরূপ ট্র্যাজেডি অনেক সময় শুধু অন্তরেই আবদ্ধ থাকে, বাইরে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি গলায়-দড়ি ইত্যাদিতে আত্মপ্রকাশ করে না। তখনি ট্রাজেডি হয় সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্করুণ। যোগাযোগের নায়িকা কুমুর ট্রাজেডি সেইরূপ নিষ্করুণ ট্রাজেডি। বিবাহকালে বয়স উনিশ না হইয়া যদি দশ হইত এবং যদি সে নূরনগরের চাটুয্যে-বাড়ীতে জন্মগ্রহণ না করিত এবং বিপ্রদাসের পাণিপল্লবতলে তাহার নবীন বয়ঃ অতিবাহিত না হইত তবে মধুসূদনের মনের অপরিসীম স্থূলতা সত্ত্বেও তাহার ঘর করিতে কুমুর কিছুমাত্র বাধিত না, এবং তাহার সঙ্গে মোতির মার দৃষ্টিকোণেও কোন পার্থক্য থাকিত না।

কুমুদিনী ছাড়া রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কোন নায়িকাই "পটের সুন্দরী" নয়। কুমুই এবিষয়ে ব্যতিক্রম। ইহার কারণও আছে। প্রাচীন অভিজাত বংশের মেয়ে সে, বহু পুরুষ ধরিয়া তাহাদের গৃহে বাছাই করা সুন্দরী মেয়ে বধূরূপে আসিয়াছে। সুতরাং সে-বাড়ীর ছেলে মেয়ে অসুন্দর হওয়াই অস্বাভাবিক।

"দেখতে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপ্‌ছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড; চোখ বড় না হোক্ একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি। রঙ শাঁখের মতো চিকণ গৌর; নিটোল দুখানি হাত; সে-হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ করতে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনায় সকরুণ ধৈর্য্যের ভাব।" "একরকমের সৌন্দর্য্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব আবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশি,—প্রতিক্ষণেই যেন সে প্রত্যাশার অতীত। কুমুর সৌন্দর্য্য এই শ্রেণীর।"

জন্মাবধি সে সংসারের উপর দুর্ভাগ্যের পাপদৃষ্টি দেখিয়া আসিয়াছে। সংসারের এই পড়ন্ত দশা, তাহার উপর মাতাপিতার মৃত্যুর নিদারুণতা কুমুর মনকে নিপীড়িত ও সঙ্কুচিত করিয়াছিল। সে-জন্য তাহার চিত্ত সর্ব্বদা কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত থাকিত, এবং দৈব-ইঙ্গিত গ্রহনক্ষত্রের ফলাফল ইত্যাদিতে আস্থা রাখিয়া কুমু মনে সান্ত্বনা আনিতে চেষ্টা করিত। তাহা ছাড়া তাহার মনে একটা স্বাভাবিক ভক্তিভাব, "একটি নিরবলম্ব ভক্তির স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাস" ছিল। বিপ্রদাস তাহাকে দিয়াছিল সুরের দীক্ষা। কুমুর ভক্তি সুরের ধারায় উপচাইয়া রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তিকে কল্পনায় ঘিরিয়া মানস-পটে নিজের জীবনের সার্থকতার এক অস্পষ্ট আলেখ্য আঁকিয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বে তাহার মনে যৌবনের বেদনা কোন সুস্পষ্ট রূপ লইয়া তাহার গোচর হয় নাই। ভাইদের উপর স্নেহভক্তি এবং সংসারের প্রতি প্রীতি তাহার হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইত। যেটুকু তাহার বেশি তাহা সে সুরের মধ্যেই যেন অস্পষ্টভাবে অনুভব করিত। সে জানিত তাহার বিবাহ হইবে, এবং সে ইহাও জানিত যে তাহার বিবাহের জন্য তাহার দাদা উদ্বেগ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু মনে মনে কুমু তাহার স্বামীর কোন কল্পনামূর্ত্তি গড়ে নাই। পুরাণ-কথায়, গানে সুরে সে রাধাশ্যামের যুগলরূপের মধ্যেই নিজের

প্রেমের আদর্শ মিলাইয়া লইয়াছিল। তাহার মায়ের কাছ হইতে জানিয়াছিল, স্বামিভক্তির রস মনকে কতটা ভরাইয়া তুলিতে পারে। তাই কোন বাস্তব স্বামীর কল্পনা না করিয়া স্বামিভক্তি-আদর্শটাকেই কুমু মনে মনে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল। "বুকের মধ্যে একটা অকারণ ব্যথা লাগ্‌ত, জান্‌ত না তার অর্থ কী। সেই ব্যথায় সন্ধ্যেবেলাকার ব্রজের পথের গোখুর-ধূলিতে ওর স্বপ্ন রাঙা হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারে নি-যে ওর যৌবনের অপ্রাপ্ত দোসর জলে স্থলে দিয়েছে মায়া মেলে, ওর যুগলরূপের উপাসনায় সেই করেছে লুকোচুরি, তাকেই টেনে এনেছে ওর চিত্তের অলক্ষ্যপুরে এসরাজে মূলতানের মীড়ে মূর্চ্ছনায়। কিছুদিন থেকে প্রত্যাশিত প্রিয়তমের কাল্পনিক আদর্শকে অন্তরের মাঝখানে রেখে এই যুবতী আপন হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাতে বসেছিল। তার যত পূজা যত ব্রত যত পুরাণ-কাহিনী সমস্তই এই কল্পমূর্ত্তিকে সজীব করে রেখেছিল। সে ছিল অভিসারিকা তার মানস-বৃন্দাবনে,—ভোরে উঠে সে গান গেয়েছে রামকেলী রাগিণীতে,— 'হমারে তুমারে সম্প্রীতি লগী হৈ শুন মনমোহন প্যারে'—···যাকে রূপে দেখবে এমনি করে কতদিন থেকে তাকে সুরে দেখ্‌তে পাচ্ছিল।" এই সুরসাধনাই কুমুর মনকে অতিশয় স্পর্শকাতর করিয়াছিল মধুসূদনের সংস্পর্শে।

সংসারে কুমুর সমবয়সী সঙ্গিনী কেহই ছিল না। সে-রকম কেহ থাকিলে কুমুর মন আইডিয়াল লইয়া অতটা মাতিয়া উঠিতে পারিত না, তাহার স্বামীর আদর্শ দুই পাঁচটা জানাশোনা স্বামীর তুলনায় আসিয়া মাটি-ঘেঁষা হইয়া উঠিত। সে জানিয়াছিল, স্বামীকে ভালোবাসা শ্যামসুন্দরকে ফুল-জল দিয়া পূজা করার মতই সহজ—গানের সুর যেমন অন্তর ভরাইয়া তোলে স্বামীর প্রেমও তেমনি তাহার ভক্তিকে উৎসারিত করিয়া দিবে।

স্বামীর আদর্শ সম্বন্ধে কুমুর কল্পনা তাহার সংসারের বাহিরে প্রসারিত হইতে পারে নাই। "ছেলেবেলা থেকে আমি যা কিছু কল্পনা করেছি সব তোমাদেরই ছাঁচে। তাই মনে একটুও ভয় হয় নি। মাকে অনেক সময়ে বাবা কষ্ট দিয়েছেন জানি, কিন্তু সে ছিল দুরন্তপনা, তার আঘাত বাইরে, ভিতরে নয়।"

'কুমু যখন শুনিতে পাইল যে যাহার সহিত ঘটক তাহার সম্বন্ধ আনিয়াছে

তাহার সহিত কোষ্ঠীর মিল হইয়াছে তখন তাহা সে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ মনে করিল। সেই-সময় আবার তাহার বাঁ চোখ নাচিয়া যেন কথাটাকে তাহার মনে পাকা করিয়া দিল; বিপ্রদাসের কোন আপত্তিকে সে খাড়া হইতেই দিল না। পরে তাহাকে অনেকবার ভাবিতে হইয়াছে, "দেবতার চেয়ে দাদার বিচারের উপর ভর করলে এত বিপদ ঘট্‌ত না।"

হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা সমস্ত ভক্তি লইয়া কুমুর হৃদয় তাঁহার স্বামীকে বরণ করিয়া লইতে উন্মুখ হইল। ইহার জন্য তাহার মন রঙীন হইয়াই ছিল। "সূর্য্য উঠবার আগে যেমন আলো হয় আমার সমস্ত আকাশ ভরে ভালোবাসা তেমনি করেই জেগেছিল।"

আঘাত আরম্ভ হইল বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই। মধুসূদনের দাম্ভিকতা, তাহার ধনগৌরব, এ সকলের পিছনে ছিল অবচেতন মনের হীনতাবোধ। এইজন্যই মধুসূদন তাহার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে কখনই সহজ ব্যবহার করিতে পারে নাই। কুমু মনকে শক্ত করিয়া ভক্তিকে একান্তভাবে অবলম্বন করিল; "মধুসূদন ব্যক্তিটিতে দোষ থাকতে পারে, কিন্তু স্বামী নামক ভাব-পদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন! সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।"

ভক্তির যেখানে বাস্তবভূমি নাই সেখানে সংসারের রূঢ় স্পর্শ হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া চলা শক্ত। আর যেখানে ভক্তির আলম্বনই রূঢ় আঘাত হানিতে থাকে সেখানে তো কথাই নাই। মধুসূদনের স্থূল হস্তাবলেপ কুমুর ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে লাগিল। "যে-একটি সহজ শুচিতাবোধ এই উনিশ বছরের কুমারী জীবনে ওর অঙ্গে অঙ্গে গভীর করে ব্যাপ্ত,...কর্ণের সহজ কবচের মতো" তাহারি মধ্যে কুমু নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিল। বিবাহের পরদিন স্বামিগৃহে যাইবার পথে একটি সামান্য ঘটনায় কুমুর ভবিষ্যৎ যেন প্রতিবিম্বিত হইল; "এমন সময় কুমুর কানে গেল সেলুন গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোক বলছে, 'দেখুন এই চাষীর মেয়েকে আড়কাটি আসাম চা-বাগানে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, পালিয়ে এসেছে; গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত টিকিটের টাকা আছে, ওর বাড়ি ডুমরাঁও, যদি সাহায্য করেন তো এই মেয়েটি বেঁচে যায়।' সেলুন গাড়ি থেকে একটা মস্ত তাড়ার

আওয়াজ কুমু শুনতে পেলে। সে আর থাকতে পারলে না, তখনি ডান দিকের জানালা খুলে তার পুঁতিগাঁথা থলে উজাড় করে দশটাকা মেয়েটির হাতে দিয়েই জানালা বন্ধ করে দিলে।” কিন্তু কুমুকে যে-আড়কাটি লইয়া চলিয়াছে তাহার হাত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবে কে।

স্বামিগৃহে আসিয়া কুমুর বিতৃষ্ণা বাড়িয়াই চলিল। এই দুস্তর মরুভূমির মধ্যে তাহার একমাত্র শীতল আশ্রয়স্থল দেবরপুত্র হাবলু। কিন্তু মধুসূদনের কঠোর শাসনে এইটুকু আশ্রয়ও সুলভ হইল না। মধুসূদন কুমুকে দৈবলব্ধ বস্তুর মতই দেখিয়াছিল এবং তাহার মন পাইবার জন্য তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা মত চেষ্টাও করিয়াছিল। কিন্তু কুমুর অন্তরের সর্ব্বাপেক্ষা কোমল স্থানে বারবার আঘাত করিয়া সে বিচ্ছেদকে কঠিনতর করিয়া তুলিল। বিপ্রদাসের উপর কুমুর ভক্তি ও স্নেহ তাহার মনে আগুন জ্বালাইয়া দেয়; “কুমুদিনীর উনিশটা বছর মধুসূদনের আয়ত্তের বাহিরে, সেইটে বিপ্রদাসের হাত থেকে এক মুহূর্ত্তেই ছিনিয়ে নিতে পারলে তবেই ও মনে শান্তি পায়। আর-কোনো রাস্তা জানে না জবরদস্তি ছাড়া।” জবরদস্তি করিয়া কুমুকে বশ করা বিধাতারও সাধ্যাতীত; বিপ্রদাসের কাছে সে ধৈর্য্যের মন্ত্র লইয়াছে। সম্পূর্ণ আত্মদান করিবে বলিয়া কুমুদিনী স্বামিগৃহে আসিয়াছিল, কিন্তু দান করিবে যাহাকে সে তো তাহার আত্মার ও আত্মসমর্পণের কোন মূল্য জানে না। উপরন্তু অজ্ঞাতসারে কুমুর সকল সংস্কারে সমস্ত মর্ম্মে বেদনা দিয়া তাহার মনের আবরণকেই দৃঢ়তর করিতেছে। “মধুসূদন যা চায় তা পাবার বিরুদ্ধে ওর স্বভাবের মধ্যেই বাধা।” কুমু ভাবিল, সহধর্ম্মিণী যদি না-ই হইতে পারি তবে দাসী হইয়া কর্ত্তব্যধর্ম্মে অটুট রহিব। কিন্তু সেখানেও গোল বাধিল।

“কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটি মাত্র রাস্তা আছে সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা।” মধুসূদনের পরম সান্ত্বনা এবং চরম ভরসা ছিল এই কল্পনা। তাহার মনের জবরদস্তি অবশেষে সেই অঘটনই ঘটাইয়া দিল,—উৎপীড়িতা তরুণীকে তাহার মনের আবরণ “যাতে করে নিজের কাছে তার ভালোলাগা মন্দোলাগার সত্যকে লুপ্ত” করিয়া “অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে নিজের

চৈতন্যকে” কমাইয়া দিয়াছিল—তাহা কাড়িয়া লইয়া নগ্ন করিয়া দিল এবং তাহার যে-দেহকে সে দেবতার পুণ্যসম্মিলনের নিত্যক্ষেত্র বলিয়া ভক্তি করিত এবং যে-দেহমাংসের স্থূলবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া একটি পরম স্পর্শের অনুভূতিতে পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল সেই দেহকে করিয়া দিল অশুচি। এইখানেই বন্দিনী রাজকন্যার পরাভব ঘটিল দৈত্যের কাছে। কুমুর মনে স্বাভাবিক ভক্তির উৎস যেন নিরুদ্ধ হইয়া গেল। “এতদিন কুমু বারবার বলেছে, আমাকে তুমি সহ্য করো—আজ বিদ্রোহিণীর মন বল্‌ছে, তোমাকে আমি সহ্য কর্‌ব কি করে? কোন লজ্জায় আন্‌ব তোমার পূজা? তোমার ভক্তকে নিজে না গ্রহণ করে তাকে বিক্রি করে দিলে কোন্ দাসীর হাটে,—যে-হাটে মাছ-মাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়, যেখানে নির্মাল্য নেবার জন্যে কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজার অপেক্ষা করে না, ছাগলকে দিয়ে ফুলের বন মুড়িয়ে খাইয়ে দেয়।” ইহার পর কুমুর বেদনা গভীরতর হইয়া উঠিল। শুধু তাহারি নয়, সনাতন নারীহৃদয়ের চিরন্তন অসহায়তা করুণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে কুমুর এই কয়টি কথায়,—“ঠাকুরপো, সংসারে তোমরা নিজের জোরে কাজ করতে পার; আমাদের-যে সেই নিজের জোর খাটাবার জো নেই। যাদের ভালোবাসি অথচ নাগাল মেলে না, তাদের কাজ কর্‌ব কী করে? দিন-যে কাটে না, কোথাও-যে রাস্তা খুঁজে পাইনে। আমাদের কি দয়া কর্‌বার কোথাও কেউ নেই?”

যতদিন মধুসূদন তাঁহার সহিত কঠিন ব্যবহার করিতেছিল ততদিন কুমুর সমস্যা ঢের সহজ ছিল। এখন মধুসূদন তাহার মন পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, কুমুর মনের দ্বন্দ্ব তাহাকে ব্যাকুলতর করিয়া তুলিতেছে। “স্বামীকে মন প্রাণ সমর্পণ কর্‌তে না পারাটা মহাপাপ, এ সম্বন্ধে কুমুর সন্দেহ নেই, তবু ওর এমন দশা কেন হোলো?” তাই যখন “মধুসূদন ওর হাত চেপে ধরে নাড়া দিয়ে বল্‌লে, তুমি কি কিছুতেই আমার কাছে ধরা দেবে না? তখন ব্যাকুল হয়ে কুমু মধুসূদনকে বল্‌লে, তুমি আমাকে দয়া করো।” এই অবসরে মধুসূদন কুমুদিনীর হৃদয়ের সব 'চেয়ে কাছে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিল। বিপ্রদাসের প্রেরিত কুমুর এসরাজ আনিয়া দেওয়াতে কুমুর মন আরও একটু নরম হইয়া আসিল। তাই মধুসূদনের কাছে এসরাজ বাজাইয়া গান করিতে যে

সঙ্কোচটুকু আসিতেছিল তাহা সে সহজেই জোর করিয়া কাটাইতে পারিল। গানের সুরে তন্ময় হইয়া কুমু নিজের উপলব্ধিতে আগেকার দিনের মত তন্ময় হইয়া গেল। "যে গানটি সে ভালোবাসে সেইটি ধর্‌ল ; 'ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে'। সুরের আকাশে রঙীন ছায়া ফেলে এল সেই অপরূপ আবির্ভাব, যাকে কুমু গানে পেয়েছে, প্রাণে পেয়েছে, কেবল চোখে পাবার তৃষ্ণা নিয়ে যার জন্যে মিনতি চিরদিন রয়ে গেল—'ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে।'" মধুসূদনের গৃহে কুমুর এই এক দিন মাত্র আত্মপ্রকাশ।

মধুসূদনের নিষ্ঠুরতার অপেক্ষা তাহার ভালবাসাকে কুমুর ভয় বেশি। কেন না মধুসূদনের আকাঙ্ক্ষা-অনুযায়ী দিবার মত তাহার কিছুই নাই। ভালবাসা না থাকিলেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে দাগ না পড়িতে পারে, কিন্তু যেখানে ভালবাসা আশা করিয়া শেষে বঞ্চিত হইতে হয় সেখানে স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে হইলে মনের অত্যন্ত দৃঢ়তা চাই। কুমুর মনে ছিল সেই দৃঢ়তা। মধুসূদনের সম্পর্কে সে ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইল। "আজ বুঝ্‌তে পেরেছি সংসারে ভালবাসাটা উপরি পাওনা। ওটাকে বাদ দিয়েই ধর্ম্মকে আঁকড়ে ধরে সংসারসমুদ্রে ভাস্‌তে হবে। ধর্ম্ম যদি সরস হয়ে ফুল না দেয়, ফল না দেয়, অন্তত শুকনো হয়ে যেন ভাসিয়ে রাখে।"

এবার মধুসূদনের মনের প্রতিক্রিয়াই সঙ্কট সংঘটন করিল। কুমুর দিকে মন দেওয়াতে তাহার ব্যবসায়ের কাজে শৈথিল্য আসিয়াছিল এবং তাহার ফলে কিছু গোলযোগ ঘটিল। কুমুর দিক হইতে মন ফিরাইয়া সে কাজে লাগিয়াছে এমন সময় নবীনের সদিচ্ছা-প্রণোদিত মিথ্যাকথা—"বৌরাণী তোমার জন্যে হয় তো জেগে বসে আছেন"—আবার তাহার মনে রঙের জোয়ার আনিল। সে গিয়া সশব্দে বিছানায় উঠিতে কুমুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অনপেক্ষিত মধুসূদনকে শয়নকক্ষে দেখিয়া সে নিজের অজ্ঞাতসারেই এতটা বিবর্ণ ও উচ্চকিত হইল যে তাহাতে মধুসূদনের রঙের আবেশ তখনি কাটিয়া গেল। এই সন্ধ্যাতে মধুসূদন-কুমুদিনীর পরস্পরের প্রতি মনোভাবের জটিলতা অনেকটা কাটিয়া গেল। কুমুদিনী মনে মনে জানিল, তাহার মনে মধুসূদনের সঙ্গ "এর পরে কড়া

পড়ে গেলে কোনো একদিন হয়তো সয়ে যাবে, কিন্তু জীবনে কোনোদিন আনন্দ পাব না তো।"

বাপের বাড়ী ফিরিয়া কুমু আর তাহার পূর্ব্বের স্থানটি সহজে খুঁজিয়া পাইল না। সে বুঝিল, "সংসারের গ্রন্থি কঠিন হয়েছে, কিন্তু ভালবাসার একটুও অভাব হয়নি।" কুমু স্থির করিল, "এই ভালবাসার উপর সে ভার চাপাবে না." সে মধুসূদনের সংসারে ফিরিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে মধুসূদন-শ্যামার সম্পর্ক বিপ্রদাসের কানে আসিল, কুমুর শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার প্রস্তাব আপাতত চুকিয়া গেল। এবার আর কুমু দাদার বিচারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে ভরসা পাইল না।

হস্তক্ষেপ করিল মধুসূদন। বাপের বাড়ীতে সাদাসিধা পোষাকে কুমুর অম্লানশ্রী দেখিয়া তাহার দখল করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। মধুসূদনের চোখরাঙানি ও হুমকি বৃথায় যাইত যদি-না কুমুর অদৃষ্টের ফাঁস শক্ত হইয়া দেখা দিত। সন্তানসম্ভাবিত কুমুদিনীকে তাহার পিতৃগৃহের ভালবাসা সংস্কার এবং মর্য্যাদাবোধ আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে যে মধুসূদনের হাড়কাটে আপনার দেহ পূর্ব্বেই বলি দিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ঠাকুর তাহাকে নিঃশেষে বঞ্চিত করেন নাই। কুমু বুঝিয়াছে, সে তাহার বিশ্বাসের কাছে, নিজের অন্তরাত্মার কাছে খাঁটি রহিয়া গিয়াছে, এবং তাই সংসারের সকল দাবীর বাহিরে তাঁহার যে আনন্দলোক সেখানে তাহার মুক্তি অপেক্ষা করিয়া আছে। এই সুরের, ভালবাসার, আনন্দের দীক্ষা বিপ্রদাসের কাছে সে পাইয়াছে। "দাদা, তুমি ঠাকুর বিশ্বাস কর না, আমি বিশ্বাস করি। তিন মাস আগে যে রকম করে করতুম, আজ তার চেয়ে বেশি করেই করি। তোমার কাছে এ-সব কথা বলতে লজ্জা করে,—কিন্তু আর তো কখনো বলা হবে না, আজ বলে যাই। নইলে আমার জন্যে মিছিমিছি ভাববে। সমস্ত গিয়েও তবু বাকি থাকে এই কথাটা বুঝতে পেরেছি; সেই আমার অফুরান, সেই আমার ঠাকুর। এ যদি না বুঝতুম তাহোলে এইখানে তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরতুম, সে-গারদে ঢুকতুম না। দাদা, এ-সংসারে তুমি আমার আছ বলেই তবে এ-কথা বুঝতে পেরেছি।"

যাহাকে সে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে তাহাকে অমর্য্যাদার আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্যই তাহার কাছ হইতে সে নিজেকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করিল। যাইবার পূর্ব্বে কুমু বিপ্রদাসকে বলিয়াছিল, "কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, কোনোদিন কোনো কারণেই তুমি ওদের বাড়ী যেতে পারবে না। জানি দাদা, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে, কিন্তু ওদের ওখানে যেন কখনো তোমাকে না দেখতে হয়। সে আমি সইতে পারব না।" হৈমন্তীও তাহার বাবাকে বলিয়াছিল, "বাবা আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আসো তবে আমি ঘরে কপাট দিব।"

কুমুদিনীর সঙ্গে মধুসূদনের পার্থক্য শুধু জাতিতে নয়, ধাতুতে ও রক্তে; কুমুর "স্বভাবটি জন্মাবধি লালিত একটি বিশুদ্ধ বংশ-মর্য্যাদার মধ্যে—অর্থাৎ এ যেন এর জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী বহু দীর্ঘকালকে অধিকার করে দাঁড়িয়ে," তাই "একটি আত্মবিস্মৃত সহজ গৌরব" সর্ব্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া রহিত। মধুসূদনের বংশ-মর্য্যাদা তাহার জন্মের বহু পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বাল্যকালে সে ছিল "রজবপুরের আন্দো মুহুরির ছেলে মেধো"। তাই ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দিয়া বংশ-মর্য্যাদাকে অবজ্ঞা করিবার তাহার এত প্রয়াস। মধুসূদনের চরিত্র যে-ধাতুতে সৃষ্ট তাহার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে কাঠিন্য। মনের কোমলতর বৃত্তি বলিতে যাহা বোঝায় তাহার ঝঞ্চাট তাহার একেবারেই ছিল না। তাহার সর্ব্বস্ব ছিল কর্ম্ম, এবং ইষ্ট ছিল সর্ব্ব বিষয়ে আত্মকর্ত্তৃত্ব। মধুসূদনের কঠিন রূঢ় ইতর ব্যক্তিত্বের অশ্লীলতা কুমুদিনীর মনে শুধু আঘাতই করে নাই গভীর লজ্জাও দিয়াছে।

"মধুসূদন দেখতে কুশ্রী নয় কিন্তু বড়ো কঠিন। ···সবসুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট; মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই কী একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে।" মধুসূদনের বয়স যৌবনের প্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে হৃদয়বৃত্তির চর্চ্চার কোন সুযোগ সে পায় নাই, এবং প্রবৃত্তিও ছিল না। সুতরাং কুমুদিনীর মন পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা গভীর হইলেও যোগ্যতা এবং ধৈর্য্যের অভাব ছিল গুরুতর। উপরন্তু নিজের অযোগ্যতাবোধজনিত অন্তরের

তীব্র নিষ্ফল রাগ এবং অনুরূপ কারণে বিপ্রদাসের প্রতি সুতীব্র ঈর্ষ্যা তাহাকে উল্‌টা পথেই চালিত করিল। "যার প্রতি মমতা তার প্রতি ওর একাধিপত্য চাই."—কুমু-যে দাদা• বিপ্রদাসকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাই তাহা মধুসূদনের এত অসহ্য। "মধুসূদন যা চায় তা পাবার বিরুদ্ধে ওর স্বভাবের মধ্যেই বাধা," "এই জাতের লোকেরাই ভিতরে ভিতরে যাকে শ্রেষ্ঠ বলে জানে বাইরে তাকে মারে।" অথচ কুমুর আকর্ষণ দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এই আকর্ষণ শুধু বাহিরের সৌন্দর্য্য নয়, কুমুর স্বভাবের সারল্য এবং "অনমনীয় আত্মমর্য্যাদার সহজ প্রকাশ।" কুমুব স্বভাব মধুসূদনের বিপরীত। এই বৈপরীত্যই তাহাকে প্রবল বেগে টানিতেছিল।

বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মধুসূদনের জীবনে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ ঘটে নাই। শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনের সংসারে "ঐশ্বর্য্যের জোয়ারের মুখেই" প্রবেশ করিয়াছিল, তাই তাহার প্রতি মধুসূদনের একটা প্রসন্নতা ছিল। "যৌবনের যাদুমন্ত্রে এই সংসারের চূড়ায় সে স্থান করে নেবে এমনো সঙ্কল্প" শ্যামার ছিল। মধুসূদনের অবচেতন মনও শ্যামার সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন ছিল না। কেবল তাহার দিনরাত ব্যবসায়-কর্ম্মে এবং চিন্তায় ঠাসা ছিল বলিয়া সে ওদিকে সচেতন হইতে পারে নাই। "এই কঠিন পরিশ্রমেব মাঝখানে চোখের দেখায় কানের শোনায় শ্যামার যে-সঙ্গটুকু নিঃসঙ্গভাবে পেত তাতে যেন মধুসূদনের ক্লান্তি দূর করত।"

অতর্কিতে তাহাকে শয়নকক্ষে দেখিয়া কুমুদিনীর আতঙ্ক যখন মধুসূদনকে দূরে ঠেলিয়া দিল তখন শ্যামাসুন্দরীর প্রেম তাহাকে সহজেই টানিয়া লইতে পারিল। শ্যামার প্রতি মধুসূদনের আকর্ষণ ভালবাসার আকর্ষণ নয়, তাহা শুধু রক্তমাংসের আকর্ষণও নয়। শ্যামা মোটেই দুর্ব্বোধ্য নয়, তাহার উপর সে মধুসূদনকে বড় বলিয়া মানে, তাই তাহার আদরে মধুসূদন যেন সুস্থ বোধ করে। "কুমু থাক্‌তে প্রতিদিন, ওর এই আত্মমর্য্যাদা বড়ো বেশি নাড়া খেয়েছিল।" "শ্যামার সম্বন্ধে ওর কল্পনায় রঙ লাগেনি, অথচ খুব মোটা রকমের আসক্তি জন্মেছে।" তাই আসক্তি সত্ত্বেও মধুসূদন শ্যামাকে সংসারের কর্ত্রীত্ব দিয়া বিশ্বাস করিতে পারে নাই, অথচ মোতির মায়ের উপর সে একেবারেই

প্রসন্ন ছিল না কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত। মধুসূদনের প্রকৃতিতে স্নেহ-পদার্থটার অংশ ছিল নিতান্ত কম। যেটুকু ছিল তাহা শুধু নবীনের ভাগেই পড়িয়াছিল। এই ভাইটিকে সত্যসত্য স্নেহ করিত বলিয়াই মধুসূদন তাহার স্ত্রীকে ভালচক্ষে দেখিত না, কল্পনা করিত, "মোতির মা যেন নবীনের মন ভাঙাতেই আছে। ছোটো ভাইয়ের প্রতি ওর যে পৈতৃক অধিকার বাইরে থেকে এক মেয়ে এসে সেটাতে কেবলি বাধা ঘটায়।"

আকৃতি-প্রকৃতিতে শ্যামাসুন্দরী কুমুদিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্যামাসুন্দরী "অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মোটা বল্‌লে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে বেশ একটু যেন ঘোষণা করছে। একখানি শাদা সাড়ির বেশি গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয় সর্ব্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেছে, কিন্তু যেন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণের মতো, বেলা যায়-যায় তবু গোধূলির ছায়া পড়েনি। ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ কালো চোখ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না, অল্প একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়। তার টস্‌টসে ঠোঁট দুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেছে। সংসার তাকে বেশি কিছু রস দেয়নি, তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামী বলেই জানে, সে কৃপণও নয়, কিন্তু তার মহার্ঘ্যতা ব্যবহারে লাগ্‌ল না বলে নিজের আশপাশের উপর তার একটা অহঙ্কৃত অশ্রদ্ধা।"

শুধু বয়সে নয় প্রকৃতিতেও শ্যামাসুন্দরী-মধুসূদনের মধ্যে বিলক্ষণ মিল ছিল। মধুসূদনকে শ্যামা সত্যসত্যই ভালবাসিত, অবশ্য নিজের ধরণে। বিবাহের পূর্ব্বে মধুসূদন ছিল অবসর-অভাবে উদাসীন। বিবাহের পরে অপ্রত্যাশিত-ভাবে সুযোগ আসিয়া পড়িল। বিচক্ষণ শ্যামা বুঝিয়াছিল, কুমুদিনীর রূপ ও বয়স মধুসূদনকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে বটে কিন্তু তাহার প্রকৃতি মধুসূদনকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে না। কুমুদিনীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই সে বয়সের তারতম্য ছুইয়া খোঁটা দিয়াছিল, "সত্যি করে বলো ভাই, আমার বুড়ো দেওরটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?" অতঃপর মধুসূদনের মনের গতিকের উপর শ্যামা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিল। কুমুদিনীর সম্পর্কে মধুসূদন প্রথম ঘা খাইতেই

শ্যামাসুন্দরী সাহস করিয়া মধুসূদনের হাত ধরিয়া ফেলিল। সে বুঝিল, তাহার স্পর্শ মধুসূদনের অসহ হয় নাই। দ্বিতীয় দিনে শ্যামার অভিসার অর্দ্ধপথে সমাপ্ত হইয়া গেল, তবে মধুসূদনকে ভাগ্যবান্ পুরুষ বলিয়া তাহার মনকে একটু প্রসন্ন করিল। তৃতীয়বারে মধুসূদনের তর্জ্জন লাভ করিয়াই শ্যামাকে ক্ষান্ত হইতে হইল, কেননা কুমুদিনী তখন মধুসূদনের মনকে রঙীন করিয়া তুলিয়াছে। "শ্যামাসুন্দরী কয়দিন থেকে একটু একটু করে তার সাহসের ক্ষেত্র বাড়িয়ে বাড়িয়ে চল্‌ছিল। আজ বুঝ্‌লে, অসময়ে অজায়গায় পা পড়েছে।" শ্যামার অশ্রুসজল সমবেদনা—"চালাকি করব না ঠাকুরপো! যা দেখ্‌তে পাচ্ছি তাতে চোখে ঘুম আসে না। আমরা তো আজ আসিনি, কতকালের সম্বন্ধ, আমরা সইব কী করে ?"—তাহার মনকে নাড়া দিয়া গেল। চতুর্থবারে শ্যামার আত্মসমর্পণ এবং কুমুদিনীর কাছে মধুসূদনের আত্মমর্য্যাদার চরম পরাভব যুগপৎ ঘটিয়া গেল। কুমুদিনী চলিয়া গেল, সুতরাং তাহাদের মিলনে আর কোন বাধা রহিল না। শ্যামা বুঝিল না যে ভালবাসিলেই বিশ্বাস করা যায় না। মধুসূদন তাহাকে অঙ্কলক্ষ্মী করিল কিন্তু গৃহিণী করিল না। অথচ কর্ত্রীত্বের লোভ তাহার মজ্জাগত। ফলে দুইজনের সম্পর্কে বিরোধ দেখা দিল। কুমুদিনীর উপর বিদ্বেষ শ্যামাকে মধুসূদনের কাছে আরো অবজ্ঞেয় করিল, মধুর-রসের সম্পর্কের মধুটুকু উবিয়া গেল। শ্যামাকেও মধুসূদন সুখী করিতে পারিল না।

বিপ্রদাসের ভূমিকায় বাঙ্গালাদেশের অস্তায়মান অভিজাত সংস্কৃতির গোধূলি-শেষের রক্তরাগ পাঠকের চিত্তে করুণমধুর শ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলে। বিপ্রদাসকে দেখিয়া মোতির মার মনে হইয়াছিল, "আহা কী সুপুরুষ। এমন কখনো চক্ষে দেখিনি ; ঐ-যে গান শুনেছিলেম কীর্ত্তনে—

গোরার রূপে লাগ্‌ল রসের বান,—
ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদীয়ায় পুরনারীর প্রাণ,

আমার তাই মনে পড়্‌ল।"..."যেন মহাভারত থেকে ভীষ্ম নেবে এলেন। বীরের মতো তেজস্বী মূর্ত্তি, তাপসের মতো শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা।"

বিপ্রদাস ছিলেন পজিটিভিষ্ট। বাইরের থেকে কোন দেবতাকে মানিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই বটে কিন্তু অন্তরের দেবতা তাঁহার জীবনে পূর্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার গভীর ধৈর্য্যে, তাঁহার মুখের শান্ত বিষাদের ছায়ায়, তাঁহার অন্তরের তপস্যা যেন বাহিরে ফুটিয়া উঠিত। বিপ্রদাস ভীষ্মের মতই নিঃসঙ্গ এবং ধৈর্য্যশীল। তিনি জানিতেন পৃথিবীতে ধৈর্য্যের সাধনাই কঠিনতম সাধনা, তাই চরম দুঃখের দিনে তিনি কুমুকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "লক্ষ্মী হয়ে শান্ত হয়ে থাক্, ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা কর্, মনে রাখিস্ সংসারে সেও একটা মস্ত কাজ।"

বিপ্রদাসের ধর্ম্ম ছিল অন্তরের পরম-উপলব্ধির ধর্ম্ম, গভীর আনন্দের এবং গভীর বেদনার ধর্ম্ম—গানের সুরের ধর্ম্ম। "কুমু, তুই মনে করিস্ আমার কোনো ধর্ম্ম নেই। আমার ধর্ম্মকে কথায় বল্‌তে গেলে ফুরিয়ে যায় তাই বলিনে। গানের সুরে তার রূপ দেখি, তার মধ্যে গভীর দুঃখ, গভীর আনন্দ এক হয়ে মিলে গেছে; তাকে নাম দিতে পারিনে।" বিপ্রদাসের কাছে কুমু এই গানের সুরের দীক্ষাই লাভ করিয়াছিল। সুরের সাধনায় বিপ্রদাসের মন মুক্তিলাভ করিয়াছিল সহজে, কিন্তু কুমুর পক্ষে তাহা সহজ হয় নাই। তাহার বালিকাজীবনের শিক্ষা তাহার নারীজীবনের সংস্কার ছিল এই মুক্তির পক্ষে দারুণ বাধা। তবে তাহার মনের সহজ ভক্তি এবং গানের সুরের মধ্যে তাহার দেবতার আনন্দ-আবির্ভাবের উপলব্ধি তাহার মুক্তিপথকে সুনির্দ্দিষ্ট ও প্রশস্ত করিয়াছিল।

মায়ের মৃত্যুর পর কুমুদিনী বিপ্রদাসের সেবার ভার লইয়াছিল। বিপ্রদাসও কুমুদিনীকে হাতে গড়িয়া মানুষ করিয়াছিল। তাই এই দুইটি ভাই-ভগিনীর পরস্পরের উপর স্নেহ-মমতা ও শ্রদ্ধা অতি অন্তরঙ্গভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। কুমুর কাছে বিপ্রদাস একাধারে পিতা মাতা ভ্রাতা এবং গুরু, বিপ্রদাসের কাছে কুমুদিনী একাধারে মাতা ভগিনী কন্যা এবং শিষ্যা। কুমু চিরকালের মত বিপ্রদাসের কাছ হইতে চলিয়া গেলে বিপ্রদাসের বিরহ হইল গুরুতর। কুমুদিনীর বিরহের পার আছে, তাহার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার

মন ভরিয়া উঠিবে। কিন্তু বিপ্রদাসের মন ভরিবে কিসে। কালিদাসের নাট্যকাব্যেও কণ্ব-শকুন্তলার বিদায়মুহূর্ত্ত এমনি সুগভীর বিষাদময়। সংসারের দাবী নিঃস্বত্বভাবে ত্যাগ করিয়া অথচ সকল দায় স্বীকার করিয়া লইয়া এই যে রোগশীর্ণ একলা মানুষটি তাহার স্নেহের একমাত্র পাত্রকে নিঃস্নেহ লাঞ্ছনা-ধিক্কারের মধ্যে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল, তাহারি অন্তরের অতলস্পর্শ শূন্যতা যোগাযোগের পরিসমাপ্তিকে সকরুণ রাগে রঞ্জিত করিয়াছে।

কতকটা নতুন-দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এবং কতকটা নিজের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ বিপ্রদাস-ভূমিকার পরিকল্পনা করিয়াছেন। বিপ্রদাসের কথায় রবীন্দ্রনাথ নিজেরই রসোপলব্ধির সুনিবিড় আনন্দবিষাদের পরিচয় পাই।

যোগাযোগের আখ্যানবস্তু সাধারণ উপন্যাসের মত বিস্তৃত নয়, কিন্তু চরিত্র-বিশ্লেষণ এবং সূক্ষ্মানুভূতির বিবরণ উপন্যাসের মত দীর্ঘায়ত।

'শেষের কবিতা'-য়[১] রোমান্সের উপর কাব্যধর্ম্ম ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পুরুষের অথবা নারীর পক্ষে যুগপৎ দুইজনকে পরস্পরবিরোধহীনভাবে ভালবাসা সম্ভব, এবং এই ভালবাসার এক পাত্র স্বামী বা স্ত্রী, অপর পাত্র সম্পর্ক- ও বন্ধন-বিরহিত; ইহাই হইতেছে শেষের কবিতার আখ্যানবস্তুর মর্ম্মকথা। বৈষ্ণব-সাধনার "পরকীয়া"-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে যেভাবে রূপান্তর লাভ করিয়াছিল শেষের-কবিতায় তাহারি পরিচয় পাই। ইহাতে অতি-আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং সমাজের ফ্যাশনের কৃত্রিমতার উপর তীব্র কটাক্ষ আছে। তবে শ্লেষ গোড়ার দিকে যত তীক্ষ্ণ শেষের দিকে তত নয়, সেখানে ব্যঙ্গের তীব্রতা কমিয়া গিয়া পাত্রপাত্রীর বাস্তবতা উজ্জ্বলতর হইয়াছে।

সবুজপত্রের যুগ হইতে রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্যের এবং কবিখ্যাতির উপর কটাক্ষ করিতে শুরু করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে নিন্দুকের নিন্দার জন্য রবীন্দ্রনাথ ক্বচিৎ কবিতায় অভিমান প্রকাশ করিয়াছেন বটে কিন্তু নিজেকে লইয়া ব্যঙ্গোক্তি

১ প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ভাদ্র-চৈত্র ১৩৩৫; পুস্তকাকারে ভাদ্র ১৩৩৬।

করেন নাই। হৈমন্তী গল্পে এই ব্যঙ্গদৃষ্টির প্রথমপ্রকাশ, তাহার পর চতুরঙ্গে। গুরুজি লীলানন্দ-স্বামী আধুনিক কবিকে মোটেই পছন্দ করিতেন না, কেন না তাঁহার লেখার মধ্যে সাত্ত্বিকতার গন্ধ তিনি বড় পাইতেন না, কিন্তু "আধুনিক কবির গানটা তাঁর চলে।" ঘরে-বাইরেয় শ্লেষ স্ফুটতর। সেখানে নিবারণ চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্বাভাস সন্দীপের ভাবান্তরে প্রকাশ পাইয়াছে; "হে আধুনিক বাংলার কবি, খোলো তোমার দ্বার, তোমার বাণী লুট ক'রে নিই, চুরি তোমারই—তুমি আমার গানকে তোমার গান করেছ—না হয় নাম তোমার হোলো কিন্তু গান আমার।" শেষের-কবিতায় নিবারণ চক্রবর্ত্তীকে খাড়া করিয়া কবি নিজের উপর একহাত লইবার উপলক্ষ্যে তাঁহার কাব্যের অতি-আধুনিক সমালোচকদিগকে নিরুত্তর করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে যাহারা গালি দেয় তাহারা যে তাঁহারি ভাব ও ভাষার সাহায্য না লইয়া পারে না—ইহাই নিবারণ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা পরোক্ষে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

শেষের-কবিতা একান্ত কাব্যরসাত্মক বলিয়া ইহার প্রধান চরিত্রগুলি কতকটা অস্পষ্ট বা অবাস্তব রূপ লইয়াছে। তবে যে-চরিত্রগুলি কমবেশি ব্যঙ্গবিদ্ধ—যেমন, সিসি, কেটি, এবং অমিত—সেগুলি কিছু স্পষ্ট হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের লেখা কোন কোন ছোট ও বড় গল্পে—যেমন পয়লা-নম্বরে ও দুইবোনে—দেখা যায় যে নায়িকার ভালবাসার দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে বৈপরীত্যের একটা বিশিষ্টতা আছে; একজন প্রাণস্ফূর্ত্ত, মুখর, receptive বা গ্রহণশীল এবং temperamental বা ভাবচঞ্চল, এবং আর একজন অধ্যয়ননিষ্ঠ, মিতভাষী, একাগ্র এবং ভাবশান্ত। শেষের-কবিতায় নায়িকার ভালবাসার দুই পাত্র অমিত-শোভনলালের মধ্যেও এই বৈপরীত্য।

অমিতর চিত্ত কবির চিত্ত। জীবনসমুদ্রের উপর উপর ভাসিয়া বেড়াইয়াই তাহার আনন্দ। জীবনের গভীরতার প্রতি সে কোন আকর্ষণ বোধ করে নাই, কেন না সে এমন কিছুরি সন্ধান পায় নাই বা সম্পর্কে আসে নাই যাহা তাহাকে সেদিকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। অমিতর স্বভাব ছিল natural বা স্বাভাবিক, এবং unconventional বা আচারব্যবহারে অকৃত্রিমতার পক্ষপাতী।

সে-জন্য যে-সমাজে সে বিচরণ করিত সেই-সমাজের কোন তরুণী তাহার চিত্তে গভীরতর আকর্ষণের বা অনুরাগের উদ্রেক করিতে পারে নাই। তাহার সমাজের কৃত্রিম এবং আড়ষ্ট পরিবেশে ক্লিষ্ট ও বিরক্ত হইয়া যখন দূরে নির্জনতার মধ্যে মনকে সুস্থ করিতে গিয়াছে তখনি সে নিতান্ত দৈবগতিকে লাবণ্যর সহিত পরিচিত হইল। লাবণ্য এমন কিছু সুন্দর মেয়ে নয়, কিন্তু দুর্লভ সংঘটনের রঙীন * মুহূর্ত্তে সে আবির্ভূত হওয়ায় অমিতর মজ্জা বিরুদ্ধ সমালোচনা মাথা উঁচু করিতেই পারিল না, তাহার মনে রঙ ধরিয়া গেল। "দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখ্‌লে। ড্রইংরুমে এ-মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিত না। পৃথিবীতে হয়ত দেখ্‌বার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।"

লাবণ্যর সৌন্দর্য্য এবং বেশভূষা দুইই চোখ-ঝলসানো কিছু নয়, সাধাসিধাই। তাহার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য তাহার সৌন্দর্য্যকে বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করিয়াছে, "উৎস-জলের যে উচ্ছলতা ফুটে উঠে, মেয়েটির কণ্ঠস্বর তারি মতো নিটোল। অল্পবয়সের বালকের গলার মতো মসৃণ এবং প্রশস্ত।"

* শিলঙের পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে আসন্নমৃত্যুর আশঙ্কা হইতে উদ্ধারের মুহূর্ত্তে এই মিলন অমিতকে যেন এক নূতন আনন্দময় জীবনের ভূমিতে আনিয়া ফেলিল। অমিতর "মনের উপর থেকে কত দিনের ধুলো-পর্দ্দা উঠে গেল, সামান্য জিনিষের থেকে ফুটে উঠ্‌ছে অসামান্যতা।" অমিতর বিস্ময়-অনুরাগ লাবণ্যর আত্ম-অনাদৃত হৃদয়ে নিজের মূল্যবোধ এবং আত্মসচেতনা আনিয়া দিল এবং অচিরে তাহার চিত্তে এক প্রকার গৌণ অনুরাগের সঞ্চার করিল।

অমিতর ভালবাসা যতই উচ্ছ্বসিত হয় লাবণ্যর মনে এই অনুভব ততই দৃঢ় হইতে থাকে যে অমিতর অনুরাগ লাবণ্য ব্যক্তিটির প্রতি ততটা নয় যতটা লাবণ্য তাহার চিত্তে যে জাগরণ ও আনন্দোচ্ছ্বাস আনিয়া দিয়াছে তাহার প্রতি। অর্থাৎ বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রের ভাষায় লাবণ্য ছিল অমিতর অনুরাগের আলম্বন এবং উদ্দীপন একত্র। অমিতকে সবচেয়ে আকর্ষণ করিয়াছিল লাবণ্যর পুরুষোচিত মননশীলতা, তাহার বলিষ্ঠ ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য। "অমিতর নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে ক্ষমা নেই,

বিচার আছে ধৈর্য্য নেই, ও অনেক জেনেছে শিখেছে কিন্তু শান্তি পায়নি—লাবণ্যর মুখে ও এমন একটি শান্তির রূপ দেখেছিল যে-শান্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।” লাবণ্যর মধ্যে গোরা-র ললিতার ছায়া যেন অনেকখানি আছে, তবে ললিতার অভিমান এবং আত্মবিদ্রোহের ভাব তাহার মধ্যে একেবারেই নাই। লাবণ্য যেন ললিতার পূর্ণবয়সের প্রতিচ্ছবি।

অমিত-চরিত্রে ধৈর্য্য এবং compromise-এর অভাবের জন্যই লাবণ্য অমিতর বিবাহপ্রস্তাব গ্রহণ করিবার পক্ষে মনে জোর পাইতেছিল না। লাবণ্যর মনে ভালবাসার মোহ নাই; “লাবণ্য বুদ্ধির আলোতে সমস্তই স্পষ্ট করে জানতে চায়। মানুষ স্বভাবতঃ যেখানে আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকে ভোলাতে পারে না।” লাবণ্যর প্রতি ভালবাসায় অমিত নিজেকে চিনেছে,—“তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায় নিজেরে চিনি।” কিন্তু লাবণ্যকে সে এখনো চিনিতে পারে নাই তাই তাহার ভালবাসা তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। উচ্চতর ভালবাসা মোহমুক্তি দেয়,—“না-চেনা জগতে বন্দী হয়েছি, চিনে নিয়ে তবে খালাস পাব, একেই বলে মুক্তি-তত্ত্ব।” লাবণ্যর আশঙ্কা, তাহাকে চিনিলে অমিতর অনুরাগের রঙ জলিয়া যাইবে, কেন না অমিত-যে ভালবাসে তাহার নিজের ভালবাসাকে। দাম্পত্যবন্ধন সহ্য করিবার মত গভীর একাত্মতা তাহাদের নাই। লাবণ্য ডুবারি-জাতীয়, স্থির-গভীর উপলব্ধিতেই তাহার জীবনের সার্থকতা; “জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে” তাহার মন যায় না, তাহার “জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই”। অমিত সাঁতারিয়া দলের, তাহার জীবনের পরম উপলব্ধি—“জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে, অথচ তার থেকে সরুতে সরুতে, নদী যেমন কেবলই তীর থেকে সরুতে সরুতে চলে তেমনি।” অমিতর আত্মচিন্তায় যেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে; “আমি কি কেবলি রচনার স্রোত নিয়েই জীবন থেকে স'রে স'রে যাব?”

ভালবাসাতেই যখন ভালবাসার সার্থকতা উপলব্ধ হয়, তখন সেই পরম প্রেম নিষ্কাম। লাবণ্য সেই পরম প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছিল, তাই পরম

ত্যাগও তাহার কাছে দুঃসহ হইল না; ভালবাসার জন্যই সে ভালবাসার পাত্রকে ধরিয়া রাখিল না। "আমি ত ভেবে পাইনে আমার চেয়ে ভালবাসতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে। ভালবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতদিন যা ছিলুম সব-যে আমার লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে আরম্ভের শেষ নেই। আমার মধ্যে এ-যে কত আশ্চর্য্য সে আমি কাউকে কেমন ক'রে জানাব? আর কেউ কি এমন ক'রে জেনেছে?"

অমিতর কথায় শোভনলালের স্মৃতি লাবণ্যর মনে জাগিয়া উঠিল এবং ভালবাসার আলোকে নবজাগ্রত তাহার চিত্তে শোভনলালের নীরব আত্মলোপী প্রেমের যথার্থ মূল্যটি ধরা পড়িল। এদিকে সিসি-লিসিদের আগমনে অমিতর কাব্যময় পরিবেশ ভাঙ্গিয়া গেল এবং কেটির উচ্ছ্বসিত আত্মপ্রকাশ লাবণ্য-অমিতর উপর শেষ যবনিকা টানিয়া দিল। অমিত বুঝিল, কেটির কৃত্রিম আবরণের মধ্যে তাহার অকৃত্রিম নারীহৃদয়টি ভালবাসার সুধাধারায় সরস হইয়া আছে। সে ইহাও অনুভব করিল, লাবণ্যকে তাহার সমাজ কখনই অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিবে না; বিবাহবন্ধনে তাহাদের প্রেমের মাল্য অচিরেই শুখাইয়া যাইবে।

মুহূর্ত্তের সৃষ্টিই নিত্যকালের আধার,—এই তত্ত্বের উপর শেষের-কবিতার প্রতিষ্ঠা। ধূলার দুলাল রঙীন নিমিষের চকিত স্ফুরণে যে-প্রেম পরাণে আবীর গুলাল ছড়াইয়া দেয়, যে-প্রেমের হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লাগিয়া চিত্ত ঝলমল করিয়া উঠে, সে-প্রেম মুহূর্ত্তের মধ্যেই অসীমতা পায়, সে-প্রেম নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ এবং অদ্বিতীয়। "গঙ্গার ও-পারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এ-পারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোন দিনই আর হবে না।"—কাব্যে এই-যে ক্ষণভঙ্গবাদ ইহা রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির একটি বিশেষ কোণ।

একভাবে দেখিলে মানুষ প্রেমের চেয়ে বড়, আর একভাবে দেখিলে প্রেম মানুষের চেয়ে বড়। বলাকার তাজমহল কবিতায় প্রেমাতিশায়ী মানুষের জয়গান, শেষের-কবিতায় মানুষাতিশায়ী প্রেমের মহিমস্তোত্র। শেষের-কবিতার নাম

হওয়া উচিত ছিল, "ক্ষণিকা," বাসরঘরের দ্বারোপান্তে আগাইয়া আসিয়া যে-ক্ষণ নরনারীর জীবনপ্রবাহে শাশ্বত রহিয়া যায় সেই ক্ষণের ক্ষণিকা,—

হে বাসর ঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।

৬

'দুইবোন',[১] 'শেষের কবিতা' এবং 'মালঞ্চ' এক-পর্য্যায়ের বই। নারীর প্রতি পুরুষের ভালবাসার দুই রূপ—এক রূপে সে পত্নী, অপর রূপে সে প্রিয়া। এই দুই-রূপ প্রেয়সীর মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকিলেও তাহা আত্যন্তিক নয়, এবং পুরুষের পক্ষেও যুগপৎ এই দুই-রূপ প্রেয়সীকে ভালবাসা অসম্ভব নয়, কেন না এই দুই-ধরণের ভালবাসার মধ্যে কোন স্বতোবিরোধ নাই। এই তথ্যটিই গল্প তিনটিতে বিভিন্ন দিক দিয়া উপস্থাপিত হইয়াছে। শেষের-কবিতায় ইহার কাব্যিক ও রোমান্টিক রূপ চিত্রিত হইয়াছে। দুইবোনে পুরুষের তরফে ইহার বাস্তব সমস্যার জটিলতা এবং নারীর তরফে সেই জটিলতার সমাধান দেখানো হইয়াছে। মালঞ্চে নারীর তরফে ইহার সংঘর্ষ এবং পুরুষের তরফে সেই সংঘর্ষের সমাধান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শুধু নামে নয়, গল্পটির প্রথম দুই ছত্রেই আখ্যানবস্তুর মর্ম্মকথা প্রকাশ পাইয়াছে;—"মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে 'এমন কথা শুনেচি। এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া।" শর্ম্মিলা হইতেছে মায়ের জাত, উর্ম্মিমালা প্রিয়ার। শশাঙ্ক হইতেছে গল্পটির একছত্র নায়ক, নীরদ তাহার প্রতিরূপ বটে কিন্তু তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বীর মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই। শর্ম্মিলা রবীন্দ্রনাথের আদর্শগত গৃহকল্যাণী; "বড়ো বড়ো শান্ত চোখ; ধীর গভীর তার চাউনি, জলভরা নবমেঘের মতো নধর দেহ, স্নিগ্ধ শ্যামল; সিঁথিতে সিঁদূরের অরুণ রেখা; শাড়ির কালো পাড়টি প্রশস্ত; দুই হাতে মকরমুখো মোটা দুই বালা,[২] সেই ভূষণের ভাষা প্রসাধনের ভাষা নয় শুভসাধনের ভাষা।"

[১] প্রথমপ্রকাশ বিচিত্রা অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩৩৯; পুস্তকাকারে ফাল্গুন ১৩৩৯।

[২] মকরমুখো প্লেন বালা রবীন্দ্রনাথের লেখায় নারী-কল্যাণীত্বের একটা প্রতীক।

নিঃসন্তান শর্মিলার সমস্ত চিন্তা ছিল তাহার স্বামীকে ঘিরিয়া। শশাঙ্ককে সকল আপদ-বিপদ এবং অপমান-লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিবার ভার সে সহজেই নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। কিন্তু শশাঙ্কর কার্য্যক্ষেত্রের ও ব্যক্তিত্বের উপর শর্মিলা কখনো নিজের ছায়াটুকুও ফেলে নাই।

আকৃতি-প্রকৃতিতে ঊর্মিমালা ছিল জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিপরীত। ঊর্মিমালার মনের উপরতলায় যেন আত্মবিস্তারের সূর্য্যালোক উছলিয়া পড়িত, আর শর্মিলার চিত্তের অন্তস্তলে আত্মসঙ্কোচের গভীর প্রবাহ ধীরগতিতে বহিয়া যাইত। ঊর্মিমালা এবং শর্মিলা এই দুই নারীর মধ্যে যেন আমাদের দেশের অতীতের এবং বর্ত্তমানের রোমান্টিক নারী-আদর্শ মূর্ত্ত হইয়াছে।

নীরদের মাহাত্ম্যে এবং তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ঊর্মিমালার মন অভিভূত হইয়াছিল। কৈশোরে সান্নিধ্য ঊর্মির মনে নীরদের প্রতি যেটুকু অনুরাগের রঙ ধরাইয়াছিল তাহা নীরদের আত্মগৌরববোধ এবং seriousness-এর জন্য লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। নীরদের গম্ভীর এবং নীরস প্রকৃতি ঊর্মির জীবনোচ্ছল সরস প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। কিন্তু শশাঙ্কর প্রকৃতিতে ঊর্মিমালার সঙ্গে অনেকটা সাম্যতা ছিল। তাই দুইজনে অত অনায়াসে এবং সহজে পরস্পরের অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। এই ঘনিষ্ঠতার পরিণাম কি দাঁড়াইতে পারে তাহা নারীর কাছেই প্রথমে ধরা পড়িবার কথা। শশাঙ্কর প্রতি সুগভীর প্রেম তাহার সম্বন্ধে শর্মিলার অনুভব শক্তিকে বাড়াইয়া দিয়াছিল, তাই এই পরিণতির আভাস সে-ই প্রথম দেখিয়াছিল। শশাঙ্ককে আনন্দ দিয়াই ঊর্মিমালা জীবনে সর্ব্বপ্রথম আপনার যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল এবং তাহার চিত্তে শশাঙ্কর প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। "শশাঙ্ক ঊর্মিকে নিয়ে আনন্দিত, সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ঊর্মিকে আনন্দ দেয়। এতকাল সেই সুখটাই ঊর্মি পায়নি। সে যে আপনার অস্তিত্বমাত্র দিয়ে কাউকে খুসি করতে পারে এই তথ্যটি অনেক দিন চাপা পড়ে গিয়েছিল, এতেই তার যথার্থ গৌরবহানি হয়েছিল।" অনুরাগ কিছু গাঢ়তর হইলেও ঊর্মির মনে অস্ফুট বেদনা জাগিতে লাগিল, কিন্তু তাহার মন যে ঠিক

কি চায় তাহা তখনো তাহার কাছে পরিস্ফুটভাবে ধরা পড়ে নাই। শর্ম্মিলার কথাতেই অবশেষে তাহার ঘোর কাটিয়া গেল ;—"প্রতিদিন ওর কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কী কাণ্ড করেছিস্ জানিস্ তা ?" প্রেমাস্পদের দোষ না দেখিয়া সকল অপরাধ অপর নারীর উপর চাপানো মেয়েদের চিরন্তন স্বভাব। শর্ম্মিলার কাছেও তাই দোষটা দেখা দিল সম্পূর্ণভাবে উর্ম্মির তরফেই।

শর্ম্মিলার নিদারুণ পীড়ার সঙ্কট-কালে শশাঙ্ক এবং উর্ম্মিমালা পরস্পরের এই কঠিন সম্পর্ক সহজভাবেই মানিয়া চলিল। তিন পক্ষই ভাবিল শর্ম্মিলার মৃত্যুর পর এই সম্পর্কের জটিলতা সম্পূর্ণভাবে কাটিয়া যাইবে। কিন্তু যাহা হইলে ভাল হয় তাহা প্রায়ই ঘটে না। শর্ম্মিলা সম্পূর্ণ অনপেক্ষিতভাবে আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচিয়া উঠিল, এবং শশাঙ্ক-উর্ম্মির সম্পর্কের জট আরো পাকাইয়া গেল। কিন্তু শর্ম্মিলা প্রিয়া-জাতের মেয়ে নয়, মা-জাতের মেয়ে। এখন সে-ই অগ্রসর হইয়া সমস্যার সহজ সমাধান উপস্থাপিত করিল, সে শশাঙ্ক-উর্ম্মির বিবাহ দিতে উদ্যুক্ত হইল। তখন শশাঙ্ক ও উর্ম্মি দুজনেরই চিত্তে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ; তাহাদের প্রেমস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল। শশাঙ্কর মন শর্ম্মিলার দিকে উন্মুখ হইয়া পড়িল, আর উর্ম্মি পলাইয়া গেল বিলাতে। উর্ম্মির প্রকৃতির, ব্যক্তিত্বের এবং প্রেমের পক্ষে ত্যাগের এই কঠিন পথ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

'মালঞ্চ'[১] গল্পে এই সমস্যারই উল্টা পিঠ দেখানো হইয়াছে। শর্ম্মিলা যদি মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া না আসিত এবং শশাঙ্কর প্রতি তাহার প্রেম যদি একান্ত স্বার্থহীন না হইত—অর্থাৎ সে যদি মা-জাতের না হইয়া প্রিয়া-জাতের মেয়ে হইত—আর উর্ম্মিমালা যদি তাহার স্নেহপাত্রী ভগিনী না হইয়া স্বামীর স্নেহপাত্রী ভগিনী বা সম্পর্কিতা নারী হইত তাহা হইলে সমস্যার জটিলতা যে-ভাবে দেখা দিত তাহাই মালঞ্চে চিত্রিত হইয়াছে। নীরজা প্রিয়া-জাতের মেয়ে। স্বামীর অনুরাগই তাহার কাম্য। তাহার অবর্ত্তমানে স্বামীর কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি তাহার কোন মমতা নাই, অন্তত পক্ষে তাহার অবচেতন মনে। নীরজার ভালবাসা একান্তভাবে আত্মসর্ব্বস্ব, সেইজন্য সরলা যে আদিত্যর বাল্যসখীরূপে

[১] প্রথমপ্রকাশ বিচিত্রা আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৪০, পুস্তকাকারে চৈত্র ১৩৪০।

একদিন স্নেহভাগিনী ছিল এই জ্ঞানও নীরজার বিশেষ ঈর্ষ্যার কারণ হইয়াছিল। কিন্তু নীরজা নিতান্ত স্বার্থপর নারী ছিল না। তাহার প্রেম দিয়া সে স্বামীর মনের এবং তাহাদের দুইজনের অপত্যস্থানীয় বাগানের দরদ বুঝিত। কিন্তু তাহার মরণান্তিক রোগ সত্ত্বেও বাঁচিবার ব্যাকুলতা মনের অনুদার দিকটাকে ধীরে ধীরে অনাবৃত করিয়া দিতেছিল। জোর করিয়া মনে দাক্ষিণ্য আনিবার চেষ্টা করিলেও দেহের দুর্ব্বলতা ও স্বার্থপর প্রেমের স্মৃতির জ্বালা তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে আত্মবিস্মৃত করিয়া দিত। কিছুতেই শেষ অবধি সে প্রসন্নমনে সরলার হাতে তাহার আসনটি দিয়া যাইতে পারিল না। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে নীরজার নিষ্ঠুর এবং বাস্তব আত্মপ্রকাশের ছবি দিয়া রবীন্দ্রনাথ একটা বিভীষিকাময় পরিবেশের মধ্যে গল্পটির উপসংহার করিয়াছেন।

আদিত্য শশাঙ্কর অপেক্ষা বলিষ্ঠতর চরিত্র। শশাঙ্কর মত সে কখনই আত্মবিস্মৃত হয় নাই, এবং তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞানও ছিল সর্ব্বদা সজাগ। তাহার মনের দ্বন্দ্ব শশাঙ্কর মনের দ্বন্দ্বের অপেক্ষা কঠিনতর। সরলার চরিত্র মধুর। মালঞ্চে নীরজাই প্রধান ভূমিকা, তাহার তুলনায় আদিত্যর এবং সরলার ভূমিকা অনেকটা অবান্তর।

দুই-বোন এবং মালঞ্চ এই দুই গল্পের রচনাভঙ্গি বিশেষ সরল, এবং কোথাও আখ্যানবস্তুকে ছাপাইয়া উঠে নাই। যোগাযোগের রচনায় কাব্যরসবাহী পদ্ধতির যে সরল পরিণতি দেখা গিয়াছে এ পদ্ধতি তাহার অপেক্ষাও সরল।

৮

অসহযোগ আন্দোলনের পর বাঙ্গালাদেশে নূতন করিয়া যে হিংসাত্মক বিপ্লব-প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছিল 'চার অধ্যায়'[১] গল্পে তাহারি তত্ত্ববিশ্লেষণ এবং স্বাধীন মূল্যনির্দ্ধারণ করিতে রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করিয়াছেন। দেশের কাজ যত মহৎই হউক না কেন তাহাতে যদি মানুষের আত্মপ্রসারণ ব্যাহত হয় এবং

১ প্রথমপ্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৪১। গল্পটি লেখা হয় সিংহলে (জুন ১৯৩৪)। শেষের-কবিতা লেখা হইয়াছিল বাঙ্গালোরে।

আত্মমর্য্যাদা নষ্ট হয় তবে তাহা ব্যক্তিজীবনের পক্ষে নিতান্ত অমঙ্গলজনক হইয়া উঠে—ইহাই চার-অধ্যায় গল্পের মূলকথা। দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের উপর রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি কত গভীর ছিল তাহা এই বইটিতে যেমন প্রকাশ পাইয়াছে এমন আর কোথাও নয়। সেই সঙ্গে কবির দূরবিহারী ও অন্তর্ভেদী রসদৃষ্টিতে হিংসাত্মক প্রচেষ্টার মারাত্মক গলদ যে কোন্ খানে তাহাও ধরা পড়িয়াছে। ইমোশনের উন্মাদনায় উন্মত্ত না হইয়া এবং শক্রর উপর বিদ্বেষ না রাখিয়া দেশের কাজ করাতেই যথার্থ মনুষ্যত্ব, যথার্থ বীরত্ব। এইখানেই ঘরে-বাইরের সন্দীপের চেয়ে চার-অধ্যায়ের ইন্দ্রনাথের মহত্ব। ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিল, "আমি অবিচার করব না, উন্মত্ত হব না, দেশকে দেবী ব'লে মা মা ব'লে অশ্রুপাত করব না, তবু কাজ করব, এতেই আমার জোর।" কানাই বলিল, "শত্রুকে যদি শত্রু ব'লে দ্বেষ না করো তবে তার বিরুদ্ধে হাত চালাবে কী ক'রে?" তাহার উত্তরে ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিল, "রাস্তায় পাথর প'ড়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালাই যেমন ক'রে, অপ্রমত্ত বুদ্ধি নিয়ে। ওরা ভালো কি মন্দ সেটা তর্কের বিষয়। ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব, সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে—এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা ক'রে আমার মানবস্বভাবকে আমি স্বীকার করি।" যেখানে স্বভাবের মর্য্যাদা বিপন্ন সেখানে ফললাভের কথা উঠিতে পারে না। তাই কানাই যখন বলিয়াছিল, "কিন্তু সফলতা সম্বন্ধে তোমার নিশ্চিত আশা নেই," তখন ইন্দ্রনাথ উত্তর দিয়াছিল, "না-ই রহিল তবু নিজের স্বভাবের অপমান ঘটাব না—সামনে মৃত্যুই যদি সব চেয়ে নিশ্চিত হয় তবুও। পরাভবের আশঙ্কা আছে বলেই স্পর্দ্ধা ক'রে তাকে উপেক্ষা ক'রে আত্ম-মর্য্যাদা রাখতে হবে। আমি তো মনে করি এইটেই আজ আমাদের শেষ কর্ত্তব্য।" বাঙ্গালীর বিপ্লব-আন্দোলনের মর্ম্মরহস্য এমন করিয়া কোথাও প্রকাশ পায় নাই।

এলা ও অতীন্দ্র দেশের ডাকে সাড়া দিয়া নিজেদের চরিতার্থকে দূরে ঠেলিয়া একজন নিজের পণকে আর একজন নিজের আত্মমর্য্যাদাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অবশেষে আত্মবলি দিল। দুইজনের এই আত্মদানে দেশের

স্বাধীনতা কিছুমাত্র আগাইয়া গেল না, অথচ তাহারা নিজেরাও অকৃতার্থ হইল এবং বৃহত্তর দেশও রহিল বঞ্চিত। আত্মস্ফূর্তির পথে তাহারা দশকে ও দেশকে যাহা দিতে পারিত তাহার মূল্য তো তুচ্ছ নয়।

বাল্যকালে বাতিকগ্রস্ত মায়ের অন্ধ প্রভুত্বের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতিক্রিয়াতে এলার মনে অল্পবয়স থেকেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নিরতিশয় দুর্দম হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার মন অবাধ্যতাব দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। "মেয়ের ব্যবহারে কলিকালোচিত স্বাতন্ত্র্যের দুর্লক্ষণ দেখে এই আশঙ্কা তার মা বারবার প্রকাশ করেছেন। এলা তার ভাবী শাশুড়ির হাড় জ্বালাতন করবে সেই সম্ভাবনা নিশ্চিত জেনে সেই কাল্পনিক গৃহিণীর প্রতি তাঁর অনুকম্পা মুখর হয়ে উঠ্‌ত। এর থেকে মেয়ের মনে ধারণা দৃঢ় হয়েছিল যে, বিয়ের জন্যে মেয়েদের প্রস্তুত হোতে হয় আত্মসম্মানকে পঙ্গু ক'রে ন্যায় অন্যায়বোধকে অসাড় ক'রে দিয়ে।" এলার বিবাহবিমুখতা দৃঢ়তর হইয়াছিল তাহার কাকীর ব্যবহারে। তাই সে উপায়ান্তর না দেখিয়া, সংসারবন্ধনে কোনদিন বদ্ধ হইবে না দেশের কাছে এইভাবে বাগ্‌দত্তা হইয়া ইন্দ্রনাথের দলে ভিড়িয়া গেল।

ইন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিল এলার আকর্ষণে এমন অনেক ছেলে আপনি আসিয়া ধরা দিবে, যাহাদিগকে অপর উপায়ে ধরা সহজ হইত না। সে ইহাও জানিত যে এলার দীপ্তিতে আর যে-ই পুড়ুক সে নিজে পুড়িবে না, "ভালোবাসার গুরুভারে তোমার ব্রত ডোবাতে পারে তুমি তেমন মেয়ে নও।" এলাকে দলে টানা সার্থক হইল যেদিন তাহার আকর্ষণে অতীন্দ্র আসিয়া ইন্দ্রনাথের ফাঁদে ধরা দিল। "ঐ যে অতীন ছেলেটা এসেছে এলার টানে, ওর মধ্যে বিপদ ঘটাবার ডাইনামাইট্ আছে," —উহার প্রতি তাই ইন্দ্রনাথের এত ঔৎসুক্য।

দেশের কাজ করিতে গিয়া এলা বুঝিল, "যতই দিন যাচ্ছে, আমাদের উদ্দেশ্যটা উদ্দেশ্য না হোয়ে নেশা হয়ে উঠ্‌ছে। আমাদের কাজের পদ্ধতি চলেছে যেন নিজের বেতালা ঝোঁকে বিচারশক্তির বাইরে।" ভাল না লাগিলেও সে ছাড়িতে পারে না। তাহাদের দলের ছেলেদের মধ্যে "সবচেয়ে ভালো যারা, যাদের ইতরতা নেই, মেয়েদের পরে সম্মান যাদের পুরুষের যোগ্য—'অর্থাৎ কলকাতার রসিক

ছেলেদের মতো যাদের রস গাঁজিয়ে-ওঠা নয়—' হাঁ তারাই ছুটল মৃত্যুদূতের পিছন পিছন মরীয়া হয়ে, তারা প্রায় সবাই আমারই মতো বাঙাল। ওরাই যদি মরতে ছোটে আমি চাইনে ঘরের কোণে বেঁচে থাকতে।" অতীন্দ্র বাঁধা পড়িয়াছে নিজের সঙ্কল্পের বন্ধনে।

এলার "হাতির দাঁতের মত গৌরবর্ণ শরীরটি আঁটসাঁট ; মনে হয় বয়স খুব কম কিন্তু মুখে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য।" অতীনকে দেখিয়া এলাই প্রথম তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং এলার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য তাহার স্পর্দ্ধাকে ছাপাইয়া অতীন্দ্রর মনে মরীচিকা জাগাইয়া দিয়াছিল। "যেন আকাশ থেকে কোন্ এক অপরূপ পাখী ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিনটাকে।" অতীন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া এলার "মন বললে, কোথা থেকে এলো এই অতি দূর-জাতের মানুষটি, চারদিকের পরিমাপে তৈরি নয়, শ্যাওলার মধ্যে শতদল পদ্ম। তখনি মনে মনে পণ করলুম এই দুর্লভ মানুষটিকে টেনে আনতে হবে, কেবল আমার নিজের কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছে।"

অতীন্দ্রর প্রেম এলার একান্ত কাম্য হইলেও সে প্রেম প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়া লইতে তাহার পরম সঙ্কোচ ছিল। এলা অতীন্দ্রর চেয়ে শুধু কয়েক মাসের ছোট তাই সে নিজেকে অতীন্দ্রর অপেক্ষা বড় বলিয়াই মনে করিত। নারীর বয়স বৎসরের মাপে নয়, মনের পরিণতিতে, তাই সে অতীন্দ্রকে বলিয়াছিল, "আমার আটাশ তোমার আটাশকে বহুদূরে পেরিয়ে গেছে।" অতীন্দ্রর হৃদয়কে তাহার প্রেম চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারিবে কি না এ সম্বন্ধে এলার সন্দেহ ছিল এই কারণে, "আমার আদরের ছোট খাঁচায় দুদিনে তোমার ডানা উঠ্‌ত ছট্‌ফটিয়ে। যে তৃপ্তির সামান্য উপকরণ আমাদের হাতে, তার আয়োজন তোমার কাছে একদিন ঠেক্‌ত তস্নানিতে এসে। তখন জানতে পারতে আমি কতই গরীব।" তাই এলা মনে মনে অতীন্দ্রকে দেশের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল।

অতীন্দ্রর ব্যক্তিত্বের প্রসার হইতে পারিত শুধু তাহার বিশেষ প্রতিভার প্রকাশে, এবং তাহার দ্বারাই সে দেশকে প্রকৃষ্টভাবে সেবা করিতে পারিত। "নিশ্চয় এমন মহৎ লোক আছেন সব যন্ত্রেই যাঁদের সুর বাজে, এমন কি, তুলো-

ধোনা যন্ত্রেও। আমরা নকল করতে গেলে সুর মেলে না।" অতীন্দ্র তাই ইন্দ্রনাথের দলে মিশিয়া দেশসেবার কাজে সুর মিলাইতে পারিল না। এখানে তাহার রুচি-অরুচির কথা তো নয়, স্বধর্ম-পরধর্মের কথা। এলা তাহাকে প্রশ্ন করিল, "কী হয়েছে তোমার অন্তু! কোন ক্ষোভের মুখে এসব কথা বলছ? তুমি কি বলতে চাও কর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য ব'লে মানা যায় না অরুচি কাটিয়ে দিয়েও?" অতীন্দ্র বলিয়াছিল, "রুচির কথা হচ্ছে না এলী, স্বভাবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বীরের কর্ত্তব্যই করতে বলেছিলেন অত্যন্ত অরুচি সত্ত্বেও; কুরুক্ষেত্র চাষ করবার উদ্দেশে এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স্ চর্চ্চা করতে বলেন নি।"

এলার প্রেমে অতীন্দ্রর কবিচিত্ত কাব্য-ইতিহাসের কল্পরূপ প্রত্যক্ষ করিল, তাহার মনে হইল যেন "দান্তে বিয়াত্রিচে জন্ম নিল ওদের দুজনের মধ্যে। সেই ঐতিহাসিক প্রেরণা ওর মনের ভিতরে কথা কয়েছে, দান্তের মতই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যে অতীন পড়েছিল ঝাঁপ দিয়ে।" ঝাঁপ দিয়াই সে বুঝিয়াছিল যে এ পথ তাহার নয়, কিন্তু তবু সে ফিরিতে পারিল না। "একে একে এমন সব ছেলেকে কাছে দেখলুম, বয়সে যারা ছোটো না হোলে যাদের পায়ের ধুলো নিতুম। তারা চোখের সামনে কী দেখেছে, কী সয়েছে, কী অপমান হয়েছে তাদের, সে সব দুর্বিষহ কথা কোথাও প্রকাশ হবে না। এরি অসহ্য ব্যথায় আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। বার বার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভয়ে হার মানব না, পীড়নে হার মানব না, পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরব তবু তুড়ি মেরে উপেক্ষা করব সেই হৃদয়হীন দেয়ালটাকে।"[১] কিন্তু হৃদয়হীন দেয়ালের চেয়ে মর্ম্মান্তিক হইল আর একটা ব্যাপার; "দিন যতই এগোতে থাকল চোখের সামনে দেখা গেল —অসাধারণ উচ্চ মনের ছেলে অল্পে অল্পে মনুষ্যত্ব খোয়াতে থাকল। এত বড়ো লোকসান আর কিছুই নেই।" অতীন্দ্রর ফিরিবার পথ নাই; "ওদের ইতিহাস নিজে দেখলুম, বুঝতে পেরেছি ওদের মর্ম্মান্তিক বেদনা, সেই জন্যই রাগই করি আর ঘৃণাই করি, তবু বিপন্নদের ত্যাগ করতে পারিনে।"

১ তুলনীয়, আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে। [প্রশ্ন (১৩৩৮)]

এলার সঙ্গে মিলনেরও উপায় নাই। দেশের কাজের নামে এক অনাথ বিধবার সর্ব্বস্ব লুট করিয়া তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। "যাকে বলি দেশের প্রয়োজন সেই আত্মধর্ম্মনাশের প্রয়োজনে টাকাটা এই হাত দিয়েই পৌঁচেছে যথাস্থানে। আমার উপবাস ভেঙেছি সেই টাকাতেই।" স্বভাবকে যে হত্যা করে সেই যথার্থ আত্মঘাতী; "স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোনো অহিতকেই সমূলে মারতে পারিনি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে। সেই পাপে, আজ তোমাকে হাতে পেয়েও তোমার সঙ্গে মিলতে পারব না।" কিন্তু এমনি অতীন্দ্রর আত্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত যে এলাকে ঈর্ষ্যার বিষ কামের ক্লেদ এবং পৈশাচিক প্রতিহিংসার চরম নির্য্যাতন হইতে বাঁচাইবার জন্য স্বহস্তে হত্যা করিতে হইল। নিজের বিষ খাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না যেহেতু মারাত্মক রোগ তাহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে মরণের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছিল।

"ইন্দ্রনাথকে ভালো দেখতে বল্‌লে সবটা বলা হয় না। ওর চেহারায় আছে একটা কঠিন আকর্ষণ-শক্তি। যেন একটা বজ্র বাঁধা আছে সুদূরে ওর অন্তরে, তার গর্জ্জন কানে আসে না, তার নিষ্ঠুর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়ে।... দৃষ্টিতে কঠিন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ঠোঁটে অবিচলিত সঙ্কল্প, এবং প্রভুত্বের গৌরব।" বিদেশ হইতে বিজ্ঞানের জয়পত্র লইয়া দেশে ফিরিয়া ইন্দ্রনাথ অধ্যাপনায় এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লাগিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু উপরওয়ালার ঈর্ষ্যা তাঁহাকে সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিল। "বুঝ্‌তে পারলেন এদেশে তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ অধ্যবসায়ের পথ রুদ্ধ।" যে জগদ্দল শক্তি দেশের বুকের উপর চাপিয়া কণ্ঠরোধ করিতেছে, ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে অসংখ্য বাধা সৃজন করিয়াছে, সেই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিতে তিনি নামিয়া পড়িলেন। "ওরা চারিদিকের দরজা বন্ধ ক'রে আমাকে ছোটো করতে চেয়েছিল, মরতে মরতে প্রমাণ করতে চাই আমি বড়ো। আমার ডাক শুনে কত মানুষের মতো মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা ক'রে চারিদিকে এসে জুটল;...কেন? আমি ডাকতে পারি ব'লেই। সেই কথাটা ভালো ক'রে জেনে এবং জানিয়ে যাব, তার পরে যা হয় হোক।...রসিয়ে তুল্‌লুম তোমাদের, মানুষ নিয়ে এই আমার রসায়নের সাধনা।"

ইন্দ্রনাথের ভূমিকা সূত্রধারের ; এলার এবং অতীশের ভূমিকা রঙ্গমঞ্চে জমিয়া উঠিলেই তাহার কাজ শেষ হইয়া গেল। তাই ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের কোন পরিণতি দেখানো হয় নাই।

আমাদের দেশের পুলিশ-শাসনের উপর রবীন্দ্রনাথের তীব্র ব্যঙ্গ তাঁহার কোন কোন গল্পে অভিব্যক্ত হইয়াছে, শুধু ঘরে-বাইরেয় এবং চার-অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ কিছু পরিমাণে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছেন। কানাই গুপ্ত পুলিশ কর্মচারী হইয়াও মনুষ্যত্ববর্জিত নয়। পুলিস-শাসনের যে-বিভাগ বিপ্লবী-প্রচেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান কতটা বেশি ছিল তাহার পরিচয় চার-অধ্যায়ে পাইতেছি। দেশীয় বিচারকদিগের উপর কটাক্ষও বড় তীব্র, "পাছে প্রমাণাভাবে শাস্তি না পাই বা অল্প শাস্তি পাই সেইজন্যে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মারফৎ সে মকদ্দমা ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে দায়ের না হয়ে যাতে বাঙালী জয়ন্ত হাজরার এজলাসে ওঠে কমিশনরের কাছে থেকে সেই রকম হুকুম আনাবে বলে মন্ত্রণা করে রেখেছে।"

চার-অধ্যায়ের পর রবীন্দ্রনাথ প্রায় পাচ বৎসর কোন গল্প লেখেন নাই। ইহার পর একেবারে ১৩৪৬ সালের আশ্বিন মাসে 'রবিবার' গল্প প্রকাশিত হয়। চার-অধ্যায়ের সঙ্গে এই গল্পটির সম্পর্ক পূর্ব্বে বিচার করিয়াছি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধ-পরিচয়

১

রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা-শিল্পী, মনীষাও তাঁহার সৃজনী-প্রতিভার মত উত্তুঙ্গ। "কবির্মনীষী"—একথা রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেই সম্পূর্ণ সত্য। মননশীলতার সঙ্গে রসসৃষ্টির অখণ্ড মিলন হইয়াছে তাঁহার প্রবন্ধে। এগুলি যেমন তাঁহার অসাধারণ মনস্বিতার পরিচায়ক তেমনি মৌলিক রসসৃষ্টিরও নিদর্শন।

প্রবন্ধ দুই রকমের,—বস্তুগর্ভ বা শাঁসালো অর্থাৎ thesis ("অস্তি"), এবং রসগর্ভ বা রসালো অর্থাৎ phesis ("ভাতি")। সাহিত্যবিচারে প্রবন্ধের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ভর করে বস্তু-পরিমাণে নয় রস-পরিমাপে। বৈজ্ঞানিক বা বিশুদ্ধ তথ্যবিচারমূলক প্রবন্ধ একান্তভাবে বস্তুপরতন্ত্র বলিয়া যথার্থ thesis এবং সাহিত্যের এলাকার বাহিরে। কিন্তু যদি এই-ধরণের প্রবন্ধে রসের স্পর্শ থাকে তবে তাহা সাহিত্যের অধিকারে আসে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বস্তুর ও রসের অদ্বৈতসিদ্ধি ঘটিয়াছে। অর্থাৎ "অস্তি" ও "ভাতি" মিলিয়া "প্রিয়" হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে পাঠ্যপুস্তকের কাটছাট নীরসতা না পাইয়া অনেকে ত্রুটি লক্ষ্য করেন। ইঁহাদের জানা উচিত, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বস্তুর ও রসের অখণ্ড সৃষ্টি, ছাচে-ঢালাই কৃত্রিম thesis নয়। "বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার ভদ্র অভ্যাস নেই, আমার অভ্যাস লক্ষ্মীছাড়া। ভেবে ব'লতে পারিনে, ব'লতে ব'লতে ভাবি, মৌমাছিদের পাখা যেমন উড়্‌তে গিয়ে গুন্ গুন্ করে।"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি তাঁহার প্রবন্ধের বেলাও সমান খাটে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চ্চা শুরু হয় কবিতা লিখিয়া। কিন্তু মাসিকপত্রের আসরে তিনি কবিতা এবং প্রবন্ধ দুই লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জ্ঞানাঙ্কুরে (১২৮২-৮৩) রবীন্দ্রনাথের একাধিক গদ্য ও পদ্য রচনা বাহির হইয়াছিল। এই-

সময়ের লেখায় একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হইতেছে পদ্য-রচনার তুলনায় গদ্য-রচনার সমধিক পরিপক্কতা। তাহার কারণ আর কিছু নয়, সমসাময়িক সাহিত্যে কাব্যের ভাষার তুলনায় গদ্যের ভাষায় উৎকর্ষ। কাব্যের ভাষা ও রীতি রবীন্দ্রনাথকে পুরাপুরি গড়িয়া লইতে হইয়াছিল; গদ্যরীতিতে তিনি বঙ্কিমের সরণি পাইয়াছিলেন, তাই গদ্যে সাধনা তাঁহার কিছু সহজ হইয়াছিল।

বিষয় ধরিয়া বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যায়,—(ক) সাহিত্যবিচার, (খ) বিশ্লেষণ, (গ) সমাজ ও ধর্ম, (ঘ) রাষ্ট্রনীতি, (ঙ) পর্যটন ও আত্মকথা, এবং (চ) কৌতুক-কল্পনা।

২

প্রবন্ধের আসরে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সাহিত্য-সমালোচনা লইয়া। ১২৮৩ সালের কার্তিক সংখ্যা জ্ঞানাঙ্কুরে ছাপা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' ইঁহার প্রথমপ্রকাশিত প্রবন্ধ বলিয়া সকলে মনে করেন। জীবনস্মৃতিতে প্রবন্ধটির উল্লেখ আছে। ইহা চতুর্থ খণ্ড জ্ঞানাঙ্কুরের শেষ প্রবন্ধ। আমার মনে হয় এই বছরের জ্ঞানাঙ্কুরে ইহাই তাঁহার একমাত্র প্রবন্ধ নয়। 'প্রলাপ'[1] হইতেছে পদ্য "প্রলাপ"; ইহার রচনারীতিতে বালক রবীন্দ্রনাথের হাতের অভ্রান্ত ছাপ রহিয়াছে। আর 'প্রলাপ-সাগর'[2] হইতেছে গদ্য "প্রলাপ"; ইহার রচনাশৈলীতে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য দুর্লক্ষ্য নয়।[3] 'প্রলাপ-সাগর' রবীন্দ্রনাথের লেখা হইলে ইহা তাঁহার প্রথম কৌতুক-রচনা।

চতুর্থ খণ্ড জ্ঞানাঙ্কুরের শেষ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ অচিরপ্রকাশিত তিনখানি তথাকথিত গীতিকাব্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে গীতিকাব্যের স্বরূপ ও মহাকাব্যের সহিত ইহার পার্থক্য ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগে চৌদ্দবছরের বালকের লেখা এই প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই, ইহার আত্যন্তিক মূল্যও

১ অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন ১২৮২, বৈশাখ ১২৮৩। ২ ফাল্গুন, চৈত্র ১২৮২, বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন ১২৮৩। ৩ যেমন, "এবে আমার এই সকল পাগলামীর পরিচয়ে কেহ আমাকে কবির শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম।"

উপেক্ষণীয় নয়। ভারতীয় সংস্কৃতি প্রতি সুদৃঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তখনি কবির মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে ভারতীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি বাহির হইল।[১] পাঠ্য-পুস্তক রূপে মেঘনাদবধকে গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল, সেইজন্য বালক রবীন্দ্রনাথ কাব্যটির উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁহার নিজের কবিপ্রতিভাও সর্ব্ববিধ কষ্টকল্পনা ও কৃত্রিম আড়ম্বরের প্রতি সবিশেষ বিতৃষ্ণ ছিল। এই দুই কারণে বালক কবি-সমালোচক মেঘনাদবধের উপর অতিরিক্ত নির্ম্মম হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ লিখিয়াও রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধকে রেহাই দেন নাই, পাঁচ বছর পরে এই নামে আবার একটি প্রবন্ধ লিখিলেন।[২] অতঃপর রবীন্দ্রনাথ আর কোন বিশ্লেষণাত্মক প্রতিকূল সমালোচনা-প্রবন্ধ লেখেন নাই। সাধনায় রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ-সমালোচনার অনুকূল পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। গ্রন্থ-সমালোচনা যে মৌলিক রচনার মতই সরস হইতে পারে তাহা ইতিপূর্ব্বে আমাদের সাহিত্যে অজ্ঞাত ছিল। লেখার অনুকূল অথবা প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করাই প্রকৃত সমালোচকের কাজ নয়; লেখক-পাঠকের মধ্যে মানসিক সেতুবন্ধন, অর্থাৎ রচনার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য যাহা সাধারণ পাঠকের চোখ এড়াইয়া যাইতে পারে তাহা স্পষ্ট করিয়া দেওয়া প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচকের কাজ; এবং ইহা রসস্রষ্টার কাজ। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই বিশুদ্ধ এবং যথার্থ সমালোচনা-ধারার প্রবর্ত্তক ও অদ্বিতীয় লেখক রবীন্দ্রনাথই।

দেশী ও বিদেশী সাহিত্য বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ ভারতীতে বাহির হইল। ইংরেজী-সাহিত্য বিষয়ে একটিমাত্র প্রবন্ধ[৩] 'সমালোচনা'-য় (১২৯৪) স্থান পাইয়াছে। 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' ও 'বসন্ত রায়' প্রবন্ধ-দুইটিতে কিশোর রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবকবিতা-পাঠের পরিচয় রহিয়াছে। ভাবগত কবিতার প্রতি

[১] বাকি অংশ ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল।
[২] ভারতী ১২৮৯ ভাদ্র সংখ্যায় প্রথমপ্রকাশিত এবং 'সমালোচনা'-য় সঙ্কলিত।
[৩] 'ডি প্রফণ্ডিস।'

তাহার সুগভীর আকর্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা'-য়। আধুনিক কাল মহাকাব্যের নয়, গীতিকাব্যেরই চর্চার অনুকূল—ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন'-এ। 'সঙ্গীত ও ভাব,' 'সঙ্গীত ও কবিতা' ইত্যাদিতে দেশীয় সঙ্গীতের প্রতি লেখকের অনুরক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

'আলোচনা'-য় (১৮৮৫) সঙ্কলিত 'বৈষ্ণব কবির গান' প্রবন্ধে বৈষ্ণব-কবিতার aesthetic আলোচনা আছে। প্রথম বর্ষের সাধনায় প্রকাশিত 'বিদ্যাপতির রাধিকা' এই বিষয় শেষ প্রবন্ধ।

বাঙ্গালা পল্লীগীতির ভিতরে সহজসুন্দর কবিত্বের যে অনায়াস প্রকাশ আছে তাহার দিকে রবীন্দ্রনাথই আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন। তাঁহার লেখার মধ্য দিয়াই আমরা বাউল-গানের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছি এবং মেয়েলি ছড়ায় কবিত্বের অপরূপ ছদ্মবেশ দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের অনুপম সৌন্দর্য্যবোধের বিশালতার ও উদারতার, তাঁহার সুগভীর রসবোধের অণিমার ও লঘিমার, অভ্রান্ত পরিচয় পাই তাঁহার লোকসাহিত্য-সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতে।

অধ্যাত্ম-সঙ্গীতের প্রভাব বেশি করিয়া পড়িয়াছিল রবীন্দ্রনাথের যৌবনপ্রান্ত হইতে, যখন তাঁহার কাব্যশিল্পে ব্যক্তিত্বের প্রসার নৈর্ব্যক্তিকতার দিকে পা বাড়াইয়াছে। কিন্তু বাউল-গানের মাধুর্য্য যে তাঁহাকে নবীন বয়সেও টানিয়াছিল 'বাউল-গান'-এ[১] তাহার পরিচয় পাই। যেখানে কষ্টকল্পনা প্রকট নয়, যেখানে আড়ম্বরের ঘনঘটায় কল্পনার দারিদ্র্য লুকাইয়া রাখিবার প্রয়াস নাই, যেখানে হৃদয়ের ভাব আপনিই প্রকাশ পাইয়াছে, সেখানে কবিত্বসুষমার এবং ভাবগাম্ভীর্য্যের একান্ত অভাব হইলেও রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতিশীল উদার কবিচিত্ত সহজে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাই কবিত্ববাহুল্যবর্জ্জিত, বিকৃতরুচি, সাময়িক-উত্তেজনাপ্রসূত, কবি-গানের অশেষ কদর্য্যতা সত্ত্বেও সেগুলির আলোচনা ও প্রকৃত মূল্য-নির্দ্ধারণে তিনি পরাঙ্‌মুখ হন নাই; "তথাপি এই নষ্টপরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ,—এবং ইংরাজরাজ্যের অভ্যুদয়ে যে

[১] প্রথমপ্রকাশ ভারতী বৈশাখ ১২৯০, সমালোচনায় সঙ্কলিত।

আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথপ্রদর্শক।"[১]

এই-ধরণের প্রবন্ধের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছে সাধনায় (১৩০১) প্রকাশিত 'মেয়েলি ছড়া'।[২] ছেলে-ভুলানো ছড়ার মধ্যে "একটি আদিম সৌকুমার্য আছে,—সেই মাধুর্য্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং সরস। শুদ্ধ মাত্র এইরসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই" রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের মেয়েলি ছড়ার সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।[৩] ইহার অনেককাল পূর্ব্বে তিনি পল্লীগীতি-সংগ্রহে চেষ্টিত হইয়াছিলেন।[৪] 'গ্রাম্য-সাহিত্য'[৫] প্রবন্ধে পল্লীগীতির মাধুর্য্য বিশ্লেষণ আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যর, বিশেষ করিয়া কালিদাসের কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের আবাল্য পরিচয় ছিল। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে লেখা অনেক প্রবন্ধে রামায়ণ-মহাভারতের ও কালিদাসের কাব্যের প্রসঙ্গ থাকিলেও সংস্কৃত সাহিত্য উপলক্ষ করিয়া স্বাধীন প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হইল সাধনার যুগে, এবং ইহার পরিণতি প্রদীপ-ভারতী-বঙ্গদর্শনে। এবিষয়ে একটি শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ হইতেছে 'কাব্যের উপেক্ষিতা'।[৬] 'প্রাচীন সাহিত্য'-এ (১৩১৪) সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অনুশীলনের ও অনুরাগের পরিচয় রহিয়াছে। এই অনুরাগ যে কত ভাবগভীর এবং কবিদৃষ্টির পরিচায়ক তাহা 'কাদম্বরী চিত্র'[৭] হইতে জানিতে পারি। এই প্রসঙ্গে 'তপোবন'-ও[৮] স্মরণীয়।

সাধনায় ও ভারতীতে প্রকাশিত আধুনিক সাহিত্যের-সমালোচনা-প্রবন্ধগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল 'আধুনিক সাহিত্য'-এ (১৩১৪)।

সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ে লেখা প্রথম দুইটি প্রবন্ধ হইতেছে 'বস্তুগত ও ভাবগত

[১] 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' (কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত গুপ্তরত্নোদ্ধার গ্রন্থের সমালোচনা), সাধনা জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ ; 'লোক-সাহিত্য'-এ (১৩১৪) 'কবি সঙ্গীত' নামে সঙ্কলিত। [২] লোকসাহিত্যে 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' নামে সঙ্কলিত। [৩] সা-প-প ১। [৪] ভারতী বৈশাখ ১২৯০। [৫] প্রথমপ্রকাশ ভারতী ফাল্গুন ১৩০৫, লোক-সাহিত্যে সঙ্কলিত। [৬] প্রথমপ্রকাশ ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ; প্রথমে হিতবাদী গ্রন্থাবলী সংস্করণের সমালোচনায় এবং পরে প্রাচীন-সাহিত্যে সঙ্কলিত। [৭] প্রথমপ্রকাশ প্রদীপ মাঘ ১৩০৬। [৮] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী মাঘ ১৩১৬।

কবিতা' এবং 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন'। এই দুই প্রবন্ধের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। তাহার পর লেখা হইল 'কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট'।[১]

সাহিত্যতত্ত্ব-ঘটিত আরো দুই চারিটি প্রবন্ধ ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। সাধনাতেও জের চলিয়াছিল। নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলিতে[২] রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ ধরিয়া দিলেন অপূর্ব্ব শোভনভাবে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'-ও (১৩৩১) দ্রষ্টব্য।

৩

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানসের গঠনে শুধুই কবিশিল্পীর ভাবদৃষ্টি ছিল না, তাহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের তথ্য- ও তত্ত্ব-দৃষ্টিও ছিল। বিজ্ঞান-বিষয়ে তিনি প্রথম জীবনে ছোটখাট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ভারতীতে ও বালকে তাহার সন্ধান মিলিবে। বিলাতী পত্রিকা হইতে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অনুবাদ করিয়া অথবা শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ও ছাত্রদের দ্বারা অনুবাদ করাইয়া প্রবাসীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি লিখিয়াছিলেন বিশ্ব পরিচয়'। বাঙ্গালা ব্যাকরণ বিজ্ঞানের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের গবেষণা অনেক বিষয়ে বিচিত্র আলোকপাত করিয়াছে; ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে অগ্রতম পথিকৃৎ বলিয়া রবীন্দ্রনাথের নাম স্মরণীয় থাকিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চতুর্থ বর্ষ জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত 'প্রলাপ-সাগর' আমি রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া অনুমান করি। প্রবন্ধটি যাহাকে বলে রসরচনা। তবুও ইহার প্রথম অংশে—"প্রথম উচ্ছ্বাসে"-এ—ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের প্রতি লেখকের কৌতূহলের পরিচয় পাই। বাঙ্গালা-ব্যাকরণের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসমন্বিত সজাগ ঔৎসুক্য ছিল অনেক কাল ধরিয়া। বালক-সাধনা-ভারতী-প্রবাসীর পৃষ্ঠায় তাহার নিদর্শন আছে।[৩] অনেকগুলি প্রবন্ধ 'শব্দতত্ত্ব'-এ (১৯০৯) সঙ্কলিত হইয়াছে।

[১] প্রথমপ্রকাশ ভারতী চৈত্র ১২৯৩। [২] 'সাহিত্য'-এ (১৩১৪) সঙ্কলিত।
[৩] যেমন, 'বাঙ্গালা উচ্চারণ' (বালক আশ্বিন-কার্ত্তিক ১২৯২), 'সংজ্ঞা বিচার' (ঐ ফাল্গুন), বাঙ্গালা বহুবচন' (ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫), 'সম্বন্ধে কার' (ঐ শ্রাবণ) ইত্যাদি।

৪

উপনিষদের সুধারসে পুষ্ট রবীন্দ্রনাথের সহজাত শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ ছিল প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি। ইহার পরিচয় তাঁহার প্রথমবয়সের গদ্যরচনার মধ্যেও সুপরিস্ফুট। প্রথমজীবনে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সংস্কারক "ব্রাহ্ম" ভাব একটু ছিল। ভারতীতে প্রকাশিত অনেক প্রবন্ধে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তর্কাতর্কিতে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মমতকাঠিন্যের পরিচয় আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত কখনো সাম্য হারায় নাই। তাঁহার কোন প্রবন্ধে যুক্তির দুর্ব্বলতা অথবা অহম্মন্যতাও প্রকাশ পায় নাই। পরবর্ত্তী কালে ভারতীতে এবং সাধনায় চন্দ্রনাথ বসুর মতামতের যে বিরুদ্ধ সমালোচনা তিনি করিয়াছিলেন তাহার যৌক্তিকতা অকাট্য।

চিন্তাশীলতায় নবীন রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহার প্রধান সমসাময়িকদিগকে বহুদূর ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন তাহা ১২৯২ সালে বালকে প্রকাশিত 'চিরঞ্জীবেষু' ও 'শ্রীচরণেষু' নামক নয়টি প্রবন্ধ পড়িলে বোঝা যাইবে। প্রবন্ধগুলি 'চিঠিপত্র' নামে (১২৯৪) সঙ্কলিত হইয়াছিল।[১] সে-সময়ে রক্ষণশীল ইংরেজী শিক্ষিতসমাজে "বৈজ্ঞানিক নব্য হিন্দুমত" বলিয়া যে অদ্ভুত অনুদার মনোভাব দেখা দিয়াছিল তাহার সরস, সুনিপুণ এবং গভীর সমালোচনা পাই এই পত্রাত্মক প্রবন্ধমালায়। পুরাতন আদর্শের ভক্ত ঠাকুরদাদা "ষষ্ঠীচরণ দেবশর্ম্মা" এবং আধুনিক আদর্শের উপাসক "নবীনকিশোর শর্ম্মা"—উভয়ের মনোভাবের বৈপরীত্য এবং মূলগত একত্ব রবীন্দ্রনাথ প্রতিপাদন করিয়াছেন গভীর ঐতিহাসিক এবং সুতীক্ষ্ণ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে। আমাদের দেশের প্রাচীন ও নবীন আদর্শ তুলনা ও যাচাই করিয়া রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে উভয়ের মধ্যে কোন বাস্তব বিরোধ নাই, এবং আমাদের দুরবস্থার আসল হেতু হইতেছে আমাদের চরিত্রগত উৎসাহহীনতা ও দুর্ব্বলতা।

নবীনকিশোরের চিত্তপটে ভারতবর্ষের অচির অরুণোদয়ের রক্তরাগ প্রতি-

[১] পরে 'সমাজ'-এ (১৩১৫) সঙ্কলিত।

ফলিত হইয়াছে, তাই তাঁহার মুখ দিয়া ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত বঙ্গদেশের অচিরাগামী গৌরবদীপ্তির ভবিষ্যদ্‌বাণী উদ্‌গীত হইয়াছে,

> আমাদের সাহিত্য যদি পৃথিবীর সাহিত্য হয়, আমাদের কথা যদি পৃথিবীর কাজে লাগে, এবং সে-সূত্রেও যদি বাংলার অধিবাসীরা পৃথিবীর অধিবাসী হইতে পারে—তাহা হইলেও আমাদের গৌরব জন্মিবে—হীনতা ধূলার মত আমরা গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিব।
>
> কেবলমাত্র বন্দুক ছুঁড়িতে পারিলেই যে আমরা বড়লোক হইব তাহা নহে, পৃথিবীর কাজ করিতে পারিলে তবে আমরা বড়লোক হইব। আমার তো আশা হইতেছে আমাদের মধ্যে এমন সকল বড়লোক জন্মিবেন যাহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের সামিল করিবেন ও এইরূপে পৃথিবীর সীমানা বাড়াইয়া দিবেন।

শেষ চিঠিতে ষষ্ঠীচরণ দ্বন্দ্বের মীমাংসায় চরম কথা বলিয়াছেন, "সম্মুখের দিকে অগ্রসর হও কিন্তু পশ্চাতের সহিত বিবাদ করিও না। এক প্রেমের সূত্রে অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে বাঁধিয়া রাখ।"

হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণতা বিষয়ে সাধনায় কয়েকটি চমৎকার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। 'কড়ায় কড়া কাহনে কাণা'-য় রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে আচার-বিচার-অন্ধসংস্কারের কড়াকড়ির ফলেই হিন্দুসমাজে নৈতিক-ব্যবহারে শৈথিল্য প্রবল হইতেছে। 'সমুদ্রযাত্রা'-য় দেখান হইয়াছে যে আমাদের সামাজিক জীবন অসামঞ্জস্যে পূর্ণ, এবং আমরা শুভবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া নিরর্থক শাস্ত্রবচন ও তুচ্ছ লোকাচার আঁকড়াইয়া রহিয়াছি।

সাধনার পালা শেষ হইবার পর রবীন্দ্রনাথের রচনায়—পদ্যের মত গদ্যেও—একটি আধ্যাত্মিকতার সুর লাগিল। নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অনেকগুলি প্রবন্ধে এই সুর প্রকট হইয়াছে। শান্তিনিকেতনে এবং অন্যত্র প্রদত্ত আচার্য্যের অভিভাষণগুলিও এই-প্রসঙ্গে আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথের চিত্ত কোন রকম কৃত্রিম বন্ধন স্বীকার করে নাই, ধর্ম্মবন্ধনও

নয়। ব্রাহ্মসমাজের আবেষ্টনে পরিবর্দ্ধিত হইয়াও তিনি নিজেকে "ব্রাহ্ম" বলিয়া কখনই ভাবিতে পারেন নাই। অবশ্য যতদিন ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্ণতা দেখা দেয় নাই ততদিন তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। যখন হইতে সঙ্কীর্ণ "ব্রাহ্ম" মনোভাব দেখা দিল তখন হইতে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নিজের যোগ শিথিল করিয়া দিলেন। 'গোরা' উপন্যাসে এবং 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ আছে। আত্মপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে হিন্দুত্ব সম্প্রদায়গত নয়, ইহা জাতিগত সমাজগত ও সংস্কারগত।

> হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্য্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি ধর্ম্ম। কিন্তু হিন্দু কোন বিশেষ ধর্ম্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্যপর্ব্বতের মধ্য দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাতপ্রতিঘাত পরম্পরায় একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অপরিসীম চিন্তাশীলতার সহিত রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতার সত্যকার ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'-য়।[১] বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষে ভারতবর্ষে ধ্বংসতাণ্ডবের পরিবর্তে সৃষ্টিসমন্বয় দেখা দিয়াছে বারবার। এই সমন্বয়ের সাধনাই বিশ্ব-সভ্যতায় ভারতবর্ষের বিশিষ্ট দান।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম তাঁহার একান্ত নিজের। বাহিরের কোন ধর্ম্মসংস্কার মানিয়া চলা তাঁহার ধাতে সহিত না। উপনিষদের উদার বাণীকে তিনি নিজের জীবনে রসোপলব্ধির দ্বারা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। প্রচলিত মত অনুসারে ইহাকে কোন সঙ্কীর্ণ "ধর্ম্ম"-পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। একটি চিঠিতে[২] রবীন্দ্রনাথ নিজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটু আভাষ দিয়াছিলেন; "শাস্ত্রে যা লেখে, তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারিনে—কিন্তু সে সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ

১ প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী বৈশাখ ১৩১৯। ২ বঙ্গভাষার লেখক পৃ ৯৭১-৭২।

অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বল্‌লেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিষটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে' তুল্‌তে পারব, সেই আমার চরম সত্য।"

কোন নাম দিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের ধর্মকে বলিতে হয় জীবনধর্ম। পরমাত্মার অংশ মানবাত্মারূপে লীলারসে জন্মজন্মান্তরের বিচিত্র অনুভূতি ও বিকাশের মধ্য দিয়া এক চরম পরিণতির অভিসারে চলিয়াছে,—এই বোধ এবং পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার-ঐক্য উপলব্ধি, হইতেছে মানবাত্মার সাধ্য, এবং এই সাধনার আনন্দই তাহার পুরস্কার। রবীন্দ্রনাথের কবি-আত্মা প্রকৃতি এবং মানবসমাজ দুইয়েরই মধ্যে বিরাট্ ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের অখণ্ড যোগটি উপলব্ধি করিয়াছিল। শুধু সূর্যের দীপ্তিতে চন্দ্রের কান্তিতে প্রকৃতির শ্যামসমারোহে নদীপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে নয়, বৃহৎপ্রকৃতি যেখানে রুদ্ররূপ ধারণ করিয়াছে সেখানেও, এমন কি বিশ্বপ্রকৃতির চরম নেতি মৃত্যুতেও এই উপলব্ধি তাঁহাকে ধন্য করিয়াছে। সুদূর প্রাক্-ঐতিহাসিক অতীতে বৈদিক ঋষি-কবি ঝড়ের তাণ্ডবে যেমন পর্জন্য দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করিতেন রবীন্দ্রনাথও তেমনি আবির্ভাব অনুভব করিয়া লিখিয়াছিলেন,

> বালি উড়িয়া সূর্যাস্তের রক্তচ্ছটাকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে—কশাহত কালোঘোড়ার মসৃণচর্মের মত নদীর জল রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—পরপারে স্তব্ধ তরুশ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিঃস্পন্দ আতঙ্কের বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তার পর সেই জলস্থল-আকাশের মাঝখানে নিজের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মেঘমধ্যে জড়িত আবর্তিত হইয়া উন্মত্ত ঝড় একেবারে দিশাহারা হইয়া আসিয়া পড়িল সেই আবির্ভাব দেখিয়াছি। তাহা কি কেবল মেঘ এবং বাতাস, ধূলা এবং বালি, জল এবং ডাঙা? এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে এ-যে অপরূপের দর্শন। এইত রস।[১]

বিরাটের উপলব্ধি বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যত সহজ মানুষের মধ্যে তত সহজ

[১] 'সুন্দর' (ভারতী ১৩১৮)।

নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বড় জটিল, তাহাতে শক্তিও আছে দুর্ব্বলতাও আছে, প্রেম-প্রীতিও আছে বিরোধ-আঘাতও আছে। সুতরাং মানুষের সঙ্গে সহজ সম্বন্ধ রাখাই বোধ করি সবচেয়ে কঠিন সাধনা, যদিও আমাদের প্রাচীন সাধক-কবিরা ইহাকেই "সহজ"-সাধনা নাম দিয়াছিলেন। এই সুকঠিন "সহজ"-সাধনাতেও রবীন্দ্রনাথের অনায়াস-সিদ্ধি। ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার অতিলৌকিক দৃষ্টি তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার রসসৃষ্টির সার্থকতা দেশকালাতিশায়ী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

> আবার মানুষের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহা মানুষকে ছাড়াইয়া গেছে। রহস্যের অন্ত পাই নাই। শক্তি এবং প্রীতি কত লোকের কত জাতির ইতিহাসে কত আশ্চর্য্য আকার ধরিয়া কত অচিন্ত্য ঘটনা ও কত অসাধ্য সাধনের মধ্যে সীমার বন্ধনকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছে। মানুষের মধ্যে ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্।[১]

রবীন্দ্রনাথের সাধনা মানবরসের সাধনা। তাই ইহাতে স্বার্থপর ও কঠিন বৈরাগ্যের স্থান নাই। "জগতের সম্বন্ধগুলিকে আমরা ধ্বংস করিতে পারি না তাহাদের ভিতর দিয়া গিয়া তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে পারি। অর্থাৎ সকল সম্বন্ধ যেখানে আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানে পৌঁছিতে পারি।"[২]

কিন্তু রসসাধনাই চরম সাধনা নয় রবীন্দ্রনাথের। "আমার স্বধর্ম্ম কী তা নিয়ে বিতর্ক আর ঘুচল না। এটুকু প্রতিদিনই বুঝতে পারি কবিধর্ম্ম আমার একমাত্র ধর্ম্ম নয়—রস বোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই আমার খালাস নয়।" রবীন্দ্রনাথ, এই মানুষসত্তাটি মহত্তর তাঁহার কাব্যের অপেক্ষা, তাঁহার তাবৎ শিল্পসৃষ্টির অপেক্ষা। তাই বৃহত্তর জীবনশিল্পের জন্য পদে পদে তাঁহাকে নিজের শিল্পসৃষ্টির মোহ, সঙ্কীর্ণরসের মোহ, কাটাইয়া চলিতে হইয়াছে। শিল্পীর পক্ষে এ বড় কঠিন সাধনা। এ-সাধনায় বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের সমানধর্ম্মা নাই। "আমার জীবনে নিরন্তর

[১] 'দুঃখ' (বঙ্গদর্শন ফাল্গুন ১৩১৪); 'ধর্ম্ম'-এ (১৩১৫) সঙ্কলিত।
[২] 'তত্ত্ব কিম্' (ঐ অগ্রহায়ণ ১৩১৩); ধর্ম্মে সঙ্কলিত।

ভিতরে ভিতরে একটি সাধনা ধরে রাখতে হয়েছে। সে-সাধনা হচ্ছে আবরণ মোচনের সাধনা, নিজেকে দূরে রাখবার সাধনা। আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা।” চতুরঙ্গে এই সাধনার রূপক দেখি। এই সাধনার সহযোগী হইতেছে “জীবনদেবতা” তত্ত্ব। মানবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার যে অবিচ্ছিন্ন অংশ—জীবাত্মা—জন্মজন্মান্তর বাহিয়া সুনির্দিষ্ট পরিণতির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে তাঁহাকেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন জীবনদেবতা। এই তত্ত্বের প্রথম আভাস পাই পঞ্চভূতের ডায়ারির প্রথম প্রবন্ধে;[১] “স্বভাবতঃ আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অতি গোপন নির্মাণশালায় বসিয়া এক অপূর্ব্ব নিয়মে আমাদের জীবন গড়েন।”[২]

প্রথমজীবনে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ে ভারতীতে যে-সব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেগুলিতে তাঁহার দুই-প্রকার মনোভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। প্রথমত ইংরেজের হাতে ভারতীয়ের অযথা অপমান ও লাঞ্ছনা এবং দ্বিতীয়ত গলাবাজি ও দরখাস্তবাজি সম্বল করিয়া পোলিটিকাল এজিটেশনের হীনতা। সাধনার যুগে তাঁহার রাষ্ট্রনীতিক মতামত নেতিত্ব কাটাইয়া সম- ও সত্য-দৃষ্টির ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই-বিষয়ে সাধনায় প্রকাশিত তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ, ‘ইংরাজ ও ভারতবাসী’[৩] অত্যন্ত মূল্যবান্। ইংরেজ-চরিত্রের যে ঔদ্ধত্য ও হৃদয়হীন স্বাতন্ত্র্য শাসক-শাসিতের মধ্যে ভেদ মানিয়া চলিয়া গৌরব বোধ করে তাহাই ইংরেজ-রাজত্বকে ধ্বংসের মুখে আগাইয়া দিবে,—ইংরাজ ও ভারতবাসী প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি এই যে অমোঘ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিল তাহা মিথ্যা হয় নাই।

> এই যে মনোহারিত্বের অভাব, এই যে অনুচর আশ্রিতবর্গের অন্তরঙ্গ হইয়া তাহাদের মন বুঝিবার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা, এই যে সমস্ত

[১] সাধনা ১২৯৯। [২] ‘অন্তর্যামী’ (ভাদ্র ১৩০১) ও ‘জীবনদেবতা’ (মাঘ ১৩০১) কবিতা দুইটি, এবং বঙ্গভাষার-লেখকে রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয় দ্রষ্টব্য।

[৩] প্রথমপ্রকাশ সাধনা আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০; ‘রাজাপ্রজা’-য় (১৩১৫) সঙ্কলিত।

পৃথিবীকে নিজের সংস্কার অনুসারেই বিচার করা, ইংরাজের চরিত্রের এই ছিদ্রটি অলক্ষ্মীর একটা প্রবেশ পথ।

"যে নিজের সম্মান উদ্ধার করিতে পারে না সে পৃথিবীতে সম্মান পায় না।" ইংরেজের সহিত সংঘর্ষে আমরা নিজের মান রাখিতে পারি না এবং সেজন্য আমরা ঘরে বাইরে কোথাও সম্মান পাই না। একথা সত্য, এবং অনেকেই বলিয়াছেন। কিন্তু কেন-যে আমরা ইংরেজের সংঘর্ষে আত্মসম্মান রক্ষায় অক্ষম তাহার মূল কারণ রবীন্দ্রনাথের অন্তঃপ্রসারী দৃষ্টিতেই ধরা পড়িয়াছে। লাঞ্ছিত বাঙ্গালীর মর্ম্মবেদনা এমন করিয়া আর কেহ বলিতে পারে নাই।

> অপমান সম্বন্ধে আমরা উদাসীন নহি কিন্তু আমরা দরিদ্র এবং আমরা কেহই স্বপ্রধান নহি, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক একটি বৃহৎ পরিবারের প্রতিনিধি। তাহার উপরে কেবল তাহার একলার নহে, তাহার পিতামাতা ভ্রাতা স্ত্রী পুত্র পরিবারের জীবনধারণ নির্ভর করিতেছে। তাহাকে অনেক আত্মসংযম আত্মত্যাগ করিয়া চলিতে হয়। ইহা তাহার চিরদিনের শিক্ষা ও অভ্যাস। সে যে ক্ষুদ্র আত্ম-রক্ষণেচ্ছার নিকট আত্মসম্মান বলি দেয় তাহা নহে, বৃহৎ-পরিবারের নিকট কর্ত্তব্যজ্ঞানের নিকট দিয়া থাকে। কে না জানে দরিদ্র বাঙ্গালী কর্ম্মচারীগণ কতদিন সুগভীর নির্ব্বেদ এবং সুতীব্র ধিক্কারের সহিত আপিস হইতে চলিয়া আসে, তাহাদের অপমানিত জীবন কি অসহ্য দুর্ভর বলিয়া বোধ হয়—সে তীব্রতা এত আত্যন্তিক, যে, সে অবস্থায় অক্ষমতম ব্যক্তিও সাংঘাতিক হইয়া উঠে কিন্তু তথাপি তাহার পরদিন যথাসময়ে ধুতির উপর চাপকানটি পরিয়া সেই আপিসের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে এবং সেই মসীলিপ্ত ডেস্কে চামড়ায় বাঁধান বৃহৎ খাতাটি খুলিয়া সেই পিঙ্গলবর্ণ বড়-সাহেবের রূঢ় লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতে থাকে। হঠাৎ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া সে কি এক মুহূর্ত্তে আপনার বৃহৎ সংসারটিকে ডুবাইতে পারে? আমরা কি ইংরাজের মত স্বতন্ত্র, সংসারভারবিহীন! আমরা

প্রাণ দিতে উদ্যত হইলে অনেকগুলি নিরুপায় নারী অনেকগুলি অসহায় শিশু ব্যাকুল বাহু উত্তোলন করিয়া আমাদের কল্পনাচক্ষে উদিত হয়। ইহা আমাদের বহুযুগের অভ্যাস।

মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কার-প্রবর্ত্তনের অনেককাল পূর্ব্ব হইতেই ভারতে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ জাগাইয়া রাখিয়া নিজেদের শাসন কায়েম রাখিবার চিন্তা করিতেছিলেন। এরূপ একটি ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'সুবিচারের অধিকার'[১] রচনা করেন। তৃতীয় পক্ষ যেখানে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে সেখানে আমাদের একমাত্র পন্থা হইতেছে নিজেদের দলাদলি মিটাইয়া যথাসম্ভব সংহত হওয়া।

নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন সম্পাদনার সময় রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন হইতে দূরে থাকিতে পারেন নাই। এইসময়ে লেখা নিটোল ও তেজস্বী প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের মনস্বিতার জ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে। এই প্রবন্ধগুলিতে যে সত্য নিষ্কপট- ও কঠিন-ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার উপযোগিতা ও মূল্য এখনো অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।[২]

রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন কিন্তু অসাংসারিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত practical ও বিচক্ষণ। সেই-কারণে তিনি আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আন্দোলনে গঠনের দিকেই বরাবর জোর দিয়া আসিয়াছেন। অরণ্যে রোদন হইলেও তিনি পুনঃপুন বলিয়াছিলেন যে সংহত হইয়া আত্মস্থ হইয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি না করিলে বাহিরের শত উত্তেজনাতেও কিছু হইবে না। আর চাই নির্ভীকতা। ইহার অভাবেই আমাদের আন্দোলনে গলার জোর সত্ত্বেও গায়ের জোর লাগিতেছে না। ১৩০৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যে অভিযোগ করিয়াছিলেন[৩] তাহা পরবর্ত্তীকালে বাঙালী যুবকের আচরণে কিয়ৎপরিমাণে সংশোধিত হইলেও আজ পর্য্যন্ত অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীর বিরুদ্ধে সমানভাবে খাটে,

[১] প্রথমপ্রকাশ সাধনা অগ্রহায়ণ ১৩০১, রাজাপ্রজা। রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকট' (বৈশাখ ১৩৪৮) দ্রষ্টব্য।

[২] 'আত্মশক্তি' (১৩১২), 'রাজাপ্রজা' (১৩১৫), 'সমূহ' (১৩১৫), 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৩১৮) ইত্যাদি গ্রন্থে সঙ্কলিত। [৩] 'মাভৈঃ' (বঙ্গদর্শন কার্ত্তিক ১৩০৯), বিচিত্র-প্রবন্ধ।

> বাঙালি আজকাল লোকসমাজে বাহির হইয়াছে। মুস্কিল এই যে জগতের মৃত্যুশালা হইতে তাহার কোনো পাস নাই। সুতরাং তাহার কথাবার্ত্তা যতই বড় হোক্, কাহারো কাছে সে খাতির দাবী করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আস্ফালনের কথায় অত্যন্ত বেসুর এবং নাকিসুর লাগে। না মরিলে সেটার সংশোধন হওয়া শক্ত।

আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্ত্তব্যের ও প্রচেষ্টার সুনিপুণ বিশ্লেষণ পাই 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষ্যে সভাপতির বক্তৃতা-য়।'[১] এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জননেতাদের প্রতি অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন।

'স্বদেশী সমাজ'[২] প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পল্লী-সংগঠনের যে পরিকল্পনা দিয়াছিলেন তাহা আমাদের প্রাচীন আদর্শের বিরোধী নহে এবং ইউরোপের আধুনিক (সোভিয়েট) আদর্শের সম্পূর্ণ অনুগত।

৬

ঘরের কোণ ছাড়িয়া বালক রবীন্দ্রনাথ যেদিন পিতার সঙ্গে হিমালয়ের পথে বাহির হইয়া পড়িলেন সেইদিন তাঁহার জীবনে এক বৃহৎ পরিবর্ত্তনের সূচনা করিল। ইহার পর হইতে আর গৃহকোণ তাঁহাকে কখনই দীর্ঘদিনের জন্য ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। ভ্রমণের নেশা তাঁহার জাগিয়া উঠিত বেশিদিন কোথাও নীড় বাঁধিয়া থাকিলে, এবং সেই নেশা ছুটিয়া গেলে আবার কোণের মানুষটি নীড়ের টান বোধ করিত। রবীন্দ্রনাথের বিদেশভ্রমণ, বিশেষ করিয়া কৈশোরে প্রথম বিলাত-প্রবাস, নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সুযোগ দিয়া তাঁহার কবিচিত্তকে বৈচিত্র্যের শিক্ষা দিয়াছিল। তাঁহার- প্রত্যেক বিদেশযাত্রা ও পর্য্যটনের অভিজ্ঞতা তাঁহার চিন্তাধারার নূতনতর প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়াছে। ইহার পরিচয় তাঁহার চিঠিপত্রে, ডায়ারিতে অথবা বিবিধ নিবন্ধে স্থান পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার বিলাত যান তখন তাঁহার বয়স সতেরো-আঠারো। সেখান হইতে তিনি ভারতীর জন্য কয়েকটি পত্রাকার প্রবন্ধ

[১] প্রথমপ্রকাশ বঙ্গদর্শন ফাল্গুন ১৩১৪ ; সমূহ। [২] প্রথমপ্রকাশ ঐ ভাদ্র ১৩১১, আত্মশক্তি।

লিখিয়াছিলেন।[১] 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' নামে এই পত্রগুলি তৃতীয় বর্ষের (১২৮৬) ভারতীতে প্রকাশিত হইতে থাকে, এবং পরে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।[২] ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য গ্রন্থ। কোন কোন পত্রের সঙ্গে ভারতীতে সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের যে মন্তব্য পাদটীকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাও পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

য়ুরোপ-প্রবাসী রবীন্দ্রনাথের এই পত্রগুলিতে তাঁহার মনোবিকাশ বেশ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম প্রথম ছিলেন তিনি নিতান্তই গৃহকাতর তাই গোড়ার চিঠিগুলিতে বিলাতি সমাজের ও জীবনযাত্রার প্রতি বিতৃষ্ণা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার পর বিলাতে তাঁহার মন বসিতে শুরু হইলে বিলাতি সমাজের ও আচার-ব্যবহারের নিন্দার ঝাঁজও কমিতে শুরু হইল, এবং বিলাতি সমাজের তুলনায় আমাদের সমাজের দোষগুলি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। এইখানেই দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতে থাকেন।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের রচনারীতিতে বিশেষত্ব আছে। পত্রগুলি সবই কথ্য-ভাষায়, একেবারে মুখের কথায়, লিখিত। ইহার পূর্বে বাঙ্গালা কথ্যভাষা নক্শা-জাতীয় ব্যঙ্গ-রচনায় ও নাটকে ছাড়া অন্যত্র ব্যবহৃত হয় নাই। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মুখামুখী একপ্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর এক প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।" কিছু অমার্জিত হইলেও রচনাভঙ্গি নিতান্ত সরল এবং মনোরম। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উৎপেক্ষাপ্রাচুর্য্য তখনি পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

[১] প্রকাশিত সকল পত্র ভারতীর জন্য লেখা হয় নাই। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন, "বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল,—কারণ, কয়েকটি ছাড়া বাকী পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই, বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে।" [২] ১৮০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্য্যটন-নিবন্ধ হইতেছে 'সরোজিনী প্রয়াণ'।[১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ষ্টীমার "সরোজিনী"-তে চড়িয়া রবীন্দ্রনাথ, দুই ভ্রাতা ও সসন্তান মধ্যম ভ্রাতৃজায়া সমভিব্যাহারে বরিশাল যাত্রা করিয়াছিলেন। এই যাত্রার উদ্যোগ পর্ব্বেই যে-দুর্য্যোগ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত বরিশাল অবধি যাওয়া ঘটে নাই, কিছু দূর গিয়া তাঁহাদিগকে ফিরিতে হইয়াছিল। প্রবন্ধটিতে শুধু এই ভ্রমণের কথাই নাই, রবীন্দ্রনাথ নানা সময়ে গঙ্গার উজানে যে সকল দৃশ্য দেখিয়াছিলেন এবং বাল্যে পেনিটির বাগানে ও কৈশোরে চন্দননগরে গঙ্গা ও গঙ্গার তীরভূমি তাঁহার মনে যে মোহের সঞ্চার করিয়াছিল তাহার পরিচয়ও ইহাতে রহিয়া গিয়াছে। "এই যে-সব ছবি আমার মনে উঠিতেছে, একি সমস্তই এইবারকার ষ্টীমার যাত্রার ফল? তাহা নহে। এ-সব কতদিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড় সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারিদিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি।" শিলাইদহ-সাজাদপুরে পদ্মার প্রেমে পড়িবার পূর্ব্বে কবি গঙ্গার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গঙ্গার এই দুইতীরের জনপদ-জীবনের রোমান্স তাঁহার প্রথম ছোট-গল্প দুইটিতে[২] ঈষৎ দ্যোতনা লাভ করিয়াছে। পদ্মাতীরের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয় নিবিড়তর, কেন না সেখানে তিনি শুধু ভাসিয়াই ফিরেন নাই, ডাঙ্গায়ও বাসা বাঁধিতেন। তাই সাধনার গল্পগুলিতে যে-জীবনরস ঘনীভূত হইয়াছে তাহা সবই রোমান্টিক নয়। পদ্মা-বাসের যুগে রচিত কোন কোন গল্পের মধ্যে গঙ্গাতীরের জনপদের ছবিও স্থান পাইয়াছে।[৩] যে-দৃষ্টি লাভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ছোট-গল্প রচনা করিয়াছিলেন সেই বিশিষ্ট রসদৃষ্টির প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল সরোজিনী-প্রয়াণে। "সূর্য্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই স্বর্ণচ্ছায় ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি, মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপরে লাবণ্যের মত সন্ধ্যার আভা—সুমধুর বিরাম, নির্ব্বাপিত কলরব,

১ ভারতী শ্রাবণ, ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ ১২৯১; বিচিত্র-প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্ত)। ২ 'ঘাটের কথা' এবং 'রাজপথের কথা'। ৩ বলা বাহুল্য, তখনো গঙ্গা দুইতীরে কলের বেড়ি পরে নাই।

অগাধ শান্ত—সে সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মত ছায়াপথের পরপারবর্তী সুদূর শান্তিনিকেতনের একখানি ছবির মত পশ্চিম দিগন্তের প্রান্তটুকুতে আঁকা দেখা যায়।”

স্বভাবোক্তির সঙ্গে সরসতার মিলন হওয়ায় সরোজিনী-প্রয়াণের ভাষায় একটি বিশেষ মাধুর্য্যের সঞ্চার হইয়াছে।

পরবর্ষে বালকে রবীন্দ্রনাথের দুইটি ভ্রমণবিষয়ক ছোট প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, ‘দশদিনের ছুটি’ এবং ‘বরফ পড়া (দৃশ্য)’। বর্ণনা সরল ও সরস।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলাত গিয়াছিলেন শিক্ষার্থী হইয়া।[১] তখন তাঁহার বয়স অল্প, তাই বিদেশী জীবনের গভীরতর পরিচয়-লাভে তখন তাঁহার কোন প্রবৃত্তি ছিল না। বয়স বাড়িলে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ জাগিল পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্ম্মস্থলে থাকিয়া বিলাতি জীবনের সত্য পরিচয় পাইতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করিলেন মেজোদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও বন্ধু লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে ১২৯৭ সালের ভাদ্র মাসে। এই যাত্রার পালাও দীর্ঘ হইল না। বিলাতি জীবনের ও ইউরোপীয় সভ্যতার যেটুকু পরিচয় পাইলেন তাহাই পর্য্যাপ্ত মনে মনে করিয়া দুই মাস যাইতে না যাইতে দেশে ফিরিয়া কবি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। আসল কথা হইতেছে যে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র মানসপ্রকৃতিতে একটা দ্বন্দ্ব ছিল সর্ব্বদা জাগরূক; তিনি ছিলেন পর্য্যায়ক্রমে একবার চির-পর্য্যটক এবং একবার ঘরকুনো। শেষের ভাবটাই ছিল প্রবলতর, তাই পর্য্যটনে ক্লান্তি আসিতে বিলম্ব হইত না।

এই স্বল্পকালস্থায়ী বিদেশভ্রমণের বৃত্তান্ত, ‘য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি’[২] নামে সাধনায় প্রকাশিত হইতে থাকে প্রথম সংখ্যা হইতে। সাধনায় এই ডায়ারি বাহির হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নূতন অভিজ্ঞতায় ইউরোপের ও ভারতবর্ষের সমাজ ও আদর্শ তুলনা এবং যাচাই করিয়া এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া চৈতন্য

[১] আরো একবার এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বিলাতের পথে রওনা হইয়াছিলেন কর্ত্তৃপক্ষের প্রেরণায়। এই যাত্রা ভঙ্গ হয় মাদ্রাজ পর্য্যন্ত গিয়া। [২] ‘য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি (দ্বিতীয় খণ্ড)’ নামে পুস্তকাকারে, সংক্ষেপ করিয়া ‘পাশ্চাত্যভ্রমণ’-এ সঙ্কলিত (১৩৪১)।

লাইব্রেরীর এক বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি প্রকাশি হয় পুস্তিকাকারে 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি (ভূমিকা), প্রথম খণ্ড' নামে।[১] এ প্রবন্ধে ভ্রমণকাহিনী কিছু নাই। তবে এক স্থলে তাঁহার বিরু সমালোচনার সরস বিশ্লেষণ আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বিরুদ্ধ-সমালোচকে যে আপত্তি তুলিতেন তাহার সাফাই রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন এইভাবে,

> অল্প দিন হয় আমার কোন লেখা যদি আমার দুরদৃষ্টক্রমে কারো অবিকল মনের মত না হত তিনি বল্‌তেন আমি তরুণ, আমি কিশোর, এখনো আমার মতের পাক ধরেনি। আমার এই তরুণ বয়সের কথা আমাকে এতকাল ধরে' এতবার শুনতে হয়েছে যে শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মনে এই একটা সংস্কার অজ্ঞাতসারে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, এই বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশ ছেলেই বয়স সম্বন্ধে প্রতিবৎসর নিরমিত ডব্‌ল্ প্রমোশন্ পেয়ে থাকে কেবল আমিই পাঁচজনের পাকচক্রে কিম্বা নিজের অক্ষমতা-বশতঃ কিছুতেই কিশোরকাল উত্তীর্ণ হতে পাবলুম না।
>
> এই ত গেল পূর্ব্বের কথা। আবার সম্প্রতি যদি আমার স্বভাব-বশতঃ আমার কোন রচনায় এমন একটা বিষম অপরাধ করে' বসি যাতে করে' কারো সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য হয়ে পড়ে তা হলে তিনি বলেন আমি সম্পদের ক্রোড়ে লালিতপালিত; দরিদ্র ধরাধামের অবস্থা কিছুই অবগত নই। আমার সম্বন্ধে এই প্রকারের অনেকগুলো কিম্বদন্তি প্রচলিত থাকাতে আমি সাধারণের সমক্ষে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত ভাবেই আছি। এই জন্য উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করে' অসঙ্কোচে উপদেশ দেবার চেষ্টা আমার মনে উদয় হয় না।

সমালোচকদের পক্ষ লইয়া রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রবন্ধরচনায় বৈশিষ্ট্যগুলি দেখাইয়া দিয়াছেন।

> প্রথমতঃ আমার ভাষা সম্বন্ধে আমি চিন্তিত আছি। আমি প্রচলিত ভাষা এবং পুঁথির ভাষার মধ্যে পংক্তিভেদ রক্ষা করি নি।

[১] বৈশাখ ১২৯৮।

দ্বিতীয়তঃ ভাবেরও আনুপূর্ব্বিক সঙ্গতি নেই। বিশ্বরচনা থেকে আরম্ভ করে দরখাস্ত রচনা পর্য্যন্ত সকল রচনাতেই হয় সাধারণ থেকে বিশেষের পরিণতি, নয় বিশেষ থেকে সাধারণের উদ্ভব, হয় সূক্ষ্ম হতে স্থূল, নয় স্থূল হতে সূক্ষ্ম, হয় বাষ্প থেকে জল, নয় জল থেকে বাষ্পোদ্গম হয়ে থাকে। আমি যে প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত কিসের থেকে কি করেচি ভাল স্মরণ হচ্চে না।...

তৃতীয়তঃ শত্রু মিত্র সকলেই মনে করবেন আমার এ লেখা প্র্যাক্‌টিকেল্ হয় নি; সমালোচনা এবং প্রতিবাদ করা ছাড়া সাধারণে এ'কে আর কোন ব্যবহারে আন্‌তে পারবেন না।... এখানকার অনেকেই স্বমনঃ-কল্পিত দর্শন বিজ্ঞানের সৃষ্টি করে' এবং স্বগৃহরচিত পলিটিক্‌স্ চর্চ্চা করে' এই নিরাধার চিন্তা জগতের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করে' থাকেন। কিন্তু আমি এম্‌নি হতভাগ্য যে এখানকার লোকেরাও আমার নামে অভিযোগ করে' থাকেন যে, আমার দ্বারা কোন প্র্যাক্‌টিকেল্ কাজ হচ্ছে না, কেবল আমি রাশি রাশি বাষ্প রচনা করে' দেশের বীর্য্যবলবুদ্ধি আচ্ছন্ন করে' দিচ্ছি।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জাপানে গমন করেন। এই-সময়ে তিনি যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহারি কয়েকখানি সঙ্কলন করিয়া 'জাপান-যাত্রী' রচিত হইয়াছিল।[১] ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও সিয়ামে গমন করেন। এই দুই পর্য্যটনের সময়ে লেখা ডায়ারি এবং চিঠিপত্র 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' এবং 'জাভা-যাত্রীর পত্র' নামে সঙ্কলিত হইয়া 'যাত্রীর'[২] অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পশ্চিমযাত্রীর-ডায়ারিতে ভ্রমণের কথা বিশেষ কিছুই নাই, তবে সে-সময়ে কবির চিত্তপটে যে-ভাব খেলিতেছিল তাহার পরিচয় যথেষ্টই আছে। যৌবনের ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে কবির কর্ম্মচঞ্চল জ্ঞাননিষ্ঠ মনের পরিচয়, কিন্তু পরিণত

[১] শ্রাবণ ১৩২৬, পরে ইহা 'জাপানে-পারস্যে'-র (শ্রাবণ ১৩৪৩) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

[২] জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬।

বয়সের ডায়ারিতে ও পত্রে তাঁহার ধ্যাননিষ্ঠ আত্ম-উপলব্ধিশান্ত চিত্তের প্রকাশ। কবির শেষের কয়েকটি রচনার মর্ম্মগ্রহণে এই ডায়ারি বিশেষ সাহায্য করে। ক্বচিৎ রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ও গভীর ব্যক্তিত্বের চকিত এক অভাবনীয় দর্শন মিলে। কবে-যে একদিন বিকাল বেলায় ছাদে বসিয়া চা খাইতে খাইতে সামনের বাড়ীর ছাদে ক্রীড়ারত উদ্দাম বালককে দেখিয়া তাঁহার মন বহিঃপ্রকৃতির সহিত একাত্মতা বোধ করিয়া বিশ্বানুভূতিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল সে-কথা হঠাৎ একদিন সমুদ্রবক্ষে জাহাজের ডেকে তাঁহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল।[১] সেই-সঙ্গে তাঁহার প্রথমজীবনের আত্মীয়বন্ধুসহচরদিগের ও কত পরিচিত-অপরিচিতদের কথা মনে পড়িয়া গেল, যাঁহারা নিজে অখ্যাত ও বিস্মৃত রহিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু কবির অচিরোদ্গত কবিত্বের মূলে স্নেহ-প্রীতি-সমবেদনায় ও শ্রদ্ধার জলসেক করিয়া তাহাকে ফুলে ফলে অপরিসীম ঐশ্বর্য্যে বিকশিত করিয়া তুলিতে তাঁহারা সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

'যাত্রী-র পর এই পর্য্যায়ের লেখা হইতেছে 'রাশিয়ার চিঠি'[২] এবং 'জাপানে—পারস্যে'[৩] সঙ্কলিত পারস্য-ভ্রমণকাহিনী অংশ।

রবীন্দ্রনাথ যে-সকল রচনায় নিজের কথা আনুষঙ্গিকভাবে উত্থাপন করিয়াছেন তাহা প্রসঙ্গক্রমে নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। তাঁহার আত্মকথা-সম্বন্ধীয় প্রথম রচনা হইতেছে বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বাঙ্গালার লেখক'-এ (১৩১১) তাঁহার প্রবন্ধ।[৪] এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজের "জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ" দিয়াছেন, এবং তাঁহার নিজের কাছে, তাঁহার কাব্যসৃষ্টির প্রেরণার মধ্যে, তাঁহার জীবন যে-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্ম্মাবধান করিবার পক্ষে এই প্রবন্ধটি বহুমূল্য।

অনেকটা এই প্রবন্ধেরই মহাভাষ্যরূপে কয় বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-

[১] রবীন্দ্রনাথের শৈশব ভৃত্যরাজতন্ত্রের অধীনে বন্দীদশায় কাটিয়াছিল বলিয়া শিশুর উদ্দাম ক্রীড়ারতিতে তিনি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতেন এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিতেন।

[২] বৈশাখ ১৩৩৮। [৩] শ্রাবণ ১৩৪৩। [৪] পৃ ২৬৫-২৭৪।

তি'[১] রচনা করেন। এই অনবদ্য বইখানিতে রবীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলীর একটি ম উৎকর্ষ প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের সমস্ত মাধুর্য্য ইহাতে মান আছে, এবং ভাষা কোথাও পল্লবিত হইয়া ভাবকে ছায়াচ্ছন্ন এবং য়কে বর্ণবহুল করে নাই। আত্মবিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ যে সংযম ও নিরাসক্তি খাইয়াছেন তাহা আর কোন সাহিত্যশিল্পীর অনুরূপ প্রচেষ্টায় দেখি নাই। জের কাব্যের মূল্য, নির্দ্ধারণে জীবনস্মৃতিতে কবি প্রায়ই অযথা কঠোর ইয়াছেন। জীবনস্মৃতির পূর্ব্বাংশ অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে ছেলেদের জন্য 'ছেলেবেলা' (১৯৪০) লিখিয়াছেন। 'গল্পসল্প' (১৯৪১) ইটিতেও কবির বাল্য-স্মৃতি কিছু কিছু প্রতিফলিত হইয়াছে।

চিঠিপত্রের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের জীবনীর ও চরিত্রের কতকটা অংশ প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র লেখক যিনি পত্র-রচনাকে সাহিত্যের একটা নূতন পদ্ধতির মর্য্যাদা দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পত্রাবলীর তিনটি সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে 'ছিন্নপত্র' (১৩১৯)[২] প্রথম। অপর দুইটি হইতেছে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (১৩৩৭) এবং 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৩৪৫)।[৩]

পরবর্ত্তী কালে চিঠিপত্রে যেমন রবীন্দ্রনাথ কোন ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ করিয়া নিজের মনের কথা বলিয়া চলিয়াছেন, প্রথম জীবনে তেমনি তিনি ছোট ছোট প্রবন্ধের আকারে নিজের নিরুদ্দিষ্ট চিন্তাকে রূপ দান করিতেন। এইরূপ কতকগুলি পত্র-প্রবন্ধ প্রথমে ভারতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়া পরে 'বিবিধ প্রসঙ্গ'[৪] এবং 'আলোচনা' (১৮৮৫) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিবিধ-প্রসঙ্গের 'সমাপন' শীর্ষক শেষ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে বইটি

১ প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ১৩১৮-১৩১৯ ; পুস্তকাকারে ১৩১৯।

২ বিচিত্র-প্রবন্ধে সঙ্কলিত 'জলপথে,' 'ঘাটে' এবং 'স্থলে' পর্যায়ের রচনাগুলিতে ছিন্নপত্রের এই কয়েকখানি চিঠির টুকরা ও রূপান্তর পাইতেছি।

৩ বই তিনখানি একত্র 'পত্রধারা' (১৩৪৫) নামে সঙ্কলিত হইয়াছে।

৪ ১৮০৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

"একটি মনের কিছু দিনকার ইতিহাস মাত্র। ইহাতে যে সকল মত ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহার সকলগুলি কি আমি মানি, না বিশ্বাস করি? সেগুলি আমার চিরগঠনশীল মনে উদিত হইয়াছিল এইমাত্র।" রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে যখন চন্দননগরে মোরান সাহেবের কুঠিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে বাস করিতেছিলেন তখন এই সব-প্রসঙ্গ লইয়া দুই ভাইয়ের মধ্যে আলোচনা চলিত 'সমাপন' প্রবন্ধের শেষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে? সেই নিস্তব্ধ নিশীথ? সেই জ্যোৎস্নালোক? সেই দুইজনে মিলিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ? সেই মৃদু গম্ভীরস্বরে গভীর আলোচনা? সেই দুই জনে স্তব্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা? সেই প্রভাতের বাতাস, সেই সন্ধ্যার ছায়া। একদিন সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান? তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু আমার এই ভাবগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রীর মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম বৃহৎ শোক। এই ঘটনার প্রারম্ভে আসিয়াই তিনি 'জীবনস্মৃতি' শেষ করিয়া দিয়াছেন। সমসাময়িক এবং পরবর্তী অনেক কবিতায় এই শোকের ছায়া পতিত হইয়াছে। ভারতীতে তিনি 'পুষ্পাঞ্জলি'[১] নামে যে আত্মচিন্তা প্রকাশ করেন তাহার বিষয়ও ইহাই। বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ লঘুতর ভঙ্গিতে এইধরণের কয়েকটি "কথিকা" লিখিয়াছিলেন, সেগুলি 'লিপিকা'-য় সংগৃহীত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্ফূর্তিতে তাঁহার এই ভ্রাতৃজায়ার স্নেহ এবং উৎসাহ যে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিল তাহা পুষ্পাঞ্জলি হইতে বোঝা যায়।

সাধনায় 'ডায়ারি' অথবা 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' নামে প্রকাশিত যে প্রবন্ধগুলি পরে কিছু সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত আকারে 'পঞ্চভূত' (১৩০৪) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা রবীন্দ্রনাথের আত্মচিন্তা পর্য্যায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সাহিত্য সমাজ, শিল্প ও জীবনের নানা বিষয় নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়াছিল। সেই সব চিন্তার পরিচয় পঞ্চভূতের

[১] ভারতী ও বালক বৈশাখ ১২৯২।

পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পরিস্ফুট। নিজের কথাও অবান্তরভাবে যতটুকু আছে তাহাও তুচ্ছ নয়; যদিও রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা শুরু করিয়াছিলেন এই বলিয়া,

> পাঠকেরা যদি "ডায়ারি" শুনিয়া মনে করেন ইহার মধ্যে লেখকের অনেক আত্মকথা আছে, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিবেন। যদি সহসা তাঁহাদের এমন আশ্বাস জন্মিয়া থাকে যে লোকটা নিশ্চয় মারা গিয়াছে, এখন তাহার দৈনিক জীবনের গোপন সিন্ধুক হইতে তাহার প্রতিদিবসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলি সর্ব্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটন করিয়া রীতিমত ফর্দ্দ করা হইবে, তবে তাঁহারা অত্যন্ত নিরাশ হইবেন।

ডায়ারির "লেখক ভূতনাথ বাবু" রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, এবং অপর পাত্রপাত্রী—পঞ্চভূত, ক্ষিতি, সমীরণ (সমীর), ব্যোম, দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী—তাঁহারি আত্মীয়-বন্ধুর প্রতিচ্ছবি। সাধনায় ডায়ারি যে-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে মানুষগুলিকে আবছাভাবে দেখা যাইত, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সংস্করণে পার্সোনাল অংশগুলি একেবারে বর্জ্জন করায় বইটির human interest খর্ব্ব হইয়াছে। কিছু উদাহরণ দিই। স্রোতস্বিনীর পরিচয় প্রসঙ্গে সাধনায় প্রকাশিত ডায়ারিতে এই আছে,

> শ্রীমতী অপ্ (ইঁহাকে আমরা স্রোতস্বিনী বলিব) ক্ষিতির এ তর্কের কোন রীতিমত উত্তর দিতে পারেন না। তিনি কেবল ছলছল কলকল করিয়া, সুন্দর ভঙ্গীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিতে থাকেন—না, না, ও কথা কখনই সত্য না। ও যখন আমার মনে লইতেছে না, তখন ও কখনই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না। কেবল বারবার "না না, নহে নহে।" তাহার সহিত আর কোন যুক্তি নাই কেবল একটি তরল সঙ্গীতের ধ্বনি, একটি অশ্রু-ছলছল অনুনয় স্বর, একটি তরঙ্গ-নিন্দিত গ্রীবার আন্দোলন। না না, নহে নহে। এবং সেই সঙ্গে আদর, যত্ন, স্নেহ, এবং নেত্র, বাহু ও সর্ব্বাঙ্গের ভাষা।[১]

[১] সাধনা মাঘ ১২৯৯ পৃ ২০১।

'পঞ্চভূত' বইয়ে আছে এইরূপ,

> "শ্রীমতী অপ্ (ইহাকে আমরা স্রোতস্বিনী বলিব) ক্ষিতির তর্কের কোনো রীতিমত উত্তর করিতে পারেন না। তিনি কেবল মধুর কাকলি ও সুন্দর ভঙ্গিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিতে থাকেন,—না, না, ও-কথা কখনই সত্য না। ও আমার মনে লাগিতেছে না, ও কখনো সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না। কেবল বারবার "না না, নহে নহে"— তাহার সহিত আর কোনো যুক্তি নাই কেবল একটা তরল সঙ্গীতের ধ্বনি, একটি অনুনয়-স্বর, একটি তরঙ্গ-নিন্দিত গ্রীবার আন্দোলন,- "না না, নহে নহে।"[১]

নিম্নলিখিত অংশটুকু একেবারে বাদ গিয়াছে,

> শ্রীমতী স্রোতস্বিনীও আমার মস্তকের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিয়া দুই একটা অকালপক্ক অপরাধী কেশের সন্ধান করিতে করিতে, স্নেহমুখে, সস্মিতনেত্রে কহিলেন "সত্যি, তুমি ডায়ারি লেখ না কেন?" বিশ্বাসপরায়ণা স্রোতস্বিনীর মাথা ও আমার সম্বন্ধে দুই একটি অমূলক সংস্কার আছে।"[২]

সাধনায় প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রবন্ধটির[৩] প্রথমাংশ বাদ দিয়া 'গদ্য ও পদ্য' শীর্ষকে পঞ্চভূতের শেষের দিকে সঙ্কলিত হইয়াছে। পরিত্যক্ত অংশের প্রথমে শিলাইদহের (?) চমৎকার বর্ণনা আছে :

> দৃশ্য। পদ্মাতীরস্থ পল্লিগ্রাম। বারান্দার সম্মুখে নদীতটে একখণ্ড ধান্যক্ষেত্র দেখা যাইতেছে। ঘনরোপিত শিশু ধান্য বৃক্ষগুলি যেন গাঢ় সবুজবর্ণের অগ্নিশিখার মত কাঁপিতেছে। এই নিবিড় সবুজ রঙটি যেন নিরতিশয় নিদ্রার মত দৃষ্টিকে আপনার অন্তস্তলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে চায়, দু'টি চক্ষু তাহার সুগভীর কোমলতার মধ্যে বারম্বার অবগাহন করিয়া কিছুতেই আর তৃপ্তির শেষ হয় না।

১. রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৫৩২।
২ সাধনা মাঘ ১২৯৯ পৃ ২০৬। ৩ ঐ ফাল্গুন ১২৯৯ পৃ ৩১৭-৩১৮।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পদ্যচ্ছন্দের উৎপত্তি বিষয়ে যে অনুমান করিয়াছেন ভাষাবিজ্ঞানেও সেই কথা বলে ;

> আমার বিশ্বাস, ভাবপ্রকাশের জন্য ছন্দের সৃষ্টি হয় নাই। ছোট ছেলেরা যেমন ছড়া ভালবাসে, তাহার ভাবমাধুর্য্যের জন্য নহে—কেবল তাহার ছন্দোবদ্ধ ধ্বনির জন্য, তেমনি অসভ্য অবস্থায় অর্থহীন কথার ঝঙ্কার মাত্রই কানে ভাল লাগিত। এইজন্য অর্থহীন ছড়াই মানুষের সর্ব্বপ্রথম কবিত্ব। মানুষের এবং জাতির বয়স ক্রমে যত বাড়িতে থাকে, ততই ছন্দের সঙ্গে সংযোগ না করিলে তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও অনেক সময়ে মানুষের দুই একটা গোপন ছায়াময় স্থানে বালক-অংশ থাকিয়া যায় ; ধ্বনিপ্রিয়তা, ছন্দপ্রিয়তা সেই গুপ্ত বালকের স্বভাব। আমাদের বয়ঃপ্রাপ্ত অংশ অর্থ চাহে, ভাব চাহে ; আমাদের অপরিণত অংশ ধ্বনি চাহে, ছন্দ চাহে।

২

সাহিত্যে কৌতুকরসের সৃষ্টি বড় দুরূহ। স্থূল ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও সস্তা রসিকতা যাহা সচরাচর আমাদের সাহিত্যে কৌতুকরস বলিয়া চলে তাহার কথা বলিতেছি না। যাহা যথার্থ হিউমার বা কৌতুকরস তাহা ট্রাজেডি বা কারুণ্যের পাশ ঘেঁষিয়া যায়। যে ঘটনা বা পরিণতি আমাদের সচেতন মনের অপেক্ষিত নয় যদি সহসা তাহাই ঘটিয়া যায়, তখন যে সূক্ষ্ম বেদনাবোধ আমাদের চিত্তের যুক্তি-আশ্রয়ী অংশকে ঈষৎপরিমাণে উত্তেজিত করে তাহাই কৌতুকরসের প্রেরণা জোগায়। কিন্তু সেই বেদনাবোধ যদি সজাগ ও তীব্র হইয়া উঠে তবে তাহা করুণরসে অভি-ব্যক্ত হয়। পঞ্চভূতের ডায়ারিতে 'কৌতুকহাস্য' এবং 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রস্তাব দুইটিতে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমাদের অন্তরে বাহিরে একটি সুযুক্তিসঙ্গত নিয়মশৃঙ্খলার আধিপত্য ; সমস্তই চিরাভ্যস্ত, চির-প্রত্যাশিত ; এই সুনিয়মিত যুক্তিরাজ্যের সমভূমিমধ্যে যখন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন তাহাকে

বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি না—ইতিমধ্যে হঠাৎ সেই চারিদিকের যথাযোগ্যতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসঙ্গত ব্যাপারের অবতারণা হয় তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধা পাইয়া দুর্নিবার হাস্যতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সেই বাধা সুখের নহে, সৌন্দর্য্যের নহে, সুবিধার নহে, তেমনি আবার অনতিদুঃখেরও[১] নহে, সেইজন্য কৌতুকের সেই বিশুদ্ধ অমিশ্র উত্তেজনায় আমাদের আমোদ বোধ হয়।" "অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়।"

স্থূলতার ইতরতার এবং রূঢ় ব্যঙ্গের সংস্পর্শ বাঁচাইয়া শুদ্ধ কৌতুকরস বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবর্ত্তন করেন বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের লেখায় তাহা সূক্ষ্ম এবং নিপুণতর শিল্পসৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। কৌতুকরসের সূক্ষ্মধারা অন্তস্তলে বহিয়া গিয়াছে বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্ধতির অপরিসীম রমণীয়তা; বক্রোক্তি, মৃদু অথবা রূঢ় ব্যঙ্গ, ব্যাজস্তুতি, শ্লেষ, দীপক প্রভৃতি অলঙ্কারের নিপুণ-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি হইয়াছে সরস-উজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের অসাধারণ সমবেদনা তাঁহার কৌতুকরসকে কুত্রাপি তীব্রতায় পর্য্যবসিত হইতে না দিয়া স্মিতশোভন মর্য্যাদায় ভূষিত করিয়াছে। তাই তাঁহার লেখায় বক্রোক্তি ও ব্যঙ্গ কখনো কঠোর বা স্থূল হইয়া চিত্তদাহের বা গ্রাম্যত্বের হেতু হয় নাই। কিছু উদাহরণ দিই।

১৯০৫ সালে প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারতভ্রমণ উপলক্ষে ক্ষণিকের জন্য যে অকারণ অজস্র অর্থব্যয় হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'রাজভক্তি'[২] প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন। ইহার আরম্ভ রূঢ়তাহীন ব্যঙ্গের একটি সুন্দর নিদর্শন,

> রাজপুত্র আসিলেন। রাজ্যের যত পাত্রের পুত্র তাঁহাকে গণ্ডি দিয়া ঘিরিয়া বসিল—তাহার মধ্যে একটু ফাঁক পায় এমন সাধ্য কাহারো রহিল না। এই ফাঁক যতদূর সম্ভব সঙ্কীর্ণ করিবার জন্য কোটালের

[১] "অতিদুঃখেরও" হইবে। [২] রাজা-প্রজায় সঙ্কলিত।

> পুত্র পাহারা দিতে লাগিল—সেজন্য সে শিরোপা পাইল। তাহার পর? বিস্তর বাতি পুড়াইয়া রাজপুত্র জাহাজে চড়িয়া চলিয়া গেলেন—এবং আমার কথাটি ফুরালো, নটে শাকটি মুড়ালো।
>
> ব্যাপারখানা কি? একটি কাহিনীমাত্র। রাজ্য ও রাজপুত্রের এই বহুদুর্লভ মিলন যত সুদূর, যত স্বল্প, যত নিরর্থক হওয়া সম্ভব তাহা হইল। সমস্ত দেশ পর্য্যটন করিয়া দেশকে যত কম জানা—দেশের সঙ্গে যত কম যোগস্থাপন হইতে পারে, তাহা বহুব্যয়ে—বহু নৈপুণ্য ও সমারোহ সহকারে সমাধা হইল।

বাঙ্গালীর জাতিগত কূপমণ্ডূকতাকে উপহাস করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়'[১] প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সরস রচনাকৌশলের একটি সুন্দর নিদর্শন পাইতেছি।

> কিম্বা হয়ত আমাদের পরিবারে পুরুষানুক্রমে কেহ কখনো হাবড়ার পুল পার হয় নাই কিম্বা দুই দিন অন্তর গরম জলে স্নান করিয়া আসিয়াছে, তাই বলিয়া যে আমিও যে পুল পার হইব না কিম্বা স্নান সম্বন্ধে আমাকে কার্পণ্য করিতেই হইবে একথা মানা যায় না।
>
> অবশ্য, আমার সাত পুরুষে যাহা ঘটে নাই অষ্টম পুরুষে আমি যদি তাহাই করিয়া বসি, যদি হাবড়ার পুল পার হইয়া যাই তবে আমার বংশের সমস্ত মাসিপিসি ও খুড়ো-জ্যাঠার দল নিশ্চয়ই বিস্ফারিত চক্ষুতারকা ললাটের দিকে তুলিয়া লইবে, "তুই অমুক গোষ্ঠীতে জন্মিয়াও পুল পারাপারি করিতে সুরু করিয়াছিস। ইহাও আমাদিগকে চক্ষে দেখিতে হইল।" চাই কি লজ্জায় ক্ষোভে তাঁহাদের এমন ইচ্ছাও হইতে পারে আমি পুলের অপর পারেই বরাবর থাকিয়া যাই। কিন্তু তবু আমি যে সেই গোষ্ঠীরই ছেলে সে পরিচয়টা পাকা।

উপমা-উৎপ্রেক্ষার বৈচিত্র্যে উপভোগ্য সরসতার সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,

১ 'পরিচয়'-এ সঙ্কলিত (১৩১৩)।

> মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন কোনোমতেই মরবার লক্ষণ দেখাচ্ছিলেন না, তখন তাঁর ছেলের রাজ্যভোগের আশা যেমন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছিল এবারকার শরতের সেই দশা। বর্ষা শেষ পর্য্যন্ত তার আকাশের সিংহাসন আঁকড়ে রইল।[১]

রবীন্দ্রনাথের যে সকল প্রবন্ধ বিশুদ্ধ কৌতুকরচনার অন্তর্গত সেগুলি তিন শ্রেণীতে পড়ে,—(ক) রূঢ় ব্যঙ্গাত্মক, (খ) মৃদু ব্যঙ্গাত্মক, এবং (গ) বিশ্রব্ধ ও সরস-সংলাপাত্মক।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমজীবনে যে কৌতুক-প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন তাহার কোন-কোনটি অল্পবিস্তর রূঢ়-ব্যঙ্গাত্মক বা satirical; যেমন 'রসিকতার ফলাফল'।[২] 'ভানুসিংহের জীবনী'-তে[৩] রবীন্দ্রনাথ নিজের ছদ্মনাম "ভানুসিংহ" উপলক্ষ্য করিয়া আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা লইয়া লঘু-কৌতুকহাস্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সময়ের অপর কৌতুকরচনা—বালকে (১২৯২) ও ভারতীতে (১২৯৩) প্রকাশিত 'হেঁয়ালিনাট্য'[৪] ছাড়া—হইতেছে 'বর্ষার চিঠি',[৫] 'ডেঙ্গো পিঁপড়ের মন্তব্য',[৫] ও 'বানরের শ্রেষ্ঠত্ব'[৬]। 'প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব'-ও[৭] এই ধরণের রচনা। প্রথম বর্ষের সাধনায়ও ব্যঙ্গাত্মক রচনা বাহির হইয়াছিল। ১২৯৮ সালের পর রবীন্দ্রনাথ আর এরূপ প্রবন্ধ লিখেন নাই।

সাধনায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উৎকৃষ্ট, মৃদুব্যঙ্গবিজড়িত, সরস প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ' এবং 'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প।' এই ধরণের "কথিকা"-র মধ্যে অনেক পরবর্ত্তীকালে-লেখা 'কর্ত্তার ভূত'[৮] অপূর্ব্ব। একথা অবিসংবাদিত সত্য যে আমাদের দেশে জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রে, সব প্রচেষ্টার ও প্রতিষ্ঠানের

১ 'পথে ও পথের প্রান্তে' দ্রষ্টব্য। ২ প্রথমপ্রকাশ ভারতী বৈশাখ ১২৯২; সংশোধিত ও পরিবর্জ্জিত হইয়া 'ব্যঙ্গকৌতুক'-এ (১৩১৪) সঙ্কলিত। ৩ নবজীবন ১২৯১। ৪ 'হাস্যকৌতুক'-এ সঙ্কলিত (১৩১৪)। ৫ বালক শ্রাবণ ১২৯২। ৬ ঐ চৈত্র ১২৯২। ৭ প্রথমপ্রকাশ সাহিত্য ১২৯৮; ব্যঙ্গকৌতুকে সঙ্কলিত। ৮ প্রথমে 'পয়লা নম্বর'-এ (১৩২৭) পরে লিপিকায় সঙ্কলিত।

উপর কর্ত্তার ভূত চাপিয়া বসিয়া আছে, সে নড়েও না সরেও না, এবং মাঝে হইতে তাহার দোহাই দিয়া দুই-চারিজন বুদ্ধিমান নায়েব মজা লুটিতেছে।

> দেশের মধ্যে দুটো একটা মানুষ—যারা দিনের বেলায় নায়েবের ভয়ে কথা কয় না,—তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় করে বলে, "কর্ত্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয় নি?"
>
> কর্ত্তা বলেন, "ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।"
>
> তারা বলে, "ভয় করে যে কর্ত্তা!"
>
> কর্ত্তা বলেন, "সেইখানেই ত ভূত।"

তৃতীয় পর্য্যায়ের রচনাগুলিই সংখ্যায় গুরুতর। শুধু কথোপকথনের মধ্য দিয়া বিনা আয়োজনে কৌতুকরসসৃষ্টির অসাধারণ দক্ষতার নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের বড় প্রহসন কয়টিতে এবং হাস্যকৌতুকে উদ্ধৃত ক্ষুদ্র প্রহসনগুলিতে আছে।[১] সাধনায় প্রকাশিত 'বিনি পয়সার ভোজ' এবং 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি'[২] বিশেষ উল্লেখযোগ্য; সংস্কৃত সাহিত্যে যাহাকে 'ভাণ' বলে এ-দুইটি সেই monologue নাট্যরচনার ক্ষুদ্র নিদর্শন। 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' বা 'চিরকুমার সভা'-র[৩] রসসৃষ্টি একান্তভাবে সংলাপের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতার সুগভীর পরিচয় এই সরস গল্পটির মধ্যে আছে। গদ্যের মধ্যে পদ্যের কণিকা দিয়া রচনামাধুর্য্যবৃদ্ধির প্রয়াসও এই প্রথম দেখা গেল। শেষের-কবিতায় তাহার পরিণতি।

১ ব্যঙ্গকৌতুকে এবং লিপিকায়ও এইরূপ কয়েকটি রচনা আছে। ২ ব্যঙ্গকৌতুকে সঙ্কলিত।
৩ ভারতী ১৩০৭-০৮, হিতবাদী গ্রন্থাবলী (১৩১১), পুস্তকাকারে (১৩১৫)।

অনুপর্ব্ব

১৯০১-১৯২৫

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ ও নব-রোমান্টিকতা

১

সব সাহিত্যেই ক্ষমতাশালী নূতন কবির বা লেখকের অনুকরণকারী জুটিতে বিলম্ব হয় না। ক্ষমতাহীন লেখকের পক্ষে অন্ধ অনুকরণ ছাড়া পথ নাই। যাহার ক্ষমতা আছে তাঁহার অনুকরণ-অনুসরণের মধ্যেও নিজের বৈশিষ্ট্য থাকে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অনুকরণকারীর আবির্ভাব হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাষা-ছন্দের একান্ত নিজস্বতা; যাহা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বৎসর লাগিয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রকাব্যের সার্থক অনুসরণ ও অনুবর্তন করিতে যে আরো সময় লাগিবে তাহা বিস্ময়কর নহে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার প্রথম যুগে বোদ্ধা পাঠকের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। সেইজন্য সেই-সময়ের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নিতান্ত ক্ষীণ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কাব্যে যে হতাশ-বিষাদের সুর বাজিয়াছিল তাহা উনবিংশ শতকের উপান্তে দুই-একজন নারী-কবির লেখায় মৃদুভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।[১] ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সজ্ঞান ভাবানুসরণ। সমসাময়িক পুরুষ-কবিদের লেখায় কচিৎ স্পষ্ট রূপানুসরণ দেখা যায়।[২]

রবীন্দ্র-কাব্যের অনুকরণকারী পুরুষ-লেখকের সংখ্যা অগণ্য। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে বেশভূষায় যেমন কবিতারচনায়ও তেমনি রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ শিক্ষিত সৌখীন শহুরিয়া নব্যযুবকদের উচ্চতম ফ্যাশন ছিল। সেকালের অনেক নবীন লেখক রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করিয়া গদ্যে পদ্যে পাড়ি জমাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

[১] দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৪৪৩ দ্রষ্টব্য। [২] ঐ পৃ ৪৩৮

২

রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ অনুপ্রেরণা তাঁহার কতকগুলি তরুণ আত্মীয়কে অল্প কবিতা-রচনায় উৎসাহিত করিয়াছিল। যেমন, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর,[১] বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, শ্রীমতী হেমলতা দেবী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ইত্যাদি।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর উদ্যোগে ঠাকুরবাড়ীর তরুণ লেখক-গোষ্ঠীর মুখপত্ররূপে 'বালক' পত্রিকা বাহির হইয়াছিল (১২৯২)। এক বৎসর মাত্র চলিয়া ইহা ভারতীর সহিত যুক্ত হইয়া যায়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিকা ছিলেন নামে মাত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথই ছিলেন আসল সম্পাদক এবং প্রধান লেখক। শেষ সংখ্যার সর্ব্বশেষে "কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদনে"-এ রবীন্দ্রনাথ অবসর লইয়াছিলেন এই বলিয়া,

> কার্য্যাধ্যক্ষের অপটুতাবশতঃ কিছুকাল হইতে বালক প্রকাশে ও বিতরণে অনিয়ম ঘটিয়াছে এবং উত্তরোত্তর অনিয়ম ঘটিবার সম্ভাবনা, এই জন্য পাঠকদিগের নিকটে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিতেছেন। বালক-কার্য্যাধ্যক্ষ সাহিত্য-ব্যবসায়ী, যথেষ্ট অবকাশ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক—তিনি কর্ম্মিষ্ঠতা ও কার্য্যনিপুণতার জন্যও বিখ্যাত নহেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহার হাতে অন্যান্য কাজের ভার আছে, ভরসা করি এইসকল বিবেচনা করিয়া বালকের গ্রাহকেরা প্রসন্ন মনে তাঁহাদের কার্য্যাধ্যক্ষকে বিদায় দিবেন।

ঠাকুরবাড়ীর এই ছেলেদের লেখা বালকে বাহির হইয়াছিল,—সুধীন্দ্রনাথ,[১] হিতেন্দ্রনাথ[২], ও বলেন্দ্রনাথ[৩]; মেয়েদের মধ্যে ছিলেন প্রতিভাদেবী, হিরন্ময়ীদেবী[১] ও সরলাদেবী[৪]। বালক ভারতীর সহিত যুক্ত হইলে ইহাদের লেখা ভারতীতে

[১] ইঁহার প্রথম দুই কাব্যগ্রন্থ হইতেছে 'শতদল' (১২৯৩) ও 'ত্রিশূল' (১৮১০ শকাব্দ)।
[২] একটি করিয়া নিতান্ত ছোট গদ্য রচনা বৈশাখ সংখ্যায়। [৩] চারিটি গদ্য রচনা ও একটি প্রবন্ধ।
[১] ইঁহারা বারো বৎসর ধরিয়া ভারতী সম্পাদন করিয়াছিলেন।

বাহির হইত। ১৩০৪ সালে হিতেন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথ 'পুণ্য' পত্রিকা বাহির করেন। ইহাতেও প্রধানত ঠাকুরবাড়ীর নবীন ও প্রবীণ লেখকদের রচনা প্রকাশিত হইত।

বলেন্দ্রনাথ গদ্য-রচনায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ ছোট-গল্পে। ইহাদের আলোচনা পরে করিতেছি। সুধীন্দ্রনাথকে সম্পাদক করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' বাহির করিয়াছিলেন ১২৯৮ সালে। পত্রিকাটি চারি বৎসর চলিয়াছিল। শেষ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধনায়ও বলেন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ প্রভৃতির লেখা কিছু কিছু বাহির হইয়াছিল।

৩

বলেন্দ্রনাথের ঠাকুরের (১৮৭০-১৮৯৯) প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'সন্ধ্যা' বাহির হইয়াছিল ফাল্গুন-সংখ্যা বালকে। সমসাময়িক গদ্য-রচনার পরিপক্কতা না থাকিলেও কবিতাটির রচনায় বাঁধুনি আছে। পর বৎসরের (১২৯৩) ভারতীতেও ইহার একটি কবিতা বাহির হইয়াছিল। গদ্য-রচনাতেই ইহার প্রাবীণ্য ছিল সমধিক। 'মাধবিকা' (১৩০৩) ও 'শ্রাবণী' (১৩০৪), এই দুইটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলিতে বলেন্দ্রনাথের কাব্যকলার পরিচয় পর্য্যবসিত। এই কবিতাগুলিতে কবিহৃদয়ের গভীর সৌন্দর্য্যানুভূতি মানসীপ্রতিমাকে ঘিরিয়া কারুকার্য্যময় রমণীয় অবগুণ্ঠন বয়ন করিয়াছে। কাব্যকলার যে সুমহৎ সম্ভাবনা কবিতাগুলিতে দ্যোতিত হইয়াছে তাহা কবির অকালমৃত্যুতে ফল-পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। কবির লেখাতেই তাঁহার ক্ষণোজ্জ্বল কবিজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু পাইতেছি :

> হে মোর সঙ্গীত, তোর পতঙ্গের প্রাণ
> এক বসন্তেই শুধু হোলো অবসান।
> এক বেলা নৃত্য শুধু এক বেলা গান,
> ছড়ায়ে রঙিন পাখা কুসুমে শয়ান।
> একটুকু স্বর্ণরেণু, পুষ্প পরিমল,

একটুকু রবিকর, শিশিরের জল,
কিছুক্ষণ খেলাধূলা মুগ্ধ অভিনয়,
তার পরে দিন শেষ—আর বেশি নয়!

গদ্য-রচনায় বলেন্দ্রনাথের সার্থকতা প্রথম হইতেই দেখা দিয়াছিল।

৪

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রিয়ম্বদা দেবী'-র[১] (১৮৭১-১৯৩৫) কবিধর্মের কিছু মিল আছে। প্রিয়ম্বদার প্রথম কবিতা ছাপা হইয়াছিল ১২৯৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা ভারতীতে। এইসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কবিতা 'অশ্রুজল'-ও বাহির হইয়াছিল। দুইটি কবিতার মধ্যে ভাবের মিল দুর্লক্ষ্য নয়। উভয়েরই কবিতার বাহন ছিল সনেট। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কাব্যরূপের মধ্যে নবীন কবিরা যে বিশেষ করিয়া তাঁহার সনেট-পদ্ধতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহার কারণ আছে। ভাব যেখানে সীমাবদ্ধ আধার সেখানে সঙ্কীর্ণ হওয়া চাই। সনেটের অপ্রশস্ত আধারে অপ্রসর ভাবগভীরতা সহজে উপচিত হইতে পারে।

বলেন্দ্রনাথের মত প্রিয়ম্বদাও কাব্যশৈলী-বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বাগ্‌বিন্যাসের শুচিতা উভয়ের কাব্যকলার বিশিষ্ট লক্ষণ। উভয়েরই সৌন্দর্য্যানুভূতি ছিল সুগভীর। তবে বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা বাস্তবপরতন্ত্র, বুদ্ধিনিষ্ঠ; প্রিয়ম্বদার প্রতিভা ভাবপরতন্ত্র, হৃদয়নিষ্ঠ। বলেন্দ্রনাথের কবিতায় বলিষ্ঠ হৃদয়াবেগহীনতা ও নিরাসক্তি সুপ্রকট। প্রিয়ম্বদার কবিতায় বিরহী নারীহৃদয়ের করুণ বিলাপ গুঞ্জরিত হইয়াছে; এবং হৃদয়াবেগ অত্যন্ত গভীর বলিয়াই তাহার প্রকাশ ধীর ও অচঞ্চল।

প্রিয়ম্বদার কাব্যকলা প্রসাদগুণভূয়িষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "প্রিয়ম্বদার অধিকার ছিল যে সংস্কৃত বিদ্যায়, সেই বিদ্যা আপন আভিজাত্যঘোষণাচ্ছলে বাংলা ভাষার মর্য্যাদা কোথাও অতিক্রম করেনি; তাকে একটি উজ্জ্বল শুচিতা দিয়েছে, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে অনায়াসে গঙ্গা যেমন বাংলার বক্ষে এসে মিলেছে

[১] ইঁহার মাতা প্রসন্নময়ী এককালে কবিতা-রচয়িত্রীরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৪৬৬ দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। বিশ্বপ্রকৃতির সংস্রবে প্রিয়ম্বদার স্পর্শসচেতন মন যে আনন্দ পেয়েছিল কাব্যে সে প্রতিফলিত হয়েছে জলের উপরে যেন আলোর বিচ্ছুরণ, আর জীবনে যত সে পেয়েছে দুঃসহ বিচ্ছেদ বেদনা কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখা দিয়েছে নারীর অবারণীয় অশ্রুধারার মতো।"

দুই-চারিটি কবিতা পূর্ব্বে বাহির হইলেও প্রিয়ম্বদার কাব্যসরস্বতী ভারতীর আসরে অনবগুণ্ঠিতভাবে দেখা দিল ১৩০৫ সালে। তখন রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদক। প্রিয়ম্বদার প্রথম কাব্য 'রেণু' (১৩০৭) প্রকাশিত হইবামাত্র কাব্যরসিকদের সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল। রেণুর অধিকাংশ কবিতাই সনেট। কবিতাগুলির মধ্যে নারীহৃদয়ের সুগভীর ব্যাকুলতা ও কারুণ্য স্নিগ্ধ ও কোমল হইয়া বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্রপটে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। ইহাই কাব্যটির মর্ম্মস্পর্শী একটানা সুর। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবসত্ত্বেও রেণুর অধিকাংশ কবিতায় কবির বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'-র আদর্শে প্রিয়ম্বদা যে ছোট ছোট কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহার অনেকগুলি প্রথমে নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে (১৩০৯) বাহির হইয়াছিল, পরে এগুলি 'পত্রলেখা'-য় (১৩১৭) সঙ্কলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক। কবিতাগুলির কোন-কোনটিতে তাঁহার সংশোধনের সম্ভাব্যতা স্বীকার করিয়া লইলেও এগুলির উচ্চ উৎকর্ষ বিস্ময়াবহ। রচনারীতির গাঢ়তা এবং ভাবানুভূতির গভীরতা পত্রলেখার কতকগুলি কবিতায় একদিকে রবীন্দ্রনাথের রচনার মাধুর্য্য অপরদিকে সংস্কৃত কবিতার দ্যুতি অর্পণ করিয়াছে। প্রিয়ম্বদার কয়েকটি কবিতা নিজেরই রচনা মনে করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'লেখন'-এ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।[১] কবিতাগুলির শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ আর কি হইতে পারে।

প্রিয়ম্বদার গাঢ়বন্ধ শব্দশুচি রচনারীতি ও ভাবগভীর স্নিগ্ধকরুণ প্রসাদগুণ পত্রলেখায় প্রকটিত হইয়াছে। যেমন, 'শুভক্ষণ':

> আকাশ গহন মেঘে গভীর গর্জ্জন,
> শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন।

[১] পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

ও কি এতটুকু নামে সোহাগের ভরে
ডাকিলে আমারে তুমি! পূর্ণনাম ধরে'
আজি ডাকিবার দিন; এ হেন সময়
সরম-সোহাগ-হাসি-কৌতুকের নয়!
আঁধার অম্বর, পৃথ্বী পদচিহ্নহীন,
'এল চিরজীবনের পরিচয়-দিন!'[1]

এই সময়ের minor কবিদের মধ্যে কোন কোন তরুণ লেখকের রচনা রবীন্দ্রনাথের হাতে অল্পবিস্তর সংশোধন লাভ করিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের 'গৃহহারা'-য় (১৩১২) তাহার কিছু প্রমাণ পাই। এই ক্ষুদ্র গাথা-কাব্যটি টেনিসনের *Enoch Arden* অবলম্বনে লেখা। মুখবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, "পূজনীয় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি অনুগ্রহপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শ রচনার মধ্যে সহজেই ধরা পড়ে।

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের অনেক কবিতা নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল। কয়েকটি কবিতায় প্রকৃত রসানুভূতির পরিচয় আছে। ইঁহার কাব্যগ্রন্থ হইতেছে 'পরিমল' (১৩০৭), 'বেলা' (১৩১০), 'পত্রপুষ্প' (১৩২১) ও 'অর্পণ' (১৩৩৭)।

৬

বিংশ শতকের গোড়া হইতে কোন কোন তরুণ কবির লেখায় অলস ও লঘু রোমান্টিকতা দেখা দিতে লাগিল। ইহার উদ্দীপনা আসিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতেই। কোন কোন কবির লেখায় এই রঙীন রোমান্টিক কল্পনার সঙ্গে সতেজ বিজ্ঞানী বৈদগ্ধ্যের সমন্বয় দেখা যায়। অকালে পরলোকগত তরুণ কবি

[1] প্রথমপ্রকাশ বঙ্গদর্শন আশ্বিন ১৩০৯ পৃ ৩০৪।

সতীশচন্দ্র রায়ের (১২৮৮-১৩১০) লেখায় এই সমন্বয়ের পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য সতীশচন্দ্র এই নব-রোমান্টিক কাব্যধারার প্রথম কবি।

সতীশচন্দ্রের কবিতায় অপরিণতির ও অপরিপক্বতার লক্ষণ যথেষ্ট থাকিলেও শক্তির প্রকাশ আছে। সতীশচন্দ্রের কবিপ্রকৃতি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ পরবর্তী বিশিষ্ট কবির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

নব-রোমান্টিক কবিদের প্রধান বিশিষ্টতা হইতেছে প্রকৃতির বর্ণহীন সহৃদয় পরিচিত সরস ও সেন্টিমেন্টাল রূপকল্পনা, লঘুছন্দ ও সরল ভাষা। সতীশচন্দ্রের কবিতায় এই তিন লক্ষণ দুর্লভ নয়।[১] যেমন 'ভগ্ন বাড়ির দেবতা'-য়,

আঙ্গিনায় আমি পা দুটি মেলিয়া
যত চুল পিঠে খুলিয়া ফেলিয়া
রাণী সম রহি সমস্ত দিন।
ঝড় কালে রহি কক্ষেতে লীন—
মাতে বায়ুদল, মেঘ ছাড়ে জল,
দুয়ারে দুয়ার পড়য়ে আছাড়,
খসে চূণকাম, ভেঙ্গে পড়ে থাম,...

সতীশচন্দ্রের রোমান্টিক কবিতার মধ্যে 'প্রাতঃপ্রবুদ্ধা'-য় লালিত্য বেশ আছে যদিও ইহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দেদীপ্যমান।[২] কবিতাটির প্রথম স্তবক উদ্ধৃত করিতেছি।

সখি, মোরে তোর স্বপনের কথা বল্।
এ প্রভাতে তোর মুখখানি নিরমল!
কুন্তলে তোর বিকল কুসুম
পাখা মেলি যেন নয়নের ঘুম
উড়ে গেছে কোন্ অজানা গগনতল।
বল্ সখি, তোর স্বপনের কথা বল্।

[১] সতীশচন্দ্রের গদ্য ও পদ্য রচনা কিছু কিছু প্রথমে নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে ও সমালোচনীতে বাহির হইয়াছিল। পরে সমুদয় রচনা 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' নামে শান্তিনিকেতন হইতে অজিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩১৯)। [২] সমালোচনী প্রথম বর্ষ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা।

ইংরেজী কাব্যের সহিত সতীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। শেলির ও ব্রাউনিঙের কাব্যের তিনি ছিলেন ভক্ত পাঠক। ব্রাউনিঙের প্রভাব তাঁহার কবিতায় কিছু কিছু পড়িয়াছে।

সতীশচন্দ্রের কবিপ্রকৃতির গভীরতর অংশের পরিচয় পাই 'আত্মসমর্পণ' কবিতায়।[১]

> তোমার চরণমূলে কুণ্ডলিয়া রব—
> সুখ দুঃখ হর্ষ আশা দৈন্যে নোয়াইয়া,
> ধীরে ধীরে গর্ব্ব ভাঙ্গি লুটাইব হিয়া!
> তুমি দিও পাদস্পর্শ নিত্য অভিনব!...

'দুয়ো-রাণী,' 'চণ্ডালী,' 'জামদগ্ন্য' প্রভৃতি কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গাথা-কবিতার পূর্ব্বাভাস পাই।

কবিত্বশক্তির সঙ্গে কাব্যরসজ্ঞতার সংযোগ বড় দুর্লভ। এই সুদুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন সতীশচন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি সতীশচন্দ্র আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ইঁহার সমালোচনা প্রবন্ধগুলি বিশেষ উপাদেয়।

৭

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) কবিপ্রকৃতিতে রসদৃষ্টির সঙ্গে তথ্যদৃষ্টির সমান অংশ ছিল। এইখানে পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের সাহিত্যপ্রতিভার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির নিগূঢ় সাজাত্য দেখি। উভয়েরই মানসিক প্রবণতা ছিল বিজ্ঞান-সুলভ অনুসন্ধিৎসার দিকে। একজনের সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছিল গদ্য-রচনায় আর এক জনের কবিতায়। দুইজনেই ছিলেন অনুবাদ-দক্ষ —অক্ষয়কুমার গদ্যে, সত্যেন্দ্রনাথ পদ্যে।

সত্যেন্দ্রনাথ যখন কবিতা রচনা শুরু করেন তখন বাঙ্গালাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের বান ডাকিয়াছে। তাই প্রথম হইতেই তাঁহার কবিতায় স্বদেশপ্রীতি

[১] সমালোচনী প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

এবং জাতীয়-জাগরণ মুখ্য প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বিজ্ঞানের চর্চ্চায় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুর্গতি বহুল পরিমাণে দূর হইতে পারে, তাই তরুণ কবি তাঁহার প্রথম কাব্য ক্ষুদ্রকায় 'সবিতা'-র (১৯০০) "সূচনা"-য় লিখিয়াছিলেন,

> প্রাচ্যের বৈদিক ঋষি এবং প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক উভয়ের চক্ষেই সবিতা জ্ঞানের আধার—প্রাণের আধার। এত উৎসাহ—এত তেজ আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। মানবের এমন গুরু আর নাই। তাই আমাদের প্রাণহীন জাতিকে অতীত ও বর্ত্তমান স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত আজি ঐ প্রাণময় অমিততেজা বিশ্বজ্ঞানরূপী সবিতার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার প্রয়াস। জীবনে উৎসাহ চাই, মনে তেজ চাই, কর্ম্মে আনন্দ চাই, হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি চাই। দর্শনের অবসাদ ঔদাস্য যথেষ্ট হইয়াছে। ...আর নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতায় শত শত লোক বর্ষে বর্ষে অনশনে প্রাণ হারাইতেছে, এমন করিয়া কতদিন চলিবে? ... তাই যদি স্বজাতীয়ের বিলোপ বাঞ্ছিত না হয় তবে এখনও দার্শনিক নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানোন্নত শিল্পশিক্ষা কর্ত্তব্য। সত্য বটে দর্শনই বিজ্ঞানের ভিত্তি, তাহা হইলেও অভিব্যক্তি হিসাবে বিজ্ঞান দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। ...এখনও সময় আছে! পূর্ব্ব প্রতিভার অঙ্গারে এখনও অনল আছে। কে বলিল উৎসুক ফুৎকারে জ্বলিয়া উঠিবে না? ভারত দর্শনে শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞানে না হইবে কেন?

সবিতার প্রথম স্তবকটি এই

তিমির-রূপিণী নিশা—সবিতা-সুন্দর!
সে তিমিরে তোমার সৃজন,
বিমল উজ্জল আলো' সৌন্দর্য্য-আধার!
ফুল্ল-উষা—অপূর্ব্ব-মিলন।
কুসুমিতা বসুন্ধরা—
দ্যু-লোক আলোক-ভরা—
জনয়িতা-সবিতা-সবার!
বরণীয়—রমণীয় নিত্য-জ্ঞানাধার!

সবিতার ছন্দে এবং রচনারীতিতে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্যের প্রভাব দেদীপ্যমান। দ্বিতীয় কাব্য ক্ষুদ্রতর 'সন্ধিক্ষণ'-এ (১৯০০ ?)-ও তাহাই। তবে রচনাভঙ্গি ঈষৎ লঘুতর হইয়াছে। সবিতায় স্তবক সংখ্যা পঞ্চাশ, সন্ধিক্ষণে চব্বিশ। সন্ধিক্ষণের শেষ স্তবকটি এই

সুবেশ রাখাল-বেশ সকল ভুলিয়া,
ধন্য হও স্বদেশের কাজে ;
প্রতিজ্ঞা রাখিয়া স্থির স্থাণুর মতন
মান্য হও জগতের মাঝে।
আত্মতেজে করি' ভর—
কর্ম্মে হও অগ্রসর !
মূর্খে শুধু বলে এ 'হুজুগ' ;
বঙ্গ ইতিহাসে আজ এল স্বর্ণ-যুগ !

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক কাব্যগ্রন্থ 'বেণু ও বীণা' (১৩১৩)। তাহার পর প্রকাশিত হয় যথাক্রমে 'হোমশিখা' (১৩১৫), 'ফুলের ফসল' (১৩১৮), 'কুহু ও কেকা' (১৩১৯), 'তুলির লিখন' (১৩২১) ও 'অভ্র-আবীর' (১৩২৩)। 'বেলা শেষের গান' ও 'বিদায় আরতি' তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছে। 'হসন্তিকা' (১৩২৪) সরস কবিতার বই। অনূদিত কবিতাগুলি 'তীর্থসলিল' (১৩১৫), 'তীর্থরেণু' (১৩১৭) ও 'মণিমঞ্জুষা' (১৩২২)—এই বইগুলিতে সঙ্কলিত আছে। 'রঙ্গমল্লী'-তে (১৩২০) কয়েকটি ক্ষুদ্র নাট্যরচনার অনুবাদ আছে। 'চীনের ধূপ' (১৩২৪) প্রবন্ধের বই। নরওয়ের লেখক Jonas Lie রচিত *Livsslaven* উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে সত্যেন্দ্রনাথ 'জন্মদুঃখী' উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।[১] পরে সত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি—'ডঙ্কানিশান'—সমাপ্ত হয় নাই।[২]

১ প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ১৩১৮। ২ প্রবাসী আষাঢ়-কার্ত্তিক ১৩৩০।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞানী বুদ্ধির অংশ ছিল প্রবল। তাই তাহার কবিতা যত তথ্যবহুল তত ভাবগভীর নয়। মানব-সংসারের জ্ঞানভাণ্ডারের সকল সামগ্রীর প্রতিই কবির যে সজাগ কৌতূহল ছিল তাহার পরিচয় তাঁহার কাব্যে সর্ব্বত্র পাই, তা সে বৈদিক সূক্তই হউক আর আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানই হউক। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ইহার ফলে আমরা তাঁহার চমৎকার গাথা-কবিতাগুলি পাইয়াছি। ইহার ইঙ্গিত কবি পাইয়াছিলেন সতীশচন্দ্র রায়ের রচনায়। সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ কৌতূহলী ছিল শব্দচয়নে। তৎসম, তদ্‌ভব ও দেশী—সর্ব্ববিধ পরিচিত ও অপরিচিত শব্দের ব্যবহারে তিনি যে দুঃসাহসিক সার্থকতা দেখাইয়াছিলেন তাহা পরবর্ত্তী কবিদের নূতন পথ দেখাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ছন্দে নূতন নূতন ঝঙ্কার তুলিয়াছেন। এই ছন্দোবৈচিত্র্য এবং ছন্দোনৈপুণ্য বাঙ্গালা কাব্যে তাঁহার বিশিষ্ট দান। কিন্তু এই ছন্দোঝঙ্কার নিতান্তই শব্দের নূপুরনিক্কণ; তাঁহার ছন্দের ঝর্না নৃত্যচাপল্যে শব্দের উৎপলখণ্ড কণিত করিয়া চলিয়াছে, ইহার মধ্যে অখণ্ড স্রোতোবেগ নাই এবং স্রোতস্বতীর গভীরতাও নাই, শুধু আছে মুখরতা এবং শব্দোপলবিচ্ছুরিত শীকরে রামধনুর ক্ষণিক বর্ণবৈচিত্র্য। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা বিশেষ করিয়া পাই ছন্দের নৃত্য, শব্দের ঝঙ্কার এবং তদুদ্বোধিত বর্ণচ্ছটাবহুল চিত্র। হৃদয়ের গভীরতর অনুভূতির স্পর্শ বড় পাই না। সত্যেন্দ্র-নাথের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার সদাজাগ্রত দেশাত্মবোধ, তাঁহার কাব্য-জীবনের আদ্যন্ত ইহার দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট রচনাভঙ্গির কিছু নিদর্শন দিই। এই উক্তিগুলিতে তাঁহার লঘু পাণ্ডিত্যের, ছন্দঃচাতুর্য্যের, শব্দশক্তির এবং উজ্জ্বল ধ্বনিচিত্র-রূপায়নের পরিচয় মিলিবে।

> দেখা হ'ল ঘুম নগরীর রাজকুমারীর সঙ্গে,
> সন্ধ্যা বেলায় ঝাপ্‌সা ঝোপের ধারে;—…
> তুঁত-পোকাতে তাঁত বুনে তার জান্‌লাতে দেয় পর্দ্দা,
> হুতোম প্যাঁচা প্রহর হাঁকে দ্বারে;

ঝর্ণাগুলি পূর্ণচাঁদের আলোয় হ'য়ে স্তব্ধা
জলতরঙ্গ বাজনা শোনায় তারে।[১]

আমি পরী অপ্সরী
বিদ্যুৎপর্ণা,—
মন্দার কেশে পরি
পরিজাত-কর্ণা;
নেমে এনু ধরণীতে
ধূলিময় সরণিতে
ক্ষণিকের ফুল নিতে
কাঞ্চন-বর্ণা।[২]

বনের হাওয়া উঠ্‌ল মেতে—ছুট্‌ল ভুবনে;
মনের মানুষ জাগ্‌ল, ও সে জান্‌ল কেমনে!
ঘর-বাসী তুই মন রে আমার, পিঞ্জরে তোর বাড়,—
পঞ্জরে তোর জাগ্‌ছে কি ও?—বনমানুষের হাড়![৩]

ছিপখান তিন দাঁড়,
তিনজন মাল্লা,
চৌপর দিন ভর
দেয় দূর পাল্লা।...
ডাক পাখী ওর লাগি
ডাক ডেকে' হদ্দ,
ওর ভয়ে সোঁত জলে
ফুল ফোটে পদ্ম।[৪]

১ 'ঘুমের রাণী,' প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী আশ্বিন ১৩১৮। ২ 'বিদ্যুৎপর্ণা,' তুলির-লিখন। ৩ 'বনমানুষের হাড়', অভ্র-আবীর। ৪ 'দূরের পাল্লা', প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী কার্ত্তিক ১৩২৩।

সত্যেন্দ্রনাথের ধ্বনিচিত্রকুশলতার একটি নিপুণ নিদর্শন 'রাত্রি বর্ণনা'।[১] কবিতাটিতে বিশ-তিরিশ বছর পূর্ব্বেকার কলিকাতার নিশীথ-চিত্র নিখুঁতভাবে ফুটিয়াছে :

ঘড়িতে বারোটা ; পথে 'বরোফ ! বরোফ !' ... লোপ !
উড়ি' উড়ি' আরসুলা দেয় তুড়ি লাফ ... সাফ !
পাল্‌কি-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে ... তুড়ে !
আঁধারে হাডু-ডু খেলে কান কবি উঁচা ... ছুঁচা !
পাহারা'লা ঢুলে আলা, দিতে আসে রোঁদ ... খোদ !
বেতালা মাতাল তাই খায় হালফিল ... কিল !...

বিদেশী ভাষার কবিতা বাঙ্গালায় রূপান্তরীকরণে সত্যেন্দ্রনাথ যে-পরিমাণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা যে-কোন সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের কথায়, সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-কবিতাগুলি ফুলের মত বৃন্তরূপ মূলকে আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রসসৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাগুলির যতটা অংশ পরস্ব ততটা অংশই নিজস্ব। কিছু উদাহরণ দিই। প্রথমে হিন্দীর অনুবাদ।

সূর্য্য, গ্রহ, চন্দ্র, তারা রশ্মিধারা বর্ষিছে,
গাহিছে গৃহী প্রেমের সুর, বাজায় তাল বৈরাগী,
শূন্যতলে ধ্বনিছে সদা ঐকতান নৌবতে,
কবীর কহে বন্ধু মম গগনে সদা রয় জাগি' !...
গগন সেথা মগন সদা নবীন চির আনন্দে
জন্ম আর মরণ, তাঁর বাজিছে তালি দুই হাতে ;
রাগিণী উঠে ঝঙ্কারিয়া কি মূর্চ্ছনা কি ছন্দে !
ত্রিলোক হতে রসের ধারা মিশিছে আসি' দিন রাতে।[২]

[১] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী আষাঢ় ১৩২০। [২] 'ঝুলন', প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী শ্রাবণ ১৩১৮।

ইহার মূল হইতেছে কবীরের এই পদ,

> গ্রহ চন্দ্র তপন জোর বরত হৈ
> ঘুরত রাগ নিরত তার বাজৈ,
> নৌবতিয়া ঘুরত হৈ রৈন দিন সুন্নমেঁ
> কহৈঁ কবীর পিউ গগন গাজৈ।...
> জনম-মরণ জঁহা তারী পরত হৈ
> হোত আনন্দ তহঁ গগন গাজৈ।
> উঠত ঝনকার তহঁ নাগ অনহদ ঘূরৈ
> তিরলোক মহলকে প্রেম বাজৈ ॥[১]

আর একটি উদাহরণ দিই ইংরেজীর অনুবাদ।

> এবার আমি নিচ্ছি ছুটি,—ছুট্‌ছি এবার জলটুঙিতে,—
> ছোট্টো আমার পাতার কুঁড়ে তুল্‌ব সেথায় কাদার ভিতে;
> হোগ্‌লা দিয়ে ছাইব তারে,—কাঠের আড়া, বাঁশের ডাঁসা,
> পাহাড়তলীর নিদ্‌মহলে মৌমাছিদের শুন্‌ব ভাষা!...[২]

ইহার মূল হইতেছে ইয়েট্‌সের The Lake Isle of Innisfree কবিতা,

> I will arise and go now, and go to Innisfree,
> And a small cabin build there, of clay and wattles made;
> Nine bean rows will I have there, a hive for the honey bee,
> And live alone in the bee-loud glade....[৩]

সরস ও ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় সত্যেন্দ্রনাথ কারিগরি দেখাইয়াছেন। স্থানে স্থানে রূঢ় হইলেও হসন্তিকার কবিতাগুলির সরসতা ছন্দের মাধুর্য্যে ও লিপি-কৌশলে উপভোগ্য হইয়াছে।

১ কবীর দ্বিতীয়খণ্ড, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, পৃ ৬১,৬৩। ২ 'জলটুঙি', প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী আশ্বিন ১৩১৯। ৩ *Poems* (১৯১১) পৃ ১২৬।

৮

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সতীশচন্দ্র রায় উভয়েই ছিলেন ভাল গদ্য-লেখক এবং উভয়েই সনেটকে কবিতার বাহন করিয়াছিলেন প্রধানভাবে। ইঁহাদেরই দলে হইতেছেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। ইনি বাঙ্গালা গদ্যের অন্যতম প্রধান ষ্টাইলিষ্ট বা লিপিকৌশলী। প্রমথবাবুর কবিতার বৈশিষ্ট্য হইতেছে তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতা এবং চাপা ব্যঙ্গের সরস ও বলিষ্ঠ ভঙ্গি। ইঁহার সনেটের গঠনকৌশল ইটালীয় সনেটের অনুযায়ী। গদ্যের মত পদ্যেও ইনি গতানুগতিকতা সযত্নে পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শব্দচয়নে প্রমথবাবুর নৈপুণ্য ও সাহস ভারতচন্দ্রের মত। ইঁহার কবিতা প্রায় সবই প্রথম বাহির হইয়াছিল ভারতীতে (১৩১৮-২০) ও সবুজপত্রে,[১] এবং সঙ্কলিত হইয়াছে 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এ (১৯১৩) ও 'পদ-চারণ'-এ (১৯১৯)।

প্রমথবাবুর কাব্যকলার একটু নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি।

আমার সনেট নাকি নিরেট সুন্দরী ?
বর্ণের প্রলেপে দেহ কঠিন চিক্কণ,
চরণের আভরণে নাহিক নিক্কণ,
বুকে নাই রাজযক্ষ্মা, উদরে উদরী।...
আমি নাকি ভাবদেহ করি বিশ্লেষণ,
প্রাণহীন মূর্ত্তি গড়ি অঙ্গে অঙ্গ যুড়ে।
প্রতিমা দর্শনে শুধু, বিনা আশ্লেষণ,
পোরে না এদের সাধ, গাত্র যায় পুড়ে![২]

৯

রবীন্দ্র-অনুগামী অনেক সমসাময়িক কবির লেখায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব অল্পবিস্তর পড়িয়াছিল। এই কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য হইতেছেন শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। করুণানিধানের প্রথম কবিতার বই হইতেছে ক্ষুদ্র 'বঙ্গমঙ্গল' (১৩০৮)। 'প্রসাদী' (১৩১১), 'ঝরাফুল' (১৩১৮), 'শান্তিজল' (১৩২০) প্রভৃতি

[১] সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৩২১ বৈশাখে। [২] 'আমার সনেট', পদ-চারণ।

কাব্য ইঁহার কবিযশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। প্রকৃতির রূপচিত্রে করুণানিধানের কবিহৃদয় বিমুগ্ধ। ইঁহার কবিতায় বিশেষ করিয়া বহিঃপ্রকৃতির রূপকল্পনা নৃত্যদোদুল ছন্দে সুনির্ব্বাচিত শব্দের মন্দিরায় ঝঙ্কৃত হইয়াছে। করুণানিধানের কাব্যকলা কিন্তু চিত্রকুশলতার উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। যেমন,

উড়ো পাখীর সুরের সুরায়
ভূর্জ্জতরুর আব্ছায়ে,
প্রবাল-বরণ বৈকালে আজ
কোন্ পাষাণী গান গাহে ?
ফুল-পরাগের ঘোম্টা টানি,
লুটিয়ে চলে আঁচলখানি,
লাজুক মেয়ে সৌদামিনী
আল্তা পরায় তার পায়ে।[১]

করুণানিধানের কবিপ্রকৃতির সঙ্গে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিপ্রকৃতি কিছু মিল আছে। তবে ইঁহার কবিকল্পনা একান্তভাবে বহিঃপ্রকৃতির রূপের পর্দ্দাতেই আটকাইয়া পড়ে নাই, তাহা পল্লীবাসী বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য ইমোশনের ফ্রেমে বাঁধা পড়িয়াছে। এখানে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কাছে কবির ঋণভার গুরুতর। 'লেখা' (১৩১৩), 'রেখা' (১৩১৭), 'অপরাজিতা' (১৩২০), 'নাগকেশর' (১৩২৪) ইত্যাদি ইঁহার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

করুণানিধান-যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে আর দুই ভিন্নপ্রকৃতির কবির নাম করিতে হয়। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক অনেকদিন হইতেই কবিতা লিখিতেছেন।[২] ইঁহার কাব্যগ্রন্থ হইতেছে 'বনতুলসী' (১৩১৮), 'উজানী' (১৩২০), 'বীথি' (১৩২২), 'নূপুর' (১৩২৭) ইত্যাদি। কুমুদবাবুর কাব্যকলা সরল ও আড়ম্বরবিহীন, কিন্তু অমসৃণ। ইঁহার কবিতায় সহজ ভাষায় মেঠো সুরে পল্লীহৃদয়ের স্বচ্ছ প্রকাশ

[১] 'তন্দ্রাপথে', প্রথমপ্রকাশ ভারতী আশ্বিন ১৩২০।
[২] প্রথম বর্ষ সমালোচনীতে (১৩০৮-১৩০৮) ইঁহার কবিতা বাহির হইয়াছিল।

দেখি। পৌরাণিক কাহিনীর ইঙ্গিত ইহার উপমা-উৎপ্রেক্ষার অজস্র পাওয়া যায়। স্ফুট উপদেশাত্মকতা ইহার কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের ভাষা ও ছন্দ নির্দ্দোষ। অর্থের ও ভাবের প্রসন্নতা ইহার কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ। তবে কাব্যরচনায় ইহার কবিপ্রকৃতির কোন একটি নিজস্ব সুর ফুটিয়া উঠে নাই। 'কুন্দ' (১৩১৫), 'কিশলয়' (১৩১৮), 'বল্লরী' (১৩২২), 'ব্রজবেণু' (১৩২২) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের ইনি রচয়িতা।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায় বেশি কবিতা লিখেন নাই। ইহার একমাত্র কাব্যগ্রন্থ হইতেছে 'নতুন খাতা' (১৩৩০)। হাল্‌কা ভাষায় লঘু ছন্দে ঘরোয়া রোমান্সের সুর কিরণধনের কবিতাগুলিতে একটি বিশিষ্ট মাধুর্য্য ও মর্য্যাদা পাইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার অনেকদিন পূর্ব্বে কবিতা লেখা শুরু করিলেও ১৩২৫ সালের কাছাকাছি ইহার কাব্যকলা বিশিষ্ট রূপ ধরিতে থাকে। তখন ইনি ভারতী গোষ্ঠীতে যোগ দিয়াছেন। এই-সময়কার কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। পরেও এই প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।[১] কোন কোন কবিতায় করুণানিধান-যতীন্দ্রমোহনের অনুসরণ দেখা যায়।[২] রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ অনুকরণও কচিৎ লক্ষিত হয়।[৩]

মোহিতবাবুর কাব্যরীতি একটু ভারি-চালের হইলেও সুঠাম ও মসৃণ। শব্দচয়নে ইহার দক্ষতা পরিস্ফুট। কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি হইতেছে দেহাশ্রিত ভোগানুগ রসপিপাসার দাবী স্বীকার। মোহিতলালের অনেকগুলি কবিতার মর্ম্মকথা অভিব্যক্ত হইয়াছে 'মোহমুদ্গর' কবিতায়। যেমন,

> এস কবি, এস বীর, নির্ম্মম সাধক এস, এস হে সন্ন্যাসী !
> ছিঁড়ে ফেল অদৃষ্টের ফাঁসী।
> দেহ ভরি কর পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা,
> ধূলা মাখি' খুঁড়ি লও কামনার কাচমণি-হীরা।

[১] তুলনীয় 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর', 'বাদল-রাতের গান' ও 'ঘুমুর ডাক,' বিস্মরণী। 'কালাপাহাড়'-এ নজরুল ইসলামের প্রভাব আছে। [২] 'পিন্টুলির বিয়ে', 'বাঁধন' ও 'মৃত-প্রিয়া', বিস্মরণী। [৩] যেমন 'নিশি ভোর' ও 'নূতন আলো', স্বর-গরল।

অন্ন খুঁটি লব মোরা কাঙালের মত,
ধরণীর স্তনযুগ করি' দিব ক্ষত
নিঃশেষ শোষণে, ক্ষুধাতুর দশন-আঘাতে করিব জর্জ্জর—
আমরা বর্ব্বর।[১]

আসলে কিন্তু কবি রিয়ালিষ্ট নন, আইডিয়ালিষ্টই। ক্বচিৎ তাঁহার রবীন্দ্রানুসারী সুগুপ্ত রোমাণ্টিক আদর্শবাদী দৃষ্টির অতর্কিত প্রকাশ দেখা যায়।

'স্বপন-পসারী' (১৩২৮), 'বিস্মরণী' (১৩৩৩) ও 'স্মর-গরল' (১৩৪৩) ইত্যাদি ইহার কাব্য গ্রন্থ।

১৩

নব-রোমাণ্টিক কবিদের মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিত। রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রবাবুর বিশেষ শক্তিশালিতার একটি প্রমাণ দিই। ১৩১৭ সালের মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে ইহার 'শীত' কবিতা বাহির হইয়াছিল। কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ'-এর প্রভাব আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহা তাঁহার 'তপোভঙ্গ'-এরও[২] সূচনা করিয়াছে। কবিতাটির প্রথম, শেষ, ও মধ্যের একটি স্তবক এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ;[৩]

বিশ্বের বিরাট বক্ষে পাতি শবাসন
সাধিতেছ প্রলয় সাধন—
কে তুমি সন্ন্যাসী।
বর্ণ-গন্ধ-গীত-বিচিত্রিত জগতের নিত্য প্রাণস্পন্দ
কি স্বতন্ত্র মন্ত্রবলে পলে পলে হয়ে আসে বন্ধ!
মরণের আবাহন তরে কেন এই তীব্র আরাধন,
চেষ্টা সর্ব্বনাশী ?
বর্ষ পরে বিশ্ব জুড়ে' বসিলে আবার—হে রুদ্র সন্ন্যাসী!...

[১] 'মোহমুদ্গর', বিস্মরণী। [২] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৩০। [৩] কেন জানি না কবিতাটির শেষাংশ 'মরীচিকা'-র পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। উদ্ধৃত শেষ দুই স্তবক মরীচিকায় নাই।

এবার কি ভাবিয়াছ ভুলিবে না আর
বসন্তের মোহিনী মায়ায়
হে রুক্ষ সংযমী!
এবার সে নামিবে যখন স্বর্গ হ'তে সুধালস তনু,
নীলাম্বরে উত্তরী উড়ায়ে উত্তরিবে করে পুষ্প ধনু,
মৃদুমন্দ নন্দনের বায়ু সঙ্গে তার আসিবে ধরায়
স্বর্গ অতিক্রমি,
তখনো কি মেলিবে না আঁখি দৃঢ়ব্রত হে রুক্ষ সংযমী? ..
সদ্য যোগভঙ্গরক্ত বিস্মিত লোচনে
চাহিবে না তুমি সন্ধ্যাকাশে
প্রেয়সীর পানে?
কল্প কল্পান্তের সুপ্তস্মৃতি মুহূর্তে কি উঠিবে না ফুটি,
নিশীথের রহস্যবাসরে ধরিয়া প্রিয়ার হাত দুটি
এবার কি যাত্রা করিবে না নিরুদ্দেশ অনন্ত প্রবাসে?
অব্যর্থ সন্ধানে
বসন্ত কি নারিবে ফিরাতে এবার তোমার প্রিয়াপানে?

যতীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত রোমাণ্টিক নিশ্চয়ই, এবং তিনি আদর্শবাদীও। তবে তাঁহার নিজস্ব সুর হইতেছে জীবলীলায় অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পেষণে মানবাত্মার নিঃসহায় আর্তক্রন্দন। হাল্‌কা ভাষা লঘুছন্দ ও মৃদুব্যঙ্গের ঝাঁজ কবির লেখায় নূতন রসের স্পর্শ দিয়াছে। বিশ্বজগতের নিয়ম ও কর্মধারায় অদৃষ্টের খামখেয়াল না দেখিয়া যাঁহারা ঈশ্বরের কল্যাণময় বিধানই লক্ষ্য করিতেছেন, যাঁহারা কবির মতে নিজেদের ভুলাইয়া রাখেন তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন,

সেদিন আবার টেনে নিয়ে গেলে ভক্তের সভাতলে,
"ঠাকুরের, আহা! অপার করুণা" কেঁদে কেঁদে তারা বলে;

"দেখিছ যেটারে দুঃখ—
ঠাওর করিয়া দেখ—সেটা সুখ অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম।"
ঠাওর করিতে দুখ সুখ হ'ল, সুখ হয়ে গেল দুখ,
মোটের উপরে বুঝিতে নারিনু লাভ হ'ল কতটুক্‌!

কবি দুঃখবাদী নহেন; তাঁহার বাস্তবদর্শী অবিশ্বাসও নাস্তিকতা নয়, ইহা অভিমানের বিরূপতা মাত্র। তাই তিনি পরক্ষণেই বলিতেছেন,

ঘুমের আড়ালে এলে তুমি ধীরে কহিলে হরিয়া জ্ঞান,
"প্রাণের দুঃখ না যাক্‌ কিন্তু যাবে দুঃখের প্রাণ।"
বন্ধু, প্রণাম হই,—
শীতের বাতাসে জমে' যায় দেহ—ছেঁড়া কাঁথাখানা কই।

ব্যথিত অভিমানী কবি চিত্ত মৃত্যুনির্ব্বাণই চরম ভাবিতেছে,

প্রেম বলে' কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।[১]

ভাববিলাসিতার ক্লৈব্য ও আধ্যাত্মিকতার মিথ্যাচারকে ধিক্কার দিয়া কবি নিবাবরণ ও নিরাভরণ সত্যকে আহ্বান করিয়াছেন,

কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস-গেরুয়ার বিলাসিতা?
কোথা সে অগ্নিবাণী—
জালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্ত্তিখানি!…
একথা বুঝিব কবে—
ধান ভানা ছাড়া কোন উঁচু মানে থাকে না ঢেঁকির রবে![২]

শেষ অবধি জয়ী হইয়াছে কবির আদর্শবাদ, আনন্দের নয় দুঃখের—

হে বিরাট! আজ হেরি যেন তব দুঃখের নাহি ওর;
চির বর্ষণে ফুরায় না তবু অফুরান আঁখিলোর!

[১] 'ঘুমের ঘোরে (প্রথম ঝোঁক),' মরীচিকা। [২] 'ঘুমের ঘোরে (চতুর্থ ঝোঁক),' ঐ।

ওগো অক্ষয় বট!

যত বেড়ে যাও আপনি ছড়াও শত দুঃখের জট।[১]

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুঃখবেদনার জটিল বন্ধনে স্রষ্টা বাঁধা পড়িয়াছেন গুটিপোকার মত,

এ ব্রহ্মাণ্ডে নিজ ব্রহ্মেরই লাগে নি কি ভাই ধোঁকা?
আপন ভুলের জটিল গুটিতে অদৃশ্য গুটি-পোকা।
বাঁচাইতে গেলে পোকার জীবন, থাকে না গুটির দাম;
গুটি যদি গোটা পেতে চাই তবে লুপ্ত পোকার নাম।[২]

এই দুঃখবেদনাকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার উর্দ্ধে উঠিবার প্রয়াসই মানবাত্মার কঠিন সাধনা;

নিশার আকাশে একা নিরুপায় মুক্তি কাঁদিছে বসি'
তারায় তারায় জাল বুনে' দিল বাঁধনের রসারসি!
মুক্তির আশে চিরক্রন্দন—তারই নাম জাগরণ,—
সে জাগরণের কত যে বেদনা, জানি তাহা মনে মন।[৩]

বৌদ্ধমতের অনুগত হইলেও কবি নির্ব্বাণপন্থী নহেন। জীবনের বাঁধা পথ তাহার রুচিকর নয়, তবুও তিনি জীবনরসকে অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার "নূতন পথ" কবিচিত্তের রোমান্স-অভিসারের পথ; "এই ধূলায় ছাপা বুকে পাথর-চাপা সদা দুরুদুরু গুরুগুরু চাকায় কাঁপা" সিধা বাঁধা রাজপথ ছাড়িয়া কবির মন "পাওটা" পথের পথিক হইতে চায়;

বামে ভর-ভর ভরা গাঙ্ শাওন-রাঙা,
ডানে থর-থর খাড়া পা'ড় ভাঙন্-ভাঙা;
পাড শালিখের দল
খোপে কলচঞ্চল
যেথা বেণার শিকড় ধরি' ঝুলিছে ডাঙা,

১ 'ঘুমের ঘোরে (সপ্তম ঝোঁক),' ঐ। ২ 'নব পন্থা,' মরুশিখা। ৩ 'মুক্তি-দুর্গ,' মরুমায়া।

সেই উঁচু নীচু আঁকা বাঁকা
পাউড়ির বুকে আঁকা

যে পথ ভাঙে ও গড়ে নিত্য নব,
আজ সে পাওটা-পথে একা পথিক হব।[১]

যতীন্দ্রবাবুর কাব্যের নামকরণে তাঁহার কবিদৃষ্টির বিশেষ ভঙ্গির ছাপ রহিয়াছে,—'মরীচিকা' (১৩৩০), 'মরুশিখা' (১৩৩৪), 'মরুমায়া' (১৩৩৭)।

১১

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী নবীন কবিদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম অগ্রণী। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের যুদ্ধোত্তর কবিতায় আধুনিকতার ছাপ পাই বাস্তব-দৃষ্টির ইঙ্গিতে ও দুঃখবাদের আভাসে। সুতরাং রবীন্দ্রব্যতিরিক্ত কাব্যসাহিত্যে ইনিই নবীনতার অগ্রদূত। নজরুল ইসলাম পুরাপুরি যুদ্ধোত্তর কবি। বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে ইনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন কতকটা বৈশাখী ঝড়ের আকস্মিকতা লইয়া। ১৩২৮ সালের শেষে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ইঁহার 'বিদ্রোহী' কবিতা বাহির হয় এবং ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীতে 'প্রলয়োল্লাস' প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বেও সাময়িক পত্রিকায়[২] নজরুলের কবিতা বাহির হইয়াছিল; কিন্তু এই দুইটি কবিতাই বোধ করি ইঁহার সবচেয়ে বিশিষ্ট ও জোরালো রচনা। ছন্দের স্পন্দে এবং ভাবের উচ্ছ্বাসে কবিতা দুইটিতে যে তীব্র সুর উঠিয়াছে তাহাতে পদানত অত্যাচারিত গণচিত্তের উল্লাস প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিয়া নজরুল মেসোপোটেমিয়ায় গিয়াছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধে, সুতরাং এই বিদ্রোহের সুর একান্ত ভাবুকচিত্তের নয়। তবে আনকোরা নূতনও নয়। রবীন্দ্রনাথের 'দুরন্ত আশা'[৩] ও 'বিজয়ী'[৪] যে নজরুলের এই-ধরণের কবিতার প্রেরণা যোগাইয়াছে তাহা নিশ্চিত। সুইনবার্ণের Hertha কবিতার ভাব 'বিদ্রোহী'-তে কিছু পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে। তবে ভাব-

[১] 'নূতন পথে', ঐ। [২] বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৩২৭-১৩২৮) ও প্রবাসী (১৩২৭)।
[৩] মানসী। [৪] পূরবী, প্রথমপ্রকাশ চৈত্র ১৩২৪।

চাষার ফেনোচ্ছাস তাঁহার স্বকীয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাবও বেশ আছে। বিদ্রোহের কড়ি সুর বেশি দিন বজায় রহিল না, কিছু কাল পরেই ইহা গতানুগতিক প্রেমের কবিতায় মধ্যমে নামিয়া আসিল। কোন কোন প্রেমের কবিতায় দৈহিক আসক্তির খাদ সুরেরও স্পর্শ লাগিয়াছে। এ সুর বিদ্রোহের সুরেরই জুড়ি। আসলে কবিচিত্ত পুরানোপন্থী রোমান্টিক। তাই "দুরন্ত কামনা"-র হাঁক সত্ত্বেও কবিচিত্ত বুঝিয়াছে

আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছে গোপন,
বৃথা আমি খুঁজে মরি জন্মে জন্মে করিনু রোদন।
প্রতি রূপে, অপরূপা, ডাক তুমি,
চিনেছি তোমায়,
যাহারে বাসিব ভালো—সে-ই তুমি,
ধরা দেবে তায়![১]

ছন্দের চটুলতা ও বাগ্‌ভঙ্গির ওজস্বিতা নজরুলের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের ব্যবহার তাঁহার কতকগুলি কবিতার ভাষায় দীপ্তি দিয়াছে, এবং ইহার বাহুল্যও স্থানে স্থানে রসহানি ঘটাইয়াছে।

নজরুলের প্রথম কবিতার বই 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) তাঁহার যশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। আজ অবধি আর কোন বাঙ্গালী কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ এমন সমাদর পায় নাই। নজরুলের গদ্যরচনাও আছে। তবে ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে ও কাব্যরসসিক্ততায় নজরুলের গল্প-উপন্যাস প্রভৃতি গদ্যরচনা সংহত ও সুস্পষ্ট শিল্পরূপ পায় নাই।

[১] 'অনামিকা', প্রথমপ্রকাশ কালি-কলম আশ্বিন ১৩৩৩।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিবিধ গদ্য লেখক

১

রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'-য় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর গদ্যলেখকরূপে। ইঁহার হাতে-খড়ি হইয়াছিল 'বালক-'এ (১২৯২)। ইহাতে বলেন্দ্রনাথের চারিটি ছোট ছোট গদ্য-রচনা বাহির হইয়াছিল।[১] এই প্রবন্ধগুলিতে বালক-সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গির কল্পনাশক্তির ও বর্ণনক্ষমতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সাধনায় প্রকাশিত রচনাগুলিতে পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে। বলেন্দ্রনাথের রচনারীতি মিতভাষিণী এবং ভাব সুসংহত। ভাব ও ভাষার শুভসংযোগে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি সাহিত্যিক essay হিসাবে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যে শিল্প-সমালোচনার নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সাধনায় প্রকাশিত কয়েকটি শিল্প ও সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'চিত্র ও কাব্য' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৩০১)।[২]

২

চিন্তাগাঢ় দৃঢ়বদ্ধ ও সুপাঠ্য প্রবন্ধ-রচনায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বলেন্দ্রনাথেরই সমকক্ষ। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান-অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উদার মনীষা বিজ্ঞানের বাহিরেও নানা ক্ষেত্রে বিচরণ করিত। সাধনায় রামেন্দ্রসুন্দরের কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। বিজ্ঞানবিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ সঙ্কলন করিয়া ইঁহার প্রথম বই 'প্রকৃতি' বাহির হয় (১৩০৩)। তাহার পর 'জিজ্ঞাসা' (১৩১০), 'কর্ম্মকথা' (১৩২০) 'চরিতকথা,' 'শব্দকথা' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পর বাহির হয় 'বিচিত্র জগৎ,' 'যজ্ঞ-কথা' ও 'জগৎকথা'।

[১] 'একরাত্রি' (জ্যৈষ্ঠ), 'চন্দ্রপুরের হাট' (শ্রাবণ), 'বনপ্রান্ত' (আশ্বিন-কার্ত্তিক) ও 'পুলের ধারে' (ফাল্গুন)। [২] বলেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ রচনাবলী হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী'-তে (১৩১৯)।

রামেন্দ্রসুন্দর ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ভাষাতত্ত্ব হইতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন, বিজ্ঞান হইতে যজ্ঞকাণ্ড—কিছুই রামেন্দ্রসুন্দরের অনুসন্ধিৎসু মানসের আলোকরশ্মির অভিষেক হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

বিজ্ঞানের তথ্যকে সহজবোধ্য করিয়া সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতে জগদানন্দ-রায়ের কৃতিত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রথম জীবনে ইনি কবিতা, গল্প, এমন কি ডিটেক্‌টিভ গল্পও লিখিয়াছিলেন। বিজ্ঞানবিষয়ে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিতে ইনি রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। 'প্রকৃতি পরিচয়' (১৩২১), 'গ্রহনক্ষত্র' (১৩২২), 'আলো' (১৩২৬) ইত্যাদি ইঁহার বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মত বিজ্ঞান-অধ্যাপক হইয়াও বিজ্ঞান ছাড়া সাহিত্য ইতিহাস শব্দতত্ত্ব ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। দুইটি মাত্র সঙ্কলন এ-যাবৎ বাহির হইয়াছে,—'পত্রালী' এবং 'ক্ষুদ্র ও বৃহৎ' (১৯২২)। যোগেশচন্দ্রের রচনারীতি তাঁহার একান্তভাবে নিজস্ব; ইহার বিশেষ গুণ হইতেছে সরলতা স্পষ্টতা ও সহজমাধুর্য্য।

৩

সাহিত্যসৃষ্টি বলিয়া নয় চিন্তাশীলতার ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় থাকায় যে-সব প্রবন্ধ শিক্ষিত-সমাজে আদৃত হইয়াছিল সেগুলির লেখকেরাও এই-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ঐতিহাসিক ও দার্শনিক রচনায় উল্লেখযোগ্য হইতেছে উমেশচন্দ্র বটব্যাল (১৮৫২-১৮৯৮), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬২-১৯৩০), কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (?-১৯২৯), সখারাম গণেশ দেউস্কর (?-১৩১৯), রামপ্রাণ গুপ্ত ও নিখিলনাথ রায়। বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে উমেশচন্দ্রের বিশেষ অধিকার ছিল। 'সাহিত্য' পত্রিকার পৃষ্ঠায় ইঁহার বেদবিচারের ও ঐতিহাসিক গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় আছে।[১] সাধনায় ইনি সাংখ্যদর্শন বিষয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া-ছিলেন; তাহা পরে 'সাংখ্যদর্শন' নামে বাহির হইয়াছে (১৩০৬)। অক্ষয়কুমারের

[১] বৈদিক প্রবন্ধগুলি পরে 'বেদপ্রবেশিকা' নামে সঙ্কলিত হইয়াছে।

'সিরাজদ্দৌলা' (১৩০৪)[১] ও 'মীরকাশিম' (১৩১২) গ্রন্থে বাঙ্গালার হতভাগ্য নবাব দুইজনের কলঙ্ককালিমা-ক্ষালন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সে-সময়ের রাষ্ট্রি আন্দোলনের এই একটি বড় ফল। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে অক্ষয়কুমার 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে ইতিহাস-আলোচনা বিষয়ক মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিলেন (১৮৯৯)। সখারাম গণেশ দেউস্কর মারাঠী হইয়াও পুরাপুরি বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে প্রবলভাবে যোগ দিয়াছিলেন। 'বাজীরাও' (১৩০৮), 'ঝান্সীর রাজকুমার' (১৩০৮) ইত্যাদি দেশপ্রেমিক-জীবনী লিখিয়া ইনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই-প্রসঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নাম মনে আসে। ইঁহার আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭)। ব্রহ্মবান্ধব তীক্ষ্ণধী তেজস্বী নির্ভীক পুরুষ ছিলেন, স্বদেশী-আন্দোলনের একজন প্রধান কর্ণধার। 'সন্ধ্যা,' 'যুগান্তর,' 'স্বরাজ,' 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্য্যায়) প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে ইঁহার প্রবল প্রাণপ্রাচুর্য্যের এবং প্রবলতর নিষ্ঠার ও যোদ্ধৃত্বের পরিচয় পরিস্ফুট।

রামপ্রাণ গুপ্তের ঐতিহাসিক রচনা সবই মুসলমান-ইতিবৃত্ত বিষয়ে; যেমন, 'হজরত মোহাম্মদ' (১৩১১), 'মোগল বংশ' (১৩১১), 'পাঠান রাজবৃত্ত' (১৩১৮) ইত্যাদি। নিখিলনাথ রায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের অনুসরণ করিয়াছিলেন। 'প্রতাপাদিত্য' (১৩১৩), 'সোনার বাঙ্গালা' (১৯০৬) ইত্যাদি ইঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা।

বিপিনচন্দ্র পালের (?-১৯৩২) যেমন স্বাভাবিক বাগ্মিতা ছিল তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত লিপিকুশলতাও ছিল। ইনি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।[২] বিপিনচন্দ্রের অধিকাংশ প্রবন্ধ journalese ধরণের; খুব কম লেখাতেই সাহিত্যোচিত রসঘনতার পরিচয় আছে।

সরস প্রবন্ধ রচনায় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাম করিয়াছিলেন। ইঁহার রচনাও স্থায়িত্বলক্ষণহীন বলিয়া ইতিমধ্যেই বিস্মৃতির পথ ধরিয়াছে। ললিতকুমারের

[১] খানিকটা সাধনায় এবং বাকিটা ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।
[২] 'সত্য ও মিথ্যা' ইঁহার গল্পের বই।

বিশিষ্ট বই হইতেছে 'ফোয়ারা' (১৩১৭), 'পাগলা ঝোরা' (১৩২৪), 'সাহারা' (১৯২৮) ইত্যাদি।

৪

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে প্রথমে সাধনায় এবং পরে ভারতীতে ও শেষে নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে কতকগুলি উৎকৃষ্ট পল্লীচিত্র ও সমাজচিত্র বাহির হইয়াছিল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অনুজ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (?-১৯১৪) এই-ধরণের গল্পচিত্র-রচনায় অগ্রণী ছিলেন। ইহার 'চিত্র-বিচিত্র'-এর (১৯০২) চরিত্রচিত্রগুলিতে বৃহৎ সংসারের বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে ভদ্র বাঙ্গালী-জীবনের ব্যর্থতা লঘুব্যঙ্গের তুলিতে অঙ্কিত হইয়াছে। শৈলেশচন্দ্রের অপর উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে দুইটি বড় গল্প, 'কলিকাল'[১] ও 'ইন্দু' (১৩০৯)[২]।

কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারী চৌধুরাণী (?-১৯২০) সাধনা-ভারতী-বঙ্গদর্শনের পাতায় অনেকগুলি চমৎকার পারিবারিক চিত্র আঁকিয়াছিলেন। ইহার 'শুভবিবাহ' (১৩১২) উপভোগ্য গল্পচিত্র। ইহার অপর বড় রচনা হইতেছে 'সোনার ঝিনুক'।[৩]

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় কিংবদন্তীঘটিত গল্পাংশের প্রাধান্য বেশি। ইহার রচনারীতি সরল ও সহৃদয়। সরস প্রবন্ধ রচনায়ও ইহার দক্ষতা ছিল। ইনি ভারতীর একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। হিতবাদীতে প্রকাশিত ইহার "বৃদ্ধের বচন"—চলতি খবরের উপর সরস টিপ্পনী—সকলে আগ্রহের সহিত পড়িত।

দীনেন্দ্রকুমার রায়ও সেকালের ভারতীয় একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ভারতীতে প্রথমে ইহার thriller বা "রোমাঞ্চক"-জাতীয় ও ডিটেকটিভ গল্প বাহির হইত। পল্লীচিত্র-অঙ্কন সাধনায় শুরু হইয়া ভারতীতে চলিতে থাকে। বিগত শতাব্দীর বাঙ্গালার নিরুদ্বিগ্ন পল্লীজীবনস্রোতের প্রশান্ত ছবি

[১] 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩০৪-১৩০৫)। [২] 'উৎসাহ' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। [৩] প্রথমপ্রকাশ মানসী ও মর্ম্মবাণী ভাদ্র-মাঘ ১৩২৮।

দীনেন্দ্রকুমারের গল্পচিত্রে রোমান্টিক বর্ণসুষমায় মণ্ডিত হইয়াছে। ইহার 'পল্লী-চিত্র' (১৩১১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্লাসিক্‌সের অন্তর্গত। 'পল্লীবৈচিত্র্য,' 'পল্লী-চরিত্র' এবং 'পল্লীকথা'-ও উল্লেখযোগ্য। শেষ জীবনে দীনেন্দ্রকুমার "রোমাঞ্চক গ্রন্থমালা 'রহস্যলহরী'-র লেখক বলিয়াই সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন।

অন্যান্য গল্পচিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে অবিনাশচন্দ্র দাসের (?-১৯৩৬ 'পলাশ্ বন' (১৮৯৬), এবং যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'উড়িয়ার চিত্র' (১৩১০) উড়িয়া সংসার-সমাজের এই অনবদ্য চিত্রগুলি প্রথমে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। যতীন্দ্রমোহন 'ধ্রুবতারা' প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন।

৫

গল্পলেখকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। ইহার মনীষায় দুইমুখী প্রতিভার সমন্বয় হইয়াছে। তুলিকায় রূপসৃষ্টিতে ইনি আধুনিক কালের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, লেখনী দ্বারা রসসৃষ্টিতেও ইহার অসাধারণত্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে অবিসংবাদিত। বলেন্দ্রনাথের মত অবনীন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন গল্পরচনায়। ইহার প্রথম রচনা-দুইটিতে (১৩০২), 'ক্ষীরের পুতুল'-এ এবং 'শকুন্তলা'-য়, সহজ ভাষায় রূপকথার ভঙ্গি অবলম্বনে দুরূহ কাব্য-সৌন্দর্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথের লেখা সবই চলতি কথায়। মৃদঙ্গাঘাতগম্ভীর গুরুতর সাধু-ভাষায় লেখা ইহার একটিমাত্র রচনার সন্ধান পাইয়াছি।[১] এই বিস্মৃত রচনাটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি; রচনারীতিতে বাণভট্টের শিল্পচাতুর্য স্মরণীয়।

> ...যে রাত্রে আমার গৃহদ্বারে, মুকুলিত রসালের সুরভিত পল্লবশয়নে, মধুমত্ত বধূসহায় পরভৃৎ, তাহার মধুকষায় পঞ্চমস্বর স্বপ্নজগতে বারম্বার কুহরিত করিল;—যে রাত্রে, তোমার নবাবিরহে অতিবিকল আমার নিদ্রাহীন নেত্রদ্বয় নববসন্তের মলয়চুম্বনে সুখালসে নিমীলিত হইল,

[১] 'দেবীপ্রতিমা', ভারতী শ্রাবণ ১৩০৫। রবীন্দ্রনাথ তখন ভারতীর সম্পাদক।

সেই রাত্রে হে রঞ্জনা, হে তরুণী তন্বঙ্গী, আমার শিশিরকাতরা ভীরু বিহঙ্গী, তুমি দেশান্তরে, নীলাম্বুচুম্বিত সিন্ধুতীরে, তোমার সেই উত্তরে রোপিত তমালশ্রেণী, দক্ষিণে বিস্তৃত পুষ্পকুঞ্জের মধ্যস্থলে, অগুরুবাসিত আতপগৃহে; শিশিরভয়ে নিবিড়বিলম্বিত স্থূল যবনিকার পটান্তরে বাতায়ন-শ্রেণী অবিচ্ছেদে রুদ্ধ করিয়া এবং অবিরলবিস্তৃত লোম-কোমল আস্তরণে গৃহতলের তুহিনতা হরণ করিয়া দিবারাত্রি কখন সঙ্গীতচর্চ্চায় কখন কাব্যালাপে কখন বা মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত তপ্ত শয্যায় অলসলুণ্ঠিত দেহে কনকপাত্রে অনলোজ্জ্বল মদিরা পানে সমস্ত শিশিরকাল বঞ্চনা করিয়া আমাদের দেবদারুচ্ছায় নিবিড় উত্তর জনপদে তোমার জলরাশিবেষ্টিত কুঞ্জভবনে আরবার ফিরিয়া আসিলে।

'ভূতপত্‌রীর দেশ' (১৩২২) অপূর্ব্ব সৃষ্টি। মেয়েলি আলাপ, ছেলেমি প্রলাপ, ছড়ার ছন্দ ও রূপকথার ইঙ্গিত মিশাইয়া এই গল্পচিত্রগুলিতে অদ্ভুত-কৌতুকরসের, স্বপ্ন-জাগরণের, সম্ভব-অসম্ভবের বিচিত্রবর্ণ ইন্দ্রজাল বোনা হইয়াছে। আগে যাহাকে জানিতাম আরব্য-উপন্যাসের একচ্ছত্র নায়ক দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা খলিফা হারুন-অল্‌-রসীদ বলিয়া, অবনীন্দ্রনাথের phantasy-তে তাঁহাকে দেখি উড়ে বেহারা হারুন্দেরই ছদ্মবেশে;

> বোগদাদের হারুন-আল-রসীদের কথা আরব্য উপন্যাসে পড়েছি, আবু হোসেনের[1] থিয়েটারেও দেখেছি;—কখনো সদাগর সেজে বেড়াচ্ছে, কখনো ফকীর, কখনো বা কাফ্রি চাকর। এখন আবার তিনি উড়ে-বেহারা সেজে এলেন দেখছি!
>
> অবাক হয়ে হারুন্দের মুখ পানে চেয়ে আছি—কখন্ আবার সে ফকীর হয়, কি বাদশা হয়! আমাকে হাঁ করে থাক্‌তে দেখে বলছে—"আমার কথায় বিশ্বাস হল না বুঝি? আচ্ছা দেখো!" বলেই একবার হারুন্দে দাড়িতে গোঁফে মোচড় দিয়েছে। আর অমনি দেখি, সে হারুন্দে আর নেই! ইয়া দাড়ি, ইয়া গোঁফ, মাথায় বকের পালক-

১. ঐ পৃ ২৯৪।

গোঁজা পাগড়ি, গায়ে চিনেপোতের জোব্বা কাব্বা পায়ে ঢিলে হজের আর দিল্লির লপেট্টা পোরে হাতে বাঁকা এক তলোয়ার নিয়ে দেখা দিয়েছে—হারুণ বাদশা! ফিক্ কোরে হেসে আমাকে সে যেমন সেলাম করেছে আর অমনি আমি ফস্ করে দেশলাই জেলে ফেলেছি। বাদশার হাতে গলায় মাথায় হীরে মাণিকের গহনাগুলো এমন ঝকঝক করে উঠেছে যে চোখে ধাঁধা লেগে গেছে। কিচ্কিন্দে ছিল পাশে, সে অমনি ফুঃ—করে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে। আর কোথায় বাদশা! —যে হারুন্দে সেই হারুন্দে!

অবনীন্দ্রনাথের শৈশবকল্পনার ও বাল্যস্মৃতির বিচিত্র সমাবেশ 'খাতাঞ্চির খাতা'-র (১৩২৩) কাহিনীকে রসসমৃদ্ধ করিয়াছে। শিশুপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে 'রাজকাহিনী' ও 'নালক'-ও উল্লেখযোগ্য।

'পথে-বিপথে'-র (১৩২৫) বর্ণসুষম ও রসোজ্জ্বল চিত্রগুলিতে শিল্প-সাহিত্য-স্রষ্টার রোমান্টিক কবিকল্পনার যাদু-স্পর্শ আছে। বিভিন্ন চরিত্রের পরিকল্পনায় সূক্ষ্মদর্শিতার প্রকাশ আছে। সর্বোপরি কবিহৃদয়ের রসানুভূতি গল্পচিত্রগুলির মধ্যে একটি বিরল আনন্দের অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথের চিন্তাগুরু রচনা হইতেছে 'ভারতশিল্প'[১] 'বাংলার ব্রত' (১৩২৬)[২] ও 'বাগীশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' (১৯৪১)।[৩] শ্রীমতী রাণী চন্দের সহযোগিতায় লেখা 'ঘরোয়া' (১৩৪৮) ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৩৫১) বই দুইটিতে পারিবারিক স্মৃতিকথা ও আত্মজীবন-কাহিনী অত্যন্ত সুখপাঠ্য হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের বহু রচনা এখনো সঙ্কলনের অপেক্ষায় আছে।

৬

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট রচনাভঙ্গি তাঁহার প্রবন্ধাবলীকে স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দিয়াছে। বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত ভাষা, পেঁচালো ও জোরালো উক্তি এবং বক্তব্য-

[১] বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশিত (১৩৫০)। [২] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক রূপে প্রদত্ত বক্তৃতার সংগ্রহ।

বিষয়ে গতানুগতিকতা সযত্নে পরিহার প্রমথবাবুর প্রবন্ধগুলিকে ঝাঁঝালো সরস নবীন ও স্বাদু করিয়াছে। প্রমথবাবুর প্রথমপ্রকাশিত প্রবন্ধ 'জয়দেব'।[১] ইহার ভাষায় না হউক বিষয়ে লেখকের স্বাধীনতার পরিচয় আছে। কথ্য-ভাষাশ্রিত যে রচনারীতি প্রমথবাবুর নিজস্ব এবং যাহা "বীরবলী" ভাষা বা ঢঙ নামে প্রসিদ্ধ তাহা তিনি প্রথম অবলম্বন করেন 'হালখাতা' ও 'কথার কথা' নামক প্রবন্ধ দুইটিতে।[২] এই দুই প্রবন্ধে এবং পরবর্তী অনুরূপ প্রবন্ধগুলিতে লেখকের নাম থাকিত "বীরবল"। প্রমথবাবু ১৩২১ সালে 'সবুজপত্র' বাহির করেন। কথ্যভাষাকে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের শক্তিশালী বাহন করিয়া তুলিতে এই পত্রিকাটি সবিশেষ সহায়তা করিয়াছে। সবুজপত্রের বিশিষ্ট চিন্তাশীল লেখকের মধ্যে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রমথ বাবুর প্রবন্ধগ্রন্থাবলী হইতেছে 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), 'নানা-কথা' (১৯১৮ ?), 'বীরবলের টিপ্পনী' (১৩২৮), 'নানা চর্চা' (১৯৩২) 'ঘরে বাইরে' (১৯৩৬) ইত্যাদি।

সাহিত্যে কথ্যভাষা আশ্রয়ের সমর্থনে প্রমথবাবু একটি প্রবন্ধে[৩] যাহা লিখিয়া-ছিলেন তাহার একটু অংশ তুলিয়া দিতেছি তাঁহার ভাষার বক্রিমসুভগতার নিদর্শন রূপে।

> সম্প্রতি বঙ্গ-সাহিত্যের ছোট বড় মাঝারি, সকল রকম সমালোচক আমার ভাষার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করছেন। প্রতিবাদে নানা জাতীয় নানা পত্র মুখরিত হয়ে উঠেছে। সে মর্মর ধ্বনি শুনে আমি

[১] ভারতী ও বালক জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭। রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে (৩ জুন ১৮৯০) এই প্রবন্ধের উল্লেখ আছে [চিঠিপত্র ৫ পৃ ১৩৫]। ১২৯৮ সালের আষাঢ় সংখ্যার সাহিত্যে 'আদিম মানব' প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। ১২৯৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা সাধনায় Merimee-র একটি গল্পের অনুবাদ 'ফুলদানী' বাহির হয়, এবং ১৩০০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় ইতালীয় হইতে অনূদিত 'টয়কোয়াটো টাসো এবং তাঁহার সিদ্ধ বেতালের কথোপকথন' প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল. ইহার পর একেবারে ১৩০৫ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা ভারতীতে 'প্রবাসস্মৃতি'।

[২] প্রথমপ্রকাশ ভারতী বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯।

[৩] 'কৈফিয়ৎ', প্রথমপ্রকাশ সবুজপত্র আশ্বিন ১৩২১।

> ভীত হলেও চমকিত হইনি, কেন না আমি যখন বাঙ্গলা লেখায় দেশে
> পথ ধরে চলেছি, তখন অবশ্য সাহিত্যের রাজপথ ত্যাগ করেছি।...
> বিশেষত সে রাজপথ শুধু পাকা নয়,—সংস্কৃত ভাঙ্গা সুরকি, বিলাতি
> মাটি এবং বাঙ্গলা চুণ দিয়ে একেবারে সানবাঁধানো রাস্তা।

আধুনিক গদ্যলেখকদিগের উপর প্রমথবাবুর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের পরেই।

৭

সরস-রচনায় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন। সাহিত্যের আসরে ইঁহার আবির্ভাব খুব বিলম্বিত, যদিও ইঁহার সাহিত্যসাধনা শুরু হইয়াছিল অল্পবয়সে। বালকে (১২৯২) কেদারনাথের তিনটি গদ্য-রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল;[১] তাহার মধ্যে দুইটিতে কেরাণী-জীবনের চিত্র আঁকা হইয়াছে।[২] এই দুইটি রচনায় কেদারনাথের পরবর্ত্তী সাহিত্যসাধনার বীজ রহিয়াছে।

কবিতা ও ছড়া রচনায়ও কেদারনাথ হাত দিয়াছিলেন। সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার অনেক কবিতা বাহির হইয়াছিল। 'ভাদুড়ী মশাই,' 'কোষ্ঠীর ফলাফল,' 'আই হ্যাজ,' প্রভৃতি সুদীর্ঘ চিত্র-উপন্যাসগুলির উপরই কেদারনাথের রসরচনার মূল্য নির্ভর করিতেছে। কেদারনাথের বিশিষ্ট রচনারীতির সরসতা নির্ভর করে কথার খেলো মারপ্যাচের উপর। কলিকাতার উত্তর অঞ্চলের উপভাষার ব্যবহারও মুদ্রাদোষের মত। সেইজন্য এই দীর্ঘরচনাগুলি বিলক্ষণ ক্লান্তিকর হইয়াছে। কেদারনাথের কয়েকটি ছোট-গল্প ও গল্পচিত্র ভালই। কিন্তু সেগুলি চাপা পড়িয়া গিয়াছে উপন্যাসগুলির প্রসারে। কেদারনাথের গল্পের বই হইতেছে 'আমরা কি ও কে' (১৩২৭), 'কবলুতি' (১৩২৮),[৩] 'পাথেয়' (১৩৩০), 'দুঃখের দেওয়ালী' (১৩৩২) ইত্যাদি। 'চীনযাত্রী' (১৩১৮)[৪] ইঁহার প্রথম গদ্যগ্রন্থ।

১ আষাঢ় সংখ্যায় 'লাঠালাঠি,' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাকার প্রবন্ধ 'লাঠির উপর লাঠি'-র প্রসঙ্গে, আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যায় 'ঠগী'; এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'শ্রীচরণেষু';— এইটি ছাড়া আর সব 'শ্রীচরণেষু' প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের লেখা। কেদারনাথের 'শ্রীচরণেষু'-তে লেখকের নাম ছিল, "সেবক শ্রীনন্দকিশোর শর্ম্মণঃ"। ২ 'লাঠালাঠি' ও 'শ্রীচরণেষু'। ৩ 'কবলুতি' পর্য্যায় প্রথম বাহির হইয়াছিল 'কালি-কলম' পত্রিকায় ১৩৩৩ সালে পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায়। ৪ প্রথমপ্রকাশ ভারতীতে (১৩১০-১৩১১) 'চীনপ্রবাসীর পত্র' নামে।

"পরশুরাম" ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু যে লঘুব্যঙ্গবিজড়িত কৌতুককাহিনীগুলি লিখিয়াছিলেন তাহা সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সবিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল সবরকমের পাঠকের কাছে। রাজশেখর বাবুর গল্পের বিষয়ে উৎকটতা অথবা অপরিচিতি নাই; যে-সব ঘটনা বা ব্যাপার আমাদের জীবনে দুর্লভ বা অসম্ভাবিত নয় এমন সব কাহিনীই তাঁহার কৌতুক-উজ্জ্বল গল্পগুলিতে স্থান পাইয়াছে। রাজশেখর-বাবু কতকটা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুসরণ করিয়াছেন। তবে ইনি অধিকতর বাস্তবনিষ্ঠ; ত্রৈলোক্যনাথ কল্পনাশক্তিতে সমৃদ্ধতর।

রাজশেখর বাবুর গল্পের বই হইতেছে 'গড্ডলিকা' (১৩৩১), 'কজ্জলী' (১৩৩৪) ও 'হনুমানের স্বপ্ন' (১৩৪৪)।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

গল্প-উপন্যাস

১

কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ তেমন সার্থক হয় নাই; কিন্তু ছোট-গল্পে তাঁহার অনুবর্ত্তন বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কাব্যের অনুশীলন আমাদের সাহিত্যে আবহমান; শত শতাব্দীর এই প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পে আসিয়া সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। জগতের সাহিত্যে ছোট-গল্পের পত্তন বেশি দিনের ঘটনা নয়; বাঙ্গালা সাহিত্যে তো রবীন্দ্রনাথই ছোট-গল্পের স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্প আমাদের সাহিত্যে যে উত্তুঙ্গ ও নিখুঁত আদর্শ স্থাপন করিল তাহাতে আধুনিক কালের সাহিত্যসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সরণি আমাদের লেখকদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল। ছোট-গল্পের পরিধি সঙ্কীর্ণ; বোধ করি সেই কারণেই ইহার বিষয়বস্তু অশেষ। বাঙ্গালীর মানসপ্রকৃতি স্বভাবতই ঘরোয়া এবং ইমোশনাল, তাই ছোট-গল্পের পক্ষে বাঙ্গালী জীবনের নৈসর্গিক উপযোগিতা আছেই। মনে হয় প্রধানত এই কারণে রবীন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তনে একাধিক বাঙ্গালী লেখক ছোট-গল্প-রচনাশিল্পে উচ্চ কোটি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথচ বাঙ্গালা সাহিত্যের ছোট-গল্পের এখনো ষষ্টিপূর্ত্তি হয় নাই।

২

বাঙ্গালা ছোট-গল্পে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২) কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের পরেই। প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথেরই সাক্ষাৎ সাহিত্যশিষ্য; রবীন্দ্রনাথের উপদেশে ইনি কবিতা-অনুশীলন[১] ছাড়িয়া দিয়া গদ্যরচনায়, গল্প-

[১] প্রভাতকুমারের কবিতা 'প্রদীপ' ও 'ভারতী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। কবিতাগুলিতে আর কিছু না থাক্ স্নিগ্ধ কৌতুকরস আছে। ইঁহার কবিতার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হইতেছে 'সেকালের প্রস্থি' [ভারতী আষাঢ় ১৩০৫ পৃ ২৫২]।

লেখায়, একান্তভাবে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন।[১] প্রভাতকুমারের প্রথম গদ্যরচনা হইতেছে রবীন্দ্রনাথের চিত্রা কাব্যের সমালোচনা।[২] ইহার অনতিবিলম্বে প্রথম গল্প 'একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবনচরিত' লেখা হয়।[৩] তাহার পর বাহির হইল 'ভূত না চোর।[৪] প্রায় দুই বৎসর পরে প্রভাতকুমার গল্প লিখিবার প্রকৃত প্রেরণা অনুভব করিলেন। 'প্রদীপ' পত্রিকায় চারিটি গল্প বাহির হইল; 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি,'[৫] 'বেনামি চিঠি,'[৬] 'অঙ্গহীনা'[৭] ও 'হিমানী'[৮]। প্রথম গল্পটি "শ্রীমতী রাধামণি দেবী" এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়াছিল; দ্বিতীয় গল্পে লেখকের নাম ছিল না, সূচীপত্রে আছে "শ্রীমতী রাধামণি দেবী"। অতঃপর ইঁহার গল্প প্রথমে ভারতীতে পরে অন্যান্য পত্রিকায় বাহির হইতে থাকে।

প্রভাতকুমারের রচনারীতিতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনের রচনাপদ্ধতির সুনিপুণ সমন্বয় হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনলঙ্কৃত দ্রুতগতি এবং রবীন্দ্রনাথের সরস স্পষ্টতা ইঁহার রচনারীতিতে বিশেষত্ব দিয়াছে। প্রভাতকুমারের গল্পে কাহিনীর সরল নির্ঝরগতি কোথাও পটভূমিকার আড়ম্বরে চাপা পড়ে নাই অথবা বিশ্লেষণের দ্বারা ব্যাহত হয় নাই। বর্ণনার ছটা এবং ঘটনার ঘনঘটা না থাকায় প্রভাত-কুমারের রচনায় গল্পরস সামান্য আয়োজনেই জমিয়াছে। কাহিনীর কৌতূহল শেষ অবধি সজাগ থাকে এবং উপসংহারে তাহা অপ্রত্যাশিতভাবে পরিতৃপ্ত হয়। এই কৌশলে প্রভাতকুমার শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্পলেখকদের সমকক্ষ। কাহিনীর তলে তলে প্রবহমান কৌতুকরসধারা প্রভাতকুমারের গল্পে শুচিস্মিত স্নিগ্ধশ্রী অর্পণ করিয়াছে। যেখানে লেখকের কৌতুককটাক্ষে ব্যঙ্গের আমেজ পাওয়া যায় সেখানেও প্রকৃত শিল্পীর সমবেদনাদৃষ্টি সর্ব্বদা সজাগ থাকিয়া খাঁটি হিউমারের সৃষ্টি করিয়াছে।

১ "রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্য রচনায় হাত দিই।...ইহাতে রবিবাবু উত্তরে লেখেন, গদ্য রচনার জন্য প্রধান জিনিস হইতেছে রস। রীতিমত আয়োজন না করিয়া, কোমর বাঁধিয়া, সমালোচনা হউক, প্রবন্ধ হউক, গল্প হউক, একটা কিছু লিখিয়া ফেল দেখি। ইহার ফলে 'দাসী'-তে চিত্রার এক সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইলাম" ['প্রভাত-কথা', কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, বিচিত্রা আষাঢ় ১৩৩৯]। ২ দাসী ১৮৯৬। ৩ প্রথমপ্রকাশ দাসী সেপ্টেম্বর ১৮৯৬। ৪ প্রথমপ্রকাশ ভারতী চৈত্র ১৩০৩। ৫ ঐ বৈশাখ ১৩০৫। ৬ ঐ ভাদ্র ১৩০৫। ৭ ঐ চৈত্র ১৩০৫। ৮ ঐ বৈশাখ ১৩০৬।

সমসাময়িক মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙ্গালী-ঘরের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী ছেলের বৈচিত্র্য-হীন জীবনের রোমান্স-রসটুকু উপচিত হইয়াছে প্রভাতকুমারের গল্পে। বাঙ্গালা সাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রভাতকুমারের গল্পের পটলডাঙ্গা-ঠন্‌ঠনে-হেদো-বীডন্‌-গার্ডেনের এবং বেজ্‌ওয়াটার-আর্লস্‌কোর্টের স্মৃতি অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

প্রভাতকুমারের গল্পের রোমান্স-রসে কোন গভীর হৃদয়াবেগসংবেদন নাই, এবং সুলভ ভাবব্যাকুলতাও নাই। জীবনের গভীরতার মধ্যে প্রভাতকুমার ডুব দেন নাই, এবং ভাবোচ্ছ্বাসবিমূঢ় কান্না-হাসির ও মান-অভিমানের পালাও গাহেন নাই। তিনি শুধু জীবননদীপ্রবাহের উপরতলের অগভীর দুঃখসুখের ছায়ারৌদ্রপাত আঁকিয়া গিয়াছেন। তবুও জীবনের রূঢ় বাস্তব-সমস্যা একেবারে এড়াইতে পারেন নাই; যেমন 'কাশীবাসিনী'।[১] গল্পটিতে কাহিনী-পরিকল্পনায় অথবা চরিত্রচিত্রণে কোথাও স্বাভাবিকতাকে লঙ্ঘন করা হয় নাই, এবং ভাবোচ্ছ্বাসের প্রচুর সুযোগ সত্ত্বেও লেখকের সংযত লেখনী বাস্তবতা ও শিল্পসঙ্গতি দুইই বাঁচাইয়া গিয়াছে।

গল্প-রসের প্রাধান্য থাকিলে চরিত্রচিত্রণে সূক্ষ্মতা ও সম্পূর্ণতা আশা করা যায় না। কিন্তু প্রভাতকুমারের গল্পে ইহার ব্যতিক্রম দুর্লভ নয়। প্রভাতকুমারের সূক্ষ্ম ও প্রখর রসদৃষ্টি ছিল বলিয়া তাঁহার কলমের দুই একটি আঁচড়ে ফিরিঙ্গী-গাড়ো হইতে পল্লী-গৃহিণী পর্যন্ত সকলেই পরম জীবন্ত ও উজ্জ্বল হইয়া জাগিয়াছে নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক লইয়া।

প্রভাতকুমারের প্রথম গল্পের বই 'নবকথা'।[২] নবকথার গল্পগুলির মধ্যে মধ্যে কাঁচা হাতের পরিচয় আছে। 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি'-র উপক্রম ও উপসংহার রবীন্দ্রনাথের ধরণের; প্রথম ও শেষ অনুচ্ছেদ দুইটিতে রবীন্দ্রনাথের সংশোধন থাকা বিচিত্র নয়। 'ভুলভাঙ্গা'-র[৩] রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান'-এর প্রভাব আছে। 'দেবী'-র[৪] কাহিনী রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। 'সারদার কীর্তি'-র[৫] অনুরূপ ঘটনা

১ বিলাত যাইবার পথে ষ্টীমারে গল্পটি লেখা হইয়াছিল (জানুয়ারী ১৯০১); প্রথমপ্রকাশ ভারতী বৈশাখ ১৩০৮। ২ প্রথম সংস্করণে বারোটি গল্প ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩১৮) পাঁচটি গল্প যোগ হয়। ৩ প্রথমপ্রকাশ ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬। ৪ প্রথমপ্রকাশ ভারতী ভাদ্র ১৩০৬। ৫ 'ষোড়শী'-তে সঙ্কলিত; প্রথমপ্রকাশ ভারতী মাঘ ১৩০৬।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ঘটিয়াছিল।[1] সুতরাং এই কাহিনীটিও তাঁহার কাছে পাওয়া। নবকথার শ্রেষ্ঠ গল্প 'কুড়ানো মেয়ে'-র আখ্যান ও চরিত্রাঙ্কণ চমৎকার।

'ষোড়শী'-র (১৩১৩) গল্পগুলিতে লেখকের হাত পাকিয়াছে। 'বাস্তুসাপ' ইহার একটি বিশিষ্ট রচনা। 'দেশী ও বিলাতী'-র (১৩১৭) গল্পগুলিতে প্রভাত-কুমারের ক্ষমতার পূর্ণবিকাশ হইয়াছে। চতুর্থ গল্পের বই 'গল্পাঞ্জলি'-র (১৩২০) একটি গল্প, 'রসময়ীর রসিকতা',[2] প্লট-নির্মাণ কৌশলে বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্পের মধ্যে স্থান পাইবে। গল্পটিতে অদ্ভুত কৌশলে ভূতের গল্পের ভীতিরস সঞ্চারিত হইয়াছে।

প্রভাতকুমারের অন্যান্য গল্প-গ্রন্থ হইতেছে 'গল্পবীথি' (১৩২৩), 'পত্রপুষ্প' (১৩২৪), 'গহনার বাক্স' (১৩২৮), 'হতাশ প্রেমিক' (১৩৩০), 'নূতন বউ' (১৩৩৫), 'জামাতা বাবাজী' (১৩৩৮) ইত্যাদি। ইনি উপন্যাসও অনেকগুলি লিখিয়াছিলেন, 'রমাসুন্দরী' (১৩১৪),[3] 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৩১৯),[4] 'জীবনের মূল্য' (১৩২৩), 'রত্নদীপ' (১৩২৪), 'সিঁদুর-কৌটা' (১৩২৬), 'মনের মানুষ' (১৩২৯),, 'সত্যবালা' (১৩৩১),[5] 'সতীর পতি' (১৩৩৫) ইত্যাদি।

প্রভাতকুমারের ছোট-গল্পের শিল্পচাতুর্য্য তাঁহার উপন্যাসগুলিতে নাই। তাঁহার উপন্যাসের প্লট রোমান্টিক এবং চিত্রবহুল। কাহিনীর মধ্যে চমকপ্রদ ঘটনা আছে। তবে ঘটনাগুলি কাহিনীর মধ্যে ঐক্য লাভ করিতে পারে নাই। প্লটের শৈথিল্য ও অগভীরতা প্রভাতকুমারের উপন্যাসের প্রধান দোষ। প্রায়ই অবান্তর চিত্রের অথবা গৌণ ঘটনার উজ্জ্বলতায় মূল কাহিনীর কৌতূহল খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। প্রধান ভূমিকাগুলি প্রায়ই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয় নাই। তবে ছোট ছোট ভূমিকাগুলিতে লেখকের দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। পাষণ্ড-চরিত্রগুলি স্মিতকৌতুকরসের অভিষেকে হৃদ্য হইয়াছে। নবীন-সন্ন্যাসীর গদাই পাল

[1] জীবনস্মৃতি দ্রষ্টব্য। [2] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী মাঘ ১৩১৬। [3] প্রথমপ্রকাশ (প্রথমে 'সুন্দরী', পরে 'রমাসুন্দরী' নামে) ভারতী ১৩০৯-১০। [4] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ১৩১৭-১৮।

[5] ইহা প্রভাতকুমারের একটি প্রথম গদ্য রচনা। প্রথম দুই পরিচ্ছেদ ভারতীতে (১৩০২-০৩) বাহির হইয়াছিল 'লালাকুমারী' নামে, তখনো রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' লিখিতে অনেক দেরি। উপন্যাসটি সম্পূর্ণভাবে প্রথমপ্রকাশিত হয় 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'-তে (১৩২৯-৩০)।

বাঙ্গালা সাহিত্যের Rogues' Gallery-তে ভাঁড়ু দত্ত ও ঠকচাচার পাশে অমরতা লাভ করিয়াছে। রোমান্স- ও কৌতুক-রসের প্রাধান্যের জন্য ট্রাজিক চরিত্রগুলিও ফুটিতে পারে নাই। ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম হইতেছে 'রত্নদীপ'-এর বৌরাণী।

৩

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬৯-১৯২৯) গল্পরচনায় হাতে-খড়ি বালকে (১২৯২)।[১] ইহাকে সম্পাদক করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথম তিনবৎসর সাধনা চালাইয়াছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ কবিতাও লিখিতেন। তবে ছোট-গল্পেই ইহার হাত খুলিয়াছিল। সুধীন্দ্রনাথের গল্পের কাহিনী সরল, রস করুণ। বাৎসল্যের ছবি এবং শিশুহৃদয়ের চিত্র ইহার লেখায় মধুর রূপ পাইয়াছে। 'কাসিমের মুরগী',[২] 'পোড়ার মুখী', 'পাগল', 'খ্রীষ্টানের আত্মকথা'[৩] প্রভৃতিতে ছোট-গল্পের নিখুঁত আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। সুধীন্দ্রনাথের গল্পের বই হইতেছে 'মঞ্জুষা' (১৯০৩), 'চিত্ররেখা' (১৯১০), 'করঙ্ক' (১৯১২) ও 'চিত্রালী' (১৯১৬)।[৪] 'মায়ার বন্ধন' (১৯০৪) বড়-গল্প।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (?-১৩৩৮) 'সাহিত্য' পত্রিকার বিশিষ্ট গল্প-লেখক ছিলেন। ইহার গল্পের বই দুইটি, 'ছোট ছোট গল্প' (১৩২২) এবং 'কর্ম্মযোগের টীকা ও অন্যান্য গল্প' (১৩২৩)। পরবর্তী গল্পগুলি এখনো গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের লিপিভঙ্গিই তাঁহার গল্পগুলিকে বিশিষ্টতা দিয়াছে; প্লট-রচনায় তেমন বিশেষত্ব নাই। আগাগোড়া লঘুব্যঙ্গের সুর এবং ছাঁটা ছাঁটা বাক্য ইহার লেখার নিজস্ব ভঙ্গি। পাত্রপাত্রীর বৈকল্য অনেক সময় কৌতুকের সুরে খাদ মিশাইয়াছে। লঘুব্যঙ্গের পালে ভর দিয়া কঠিন প্লট সুন্দরভাবে তরিয়া গিয়াছে 'যে হেতু ও সে হেতু' গল্পে।[৫] কাহিনীর অসমসাহসিক বাস্তবতা সে-সময়ের পক্ষে খুবই অভিনব।

[১] 'স্বাধীনতা' বৈশাখ সংখ্যা। [২] প্রথমপ্রকাশ ভারতী শ্রাবণ ১৩১৮।
[৩] প্রথমপ্রকাশ সাহিত্য ফাল্গুন ১৩০৭।
[৪] চিত্রালী মঞ্জুষারই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। [৫] প্রথমপ্রকাশ সাহিত্য ১৩১১।

পল্লীকুটীরবাসী নরনারীর idyllic ও নীতিরসপূর্ণ করুণ চিত্র আঁকা হইয়াছে জলধর সেনের (?-১৯৩৯) গল্পে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব্বে গল্পে নির্য্যাতিত দুঃখিনী নারীর কিঞ্চিৎ পক্ষ লইয়াছিলেন জলধর। তবে ইনি নিষ্ঠুরতাকে স্বীকার লইয়াছিলেন এবং সমাজবিধানের নায্যতা বিচার করিতে সাহস করেন নাই। জলধরের প্রথম গল্প হইতেছে 'দুঃখিনী' (১৯০৯),[১] শ্রেষ্ঠ গল্প 'বিশুদাদা (১৩১৮)।[২] ইঁহার শ্রেষ্ঠ গদ্য-রচনা হইতেছে 'হিমালয়' (১৯০১)। 'প্রবাস চিত্র' (১৩০৬) প্রভৃতি ভ্রমণকাহিনীও সুখপাঠ্য। 'ছোট কাকী ও অন্যান্য গল্প' জলধরের প্রথম ছোট-গল্পের বই। ইহার দুইটি গল্পে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ আছে।[৩] আর দুইটি দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা।[৪]

গতানুগতিক পথ ধরিয়া যাঁহারা গল্প লেখায় অল্পবিস্তর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১২৭৬-১৩২৭), প্রকাশচন্দ্র দত্ত, ভবানীচরণ ঘোষ, পাঁচুলাল ঘোষ, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ পাল, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য[৫] প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

হেমেন্দ্রমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত (১৩০৩ সাল হইতে) "কুন্তলীন পুরস্কার" ছোট-গল্পরচনায় বহু লেখককে উৎসাহিত করিয়াছিল। গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া পরবর্ত্তী কালে নাম-করা অনেক লেখক একদা কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; যেমন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, "ইন্দিরা দেবী", অনুরূপা দেবী ইত্যাদি। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছিলেন এমন কোন কোন লেখকও এই পুরস্কারের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে জগদানন্দ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ম্মফল' গল্পটি ১৩১০ সালে কুন্তলীন পুরস্কার রূপে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। "গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন"-এ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "আমার রচিত এই ক্ষুদ্র

[১] প্রথমপ্রকাশ (অংশত) জাহ্নবী ১৩১৪। [২] মানসীতে প্রথম প্রকাশিত। [৩] 'ছোট কাকী' ও 'ছুটি'। [৪] 'মৃতের মৃত্যু' ও 'মামাবাবু'। [৫] ইঁহার প্রথম উপন্যাস 'নবযৌবন' (১৩১৩) ও প্রথম গল্পের বই 'কথাকুঞ্জ' (১৩১৪), 'নারায়ণ,' 'ভারতবর্ষ,' 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় পরবর্ত্তী কালে প্রকাশিত গল্পে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ধরণে পল্লীকাহিনী, ও মান-অভিমানের পালার বাড়াবাড়ি আছে।

গল্পটি গ্রহণ করিয়া কুন্তলীনের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সাহায্যার্থে তিনশত টাকা দান করিয়াছেন।"

৪

আলোচ্য সময়ে পূর্ব্বতন পদ্ধতির রোমান্টিক উপন্যাস রচনা কিছুমাত্র কমে নাই। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে কোন কোন উপন্যাসের প্লটে অতীত ইতিহাসের বীরনায়কদিগের আবির্ভাব ঘটিল। রক্ষণশীল পন্থায় দেশোদ্ধার পল্লী-উন্নয়ন ও সমাজসংস্কার উদ্দেশ্যে নীতিমূলক বা উপদেশাত্মক কাহিনীও লেখা হইতে লাগিল। এই সময়ের উপন্যাস-লেখকদিগের মধ্যে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে নূতনত্বের আবির্ভাব করিলেন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙ্গালায় তথাকথিত "ঐতিহাসিক" উপন্যাসে ইতিহাস কাহিনীর অযথা অমর্য্যাদা দেখিয়া ইনি ইতিহাস-কাহিনী অবলম্বন করিয়া উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথম রচনা 'পাষাণের কথা'-য় গল্পরস বিশেষ কিছু না থাকায় সাধারণ পাঠকের কাছে সমাদর পায় নাই। রাখালদাস তাহার পর গুপ্ত ও পাল সাম্রাজ্যের ইতিহাস-কাহিনী অবলম্বন করিয়া উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন। গুপ্ত ও পাল ইতিহাসের তথ্য আবিষ্কারে রাখালদাসের যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল; সুতরাং বিষয়বস্তুর উপর তাঁহার অনন্যসাধারণ অধিকার ছিল নিশ্চয়ই। 'শশাঙ্ক' (১৩২১)[১] উপন্যাসে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ভগ্নদশার ছবি পাই। 'ধর্ম্মপাল'-এ (১৩২২)[২] পাল-সাম্রাজ্যের গৌরবদিনের উজ্জ্বল চিত্র আছে। 'করুণা'-য় (১৩২৪) গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর দুইখানি উপন্যাস লেখা হয় মোগল-সাম্রাজ্যের কাহিনী লইয়া—'ময়ূখ' (১৩২৩) ও 'অসীম'।[৩]

১ মানসীতে প্রথম প্রকাশিত। ২ প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ১৩২১-২২। ৩ প্রথমপ্রকাশ ভারতবর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩২৮ হইতে।

প্রথম তিনখানি উপন্যাসে প্রাচীন ভারতের গৌরব-ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ মূর্ত্তি ধরিয়াছে ইতিহাসের ক্ষীণ-সূত্র অবলম্বন করিয়া। স্কন্দগুপ্ত, যশোধবল, মৌখরী অনন্তবর্ম্মা প্রভৃতি নামের গৌরব এবং মহাপ্রতীহার, কুমারপাদীয় মহামাত্য, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহানায়ক ইত্যাদি পদবীর মোহ রাখালদাসের বর্ণনা আশ্রয় করিয়া পাঠকের মনে প্রাচীন রোমান্সের স্বপ্নসৌধ গড়িয়া তুলে।

রাখালদাস দুইখানি "সামাজিক" উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন, 'পক্ষান্তর' ও 'অনুক্রম'।

৫

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর কবিতা ও প্রবন্ধের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গল্পলেখাতেও ইহার বৈশিষ্ট্য অসাধারণ। ইহার প্রথম মৌলিক গল্প 'প্রবাসস্মৃতি' বিলাতের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে লেখা। রচনা আগাগোড়া রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক পরিমার্জ্জিত বলিয়া বোধ হয়।[১] তাহার পর প্রমথবাবু বহুকাল আর কোন গল্প লিখেন নাই। অবশেষে ১৩২২ সালে সবুজপত্রে ইহার সবচেয়ে বিশিষ্ট গল্প-চতুষ্টয় বাহির হইল, 'চার-ইয়ারী কথা'।[২] তাহার পর ইনি আরো বহু গল্প লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোনটিরই শিল্পপারিপাট্য চার-ইয়ারী-কথাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।[৩]

প্রমথবাবুর প্রবন্ধে যেমন গল্পেও তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার সঙ্গে উজ্জ্বল ভাষা-শিল্পের দুর্লভ সমন্বয় ঘটিয়াছে। তাঁহার বর্ণনরীতি গল্প-বলার মত। ষ্টাইলের মধ্যে যেটুকু কৃত্রিমতা আছে তাহা কঠিন কারুকার্য্যে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। গল্পের কাহিনীতে ভাগ্যের বঞ্চনার ও অদৃষ্টের পরিহাসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অভিনব। চরিত্রগুলি সোজাসুজি জীবন হইতে নেওয়া নয়, সেগুলিকে জীবনের abstraction বলা যাইতে পারে, তবুও সেগুলি জীবন্ত হইয়াছে বুদ্ধিরসসিক্ত কৌতুক-সমবেদনার স্পর্শে।

[১] ১৩০৫ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত। সে বছর রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদক ছিলেন। পরে মাতুলের এই কাহিনী লইয়া প্রিয়ম্বদা দেবীও গল্প লিখিয়াছেন 'বিগত-বসন্তে' [বিচিত্রা আষাঢ় ১৩৩৯]। ভারতীতে 'প্রবাসস্মৃতি'-লেখকের নাম ছিল না। [২] পুস্তকাকারে ১৯১৬। [৩] 'গল্প সংকলন'-এ (১৩৪৮) ইঁহার গল্পগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

৬.

ভারতী-সম্পাদন উপলক্ষ্যে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (? -১৯২৯) একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই ছোট-গল্প রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন এবং অনুবাদ ও অনুসরণের দ্বারা গল্পে-উপন্যাসে আধুনিক বিদেশী সাহিত্যের ভাব ও ভঙ্গি বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়া নব্য-রোমান্টিকতার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। রোমান্টিক ভাবাতিশয্য ইঁহাদের রচনারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভারতী-গোষ্ঠীর অধিনায়ক মণিলাল ছিলেন পাকা লিখিয়ে। তাঁহার রচনারীতি সরল নিরলঙ্কৃত এবং সহজকবিত্ব-মণ্ডিত। সূক্ষ্ম রোমান্টিক অনুভূতি ইঁহার রচনায় বর্ণসুষমা লাভ করিয়াছে। বিদেশী গল্পের অনুবাদে মণিলাল বিশেষ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। 'কল্পকথা'-র (১৯০৯) গল্পগুলি জাপানী গল্পের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে লেখা। 'আলপনা'-র (১৯১০) কয়েকটি গল্পেরও মূল বিদেশী। অপর গল্পের বই হইতেছে 'ঝাঁপি' (১৯১২), 'মহুয়া,' 'পাপ্‌ড়ি' ও 'জলছবি'। 'মনে মনে' (১৯১৯) বড়-গল্প। ইনি নাটকও লিখিয়াছিলেন 'মুক্তার মুক্তি'।

মণিলালের বিশিষ্ট গল্পগুলিতে বঞ্চিত হৃদয়ের মূক রসপিপাসার যে আর্তধ্বনি শোনা যায় তাহা সাধারণ লেখকের হাতে তাহা সহজেই সস্তা ভাবোচ্ছ্বাসে পরিণত হইতে পারিত। মণিলালের রসদৃষ্টি ও সংযম তাঁহার গল্পের কাহিনীকে তুচ্ছতা হইতে বাঁচাইয়া গিয়াছে। 'তুরুপ,' 'টাকার থলি,' 'বিন্দু,'[১] 'দুই সন্ধ্যা,'[২] 'মুক্তি' প্রভৃতি গল্পে মণিলালের দক্ষতা সবচেয়ে পরিস্ফুট। শেষের গল্পটি সমসাময়িক একাধিক লেখককে তথাকথিত "বাস্তব" গল্প-উপন্যাস রচনার প্রেরণা দিয়াছে। একতরফা প্রেমের অলস রোমান্টিক কল্পনার চমৎকার ছবি 'মনে মনে'। ইহাও সমসাময়িক লেখকদের প্রভাবিত করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভারতী-গোষ্ঠীর একজন প্রধান ও প্রবীণ লেখক। ইনিও প্রথমে গল্পই লিখিতেন। ইঁহার প্রথম দুইটি গল্পের বই হইতেছে

১ মহুয়া। প্রথমপ্রকাশ ভারতী আশ্বিন ১৩২০।
২ পাপ্‌ড়ি।

'শেফালি' (১৯১০) ও 'নির্ঝর' (১৯১১)। সৌরীন্দ্রমোহন পরে বহু উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইঁহার নাট্যরচনাও আছে। ইঁহার অধিকাংশ রচনার কাহিনী বিদেশী সাহিত্য হইতে নেওয়া।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা মাধুরীলতা দেবীর (১৮৮৬-১৯১৮) লেখা কয়েকটি মৌলিক ও অনুবাদ গল্প ভারতী-প্রবাসী-সবুজপত্রে বাহির হইয়াছিল। তাহার মধ্যে দুইটি, 'মাঁতা' শক্র'[১] ও 'সুরো'[২] চমৎকার। কাহিনী রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া বলিয়া মনে হয়।

৭

ভারতী-গোষ্ঠীর উপন্যাস-লেখকদের মধ্যে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান। ইনি ছোট-গল্প লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন অল্পবয়সেই। ইঁহার গল্পের বই হইতেছে 'পুষ্পপাত্র' (১৯১০), 'বরণডালা' (১৯১০), 'সওগাত' (১৯১১), 'ধূপছায়া' (১৯১২) 'চাঁদমালা' (১৩২২), 'কনকচুর' (১৩২২) ইত্যাদি। 'চটির পাটি'র মত গল্পচিত্রে চারুচন্দ্র বেশ রস জমাইয়াছেন, তবে রোমান্টিকতার আতিশয্য ও রচনারীতির বর্ণবাহুল্য অনেকগুলি গল্পের রসহানি ঘটাইয়াছে। ইনি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন অনেকগুলিই ; তাহার মধ্যে কতকগুলির কাহিনী বিদেশী উপন্যাস হইতে গৃহীত।[৩]

প্রথম মৌলিক উপন্যাস 'স্রোতের ফুল'-এর[৪] কাহিনী রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া বলিয়া মনে হয়। চতুরঙ্গের কাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীর সবিশেষ সাদৃশ্য আছে। ভূমিকাগুলির ঐক্যও স্পষ্ট। স্রোতের-ফুলের বিপিন চতুরঙ্গের শ্রীবিলাস ও শচীশ একাধারে ; নবকিশোর কতকটা শচীশের প্রতিচ্ছবি ; চারুচন্দ্রের স্মৃতিরত্ন, হরিবিহারী, কালীতারা, প্রেমানন্দ ও মালতী যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের জ্যাঠামশায়, হরিমোহন, হরিমতী, লীলানন্দ ও দামিনী। উপন্যাসকাহিনীকে চারুচন্দ্র পুষ্ট করিতে পারেন নাই। ভূমিকাগুলি সুচিত্রিত নয়, হয় বর্ণবহুল নয় বর্ণহীন।

১ ভারতী কার্তিক ১৩১৫। ২ সবুজপত্র আষাঢ় ১৩২২। ৩ যেমন 'আগুনের ফুলকি,' 'যমুনাপুলিনের ভিখারিণী,' 'চোরকাঁটা,' 'সর্বনাশের নেশা,' 'অদর্শনা,' 'জোড়-বিজোড়,' 'নোঙর-ছেঁড়া নৌকা,' ইত্যাদি। ৪ প্রথমপ্রকাশ ভারতী ১৩২১-১৩২২, পুস্তকাকারে ১৩২২ সালে।

প্রেমানন্দের উপর অবিচার করা হইয়াছে। বিপিন দুর্ব্বল ও ছিঁচকাদুনে-গোছের; যৌন উদ্দেশ্যের উপর ঝোঁক বেশি দেওয়া হইয়াছে। উপসংহার অনপেক্ষিত ও গতানুগতিক। তবে চোখের-বালির ছায়া বেশ বোঝা যায়। সবশুদ্ধ স্রোতের-ফুল সমসাময়িক উপন্যাসের মধ্যে বিশেষত্বহীন নয়।

'দুইতার'[1] ও 'হেরফের' (১৯১৯) উপন্যাস দুইটির প্লট যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দান তাহা লেখক স্বীকার করিয়াছেন। 'দোটানা'-র (১৯২০) কাহিনীও রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া বলিয়া মনে হয়।

'পরগাছা'[2] চারুচন্দ্রের দ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কাহিনীর বাস্তবতা হৃদয়-গ্রাহী। রচনাও বাহুল্যের পল্লব-বর্জ্জিত। 'পঙ্কতিলক' (১৯১৯) ইহার সবচেয়ে বিখ্যাত বা কুখ্যাত উপন্যাস। প্লটে সাহসিকতার প্রকাশ আছে, তবে কাহিনীর গাঁথুনি জমাট হয় নাই। রস-সঙ্গতিরও অভাব আছে। নায়িকা আভার ভূমিকা স্বাভাবিক বাঙ্গালী মেয়ের মত হয় নাই। জগন্নাথের সহিত তাহার বিবাহ এবং সন্ন্যাসী নির্ম্মলের সহিত তাহার সংসর্গ স্বাভাবিক তো নয়ই যুক্তিযুক্তও নয়। তবে স্রোতের-ফুলের তুলনায় পঙ্কতিলকে সংস্কারপ্রচেষ্টার প্রচণ্ডতা কম।

গল্পে-উপন্যাসে সংস্কারপ্রচেষ্টা-প্রকাশে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমানধর্ম্মা। ভারতী-গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই ভাল গল্পলেখক ছিলেন। হেমেন্দ্রকুমারের লিপিকুশলতা বোধ হয় মণিলালের পরেই সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রচনারীতি সহজ ও সরল, মধুর এবং মিতভাষিণী। রোমান্টিক গল্প-উপন্যাস ছাড়া ইনি thriller বা "রোমাঞ্চক" ও ডিটেক্‌টিভ গল্প লেখায়ও কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন।[3] ইঁহার রোমান্টিক গল্পের প্লটেও রোমাঞ্চকতার বেশ আভাস আছে।

হেমেন্দ্রকুমারের গল্পের বই হইতেছে 'পসরা' (১৩২২), 'মধুপর্ক' (১৩২৪), 'সিঁদুর-চুপড়ী' (১৩২৮), 'মালা-চন্দন' (১৩২৯), 'শুক্তারার প্রেম' (১৩৩১) ইত্যাদি।

১ প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ১৩২৪, পুস্তকাকারে ১৯১৮। ২ প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ১৩২৩।

৩ এই-ধরণের একটি গল্প 'উপন্যাস-সংগ্রহ'-এ (১৯০৯) প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঁচকড়ি দে-র বোধ করি প্রধান সাহিত্যশিষ্য হেমেন্দ্রবাবু।

বড়-গল্প ও উপন্যাস হইতেছে 'আলোয়ার আলো' (১৩২৫), 'জলের আল্পনা' (১৩২৬), 'কাল-বৈশাখী', 'পায়ের ধূলো' (১৩২৮), 'ঝড়ের যাত্রী' (১৩৩০) ইত্যাদি। আলেয়ার-আলোর প্লট চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আলোকলতা'-র (১৯২০) মত। শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর 'বন্ধু'-র কাহিনীও অনুরূপ। কাহিনীটি মূলে বিদেশী হওয়া সম্ভব। কাল-বৈশাখীর প্লটে রোমাঞ্চক উপন্যাসের বীজ আছে; নায়ক বিনোদ বিলাতী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের পাষণ্ডের ছাঁচে গড়া। পায়ের-ধূলোর কাহিনী খানিকটা বাস্তব-ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজপরিত্যক্ত নারীর সদ্‌গতির প্রচেষ্টা গল্পটিকে কতকটা প্রচারমূলক করিয়াছে। ঝড়ের-যাত্রীতে সংস্কারপ্রচেষ্টা আরো প্রকট।

হেমেন্দ্রবাবু কবিতাও লিখিয়াছেন। ইঁহার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'যৌবনের গান'।

হেমেন্দ্রলাল রায় প্রধানত কবি ছিলেন। ইঁহার কবিতার বই হইতেছে 'ফুলের ব্যথা'। হেমেন্দ্রলাল দুই-একখানি উপন্যাসও রচনা করিয়াছিলেন। 'ঝড়ের দোলা'-য় (১৩৩২) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রহীনের প্রভাব আছে। সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টাও ইহাতে সুস্পষ্ট। ইঁহার অপর উপন্যাস হইতেছে 'মায়ামৃগ'।

শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর প্রথম গ্রন্থ 'বাজীকর' (১৯২২) গল্পের বই। প্রথম উপন্যাস হইতেছে 'ঝড়ের পাখী'; ইহাতে (১৩৩০) ব্রাহ্মপরিবারের চিত্র আঁকা হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো'-র প্রভাব সত্ত্বেও 'দুই-রাত্রি'-র (১৩৩৪) কাহিনী বেশ জমিয়াছে। প্রেমাঙ্কুরবাবুর রচনারীতি একান্তভাবে কথ্যভাষাশ্রিত এবং ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক। কাহিনী রোমাণ্টিক হইলেও রচনাকে ভাবাতুর বা অশ্রুসিক্ত করিয়া তোলে নাই। মনে হয় ইঁহার প্রেরণার মূলে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে; রসদৃষ্টিও আছে।

৮

ভারতীর লেখিকাদের মধ্যে তিনজনের নাম সুপরিচিত,—ইন্দিরা দেবী, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ও শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী। ইঁহাদের দ্বারা প্রচলিত পদ্ধতির রোমাণ্টিক উপন্যাসে কিছু বৈচিত্র্যের আমদানি হইল। গৃহস্থ-নারীর মান-

অভিমানের পালা, তাহার অন্তর্গূঢ় প্রেমের সফলতা-বিফলতার ঘরোয়া কাহিনী, গৃহগণ্ডীর পরিবেশে বর্ণিত হইয়াছে ইঁহাদের উপন্যাসে। ইঁহাদের কাহিনীতে স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা নায়িকাদের জীবনের অবলম্বন হইতেছে শ্বশুরের অথবা পিতামহের স্নেহ। লেখিকাদের নারীমানসের প্রকাশও লক্ষণীয়। ইঁহাদিগকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাবশিষ্য এবং অগ্রদূত দুইই বলা চলে। অনুরূপা ও নিরুপমা সাহিত্যের আসরে দেখা দিবার পূর্ব্বে শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন। ইঁহাদের কোন কোন রচনায়, বিশেষ করিয়া কাহিনী-পরিকল্পনায়, শরৎচন্দ্রের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। অথচ অপরিচিত 'মন্দির' এবং নাতিপরিচিত 'বড়দিদি' ছাড়া শরৎচন্দ্রের আর কোন রচনা ইঁহাদের প্রতিষ্ঠালাভের পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই।

ভারতী-গোষ্ঠীর রীতি অনুযায়ী ইঁহারা প্রথমে গল্প লিখিয়া হাত পাকাইয়া তবে উপন্যাস-রচনা শুরু করিয়াছিলেন। তবে ইঁহাদের গল্প সাধারণত উপন্যাসের তুলনায় নিকৃষ্ট।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর অগ্রজা ইন্দিরা দেবীর আসল নাম সুরূপা (১৮৭৯-১৯২২)।[১] ইনি অনেকগুলি গল্প লিখিয়াছিলেন। ইঁহার গল্পের বই হইতেছে 'নির্ম্মাল্য'(১৩১৯), 'কেতকী' (১৩২২) ও 'ফুলের তোড়া' (১৩২৫)। 'স্পর্শমণি'[২] ইঁহার প্রথম মৌলিক এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ঘরোয়া পরিবেশের চিত্রণে ইনি নিপুণতা দেখাইয়াছেন।

অনুরূপার গল্পগুলি অকিঞ্চিৎকর। ইঁহার সুবৃহৎ উপন্যাসগুলি সাধারণ পাঠকের খুবই পরিচিত,—'পোষ্যপুত্র' (১৩১৫),[৩] 'জ্যোতিহারা' (১৩১৫),[৪] 'বাগ্‌দত্তা' (১৯১৪),[৫] 'মন্ত্রশক্তি' (১৩২২),[৬] 'মা' (১৩২৭)[৭] ইত্যাদি। পোষ্যপুত্রের কাহিনীতে বিদেশী গল্পের প্রভাব আছে। জ্যোতিঃহারায় গোরার অনুসরণ হইয়াছে। মন্ত্রশক্তির কাহিনীতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মন্দির'[৮] গল্পের ছায়া পড়িয়াছে।

[১] ১৩২০ সাল হইতে ইঁহার রচনা "ইন্দিরা দেবী"-র নামে বাহির হইতে থাকে। [২] প্রথমপ্রকাশ মানসী ও মর্ম্মবাণী ১৩২৪-১৩২৫। [৩] প্রথমপ্রকাশ ভারতী ১৩১৭-১৩১৮। [৪] 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় 'বিপরীত' নাম প্রথমপ্রকাশিত। [৫] ঐ ভারতী-১৩১৯-১৩২০। [৬] প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২০-১৩২১। [৭] ঐ ভারতবর্ষ ১৩২৫-১৩২৭। [৮] ১৩০৯ সালের কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত ও ১৩১০ সালে প্রকাশিত।

অনুরূপার উপন্যাসের প্লট অযথা ঘোরালো এবং অতিরিক্ত ফেনানো। সংযমের অভাবে ইহার বর্ণনরীতি প্রায়ই বাগাড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। লেখিকা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী, সুতরাং পুরানো পন্থার রক্ষণশীল আবহাওয়ায় সংবর্দ্ধিত। সেইজন্য ইহার প্রায় সব উপন্যাসেই আধুনিক বলিয়াই আধুনিকতার প্রতি অহেতুক বিরূপতা এবং পুরানো বলিয়াই সনাতনী পদ্ধতির প্রতি আন্তরিক পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে এবং রোমান্স-রসবাহুল্যের হেতু শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর উপন্যাস একশ্রেণীর পাঠকের কাছে সবিশেষ উপাদেয়।

শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর আসল নাম অনুপমা: এই নামে ইহার কতিপয় গল্প ও চিত্র "কুন্তলীন-পুরস্কার" পুস্তিকামালায় এবং ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা নিরুপমার প্রথম উপন্যাস 'অন্নপূর্ণার মন্দির'-এর (১৩২০)[১] কাহিনী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অনুপমার প্রেম' গল্পটি[২] স্মরণ করায়। দ্বিতীয় উপন্যাস 'দিদি' (১৩২২)[৩] নিরুপমার শ্রেষ্ঠ রচনা। অপর উপন্যাস হইতেছে 'বিধিলিপি' (১৩২৬), 'শ্যামলী' (১৩২৬) 'বন্ধু,' 'উচ্ছৃঙ্খল,' 'পরের ছেলে,' 'আমার ডায়েরি' ইত্যাদি। 'বন্ধু'-র কাহিনীতেও শরৎচন্দ্রের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। 'আলেয়া' (১৩২৪) গল্পের বই; 'অষ্টক'-এর (১৩২৪) গল্পগুলির কতক নিরুপমার লেখা, বাকিগুলি অগ্রজ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্টের লেখা। 'বন্ধু' চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আলোকলতা'-র ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'আলেয়ার আলো'-র অনুরূপ। কাহিনীতে ও রচনারীতিতে শরৎচন্দ্রের প্রভাব আছে; রাজেন্দ্র ও অমলা শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার মত।

নিরুপমার উপন্যাসের প্লট সাদাসিধা এবং সুগঠিত। রচনারীতি সরল সংযত ও শোভন। অভিমান অথবা কর্ত্তব্য গুরুতর হইয়া ভাবী অথবা ভবং পতি-পত্নীর মিলনে দুস্তর বাধা জন্মাইয়া পরিশেষে প্রেমের প্রৌঢ়িতে, আত্মত্যাগের কিংবা বাৎসল্যের প্রেরণায়, পরিণামে—দেহের নয়—মনের মিলনে কাহিনী পরিসমাপ্ত

[১] প্রথমপ্রকাশ ভারতী কার্ত্তিক-চৈত্র ১৩১৮।

[২] প্রথমপ্রকাশ সাহিত্য চৈত্র ১৩২০, 'কাশীনাথ'-এ (১৩২৩) সঙ্কলিত।

[৩] প্রথম-প্রকাশ প্রবাসী ১৩১৯-১৩২০।

হইয়াছে। এই রোমান্টিক frustration বা ব্যর্থতা এবং বৃহত্তর প্রেমে তাহার সার্থকতা ইহার সুপাঠ্য উপন্যাসগুলির প্রধান সুর।

শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া রোমান্টিক উপন্যাস-কাহিনীতে একটু নূতনত্ব আনিলেন বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়া। 'সেখ আন্দু' (১৩২৪)[1] ইহার প্রথম প্রকাশিত সম্পূর্ণ উপন্যাস; কাহিনীর নায়ক মুসলমান ড্রাইভার। ইহার অন্যান্য রোমান্স হইতেছে 'নমিতা' (১৩২৫), 'জন্ম অপরাধী' (১৯২০) ইত্যাদি। 'মিষ্টি সরবৎ' (১৯২০) মুসলমান-সংসারের সরস কাহিনী।

শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী ও শ্রীযুক্তা সীতা দেবী, এই দুই ভগিনীর গল্প-উপন্যাসে শহরবাসী মধ্যবিত্ত ব্রাহ্ম তরুণতরুণীর রোমান্স যথাসম্ভব বাস্তব পরিবেশে বর্ণিত হইয়াছে। শান্তা দেবীর রচনার চাল একটু গুরু, এবং প্লটও কতকটা দীর্ঘায়িত। সীতা দেবীর রচনাভঙ্গি লঘু এবং তাঁহার গল্প-উপন্যাসের বিষয়ও বিকীর্ণ নয়। এইজন্য ইহার রোমান্টিক কাহিনীগুলি জমিয়াছে ভাল। ইহারা ছোট-গল্প লেখাতেও কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। ভগিনীদ্বয়ের প্রথম মৌলিক উপন্যাস 'উদ্যানলতা'[2] দুইজনের মিলিত রচনা। ইঁহাদের বিশিষ্ট বড়-গল্প ও উপন্যাস হইতেছে সীতা দেবীর 'সোনার খাঁচা'[3] ও 'রজনীগন্ধা'[4] এবং শান্তা দেবীর 'চিরন্তনী'[5] ইত্যাদি।

৯

ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে নিতান্ত তরুণ সাহিত্যিকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল তাঁহাদের অনেকে শরৎচন্দ্রের পূর্বেই গল্প-উপন্যাস লিখিয়া অল্পবিস্তর খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই দলে ছিলেন শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী, তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট এবং শরৎচন্দ্রের মাতুলবংশীয় গিরীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী মজঃফরপুরে শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে আসিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিও এই দলের।

[1] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ১৩২২। [2] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ১৩২৫-১৩২৬। "শ্রীসংযুক্তা দেবী"-র নামে। [3] ঐ ১৩২৩। [4] ঐ ১৩২৮। [5] ঐ ১৩২৭-১৩২৮।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্টের ও শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর কয়েকটি গল্প 'অষ্টক' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিভূতিভূষণের নিজস্ব গল্পের বই হইতেছে 'সপ্তপদী' (১৩৩০)। দ্বিতীয় গল্প 'হাত দু'খানি' চমৎকার, তবে রচনাভঙ্গি একটু পল্লবিত ও অলঙ্কৃত। ইঁহার প্রথম বড়-গল্প বা উপন্যাস 'স্বেচ্ছাচারী'-র (১৩২৪) কাহিনী ইন্দিরা-অনুরূপার ধরণের; নিরুপমার 'শ্যামলী' উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গেও ঈষৎ সম্পর্ক আছে। বর্ণনভঙ্গির লঘুত্ব সর্ব্বত্র কাহিনীর উপযুক্ত হয় নাই। রোমান্সেরও প্রাধান্য আছে। তবুও কাহিনী জমিয়াছে। দ্বিতীয় উপন্যাস 'সহজিয়া'-র (১৩২৯) কাহিনী মন্দ না হইলেও প্লটের শেষার্দ্ধ সুগঠিত নয়। ভাবুকতার কিছু বাড়াবাড়ি আছে। বাবাজি ও তাঁহার সঙ্গীর সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান-টুকু উপাদেয় হইয়াছে। তবে লেখক এইটুকুর খুব সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। উপসংহার অনুরূপার উপন্যাসের মত।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

বাঙ্গালা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) আকস্মিক আবির্ভাবে সাধারণ পাঠকসমাজে আনন্দচাঞ্চল্যের যে সাড়া পড়িয়াছিল তেমনটি আর কখনো ঘটে নাই। শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'মন্দির'[১] বেনামিতে ১৩০৯ সালের কুন্তলীন-পুরস্কার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়াছিল। ১৩১৪ সালের প্রথমে ভারতীতে[২] 'বড় দিদি' গল্প অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পাঁচ বৎসর পরে অকস্মাৎ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকিয়া সাহিত্যরসিক-সমাজকে সচকিত করিল। ১৩১৯ সালে 'যমুনা'-র কার্ত্তিক-পৌষ সংখ্যায় 'বোঝা'; 'সাহিত্য'-এর মাঘ সংখ্যায় 'বাল্যস্মৃতি', ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় 'কাশীনাথ'; ১৩২০ সালে যমুনায় বৈশাখ হইতে আশ্বিন সংখ্যায় 'চন্দ্রনাথ', বৈশাখ সংখ্যায় 'পথনির্দ্দেশ', আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যায় 'আলো ও ছায়া', শ্রাবণ সংখ্যায় 'বিন্দুর ছেলে', কার্ত্তিক-চৈত্র সংখ্যায় 'চরিত্রহীন' (আংশিকভাবে), ফাল্গুন সংখ্যায় 'পরিণীতা'; 'ভারতবর্ষ'-এর পৌষ-মাঘ সংখ্যায় 'বিরাজ-বৌ'; সাহিত্যের চৈত্র সংখ্যায় 'অনুপমার প্রেম'; এবং ১৩২১ সালে ভারতবর্ষের বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যায় 'পণ্ডিত মশাই' এবং সাহিত্যের আষাঢ় সংখ্যায় 'হরিচরণ' বাহির হইল।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের অপেক্ষা গল্প সংখ্যায় গুরুতর। তাঁহার গল্পগুলি প্রায়ই বড়-গল্পের পর্য্যায়ের। অনেকগুলি গল্প আকারে সুদীর্ঘ না হইলেও যথার্থ ছোট-গল্পের সম্পূর্ণ লক্ষণবিশিষ্ট নয়। প্লট সঙ্কীর্ণ নয়, কাহিনীর বুনানিতে প্লটের সূত্র শ্লথ, এবং উপসংহারে ক্লাইমাক্স-এর অভাব; এইজন্য এ-গুলিতে ছোট-গল্পের

[১] প্রথমপ্রকাশ ১৩১০। [২] বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, প্রথম দুই সংখ্যায় লেখকের নাম ছিল না।

রস- ও শিল্প-সৌন্দর্যের অভাব আছে। 'পথ নির্দেশ,' 'বিন্দুর ছেলে,' 'একাদশী বৈরাগী'[1] প্রভৃতি গল্পে আদর্শ ছোট-গল্পের সব লক্ষণ বজায় নাই। তবে একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হইতেছে 'মহেশ'।[2]

২

শরৎচন্দ্রের গল্পে সমসাময়িক একাধিক গল্প-লেখকের প্রভাব পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সর্বাধিক। 'মেজদিদি'[3] গল্পের কাদম্বিনী ও হেমাঙ্গিনী যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের ফটিকের মামা ও 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণালের ছাঁচে ঢালা। স্ত্রীর-পত্র গল্পের প্রভাব শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া'-র (১৩২৩) উপর ক্ষীণ হইলেও নিশ্চিতভাবে পড়িয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৩২৩) গল্পের আদর্শ যোগাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা'। 'স্বামী'[4] ঘরে-বাইরের আদর্শে পরিকল্পিত। রবীন্দ্রনাথের 'ব্যবধান,' 'অনধিকার প্রবেশ' প্রভৃতি গল্পের ভূমিকা শরৎচন্দ্রের অনেক গল্পে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ গুরুতর, বিশেষ করিয়া 'চোখের বালি' সম্পর্কে।[5] সে কথা পরে বলিতেছি।

কোন কোন গল্পে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ও জলধর সেনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 'অনুপমার প্রেম' গল্পের আরম্ভ প্রভাতকুমারের অনুরূপ এবং শেষাংশ রবীন্দ্রনাথের। 'চন্দ্রনাথ'-এর প্লটে রবীন্দ্রনাথের 'ত্যাগ' ও প্রভাতকুমারের 'কাশীবাসিনী' গল্পের এবং কোন কোন ভূমিকায় জলধর সেনের 'বিশুদাদা'-র ও রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'-র প্রভাব আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে' (১৩১৯) নাটকেরও যেন ক্ষীণ ছায়া আছে; অন্তত পক্ষে সরযূ, দয়াল, বিশ্বেশ্বর এই নামগুলি সম্পর্কে।

শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়াছিলেন সজ্ঞানভাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী তাঁহার প্রথম জীবনে চিত্তে কি

[1] প্রথমপ্রকাশ ভারতবর্ষ কার্তিক ১৩২৪। [2] প্রথমপ্রকাশ বঙ্গবাণী আশ্বিন ১৩২৯।
[3] প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ কার্তিক ১৩২১। [4] প্রথমপ্রকাশ নারায়ণ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২৪।
[5] 'স্বদেশ ও সাহিত্য' (১৩৩২)।

রসসম্ভার যোগাইয়াছিল তাহা তিনি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন; "উপন্যা
সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না। পড়ে পড়ে
বইগুলো যেন মুখস্থ হ'য়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অ
অনুকরণের চেষ্টা না করেছি এমন নয়।" ইহার প্রথম দুইটি গদ্য রচনা হইতেছে
'ক্ষুদ্রের গৌরব'[১] ও 'গুরুশিষ্য সম্বাদ'[২]। রচনায় স্পষ্টভাবে কমলাকান্তের দপ্তরের
ভাব ও ভঙ্গি অনুকৃত হইয়াছে। 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'-র উপোদ্‌ঘাত[৩]
কমলাকান্তের ধরনের।

৩

শরৎচন্দ্রের লেখায় গল্প-বলার সরস ও সহজ আর্টের প্রকাশ হইয়াছে। ইনি
বাঙ্গালা সাহিত্যের "Tusitala," যদিচ ষ্টিভেন্‌সনের কলানৈপুণ্য ইহার ছিল না।
শরৎচন্দ্রের গল্পে প্লট-রচনা গৌণ, বর্ণনা মুখ্য। লেখার ভঙ্গিতেই তাঁহার গল্পের র
জমিয়াছে। ভাল গল্প-বলিয়ের মত শরৎচন্দ্রের রসকল্পনা অভিজ্ঞতার খেই
ধরিয়াই খুলিয়াছে। যেখানে মুখ্যত কল্পনার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে
সেখানে চিত্র অনুজ্জ্বল। সহজ ও সুলভ হৃদয়বৃত্তির উচ্ছ্বাস জমাইয়া রোমান্টিক
পরিমণ্ডল সৃষ্টি শরৎচন্দ্রের লেখার অসাধারণ সমাদরের প্রধান হেতু। এই
হৃদয়োচ্ছ্বাসপূর্ণ রোমান্টিকতা কিশোর-মনের কল্পনার মত মনে হয়, বিশেষ করিয়া
'মন্দির,' 'বড়দিদি,' 'পরিণীতা' প্রভৃতি প্রথম যুগের রোমান্‌সগুলিতে। সাক্ষাৎ
অভিজ্ঞতা না থাকায় পূর্ব্বরাগের এবং নববিবাহিত দম্পতীর অনুরাগের চিত্রে
কিশোরমানসসুলভ অবাস্তব রোমান্টিক কল্পনার আতিশয্য প্রকট হইয়াছে। এই
রোমান্স-রসবাহুল্যেই শরৎচন্দ্রের দুঃখান্তিক গল্পগুলি প্রায়ই ট্রাজিক না হইয়া
প্যাথেটিক হইয়াছে। এমন কি 'অরক্ষণীয়া'-র অমন অনবদ্য ট্রাজিক ক্লাইমাক্স
একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছে রোমান্টিক উপসংহারে।

১ রচনাকাল শ্রাবণ ১৩০৮; প্রকাশ যমুনা মাঘ ১৩২০। ২ রচনাকাল ঐ? প্রথমপ্রকাশ যমুনা ফাল্গুন ১৩২০, স্বদেশ-ও-সাহিত্যে সঙ্কলিত। ৩ ভারতবর্ষ মাঘ ১৩২২। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব্বে এই অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সেণ্টিমেণ্টাল আবেদন ও রোমাণ্টিক পরিমণ্ডলটুকু যাহাতে পুরামাত্রায় বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্যেই শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ প্রায়ই অসম্পূর্ণ কিংবা অতিশয়িত হইয়াছে, এবং তাহার ফলে ভূমিকাগুলিতে অবাস্তবতার স্পর্শ লাগিয়াছে। তবে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে সঞ্চিত এক-আধটি ঘটনা বা চিত্র কাহিনীর উপভোগ্যতা বাড়াইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু প্লটে এবং চরিত্রকল্পনায় আশানুরূপ বৈচিত্র্য পাই না। তবে বৈচিত্র্যহীনতা-সত্ত্বেও যে শরৎচন্দ্রের লেখায় রসসৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই ইহা তাঁহার লিপিকুশলতার পরিচায়ক। ইঁহার গল্প-উপন্যাসের প্রধান ভূমিকাগুলি মোটামুটি তিন শ্রেণীতে পড়ে,—(১) আত্মভোলা উদাসীন অথবা বুদ্ধিবিবেচনাহীন মূঢ়, (২) শঠ, কপট অথবা মূর্খ, এবং (৩) অসমহৃদয়াবেগ-উচ্ছ্বসিত স্নেহশীল ব্যক্তি যাহার মেজাজে ও ব্যবহারে যথাক্রমে তীব্রতম অভিমানের সঙ্গে নিষ্ঠুরতম প্রত্যাখ্যান ও আর্দ্রতম স্নেহের সঙ্গে কোমলতম অভ্যর্থনা ছায়া ও রৌদ্র ফেলিয়া চলিয়াছে। মানবের জীবনে প্রচণ্ডতায় প্রকৃতির শক্তির অনেক উপরে যায় অনাদি অদৃষ্টচক্রের শক্তি। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিতে অদৃষ্টের উপযুক্ত স্থান নাই। তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলি সাধারণত নিজেদেরই বিশিষ্ট হৃদয়াবেগ- ও মনোবৃত্তি-চালিত যন্ত্রমাত্র; কচিৎ তাহারা পারিপার্শ্বিকের চাপে পিষ্ট; কিন্তু কখনো তাহারা অমোঘ অদৃষ্টচক্রের পাকে নিষ্পেষিত নয়। অদৃষ্টের খেলা জীবনের গভীরতম ট্রাজেডির বিষয়, লঘু রোমান্সের সঙ্কীর্ণ ভূমিতে তাহার উপযুক্ত পরিসর কোথায়।

শরৎচন্দ্রের গল্পের পাত্রপাত্রীর পরস্পর সম্পর্কে বিশেষ একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হইতেছে স্নেহ সম্বন্ধে তির্য্যক্‌ভাব। অর্থাৎ ভালবাসার বন্ধন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইয়া অসাক্ষাৎ সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়া দৃঢ়তর হইয়াছে। তাই শরৎচন্দ্রের লেখায় বৈমাত্র ভাই, জ্ঞাতি ভাই-ভগিনী, খুড়ী-মাসী, দেবরপুত্র-ভগিনীপুত্র এমন কি আরো দূরতর আত্মীয়তাসম্পর্কের মধ্যে নিবিড় স্নেহবন্ধন চিত্রিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে এই-ধরণের গভীর স্নেহসম্পর্কের চিত্র আছে, কিন্তু সেখানে পিতা-মাতা পুত্র-কন্যা সহোদর-সহোদরা প্রভৃতি সাক্ষাৎ রক্ত-

সম্বন্ধেরও অনুরূপ ছবির অভাব নাই। শরৎচন্দ্রের লেখায় সাক্ষাৎ স্নেহসম্পর্কে চিত্র একেবারেই নাই। ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথমত রোমান্স-র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের অপেক্ষা দূরতর সম্পর্কে জমে ভাল; দ্বিতীয়ত শৈশবে ও বাে শরৎচন্দ্রের অদৃষ্টে বাপ-মায়ের ভালোবাসার অপেক্ষা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ে ভালোবাসা বেশি করিয়া জুটিয়াছিল বলিয়া বোধ করি।

'চন্দ্রনাথ,' 'বিরাজ বৌ,' 'পল্লী সমাজ'[১] প্রভৃতি গল্পে মৃতপ্রায় সমাজে নারী-সম্পর্কে অযথা উৎপীড়নের চিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের এমন অবস্থায় সমাজ-ব্যবস্থাকে অকরুণ মানিয়াছেন, তবে অন্যায় বলেন নাই এবং অমান্যও করেন নাই। শরৎচন্দ্রও অমান্য করিতে সাহস করেন নাই, তবে অন্যায় বলিয়াছেন মুক্তকণ্ঠে, এবং চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার শ্লথবন্ধন পল্লীসমাজের মৃ হৃদয়হীনতা ও কদর্য্য স্বার্থপরতা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। "সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে।"[২] —এই মনোভাবেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বগামী লেখকদিগের প্রধান পার্থক্য। শরৎচন্দ্র নারীত্বের সম্বন্ধে মহৎ ধারণা পোষণ করিতেন। বোধ করি প্রথম জীবনে তিনি একাধিক তেজস্বিনী ও প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্না স্নেহশীলা মহিলায় ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহার প্রায় সকল মহিলা-ভূমিকায় প্রাবল্য ও শক্তিমত্তা প্রকটিত হইয়াছে, এবং প্রধানত এই-হেতুই সতীত্বের গতানুগতিক ধারণার বিরুদ্ধে তিনি অতটা উগ্রমত পোষণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বগামী লেখকদিগের সঙ্গে তাঁহার আর একটি প্রবল পার্থক্য পাই সতীত্বের এই ধারণায়। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আগেকার সব গল্প-লেখকেরই text-book morality অর্থাৎ পুথিগত নীতিবোধের বাহিরে বৃহত্তর চারিত্র্যনীতির কোন ধারণা ছিল না। সমাজের অনুবীক্ষণে যাহারা পতিতা তাহাদের কাহারো কাহারো মহত্বের পরিমাপ যে মনুষ্যত্বের উচ্চতর মানদণ্ডও ছাড়াইয়া যাইতে পারে সে-বিষয়ে আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই তাঁহার কোন কোন গল্পে[৩] ও কবিতায়[৪] সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্ত

[১] প্রথমপ্রকাশ ভারতবর্ষ আশ্বিন অগ্রহায়ণ ও পৌষ। প্রথমে নাম ছিল 'পল্লীকাহিনী'
[২] 'স্বদেশ ও সাহিত্য' পৃ ৯০৫ [৩] 'বিচারক'। [৪] 'সতী' ও 'করুণা'।

করেন ;—"মর্ত্তে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতীশিরোমণি"। শরৎচন্দ্রও কয়েকটি উপন্যাসে এই তত্ত্বটিই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে একনিষ্ঠ প্রেম তথাকথিত সতীত্ব-নিষ্ঠারও উপরে। এ-বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি 'নারীর মূল্য' বইটিতে[১] এবং একাধিক প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় বার বার বলিয়াছেন ; "সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায় ?"[২] "সতীত্বকে আমি তুচ্ছ বলি নে, কিন্তু একেই তার নারীজীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি।"[৩] বর্ম্মী নারীর প্রশংসায় বলিয়াছেন, "কেবলমাত্র নারীর সতীত্বটাকে একটা ফেটিস করে তুলে তাদের স্বাধীনতা তাদের ভাল হ'বার পথটাকে কণ্টকাকীর্ণ করে' তোলে নি।"[৪]

যে-সব নারী ক্ষণিক ভুলের বশে অথবা পেটের দায়ে কিংবা অবস্থার গতিকে পরপুরুষকে দেহ সমর্পণ করিতে বাধ্য হয় তাহাদের প্রতি সমাজের নির্ম্মম অবহেলা শরৎচন্দ্রকে ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। মনে হয় প্রথম জীবনে তিনি এইরূপ একাধিক হতভাগিনীর পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা না থাকিলে এতটা দরদ, এমন কি অতিরিক্ত সহানুভূতি, জাগিতে পারে না। এক সময়ে শরৎচন্দ্র "এই বাঙ্গলা দেশে কুলত্যাগিনী বঙ্গরমণীর" ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিলেন, "তাহাতে বিভিন্ন জেলার সহস্রাধিক হতভাগিনীর নাম, ধাম, বয়স, জাতি, পরিচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ লিপিবদ্ধ ছিল।" তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, "এই হতভাগিনীদের শতকরা সত্তরজন সধবা। বাকী ত্রিশটি মাত্র বিধবা। ইহাদের প্রায় সকলেরই হেতু লেখা ছিল, অসহ্য দারিদ্র্য ও স্বামী প্রভৃতির অসহনীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন।"[৫]

তত্ত্বের দিক দিয়া শরৎচন্দ্র যে দুঃসাহস দেখাইয়াছেন কাহিনীর পরিণতিতে

১ "অনিলা দেবী" এই ছদ্মনামে প্রকাশিত। প্রথমপ্রকাশ যমুনা বৈশাখ-আষাঢ় ও আশ্বিন-ভাদ্র ১৩২০। ২ স্বদেশ ও সাহিত্য পৃ ৯২। ৩ ঐ পৃ ১৬। ৪ ঐ ১৮।

৫ 'নারীর মূল্য,' যমুনা আষাঢ় ১৩২০।

তাহা না দেখাইয়া ভালই করিয়াছেন কেন না সাহিত্যরসসৃষ্টি আর সমাজসংস্কার-প্রচেষ্টা একধরণের কাজ নয়। শরৎচন্দ্র ঠিকই লিখিয়াছিলেন, "সমাজসংস্কারের কোন দুরভিসন্ধি আমার নাই। তাই, বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখ বেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়ত আছে, কিন্তু সমাধান নেই। ও কাজ অপরের, আমি শুধু গল্পলেখক, তা' ছাড়া আর কিছুই নই।"[১] কিন্তু শেষের দিকের লেখায় শরৎচন্দ্র শিল্পী-মনের নিরাসক্তি সব সময় রক্ষা করিতে পারেন নাই।

সমাজ-সমস্যার বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও শরৎচন্দ্রকে রিয়লিষ্ট অর্থাৎ বাস্তবতন্ত্রী লেখক বলা চলে না। ইহার বাস্তবদৃষ্টি সর্ব্বদা সজাগ ছিল না, গভীরও ছিল না; সে-দৃষ্টি সহজেই রোমান্‌সের কুজ্ঝটিকায় ঘোলাইয়া গিয়াছে। ইহার অঙ্কিত চরিত্রগুলি সেই-পরিমাণেই বাস্তব যে-পরিমাণে তাহারা জীবনের দীনতা, কুশ্রীতা ও কদর্য্যতাকে রূপার্পিত করে। প্রধান পাত্রপাত্রীর রোমান্টিক idealism অর্থাৎ আদর্শপন্থার সঙ্গে এই কুশ্রী বাস্তবপন্থার টানা-পোড়েনেই শরৎচন্দ্রের কাহিনীর উপভোগ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বোপরি লেখকের সহানুভূতি এবং হীননিপীড়িতদিগের জন্য অকৃত্রিম বেদনাবোধ কাহিনীকে সহৃদয় এবং ভূমিকাগুলিকে স্নিগ্ধোজ্জ্বল করিয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে গল্প-উপন্যাসের রসদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য কোথায়। ইহার উত্তরে এই কথা বলিব: রবীন্দ্রনাথের রসদৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই অখণ্ড রূপটি ধরা পড়িয়াছে যে-রূপ বিশ্বজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত এবং যে-রূপ জন্মজন্মান্তরের খেয়া বাহিয়া চরম চরিতার্থতার অভিসারে চলিয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথের গল্পে দীনতম ভূমিকাও লেখকের অনুনয় সমর্থন অথবা সাফাই ব্যতিরেকেই নিজের মাহাত্ম্যে মহিমান্বিত। শরৎচন্দ্রের রসদৃষ্টি মানবজীবনকে দেখিয়াছে খণ্ডরূপে যে-খণ্ডের আরম্ভ ও শেষ এইখানেই। তাই ভূমিকার মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন বা প্রতিষ্ঠা করিতে শরৎচন্দ্রকে যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিতে অথবা স্থূলতঃ হৃদয়াবেগের দোহাই দিতে হইয়াছে, এবং এইকারণেই তাঁহার রচনায় জীবনের পরপারের কথা মামুলি-ধরণের, এবং আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বিচার

[১] স্বদেশ ও সাহিত্য পৃ ১৪৮।

ভাসাভাসা ও নিরর্থক হইয়াছে। সমাজের পক্ষে শরৎচন্দ্র যে গতানুগতিকতাকে মানেন নাই তাহা যে তিনি ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম ক্ষেত্রেও অস্বীকার করিয়াছেন এমন মনে করিবার হেতু নাই।

শরৎচন্দ্রের রচনা নিরতিশয় সরল মধুর ও প্রাঞ্জল। এইদিকে তাঁহার রসসৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। তিনি রোমান্‌স রচনা করিয়াছেন বটে কিন্তু জীবনের সমস্যা একেবারে এড়াইয়া যান নাই। অভিজ্ঞতা তাঁহার সঙ্কীর্ণ হইলেও গভীর ছিল এবং তাঁহার সহানুভূতি ছিল অকৃত্রিম ও প্রগাঢ়। তাঁহার রস-অনুভূতি ছিল, বাস্তব দৃষ্টিশক্তিও ছিল। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টিতে তাঁহার শক্তির উপযুক্ত ও পর্য্যাপ্ত প্রকাশ নাই।

৪

প্রথম স্তরের বড় গল্পগুলির কাহিনীর মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র আছে। 'মন্দির,' 'বড়দিদি,' 'পথনির্দ্দেশ,' 'আলো ও ছায়া,' 'পণ্ডিত মশাই,' 'পল্লীসমাজ,' 'দেবদাস' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসে, দু-তরফা না হউক একতরফা, সৌভ্রাত্র্য ও সৌহৃদ্য সম্পর্ক বা বংশমর্য্যাদা মিলনের পক্ষে অসম্ভব বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'শ্রীকান্ত' বা 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'-ও[১] এই স্তরের উপন্যাস। তবে এখানে মিলন দীর্ঘকাল প্রতিহৃত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত নিরুদ্ধ হয় নাই।

'মন্দির' ও 'বিরাজ-বৌ' গল্পের পটভূমিকার পত্তন হইয়াছে শরৎচন্দ্রের পিতৃভূমি সরস্বতী-তীরবর্ত্তী দেবানন্দপুর অঞ্চলে। কাহিনী যোগাইয়াছে তাঁহার বাল্যস্মৃতি। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কৈশোর-রচনা 'শুভদা'-য় (১৯৩৮) বিরাজবৌ-এর কাহিনীর অসংস্কৃত মৌলিক রূপটি রক্ষিত হইয়াছে।

প্রধান পাত্রপাত্রীর কঠিন পীড়া কিংবা মৃত্যু দ্বারা কাহিনীর সঙ্কটমোচন অথবা গ্রন্থিচ্ছেদ শরৎচন্দ্রের প্লট-পরিকল্পনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রথম স্তরের গল্প-উপন্যাসে এই বৈশিষ্ট্য সুপ্রকট। মন্দির, বড়দিদি, বিরাজ-বৌ, দেবদাস

[১] প্রথমপ্রকাশ: প্রথম পর্ব্ব ভারতবর্ষ ১৩২২-১৩২৩, দ্বিতীয় পর্ব্ব ঐ ১৩২৪-১৩২৫, তৃতীয় পর্ব্ব (অংশত) ঐ ১৩২৭-১৩২৮ চতুর্থ পর্ব্ব বিচিত্রা ১৩৩৮-১৩৩৯।

ইত্যাদিতে কাহিনীর জট ছাড়ানো হইয়াছে মুখ্যপাত্রের মৃত্যুতে। এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব জাগ্রত।

'দেবদাস'[১] শরৎচন্দ্রের প্রথমতম উপন্যাস যদিও না হয় প্রথম উপন্যাসগুলির অন্যতম নিশ্চয়ই। ইহার রচনা-সমাপ্তিকাল সেপ্টেম্বর ১৯০০। তখনো রবীন্দ্রনাথের চোখের-বালি বাহির হয় নাই; সুতরাং উপন্যাস-কাহিনীতে বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রভাব জাগ্রত। পার্ব্বতী-দেবদাসের বাল্যসৌহার্দ্দ্যলীলায় শৈবলিনী প্রতাপের প্রণয়লীলার অনুসরণ আছে; পার্ব্বতী-ভুবনবাবুর দাম্পত্য-ব্যবহারে লবঙ্গ-রামসদয়ের দাম্পত্যলীলার অনুকরণও দুর্লক্ষ্য নয়। দেবদাস-পার্ব্বতীর করুণ কাহিনীর মধ্যে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুর কচিৎ বাজিয়াছে। কিন্তু রঙ অত্যন্ত চড়িয়া গিয়া দেবদাসের শোচনীয় পরিণতি পাঠকের অশ্রু আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেও শিল্পের হানি করিয়াছে। দেবদাসের প্রথম অংশে যে সরল সুন্দর স্বাভাবিকতা দেখি তাহা শেষাংশের সেন্টিমেন্টালিটিতে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

'চরিত্রহীন'[২] শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বিশিষ্ট উপন্যাস। এই কারণে বইটির বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে। সাধারণ পাঠকসমাজে চরিত্রহীনের মূল্য লইয়া এখনো মতভেদের অন্ত নাই। তাহার কারণ উপন্যাসটিতে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-শিল্পের দোষ ও গুণ সমানভাবে আছে। চরিত্রহীনের রচনাকাল জানা নাই। কিন্তু ইহা যে ১৩০৮ সালের আগে লেখা হয় নাই তাহা বুঝিতেছি চোখের-বালির প্রভাব হইতে। ১৩০৮ সালের খুব বেশি দিন পরেও নয়, কেন না তখনো বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব চুকিয়া যায় নাই।

রবীন্দ্রনাথের চোখের-বালি শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে যে নূতন রস-ভাণ্ডারের সন্ধান দিয়াছিল তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে থাকে। চোখের-বালি শরৎচন্দ্রকে কতটা অভিভূত করিয়াছিল তাহা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন; "ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো।

১ প্রথমপ্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২৩-১৩২৪। ২ প্রথমপ্রকাশ (অংশত) যমুনা ১৩২০-১৩২১, গ্রন্থাকারে ১৩২৪ সালে।

…কোন কিছু যে এমন করে' বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্ব্বে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু সাহিত্যের নয় নিজেরও যেন, একটা পরিচয় পেলাম।"[১]

চরিত্রহীনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব নিতান্ত ক্ষীণ। হারাণ-কিরণময়ীর সম্পর্কে চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর ব্যবহারের আমেজ আছে; এবং কিরণময়ীর ব্যবহার কচিৎ রোহিণীর মত, আর ইহার পরিণাম শৈবলিনীর পরিণামের অনেকটা অনুরূপ। শুধু এইটুকুতেই বঙ্কিম-প্রভাব পর্য্যবসিত। রবীন্দ্র-প্রভাব কিন্তু গুরুতর। চোখের-বালির বিনোদিনীর আদর্শে কিরণময়ীর ভূমিকা পরিকল্পিত হইয়াছে। উপেন্দ্রও অনেকটা মহেন্দ্রের মত, তবে বর্ণহীন ও আদর্শায়িত। কিরণময়ীর কথাবার্ত্তায় ও বক্তৃতায় স্পষ্টই বিনোদিনীর অনুকরণ। দিবাকরকে লইয়া কিরণময়ীর পলায়ন সহজেই বিনোদিনী-মহেন্দ্রর পলায়ন-কাহিনী মনে করাইয়া দেয়। সুরবালা আশার ছাঁচে গড়া, তবে আশার সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব তাহার নাই। উপেন্দ্রর ভূমিকায় দৈবাৎ বিহারীর ক্ষীণ ছায়া পড়িয়াছে। দিবাকর কচিৎ নষ্টনীড়ের অমলকে স্মরণ করায়।

চরিত্রহীনের প্লট খুব গোছালো নয়। তাহার প্রধান কারণ হইতেছে যে প্লটে বস্তু ও কল্পনা মিশ খায় নাই। কোন কোন আখ্যায়িকা বাস্তবনিষ্ঠ এবং তাহাতে লেখকের আত্মজীবনীর অংশ কম নয়। দিবাকর যদি লেখকের বাস্তবজীবনের প্রতিবিম্ব হয় তবে সতীশ তাঁহার ভাবজীবনের প্রতিবিম্ব।

প্লটে দুইটি সমান্তরাল কাহিনী অনুস্যূত হইয়াছে। কিন্তু সে দুইটির যোগসূত্র সর্ব্বত্র অব্যাহত নয়। প্রথম কাহিনীর নায়িকা সাবিত্রীর চরিত্রহীনতা দুরদৃষ্টবশে, দ্বিতীয় কাহিনীর নায়িকা কিরণময়ীর চরিত্র স্বকৃতভঙ্গ।

নায়ক বলিতে যদি কেহ থাকে তো সতীশ। এক হিসাবে সতীশই হইতেছে প্রধান ঘটনাস্রোতের নিয়ন্তা। সতীশেরই স্নেহভিক্ষায় কিরণময়ীর কঠিন হৃদয়ে প্রথম আর্দ্রভাব সঞ্চার হয়; তাহার কথাতেই কিরণময়ীর সম্পর্কে উপেন্দ্র সজাগ হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের রোমান্সের নায়ক যেমন হইয়া থাকে সতীশও তেমনি

[১] স্বদেশ ও সাহিত্য পৃ ১৩৪।

—ধনবান্ ও সংসারবন্ধনহীন, উদারহৃদয় এবং মধ্যে মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল, আসলে ভাললোক। সে প্রবলবিশ্বাসী, কিন্তু তাহার বিশ্বাসভূমি হইতেছে ধোঁয়াটে "উপীন্ দা"। সতীশ রোমান্টিক মেজাজের লোক, তবুও সাবিত্রীর সম্পর্কে তাহার নিরর্থ মান-অভিমানের খামখেয়াল ও চলচিত্ততা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

দিবাকর-ভূমিকায় লেখক প্রধানত নিজেকেই প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন বলিয়া অনেকটা স্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু শেষের অংশে—বিশেষ করিয়া আরাকানের ব্যাপারে—তাহার পরিণতি কিছুতেই স্বাভাবিক বলা চলে না।

উপেন্দ্রর ভূমিকা অস্পষ্ট, কতকটা রহস্যাবৃত। দেবপ্রতিমার মাহাত্ম্যের মত তাঁহার মহত্ত্বও যেন জনশ্রুতিগম্য। কাহিনীর শেষের দিকে উপেন্দ্র মানুষের মত হইয়াছে বটে কিন্তু অতিরিক্ত অশ্রুপ্রবণতা বাস্তবতাকে লঘু করিয়াছে। সাবিত্রীকে দেখিবামাত্র সতীশের সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাবের পরিবর্তন "উপীন্দার" তুরীয় জ্ঞানশীলতার ও অনির্বচনীয় মহৎহৃদয়ের কাছেও অনপেক্ষিত।

সতীশের চাকর বিহারী শ্রীকান্তের রতনের অগ্রদূত। সতীশ-সাবিত্রীর প্রতি তাহার আকস্মিক ও অহেতুক অনুরক্তির কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কথায় কথায় পায়ের ধূলা নেওয়া এবং অনুপস্থিতের উদ্দেশে কপালে হাতজোড় করিয়া ঠেকানো বিরক্তির উদ্রেক করে। অনঙ্গ ডাক্তারের ক্ষুদ্র ভূমিকা বেশ বাস্তব। তবে তাহাকে অতটা স্বর্ণগৃধ্নু না করিলেই ভাল হইত।

সুরবালার ভূমিকা চরিত্রহীন-কাহিনীর ধ্রুবতারার মত। সুরবালা স্নেহশীল সরলহৃদয় বিশ্বাসপ্রবণ। কিন্তু কেন যে তাহার উপর উপেন্দ্রর অত ভক্তি ও আস্থা তাহার ইঙ্গিতটুকুও নাই। সুরবালার মৃত্যুতে উপেন্দ্রর মনে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসিল, তাঁহার হৃদয়ের কাঠিন্য চলিয়া গিয়া ক্ষমাশীলতার আবির্ভাব হইল। সুরবালা কাহিনীর আড়ালে থাকিয়া গিয়াছে বলিয়া এই পরিবর্তনের যুক্তিযুক্ততা বোধগম্য নয়। সুরবালা উপেন্দ্রর গুরু, কিরণবালারও। সুরবালার পতিপ্রেমই তাহার নিরুদ্ধ হৃদয়বৃত্তির যথার্থ প্রকাশপথ দেখাইয়াছিল—স্বামিসেবার মধ্য দিয়া। সে-পথ যখন অবিলম্বে রুদ্ধ হইয়া গেল তখন সুরবালার সরল বিশ্বাস (এবং সতীশের সস্নেহ ব্যবহার) তাহাকে সান্ত্বনার পথ নির্দেশ করিয়াছিল।

কাহিনীর রঙ্গমঞ্চে সাবিত্রী প্রথম দেখা দিল যেন বিলাতী landlady বা বাড়ীওয়ালীর ভূমিকায়। সাবিত্রীর সম্পর্কে মেসের বাবুদের ও লোকজনের ব্যবহার অত্যন্ত অবাস্তব। সাবিত্রী-ভূমিকা শরৎচন্দ্রের আদর্শ নায়িকাপরিকল্পনার একান্ত অনুগত। প্রেমাস্পদের উপর সুদৃঢ় অধিকারবোধ-সত্ত্বেও তাহার উপর তাহার অযথা দুর্ব্যবহারের অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া দায়। স্বীকার করি প্রেমের কৌটিল্য এবং নারীচিত্তের ছলনা সাহিত্যে ও মনস্তত্ত্বে স্বীকৃত তথ্য, কিন্তু তাহারো সীমা আছে। শুধু সাবিত্রীতে নয় শরৎচন্দ্রের প্রায় সকল প্রধান নারী-ভূমিকায় এই প্রেমকৌটিল্য খামখেয়াল ও চলচিত্ততা নিতান্ত পৌগণ্ডচাপল্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সতীশ-সাবিত্রীর সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ঘোষের বিল্বমঙ্গল নাটকের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিরণময়ীর চরিত্রকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণীর এবং রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীর মনোবৃত্তি আরোপিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপর টেক্কা দিতে গিয়া শরৎচন্দ্র কিরণময়ীকে পুরাপুরি বিদুষী করিয়া ছাড়িয়াছেন। কিরণময়ী ছাপা রামায়ণে খুশি নয়, রামায়ণের "পুথি" পাঠ না করিলে তাহার তৃপ্তি নাই। কিন্তু তাহার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এই পুথি পড়া খাপ খায় না এবং তাহার পরবর্ত্তী জীবনেও ইহার সঙ্গতি নাই। দিবাকরের সঙ্গে তাহার মূষিকমার্জ্জার-ক্রীড়ারও কোন সাফাই নাই, যৌন ক্ষুধা ছাড়া। পরিণামে কিরণময়ীর মস্তিষ্ক বিকৃতিও ইহাই ইঙ্গিত করে। কিরণময়ীর দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের একটিকে টানিয়াছে উপেন্দ্রর প্রতি ভালবাসা ত্যাগের ও শান্তির তটভূমিতে, অপরটিকে টানিয়াছে দেহের ক্ষুধা দিবাকরকে উপলক্ষ্য করিয়া ভোগের ও সর্ব্বনাশের অতলে। এই দুই বিপরীত টানে পড়িয়া হতভাগিনীর জীবন গেল নষ্ট হইয়া।

সমাজের হৃদয়হীন কঠোরতাকে নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করিলেও শরৎচন্দ্র সমাজের মর্য্যাদা কখনো ক্ষুন্ন করেন নাই। তাঁহার লেখায় হয়ত চাণক্যশ্লোকের নীতিসূত্র উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে, কিন্তু যাহা প্রকৃত নীতিবোধ, যাহার উৎস বইয়ের ছাপা পাতা নয়, মানুষের জীবন্ত হৃদয়, তাহার উপরই তাহার নির্ভর। সাবিত্রীর পূর্ব্বজীবন যে ভদ্র-সমাজের অনুমোদিত প্রণালীতে যাপিত হয় নাই তাহার জন্য

জানত সে দায়ী নয়, দায়ী তাহার পারিপার্শ্বিক, তাহার সঙ্কীর্ণ সমাজ-পরিস্থি
কিন্তু সমাজ-দৃষ্টিতে চরিত্রহীন হইলেও সে সতীশের সম্পর্কে অসতী নয়, কেন
সতীশের ভালবাসা পাইবার পর হইতে তাহার হৃদয় একনিষ্ঠ হইয়াছে। কিরণময়ী
তাহার দেহকে অপবিত্র করিয়াছে ক্ষণিক প্রবৃত্তির তাড়নায়। কিন্তু উপেন্দ্র
প্রতি তাহার প্রেমনিষ্ঠা এতটুকুও টলে নাই। সুতরাং চরিত্রহীন হইয়াও সে
অসতী নয়। তথাপি শরৎচন্দ্র এই দুই নারীকে তাহাদের জীবনের চরিতার্থতা
হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন সমাজের মুখ চাহিয়া। কিরণময়ীর কথা উঠে না।
সতীশ-সাবিত্রীর মিলনের বাধা সরোজিনী কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য্য নয়।

বিলাতি-আচারপরায়ণ শিক্ষিতসমাজের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎপরিচয় ছিল
বলিয়া বোধ হয় না। তাই যেখানে তিনি ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য মহিলার চিত্র
আঁকিতে গিয়াছেন সেইখানেই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। সরোজিনী-ভূমিকাতে
তাই তাঁহার অজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভূমিকায় 'গোরা'-র ললিতার কিঞ্চিৎ
ছায়া আছে। অঘোরময়ীর ভূমিকায় ব্যঙ্গবিজড়িত বাস্তবতা আছে।

ষ্টীমারের ও আরাকানের আখ্যানের অবান্তর ক্ষুদ্র ভূমিকাগুলি জীবন্ত হইয়াছে।
জাহাজে কিরণময়ী-দিবাকরের সম্পর্ক 'নৌকাডুবি'-র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাস-চিত্র। চরিত্রহীনের সঙ্গে
শ্রীকান্তর একটু সম্পর্ক আছে। দ্বিতীয় পর্ব্ব শ্রীকান্ত বর্ম্মার ব্যাপারে চরিত্রহীনের
আরাকান কাহিনীরই অনুবৃত্তি করিয়াছে। প্রথম পর্ব্বে শরৎচন্দ্র বাল্যজীবনকে
আশ্রয় করিয়া অপূর্ব্ব idyll রচনা করিয়াছেন। ইন্দ্রনাথ-ভূমিকার কল্পনা কতটা
বাস্তবনিষ্ঠ জানি না, কিন্তু সে যে রবীন্দ্রনাথের তারাপদর মত সাহিত্যের অমরা-
বতীর অধিবাসী তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্নদাদিদির আখ্যায়িকা উজ্জ্বল ও মধুর।
পরে 'বিলাসী'[১] গল্পে এই কাহিনীর উল্টা পিঠের ছবি পাই।

তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব্বে কল্পনার ভাগ সমধিক, তাই এই পর্ব্ব দুইটিতে প্রথম
দুই পর্ব্বের উজ্জ্বল ও হৃদয়গ্রাহী চিত্র পাই না। শ্রীকান্তর কাহিনীতে ধারাবাহিকত্ব
এবং প্রধান দুই ভূমিকা সাধারণ থাকিলেও উপন্যাসের সংহতি ও সুডৌল রূপ

[১] প্রথমপ্রকাশ ভারতী বৈশাখ ১৩২৫।

ইহাতে নাই। বইটিতে সমগ্রতা নাই, না কাহিনীর দিক্ দিয়া, না রচনার দিক্ দিয়া, না ভাবের দিক্ দিয়া। শ্রীকান্তর আসল গুণ এই যে ইহাতে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার খণ্ড খণ্ড চিত্র সহৃদয়তার সহিত অঙ্কিত হইয়া রসব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে।

চরিত্রহীনের মত 'গৃহদাহ'-র[১] শরৎচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। কোন কোন ভূমিকায় 'গোরা'-র অনুকরণ আছে। কাহিনীর কোন অংশই লেখকের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়। তাই পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসের উৎকৃষ্টতা ইহাতে তেমন নাই। পীড়ার অথবা মূর্চ্ছার সাহায্যে কাহিনীর জট ছাড়ানো শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের একটি সাধারণ বিশেষত্ব। চরিত্রহীনে এবং শ্রীকান্তে এই বিশেষত্ব বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে। গৃহদাহে কিন্তু ইহার বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়াছে।

চরিত্রহীনে যে সমস্যা উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক ; জীবনে সেরূপ ঘটনা নিত্যই না হউক কচিৎ ঘটিয়া থাকে। গৃহদাহের সমস্যা কখনো ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সমস্যার কৃত্রিমতা ঢাকা পড়িয়া যায় যদি লেখক এটিকে পূর্ণ ও অক্ষুণ্ণ পরিপ্রেক্ষণীতে উপস্থাপিত করিতে পারেন। তাহা না করিলে কৃত্রিমতা পর্য্যবসিত হয় নিদারুণ অস্বাভাবিকতায় গৃহদাহের সমস্যা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও কৃত্রিম, এবং প্লট-পরিকল্পনার শৈথিল্য সে কৃত্রিমতাকে ঢাকিতে পারে নাই। স্বামী-নিষ্ঠা হইতে যে প্রেম জন্মায় তাহার মূল সুদূরবিসারী, তাহা নারীচিত্তের ক্ষণভ্রান্তি মানমোহ ইত্যাদি বিপর্য্যয় সহ্য করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকে, এবং অবস্থার বিপাকে এরূপ নারীর দেহ-অশুদ্ধি ঘটিলেও তাহার পাতিব্রত্যের হানি হয় না। ইহাই গৃহদাহ-কাহিনীর তত্ত্বকথা। কিন্তু কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকার ব্যঙ্গাশ্রিত অতিরঞ্জনের ফলে এবং ঘটনাবলীর অতিনাটকীয়তার জন্য গৃহদাহের তত্ত্বকথা একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। যে-সমাজ হইতে শরৎচন্দ্র প্রধান কয়েকটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন,

[১] প্রথমপ্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২৩-১৩২৬।

অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ, সে-সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না।[১] অজ্ঞতা পরবর্তী কয়েকটি উপন্যাসেও সুপ্রকট।

গৃহদাহের প্রধান নায়ক মহিমের ভূমিকা ভাল করিয়া ফোটানো হয় না। চরিত্রহীনের উপেন্দ্রর মত গৃহদাহের মহিমও সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বহীন এ অস্বাভাবিক। তাহাকে অহেতুক মহত্বের এত উচ্চ সিংহাসনে বসান হইয়া যে তাহার মানবত্ব রহিয়া গিয়াছে উপন্যাসকাহিনীর যবনিকার ওপারেই।

প্রতিনায়ক সুরেশ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সাধারণ নায়কের গুণবিশিষ্ট। সে ইমোশনাল, মেজাজী ও স্বেচ্ছাচারী, আসলে ভাল মানুষ, এবং একটুতেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়ে। উপন্যাস-কাহিনীতে তাহার প্রথম আবির্ভাবের উপযুক্ত হেতুবাদ নাই। তাহার অনেক কার্য্যের কোন সঙ্গত কারণ, আধিভৌতিক (physical) অথবা আধিমানসিক (psychological), খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে সাধু নয়, পাষণ্ডও নয়—সে পাগল। সুরেশ কিরণময়ীর রূপান্তর। কিরণময়ী পাগল হইয়াছিল শেষে, সুরেশ প্রথম হইতেই।

কেদারবাবুর ভূমিকায় প্রথম দিকে ব্যঙ্গের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়াছে। শেষের দিকে তাঁহাকে মানুষের মত দেখি বটে, কিন্তু অত্যন্ত রঙ-চড়া। তিনি শেষে ছিঁচ-কাঁদুনে হইয়া পড়িয়াছেন।

অচলার ভূমিকা ভাল করিয়াই আঁকা হইয়াছে। তবে তাহার চরিত্রে রহস্য-ময়তা ও অহেতু খেয়ালি-ভাব না থাকিলে ভূমিকাটি স্পষ্টতর হইত। শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার রোমান্টিক আদর্শ অনুযায়ী সুরেশ-অচলার মেজাজও ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুসজল প্রেমোচ্ছ্বাস ও মর্ম্মভেদী বাক্যকশাঘাতের দোলায় দুলিতেছে। অচলা ব্রাহ্মঘরের শিক্ষিতা মেয়ে হইলেও তাহার আচরণ সর্ব্বদা বাঙ্গালীর মেয়ের মত নয়। অচলা-ভূমিকার পরিকল্পনায় ইংরেজি নভেলের ছায়াপাত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

শরৎচন্দ্রের মনে নিষ্ঠার ও শুচিতার যে আদর্শ ছিল তাহা মৃণাল-ভূমিকায়

[১] চৌত্রিশ পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মসমাজের উপর যে কটাক্ষপাত আছে তাহা সঙ্গত নয়।

রূপগ্রহণ করিয়াছেন। তবে রোমান্টিক ভাব ও বর্ণবহুলতা ভূমিকাটিকে যে কিয়ৎপরিমাণে অবাস্তব করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কাহিনীর মধ্যে melodrama বা অতিনাটকীয়তার স্পর্শ (বিশেষ করিয়া উনিশ পরিচ্ছেদে) রসহানি ঘটিয়াছে। পাড়াগাঁয়ের খ'ড়ো বাড়িতে মহিম থাকে "ছয়নলা পিস্তল" লইয়া!

'দত্তা'[1] রোমান্টিক উপন্যাস। কাহিনী ছোট-গল্পের উপযোগী, তাহাকে অযথা ফেনাইয়া বড় করা হইয়াছে। Charles Garvice-এর *Leola Dale's Fortune* উপন্যাসের সঙ্গে দত্তা-কাহিনীর বেশ মিল আছে।[2] সম্ভবত পূর্ব্ব-পঠিত ইংরেজি উপন্যাসখানির কাহিনী শরৎচন্দ্র অজ্ঞাতসারে অনুসরণ করিয়াছেন। কয়েকটি ভূমিকার পরিকল্পনায় 'গোরা'-র প্রভাব অনুভূত হয়। দয়াল স্পষ্টই পরেশবাবুর ছাঁচে ঢালা। রাসবিহারীর ও বিলাসবিহারীর সুচিত্রিত ভূমিকায় ব্যঙ্গের আতিশয্য ইংরেজির প্রভাব জ্ঞাপন করে।

'দেনা-পাওনা'-র[3] চিত্তাকর্ষক কাহিনীর মূলও ইংরেজি হইতে গৃহীত বলিয়া সন্দেহ করি। ষোড়শীর মত দেবদাসী বাঙ্গালীর সমাজে (তা সে যত সুদূর পল্লী হউক না কেন) সম্পূর্ণ অপরিচিত। জীবানন্দের ভূমিকায়ও বিদেশি ঢঙ একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। তবুও গল্পটির মৌলিকত্ব ও মনোহারিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

'পথের দাবী'-তে[4] বাঙ্গালার বিপ্লব-আন্দোলনে ঢেউ ব্রহ্মদেশে ও দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়ায় যে-ভাবে পৌছিয়াছিল তাহারি চিত্র অস্ফুট রোমান্টিক প্রেম-কাহিনীর সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। অপূর্ব্ব-ভারতীর প্রেমকাহিনী সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে নিরর্থক হইয়াছে, কেন না বিপ্লবপন্থার রহস্যভীষণতার পরিমণ্ডলকে প্রায়ই অত্যন্ত লঘু ও নাটকীয়, এমন কি অতিনাটকীয়, করিয়া দিয়াছে। সব্যসাচী (ডাক্তার), শশী, তলওয়ারকর প্রভৃতি কয়েকটি ভূমিকা রোমান্সের বর্ণাতিশয্য সত্ত্বেও চমৎকার জমিয়াছে। এগুলি বাস্তবমূলক বলিয়া মনে হয়। সুমিত্রার নির্লিপ্ততা ও কাঠিন্য একটু কম হইলে বোধ হয় ফুটিত ভাল।

[1] প্রথমপ্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২৪-১৩২৫। [2] শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় এই সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।
[3] প্রথমপ্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২৭-১৩৩০। [4] প্রথমপ্রকাশ বঙ্গবাণী ১৩২৯-১৩৩৩।

অপূর্ব্ব ঘরপোষা কুনো বাঙ্গালী ছেলে, স্বীকার করি। সে হয়ত লেখকের প্রতিচ্ছবি, তাহাও স্বীকার করিতে ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহাকে অযথা ক্ষণে ক্ষণে স্ত্রীলোকের অধীনে মেরুদণ্ডহীন দেখাইয়া ব্যঙ্গ করিবার কিছু আবশ্যকত ছিল না। রোমান্‌স্-বাহুল্য ও ছোটখাট অসঙ্গতি সত্ত্বেও ভারতীর ভূমিক মন্দ খোলে নাই। মোটের উপর সব্যসাচীর কোমলগম্ভীর ভূমিকাই পথের দাবীর গল্পরস প্রচুরভাবে জমাইয়া তুলিয়াছে নতুবা বিপ্লবপন্থার চিত্র হিসাবে পথের-দাবী সার্থক রচনা হয় নাই।

শরৎচন্দ্রের রচনাভঙ্গির প্রধান গুণ সরলতা ও হৃদয়গ্রাহিতা। তাঁহার গল্প-উপন্যাসের উপক্রম যেমন একেবারে কাহিনীর মধ্যে পাঠককে প্রবেশ করাইয়া দেয় তাঁহার লেখার ভঙ্গিও তেমনি সহজে বুদ্ধির চৌকাট ডিঙ্গাইয়া মনে লাগে। কাহিনীর অতর্কিত উপক্রম রবীন্দ্রনাথের গল্প হইতে নেওয়া। যেমন, "বেণী ঘোষাল মুখুয্যেদের অন্দরের প্রাঙ্গণে পা দিয়াই সম্মুখে এক প্রৌঢ়া রমণীকে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'এই যে মাসি, রমা কই গা?'" —পল্লীসমাজের এই আরম্ভের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি-সমর্পণ' গল্পের উপক্রম — "বৃন্দাবন কুণ্ড মহা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল—'আমি এখনি চলিলাম।'"

রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম প্রভাব সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের রচনারীতির স্বকীয়তা অস্বীকার্য্য। কিন্তু মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সজ্ঞান অনুকরণ ভাল করিয়া মিশ খাইতে পারে নাই। যেমন, চরিত্রহীনে সতীশ কথা বলিয়া (গোরার পরেশ বাবুর মত) "ঘাড় হেঁট করিয়া নিজের অন্তরের ভিতর তলাইয়া দেখিতে লাগিল।" "অত্যন্ত অকস্মাৎ লব্ধ নূতন চেতনার মত এই একটা কথা তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া গেল"।

আসল কথা, কাহিনীর পরিকল্পনায় এবং বর্ণনায় শরৎচন্দ্র যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্তির পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু শিল্পরূপায়নে সর্ব্বত্র সমান নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই।

বিংশ পরিচ্ছেদ

নবীন রোমান্টিকতা ও জীবনদৃষ্টি

১

ভারতী-গোষ্ঠীর প্রধান লেখকদের রচনায় নোতুন রোমান্স-রসের সঙ্গে জীবনের বাস্তবতাকে যথাসম্ভব মিলাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তবে রোমান্স্-ভাবাবেগের প্রাধান্যের জন্য বাস্তবদৃষ্টি ঘোলাটে হইয়া অনেকটা আদর্শদৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। এই-কারণেই কোন কোন লেখকের উপন্যাসে-গল্পে স্পষ্ট সংস্কারপ্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

ভারতী-গোষ্ঠীর দুইজন লেখককে মুখ্য ধরা চলে,—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মণিলালের রচনায় সাধারণত রোমান্স্-দৃষ্টিরই প্রাধান্য, চারুচন্দ্রের লেখায় বাস্তবঘেঁষা আদর্শবাদের ও সংস্কার দৃষ্টির। এই দুইজনের প্রভাব পরবর্তী কালে গল্প-উপন্যাসে দুইটি school অর্থাৎ বিশিষ্ট লেখক-সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে, নবীন রোমান্টিক সম্প্রদায় ও জীবন-দ্রষ্টা সম্প্রদায়।

এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ঐক্য আছে তাহাই প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাঙ্গালা গল্প-উপন্যাসে আধুনিকতার বীজ। ইহা হইতেছে সমসাময়িক ইউরোপীয় ভুয়িংরুমের ফেশানেব্‌ল্ নাস্তিক cosmopolitan সংস্কৃতির অধ্যাস, যে-সংস্কৃতির একটি প্রধান সংহিতা ছিল হ্যাভ্‌লক্ এলিসের ছয় খণ্ড যৌন-মনস্তত্ত্ব।[১] নবীন-রোমান্টিক সম্প্রদায়ের প্রথম ও মুখ্য লেখক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসুর পূর্বেকার রচনায় এই "আধুনিক" মনোভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে; "কিন্তু তখন যে আমার মনোজগতে নীট্‌সে হোপেনহাওয়ারের যুগ, হ্যাভলক্ এলিস্ পড়ে মেজাজ গরম রয়েছে।"[২] "আমার যুবক বন্ধুরা জানেন আমি এক নীরব কবি, এক

[১] তুলনীয় ঘরে-বাইরের (১৩২২) সন্দীপের উক্তি, "আমি কিছুদিন আগে আজকালকার দিনের একখানি ইংরেজি বই পড়ছিলুম, তাতে স্ত্রীপুরুষের মিলনরীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট-স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে।" [২] 'অরুণ,' প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী শ্রাবণ ১৩২৩।

সাহিত্যরসজ্ঞ পণ্ডিত, খুব উপন্যাস পড়ি, শুধু অর্থাভাবে প্রতিভা বিকশিত হইল না। বেদ হইতে নীট্‌সে, কালিদাস হোমর হইতে শেলী গতিয়ে, বাৎস্যায়ন হইতে ফ্রয়েড্ সবই আমি পড়িয়াছি। ...কিছুদিন পূর্ব্বেই বার্টনের একাধিক সহস্ররজনী তৃতীয়বার পাঠ শেষ করিয়াছিলাম।"[১]

বিবাহিত নারীর তির্য্যক্ প্রেম ও যৌনক্ষুধা গল্প-উপন্যাসের বিষয়ীভূত করিয়া শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গতানুগতিকতা পরিহার করিতে চেষ্টা করিলেন ইহার প্রথম গল্প 'ঠানদিদি'[২] নষ্টনীড় কাহিনীর-প্রভাব সত্ত্বেও বলিষ্ঠ রচনা হইয়াছে। ইহার 'শুভা' (১৩২৭), 'শাস্তি' (১৩২৮?) ও 'পাপের ছাপ'[৩] প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়ে যথেষ্ট সাহসিকতার ও নিরঙ্কুশতার পরিচয় আছে। শেষের বইটি পুরাপুরি criminological উপন্যাস। সাধারণ রোমান্টিক গল্প রচনাতেও নরেশচন্দ্র লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন; 'অগ্নি সংস্কার' (১৩২৭) সুপাঠ্য গল্প।

২

নবীন রোমান্টিক লেখকদের অগ্রণী হইতেছেন শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু। ইহার সঙ্গে গোকুলচন্দ্র নাগের (১৮৯৩-১৯২৫) নাম করিতে হয়। গোকুলচন্দ্রের ছোট ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথের "কথিকা"-র অনুকরণ দেখা যায়।[৪] স্বপ্নময় ভাবাতুরতা ইহার রচনার বিশিষ্ট লক্ষণ। ইনি আর্টস্কুলে চিত্রশিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন; ইহার লেখায়ও তাই চিত্রের লক্ষণ পরিস্ফুট। দীনেশরঞ্জন দাসের সহযোগিতায় গোকুলচন্দ্র ১৩৩০ সালে 'কল্লোল' পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকাটি কিছুদিনের জন্য তরুণ সাহিত্যিকদের মুখপত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

[১] 'ভূতের গল্প,' প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮।

[২] প্রথমপ্রকাশ নারায়ণ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫; 'দ্বিতীয় পক্ষ'-এ (১৩২৬) সঙ্কলিত।

[৩] 'মেঘনাদ' নামে ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত (কার্ত্তিক ১৩২৭ হইতে); 'পাপের ছাপ' নামে পুস্তকাকারে (১৩২৯)।

[৪] ১৩২৭ সালে প্রবাসীতে ও ভারতবর্ষে ইঁহার কয়েকটি "কথিকা" প্রকাশিত হইয়াছিল। নব্যভারতেও কয়েকটি বাহির হইয়াছিল। এই প্রথমরচনাগুলি 'রূপরেখা'-য় (১৩২৯) সঙ্কলিত আছে।

গোকুলচন্দ্রের একমাত্র উপন্যাস 'পথিক' কল্লোলের প্রথম সংখ্যা হইতে বাহির হইতে থাকে।[১] মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে গোকুলচন্দ্রের সাধর্ম্য পথিকে এবং 'নিশীথের কথা' গল্পে লক্ষ্য করা যায়। বড়-গল্প 'সোনার ফুল'-এ[২] ইহার বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় আছে। ভারতী- গোষ্ঠীর প্রভাবও ইহাতে দেখা যায়। কল্লোলের অগ্রদূত রূপে 'ঝড়ের দোলা' (১৩২৯) বাহির হয় "Four Arts Club" কর্তৃক। ঝড়ের-দোলায় এই চারিজন লেখকের চারিটি গল্প আছে,—গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশ-রঞ্জন দাস, শ্রীমতী সুনীতি দেবী ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু।

গোকুলচন্দ্রের প্রতিভা ছিল। চিত্র এবং লিপি উভয় শিল্পেই তাঁহার অধিকার ছিল। এই অধিকার দৃঢ় হইতে পারে নাই তাঁহার অকালবিয়োগে। পথিক উপন্যাসে গোকুলচন্দ্রের শক্তি ও দুর্ব্বলতা দুইয়েরই পরিচয় আছে।—শক্তি দেখি ছোট ছোট পারিবারিক চিত্র অঙ্কনে ও বাস্তবদৃষ্টিতে, দুর্ব্বলতা দেখি প্লট-গঠনের শৈথিল্যে এবং চরিত্রচিত্রণের ভাবপরতন্ত্রতায়।

৩

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসুর গল্পে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান্ তরুণের দৃষ্টিতে কলিকাতার ধনী ও ফেশানেব্‌ল্ suburbia সমাজের রোমান্স উজ্জ্বল রূপ পাইয়াছে। ইহার 'রমলা' নবীন রোমান্টিক সম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এই বইটির প্রভাব সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী তরুণ লেখকদের রচনায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে পড়িয়াছে। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের ও শরৎচন্দ্রের ছাড়া আর কাহারো উপন্যাস এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী তরুণের রোমান্স-স্বপ্ন রমলায় রসায়িত হইয়াছে।

মণীন্দ্র বাবুর প্রথম গল্প 'অরুণ' ১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল।[৩] গল্পটিতে তাঁহার নিজস্বতার পরিচয় যথেষ্ট আছে।

[১] পুস্তকাকারে বাহির হয় ১৩৩২ সালে।

[২] প্রথমপ্রকাশ (অসম্পূর্ণভাবে) বঙ্গবাণী শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩২৯, পুস্তকাকারে ১৩৩০।

[৩] ইঁহার অধিকাংশ বিশিষ্ট গল্পই ১৩২৭-১৩৩০ সালের মধ্যে প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল।

লেখক যে ভবিষ্যতে বাস্তবপন্থা ছাড়িয়া রোমান্স-পন্থার পথিক হইবেন বোঝা যায় ;

> বীণা শান্ত হয়ে বসে আমায় সব কথা বল্লে—বল্লে আমাকে তার চাই। আমি বল্লুম, "বীণা, মুস্কিলে ফেল্‌লে।" এক তরুণী তার যৌবনজাগ্রত বিকচোন্মুখ দেহপদ্মকে আমার বুকে সঁপতে চায়,—আমি বীর, আমি তা প্রত্যাখ্যান করলুম।
>
> আমার কথা শুনে সে এক শ্যাওলা-ঘেরা পাথরে বসে পড়্‌লো।

মুমূর্ষু নায়কনায়িকা লইয়া ইহার কয়েকটি গল্পের pathological বা morbid পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'মাসি' এই-ধরণের গল্পের মূল আদর্শ। মণীন্দ্র বাবুর morbid গল্প অনেকেই অনুসরণ করিয়াছেন। দুই-একটি গল্পে[১] ভৌতিক বা অতিলৌকিক পরিবেশ সুন্দর জমিয়াছে। ইহার গল্পের বই হইতেছে 'মায়াপুরী' (১৯২৩), 'রক্তকমল' (১৯২৪), 'সোনার হরিণ' (১০২৪) ইত্যাদি। 'রমলা'[২] ইহার প্রথম উপন্যাস এবং সব চেয়ে বিশিষ্ট রচনা। পরবর্তী কালের বিশিষ্ট উপন্যাস 'জীবনায়ন'-এ যৌবনোন্মেষের psychosis অত্যন্ত নিপুণতা ও অভিজ্ঞতার সহিত বিশ্লিষ্ট ও বিবৃত হইয়াছে।

মণীন্দ্রবাবুর গল্প-উপন্যাসের নায়িকারা সুন্দরী, শিক্ষিত এবং unsophisticated, ছেলে-মানুষ ও অপাপবিদ্ধ। নায়কেরাও স্মার্ট শহুরিয়া, ড্রইংরুম-বিলাসী, দার্জ্জিলিং-পুরী-নিবাসী ; কন্টিনেণ্টাল উপন্যাস এবং ফারসী কবিতা দুইই তাহাদের উপভোগের বস্তু ; তাহারা পিয়ানোয় বীটোফেনের মুনলাইট সোনাটা অনর্গল বাজাইতে পারে, চমৎকার বাঙ্গালা কবিতা লিখিতে পারে, ছবি আঁকাও বেশ আসে ; তাহারা অত্যন্ত ভাববিলাসী ও প্রণয়কাতর। মোট কথা তাহারা মূর্ত্তিমান্ college boy রোমান্স। বাস্তবতার সঙ্গে অতিরিক্ত সম্পর্কশূন্যতার জন্য মণীন্দ্র-বাবুর গল্প-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা পুরাপুরি রোমান্স-রাজ্যের অধিবাসী হইয়া

[১] যেমন 'ভূতের গল্প,' প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, 'রেবতী' নামে সংক্ষিপ্তভাবে রক্তকমলে সঙ্কলিত। [২] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ১৩২৯, পুস্তকাকারে ১৩৩০।

আছে। তবে লেখার নৈপুণ্যে ও চরিত্র-চিত্রণে সহৃদয়তার জন্য কাহিনীর কাব্যরসের তেমন হানি হয় নাই।

৪

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রসদৃষ্টি মণীন্দ্রবাবুর রসদৃষ্টির সমধর্মী। দুইজনেই সমান রোমান্টিক এবং সমান কবিত্বভাববিহ্বল। তফাৎ এই, মণীন্দ্রবাবুর পাত্রপাত্রী শহরবাসী ধনী ও cultured বা সংস্কৃতিমান্, আর বিভূতিবাবুর পাত্রপাত্রী পল্লীবাসী দরিদ্র ও সাধারণ শিক্ষা বা অশিক্ষা প্রাপ্ত। মণীন্দ্রবাবুর নায়কের পরিচয় দিয়াছি। বিভূতিবাবুর নায়কেরা তাহার ঠিক বিপরীত; তাহারা পাড়াগেঁয়ে লাজুক ছেলে, গাঁয়ের ইস্কুলেই তাহাদের শিক্ষা; পোড়ো ভিটার জঙ্গলে ঢাকা কুটীর-বাসী সর্ব্বংসহ মূক নারীহৃদয়ের ব্যাকুলতা তাহাদের হৃদয়ের তারে ঝঙ্কার তোলে। তাহারা নিশ্চয়ই মণীন্দ্রবাবুর নায়কদের তুলনায় ঢের বেশি বাস্তব; তবে কোথাও কোথাও সেন্টিমেন্টালিটির প্রাবল্যে রোমান্স ও কাব্য-রসের বাড়াবাড়ি হইয়াছে।

লেখক দুই জনেই গাছপালার ভক্ত। তবে মণীন্দ্রবাবু মূল্যবান্ সযত্নরোপিত বিলাতি লতাগুল্ম মৌসুমী ফুলের, আর বিভূতিবাবু পাড়াগাঁয়ের মেঠো পথের ধারে যে-সব নামহারা গাছ-আগাছা কালে অকালে "গন্ধ এলায়" সে-সকলের। মণীন্দ্রবাবুর গল্পের নায়ক ভাবে,

> তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। বিগোনিয়া ফুলের মত রাঙা মুখ ঘেরিয়া কালো কেশের রাশি; তাহার উপর ফিউসিয়া ফুলগুলি নত হইয়া পড়িয়াছে। গায়ে পিটুনিয়া ফুলের রং-এর এক জামার ওপর এষ্টার ফুলের রং-এর একখানি সাড়ি। মোজাবিহীন পায়ে ক্যাক্টাসের মত লাল ভেলভেটের চটিজুতো।[১]

বিভূতিবাবুর গল্পের নায়ক দেখে,

> পথের ধারের এক জায়গায় খানিকটা মাটি কারা বর্ষাকালে তুলে নিয়েছিল, সেখানটায় এখন বনকচু কালকাসন্দা ধুতুরা কুঁচকাঁটা আর

১ 'দার্জিলিংএ.' প্রথমপ্রকাশ ভারতবর্ষ কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৮, সোনার-হরিণে সঙ্কলিত।

> ঝুমকো লতার দল পরস্পর জড়াজড়ি ক'রে একটুখানি ছোট ঝোপ-মত তৈরী করেছে। শীতল হেমন্ত-অপরাহ্ণের ছায়া সবুজ ঝোপটির ওপর নেমে এসেছে। এমন একটা মিষ্ট নির্ম্মল গন্ধ গাছগুলো থেকে উঠছে, এমন সুন্দর শ্রী হয়েছে ঝোপটির, সমস্ত ঝোপটি যেন বনলক্ষ্মীর শ্যামল শাড়ীর একটা অঞ্চলপ্রান্তের মত।[১]

বিভূতিবাবুর প্রথম সার্থক রচনা 'উপেক্ষিতা'-য় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসুর প্রভাব উপেক্ষা করা যায় না। উপসংহারে প্রভাব অনুকরণে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী গল্পগুলিতে এই প্রভাব কাটিয়া গিয়াছে। বিভূতিবাবুর বিখ্যাত ও বৃহৎ উপন্যাস-চিত্র 'পথের পাঁচালী'[২] ও 'অপরাজিত'[৩] আমাদের আলোচ্য সময়ের পরে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহার সাহিত্যসৃষ্টির বিশেষ ভঙ্গি ও রূপ ইঁহার প্রথম কয়েকটি গল্পেই (১৩২৮-১৩৩১)[৪] দেখা দিয়াছিল। এই কারণে বিভূতিবাবুর রচনার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

'পুঁই-মাচা' গল্পটি বিভূতি বাবুর সব চেয়ে বিশিষ্ট ও নিখুঁত রচনা। বাঙ্গালা সাহিত্যের এটি একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। পথের-পাঁচালী এই ছোট-গল্পটিরই বিস্তারিত ভাষ্য। এই গল্পে এবং ইঁহার অন্য বিশিষ্ট রচনায় দেখি পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালার ধ্বংস-পথবাহী পল্লীজীবনে অরণ্যাক্রান্ত পরিবেশে দারিদ্র্যজর্জ্জর মুমূর্ষু নরনারীর ক্রমবর্দ্ধমান অভিভব। হিংস্র আরণ্য লতাগুল্মের শ্বাসরোধকারী পট-ভূমিকায় মানবমনের ভাববিলাস ও কবিকল্পনাবাহুল্যও যেন অনেকটা কণ্ঠরোধকারী ও morbid বা দুঃস্বপ্নবিজড়িত হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয়, জঙ্গলাকীর্ণ পোড়ো ভিটার নিঃসঙ্গ বিভীষিকা যেন মরণের ছায়া ফেলিয়া শনৈঃশনৈ অগ্রসর হইতেছে বাকি বসতিগুলি দখল করিতে। বিভূতিবাবুর রচনায় প্রকৃতি মানবজীবনের

[১] 'উপেক্ষিতা,' প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী মাঘ ১৩২৮, 'মেঘ-মল্লার'-এ সঙ্কলিত।

[২] প্রথমপ্রকাশ বিচিত্রা ১৩৩৫-১৩৩৬, পুস্তকাকারে আশ্বিন ১৩৩৬। [৩] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ১৩৩৬-১৩৩৮, পুস্তকাকারে ফাল্গুন ১৩৩৮। [৪] 'উপেক্ষিতা' (প্রবাসী মাঘ ১৩২৮), 'উমারাণী' (প্রবাসী শ্রাবণ ১৩২৯), 'মৌরীফুল' (প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩০) ও 'পুঁই মাচা' (প্রবাসী মাঘ ১৩৩১)। 'নব-বৃন্দাবন'-এ (মেঘ-মল্লার) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ প্রভাব আছে।

খেলাঘর অথবা পটভূমিকা নয়, মানবজীবনই প্রকৃতির খেলাঘর অথবা পটভূমিকা।

পথের-পাঁচালী রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে রচিত আত্ম-কথামূলক উপন্যাস-চিত্র। লেখকের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও রসদৃষ্টি বইটির আখ্যায়িকাগুলিকে রমণীয় করিয়াছে। উদ্ভিদ্-বর্ণনার বাহুল্য এবং ভাবাবেগ-প্রবলতা একটু কম হইলে ভাল হইত, অন্তত 'পুই-মাচা'-র শিল্পসঙ্গতি বজায় থাকিত।

অপরাজিত পথের-পাঁচালীরই অনুবৃত্তি। ইহাতে কৈশোর-যৌবনের মধ্য দিয়া নায়কের ভাবজীবনের গঠন ও পরিণতি বর্ণিত হইয়াছে নৈপুণ্যের সহিত।

বিভূতিবাবুর রচনায় রোমান্টিকতারই একাধিপত্য এবং ইহা একান্তভাবে idyllic বা কাব্যরসবাহী। সেই কারণে ইহার গল্প-উপন্যাসের কাহিনী ঘটনা-বহুল না হইয়া চিত্রবহুল হইয়াছে। মণীন্দ্রবাবুর রোমান্টিকতায় চিন্তাপ্রধান অলসতা আছে, বিভূতিবাবুর রোমান্টিকতায় ভাবপ্রধান বেদনানুভূতি আছে। বিভূতিবাবুর রচনায় রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রভাব অধিকতর পরিস্ফুট।

রবীন্দ্রনাথের "কল্যাণী''-র মত বৃক্ষলতাগুল্মের ছায়াঢাকা-কুটীরবাসিনী পল্লী-বধূ—"নিখুঁত মেয়েলি ধরণের মেয়ে"—বিভূতিবাবুর কবিদৃষ্টি অধিকার করিয়া আছে; "আমার ভারি ভাল লাগছিল—এই সব অজানা ক্ষুদ্র গ্রামে ঘরে ঘরে অবনীর বৌয়ের মত কত গৃহস্থবধূ ভারবাহী পশুর মত উদয়াস্ত খাটচে ···—পাড়া-গাঁয়ের ডোবার ধারের বাঁশবাগানের ছায়ায় জীবন তাদের আরম্ভ, তাদের সকল সুখ-দুঃখ, আনন্দ, আশা-নিরাশার পরিসমাপ্তিও ঐখানে।"[১]

বিভূতিবাবুর বাঁশীতে এই একটি সুরই বাজিয়াছে ভাল করিয়া।

৫

শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রোমান্টিকতার সরণি ধরিয়াই গল্পরচনা শুরু করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম গল্পগুলিতে গোকুলচন্দ্র নাগ প্রমুখ রোমান্টিক-

১ যাত্রাবদল (১৩৪১) পৃ ৩১।

ভাবুক লেখকদের প্রভাব দেখা যায়। 'আমের মঞ্জরি'-তে (১৩৩০ ?) এই গল্পগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। বড়-গল্প 'হাসি'-ও (১৩৩০) এই-পর্যায়ের। 'ডাকাত'[১] ও 'মজিদ মাটি'[২] গল্প দুইটিতে মুসলমান-সংসারের চিত্র অভিনবত্বের সূত্রপাত করিয়াছে।

শৈলজানন্দের রসদৃষ্টিতে রোমান্টিকতার ঘোর অচিরে কাটিয়া গিয়া, বাস্তব-অন্বীক্ষা জাগিয়া উঠিল। ইহার তীব্র অভিজ্ঞতা এবং তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞা সাহিত্যের পরিচিত ঋজুপথ দূরে রাখিয়া মানবের বহুবিচিত্র জীবনারণ্যের পদবী অনুসরণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পর সাহিত্যে এমন যথার্থ জীবন-অন্বীক্ষা আর দেখা যায় নাই। শৈলজানন্দের বিশিষ্ট গল্পগুলিতে — এই গল্পের সংখ্যা বড়কম নয় — তাঁহার নিজের বাস্তব-অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিই রূপায়িত ও রসায়িত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে রোমান্সের রেশ অনুভব করি তাহা subjective অথবা লেখকের অধ্যাস নয়, তাহা কাহিনীরই আনুষঙ্গিক; তাহা বাস্তব-রস। শৈলজানন্দের গল্পে যে বাস্তবতা পাই তাহা "আধুনিক" সাহিত্যের মার্কামারা বাস্তবতা নয়, বুদ্ধিমূলক কৃত্রিম বাস্তবতাও নয়, তাহা জীবনের বাস্তবতা। শৈলজানন্দ জীবনকে যে-ভাবে দেখিয়াছেন সেই-ভাবেই তাহা কাহিনীতে প্রতিফলিত করিয়াছেন, তাহাতে নিজের হৃদয়াংশ অথবা বুদ্ধি-অংশ যোগ করিয়া দিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। এইজন্য তাঁহার গল্পের ও গল্পচিত্রের পাত্রপাত্রীগুলি তাহাদের তুচ্ছ ও সঙ্কীর্ণ জীবনকে যথাযথ অনুসরণ করিয়াও মৌলিক মানবত্বের অলৌকিক মহিমার দ্যুতিমণ্ডিত হইয়াছে।

গল্পের পাত্রপাত্রীর নির্দিষ্ট স্থানকালপরিবেশের যথার্থতা, অর্থাৎ যাহাকে ইংরেজীতে local colour বলে, তাহার সর্বাঙ্গীন রূপ দেখি শৈলজানন্দের গল্পে। অথচ কোথাও তাহা কাহিনীর মানুষগুলিকে পিছনে ফেলিয়া প্রাধান্য লাভ করে নাই। ইঁহার গল্পের বিষয় জীবন্ত, vital বা প্রাণবান্, মানবমনোগহনপ্রসারী; ইঁহার গল্পের রূপ কঠিন ও তীব্র। হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস নাই, ব্যাখ্যা নাই, বুদ্ধির

[১] প্রথমপ্রকাশ 'মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' বৈশাখ ১৩২৯; আমের-মঞ্জরিতে সঙ্কলিত।
[২] আমের-মঞ্জরি।

ও সংস্কারের আলোকে পরখ করিবার প্রয়াস নাই। কাহিনীর মধ্যে যেন সনাতন মানব-হৃদয়ের অস্ফুট স্পন্দন শোনা যায়। শৈলজানন্দের গল্পে মানব-জীবনের চলিত মূল্যই ধরা হইয়াছে, লেখকের ইমোশন অথবা প্রেজুডিস না থাকায় ভোল ফিরাইয়া জীবনের রূপকে সাহিত্যের হাটে মহার্ঘ্য করিবার কোন প্রযত্ন নাই। নিখুঁত পরিবেশের মধ্যে মানবহৃদয়ের মৌলিক রহস্যের স্বচ্ছ ও নিরাভরণ প্রকাশই ইহার শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিতে সুদুর্লভ বাস্তবরস সঞ্চারিত করিয়াছে। পাত্রপাত্রীর মুখে স্থানোচিত ভাষা শৈলজানন্দের রচনার একটা বিশেষ আকর্ষণ; বাঙ্গালা সাহিত্যে এতদিন কেবল হাস্যরসের জন্যই dialect ব্যবহৃত হইত; শৈলজানন্দ তাহার সার্থক ব্যবহার করিয়াছেন বাস্তবরসসৃষ্টিতে।

'লক্ষ্মী' (১৩৩০) গল্পে রোমান্টিকতার মধ্যে বাস্তবতার স্পর্শ লাগিয়াছে। লেখকের বাস্তব-অভিজ্ঞতার ছায়া কাহিনীতে মাঝে মাঝে পড়িয়াছে। তবুও সুর প্রধানত রোমান্টিক, এবং রচনা অপরিপক্ব। বাস্তবদৃষ্টি পুরাপুরি খুলিয়া গেল কয়লা-কুঠীর গল্পগুলিতে। এই গল্পধারার প্রথম হইতেছে 'রেজিং রিপোর্ট'।[১] কয়লা-কুঠীর গল্পগুলিতে বর্দ্ধমান-বীরভূম জেলার সীমান্তবাসী সাঁওতাল-বাউড়ীদের জীবনচিত্রে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিধি প্রসারিত হইয়া গেল অজ্ঞাতপূর্ব্ব দেশে। 'মা,'[২] 'ঝুমরু,'[৩] 'মরণ বরণ'[৪] প্রভৃতি গল্পে অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত, প্রকৃতির দুলাল, "অসভ্য" মানবমনের fundamental জটিলত্বের প্রকাশ হইয়াছে আড়ম্বরহীন স্বল্প আয়োজনে।

কয়লাকুঠী-গল্পধারার প্রথম গল্পের অন্যতম হইতেছে 'নারীর মন' আর শেষ গল্পের অন্যতম 'জোহানে বিহা'। এই দুইটিকে এই-ধরণের গল্পের টাইপ বলা যাইতে পারে; নারীর-মনে[৫] ভালবাসার অপমান, প্রেমাস্পদের বিশ্বাস-হীনতা ও নিষ্ঠুরতা, ভগিনীর সপত্নীভাব, নারীচিত্তের স্বাভাবিক অভিমান,—সমস্ত ছাপাইয়া জয়ী হইয়াছে নারীচিত্তের মৌলিক contrariness ও অভিমান,

[১] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ফাল্গুন ১৩২৯; 'বিচার' নামে 'দিন-মজুর'-এ (১৯৩২) সঙ্কলিত।
[২] ঐ কল্লোল বৈশাখ ১৩৩০, 'জননী' নামে দিন-মজুরে। [৩] ঐ ঐ আশ্বিন ১৩৩০, দিন-মজুরে।
[৪] ঐ ঐ মাঘ ১৩৩০, ঐ। [৫] প্রথমপ্রকাশ কল্লোলে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০; 'বিজয়িনী' নামে দিন-মজুরে সঙ্কলিত।

উৎসারিত হইয়াছে তাহার পাথর চাপা ভগিনীস্নেহ। বোন টুর্নী ভুলির স্বামী পীরু-মাঝিকে ভুলাইয়াছে। বাধা দিতে গিয়া ভুলি স্বামীর কাছে অপমানিত হইয়াছে, শেষে মারও খাইয়াছে। ভোলাকে সে পীরুর বিরুদ্ধে লাগাইল, তবুও পীরুর কাছে ভোলার পরাজয়ে সে দুঃখ বোধ করিল না। এমন সময় সে শুনিল যে আড়কাটি টুর্নীকে খুঁজিতেছে; "সে নাকি আসামে কাজ্ করতে যাবেক্।"

ভুলি তাড়াতাড়ি আড়্কাঠির নিকট গিয়া বলিল,—কাথে খুঁজ্ছিস্ হে?

লোকটা তখন ষ্টেশনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, বলিল, — টুর্নী মেঝেন্কে। কোথায় আছে বল্তে পারিস্?

ভুলি তাহার হাত ধরিয়া আর একটু সরাইয়া লইয়া গিয়া বলিল, — টুর্নী আমারই বোন্, সে যাবেক্ নাই। চল্ আমি যাব।

লোকটা বলিল, — বাঃ তাকে যে পঁচিশটা টাকা দিয়েছি।

— আমাকেও ত দিথিস্? আমি লিব নাই, চল্।

আড়কাঠি সানন্দে বলিল, — চল্ তবে ইষ্টেশনে।

ভুলি তাহার সহিত ষ্টেশনে আসিয়া দেখিল, আরও কুড়ি পঁচিশজন কুলি-কামিন সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় তাহারাও আসাম-যাত্রী।

ট্রেনখানা আসিয়া দাঁড়াইল। ভুলির মনে হইতেছিল, কতক্ষণে সে ট্রেনে চড়িয়া চলিয়া যাইবে! সে ত আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। সকলের আগে ট্রেনে গিয়া বসিল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ভুলির চোখ দুইটা এতক্ষণে ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। দূরে পলাশবনের ভিতর দিয়া টুর্নী ছুটিতে ছুটিতে ষ্টেশনের দিকে আসিতেছিল। ভগিনীকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া ভুলি জানালার পাশে সরিয়া বসিল।

ভুলির চোখে জল দেখিয়া একটা সাঁওতালের মেয়ে বলিল, — কাঁদছিস কেনে?

> ভুলি চোখের জল মুছিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল,— দ্যুৎ কাঁদ্‌ব কেনে লো?

জোহানের-বিহা-র[1] নায়িকা সুখী নারীর-মনের ভুলির মত নয়। খোঁড়া জোহানের সঙ্গে তাহার বিবাহ সামাজিক আবরু-রক্ষার জন্য। বিবাহের পরেও সে স্বামীর মর্য্যাদা রাখিয়া চলে নাই, তাহাকে ভালোবাসা তো দূরের কথা। তবুও জোহানের অপমৃত্যুতে তাহার শোক যুক্তিসঙ্গত না হইয়াও তাহার অন্তরের নারীপ্রকৃতিকে, তাহার মৌলিক মানবতাকে অনপেক্ষিতভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে।

অবান্তর ভূমিকাগুলি সমান উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। জোহানের "মেজ-ভাই বোহান্ খাদের নীচে কয়লা কাটে। ছোট ভাই মোহান্ তখন গাড়ি ঠেলে। ছুটি পায় সন্ধ্যাবেলা, পূবের সূর্য্য পছিতে,— বেলা তখন 'লিছি-লিছি'।" "দু'নম্বর ধাওড়ার সুমুখে প্রকাণ্ড একটা দেশী কুলের গাছ; ··· সকালে সেই ন্যাড়া কুল-গাছের তলায় বসিয়া জোহান্ রোদ পোহায়, বিকালে মদ খায়, আর নেশার ঝোঁকে আপন মনেই গান করে— "। ছোট-ভাইদের রোজগারের পয়সায় পঙ্গু বড়-ভাই মৌজ করিয়া যদি তাহার উপর আবার বিবাহ করিতে চায় তবে অন্যায় কথা বটে। উপরন্তু মেজো-ভাই বোহানের মেজাজ ছিল একটু চড়া, এবং জোহানের মনেও নিজের অঙ্গহীনতার জন্য লজ্জা ছিল; তাই তাহার বিবাহপ্রসঙ্গে ভাইয়ের ঠাট্টা সে প্রসন্ন মনে লইতে পারিত না। সে ভাবিত,

> 'আমার বিয়া হবেক্ শুনে' শালার হিয়া গেল ফেটে! বাদেই মরুল শালা···ভাই না আমাব ইয়ে! হবেক্ নাই? আমার হবেক্ এগুতে,—আমি বড় ভাই। তাবাদে তুদের। হয় হবেক্ না হয় না হবেক্। তাতে আমার কি? তাই বলে' আমার বৌটি ত আর তুখে দিছি নাই রে শালা হারামজাদা বেটা খচ্চর!'···'মুংরা মাঝির

[1] কালি-কলম বৈশাখ ১৩৩৩। গল্পটি সংক্ষিপ্ত ও ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া 'বিবাহ' নামে দিন-মজুরে সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল গল্প সংক্ষিপ্ত রূপে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; পাত্রপাত্রীর নাম-পরিবর্ত্তনও সুসঙ্গত হয় নাই। বর্ত্তমান আলোচনায় কালি-কলমে প্রকাশিত কাহিনী গ্রহণ করিয়াছি।

মিছা কথা? মাইরি আর কি! তুর কথাতেই! অত অত মদের দাম লাগে না? ছাগলটো দিলম্ তবে অম্‌নি-অম্‌নি?' যাক্ এতদিনে বুঝা গেল। এই তিন-ভেইয়াদের বড় ছাগলটা…তাহা হইলে হারায় নাই।

জোহান্ চলিয়াছে সিদ্ধেশ্বরী ধাওড়ায় মুংরা মাঝির কাছে বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি করিতে। "সাইডিং-লাইনের ওপারে গাদা-করা কতকগুলা কয়লার পাশে ছোট ভাই মোহানের সঙ্গে দেখা। হাতে দুইটা মোটা-মোটা রূপার বালা,—অন্ধকারে মন্দ দেখায় না। শিকে-ঝোলান কেরোসিনের মগ্-বাতিটার মুখে ভর্‌ভর্ করিয়া বিস্তর ধোঁয়া বাহির হইতেছিল। দাদাকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'ওকাতেম্ চালাঃ' আ?—অর্থাৎ যাস্ কোথা? জোহান্ বলিল, 'ছাগল খুঁজতে।' মোহান্ বলিল, 'আঁধারে যাস্ না; তুঁই ঘরকে চল্।' 'না, দেখে আসি।' 'ছাগল এসেছে। তুঁই জানিস না দাদা।' 'জানি, জানি—।'—বলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে জোহান্ আগাইয়া গেল।" অনেকক্ষণ পরে জোহান্ ফিরিল। দাদার জন্ম মোহানের তখনো ঘুম আসে নাই; "ধাওড়ার চালায় মোহানের লাঠির শব্দ হইতেই ঘরের ভিতর হইতে ছোট ভাই মোহান্ বলিয়া উঠিল, 'কেনে গেলি আঁধারে আঁধারে? ছাগল ত তখন এসেছিল।" বোহানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, বলিল, "হুঁঃ! ছাগেল খুঁজতে যেছে নয় আরও-কিছু করতে…"।

বিবাহের পর মেজ-ভাই দাদাকে বলিল, "হেথা আর রইবি কিস্‌কে? বিয়া কর্‌লি, বেশ কর্‌লি; ইবারে লে মেয়ে লিয়ে—চল্ ঘর্‌কে।" জোহান্ উত্তর দিল, "হঁ রে হঁ,—তুঁই চুপ্ কর্! বিহুটো খুব ভাল তুর্।" জোহান কনের বাড়ীতেই রহিয়া গেল, কেননা তাহার শ্বশুরের ঘরকন্না দেখে কে। বিদায়ের সময়

মোহান্ অনেকক্ষণ হইতে বলি-বলি করিয়া এইবার একটা ঢোক্ গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি আবার কখন আস্‌ব বায়হা?' বলিতে বলিতে ডাগর-ডাগর চোখ দুইটা তাহার ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল।

জোহান্ বলিল, 'হঁ আস্‌বি,—এই আমি…এই…বলে' পাঠাব।'

মোহান্ নীরবে ঘাড় নাড়িল।

বোহান্ বলিল, 'হঁ, বলে' পাঠাবেক্ উ, তবেই হইছে! দেলা আ!' জোর করিয়া মোহানের হাতে ধরিয়া সে তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। চলিতে চলিতে মোহান্ দু'তিনবার ফিরিয়া তাকাইল। 'আসি তা হ'লে বাইহা?'

জোহানের কাছ হইতে কোনও জবাব পাওয়া গেল না।

শৈলজাবাবুর অসাধারণ সাঁওতালি গল্পগুলি সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফল খুব ভাল হয় নাই; ইহার লেখা অন্য গল্পগুলির মাধুর্য্য আজ অবধি প্রায় সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।

'নারীমেধ-'এর (১৩৩৫) গল্প তিনটিতে সমাজ-সংসারের পাথর-চাপা বঞ্চিত নারীহৃদয়ের মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডি পরিপূর্ণ বাস্তব ও নিরতিশয় তীব্র রূপ লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম গল্প 'নারীমেধ'-এর অনতিশয়িত নিষ্ঠুর বাস্তবতা আমাদের সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। দ্বিতীয় গল্প 'যখের ধন' বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে একটি।

'বধূবরণ'-ও[১] গল্প শৈলজাবাবুর একটি বিশিষ্ট গল্প। কাহিনীর পরিকল্পনায় এবং নারীবিদ্বেষী ননীমাধবের মনোবৃত্তির বিকাশ ও পরিণতির বর্ণনায় লেখকের অভিজ্ঞতার সূক্ষ্মদর্শিতার ও সহৃদয়তার বিশেষ পরিচয় রহিয়াছে। তাহার স্বার্থ-পর খামখেয়ালি ও নিষ্ঠুর মনোবৃত্তির পিছনেও যে মৌলিক মানবিকতা ক্রিয়াশীল ছিল তাহা অনাবৃত হইয়াছে গল্পের উপসংহারে। গৌরীর ট্রাজেডি যাহা লেখক কথায় ব্যক্ত করেন নাই, তাহা উহ্য থাকিয়া নিষ্ঠুর উপসংহারে বিষাদঘন কঠিন শিল্পরূপ পাইয়াছে;

স্বল্পালোকিত সেই নির্জ্জন কক্ষের বাতায়ন-পথে মুখ বাড়াইয়া ননীমাধব একবার ষ্টেশনের দিকে তাকাইল। কেরোসিন-বাতির একটুখানি আলো গৌরীর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বাক্সের উপর সবুজ রঙের শালখানি গায়ে দিয়া তখনও সে ঠিক তেমনিভাবে পাষাণ-মূর্ত্তির মত বসিয়া। স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় অন্ধকারের দিকে ব্যাকুল একাগ্র দৃষ্টি তাহার তখনও নিবদ্ধ।

[১] 'বধূবরণ'-এ সঙ্কলিত।

এই বয়ঃসন্ধিগতা কিশোরীর—এবং শুধু এই কিশোরীর কেন, সমগ্র নারীজাতির নিষ্ঠা ও ভালবাসার উপর আস্থা তাহার অনেকদিন হইতেই নাই। আজও তাই সে তাহার দৈনন্দিন ঘটনার মতই অত্যন্ত সহজভাবে গৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত নীরবে গহনার বাক্সটি কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু এমনি মজা, মুখখানি তাহার চোখের সুমুখ হইতে যতই ঝাপ্‌সা হইয়া আসে, ননীমাধবও জানালার বাহিরে তত বেশি করিয়া তাহার গলা বাহির করিয়া দেয়।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ!

গাড়ীর বেগ ক্রমশ দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে লাগিল। ননীমাধবের চোখের সুমুখ হইতে গৌরীর সেই একাগ্র উন্মুখ দুটি চক্ষু অদৃশ্য হইল, মুখখানি অদৃশ্য হইল, দেহ অদৃশ্য হইল, সবুজরঙের শাল, শালের নীচে গৌরীর দুটি অলক্তকরঞ্জিত সুকোমল শুভ্র পা, ঝিনের তোরঙ্গ, কেরোসিনের আলো—দেখিতে দেখিতে পশ্চাতের অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

রবীন্দ্র-শৈলীর সার্থক অনুবর্তন গল্পটিকে রসসমৃদ্ধ করিয়াছে।

শৈলজানন্দের উপন্যাস বা বড়-গল্পগুলি তাঁহার ছোট-গল্পের রসরূপ ও সার্থকতা পায় নাই। এগুলিতে জীবনের অন্বীক্ষা অপেক্ষা আদর্শদৃষ্টির পরিচয়ই বেশি। তবে যেগুলি পুরাপুরি সংসার- অথবা সমাজ-চিত্র সেগুলির কাহিনীতে সম্পূর্ণতা না থাকিলেও চরিত্রচিত্রণে উজ্জ্বল রসসৃষ্টি হইয়াছে। এই-ধরণের বোধ করি শ্রেষ্ঠ গল্পচিত্র হইতেছে 'ষোল আনা'।[১] ইহাতে উত্তরপশ্চিম রাঢ়ের জীবনচিত্র যথার্থ পরিবেশে ও নিখুঁত সংলাপে লেখকের অভিজ্ঞা-সহৃদয়তা-সংযমের spot light-এ ক্ষণোজ্জ্বল দীপ্তি লাভ করিয়াছে। কাহিনীক্ষীণ গল্পটিতে যেন গ্রাম্য জীবনের অ-রোমান্টিক বাস্তবরসায়িত pageant বা শোভাযাত্রা চলিয়াছে।

শৈলজাবাবুর বাস্তবদৃষ্টি যথার্থ জীবন-অন্বীক্ষা; ইহাতে আতিশয্য নাই, কৃত্রিমতাও নাই। ভাল-মন্দের টানাপোড়েনে নিয়ত যে জীবনপট বোনা হইতেছে তাহারি কয়েকটি রসোজ্জ্বল খণ্ড ইহার শ্রেষ্ঠ রচনায় পাইতেছি।

১ প্রথমপ্রকাশ বিজলী ফাল্গুন ১৩৩১-বৈশাখ ১৩৩২।

নির্ঘণ্ট